ছোটদের বিজ্ঞানকোষ

প্রথম খণ্ড

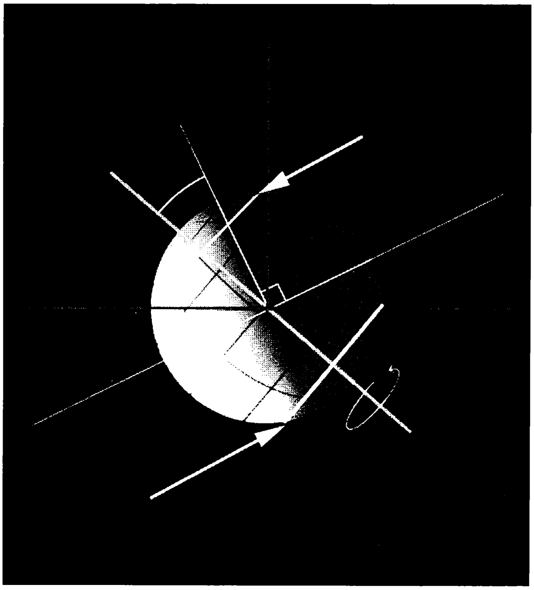

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ : ১ম খণ্ড

বাশিশুএ ৬৫০

প্রকাশক মো. তাজুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে ক্রিডেন্স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ১৭ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১৬, জুন ২০০৯।

মূল্য ৳ ৫২৫.০০

CHOTODER BIJNANKOSH (Children's Science Encyclopaedia) Vol-1. Publisher Md. Tazul Islam, Director, Bangladesh Shishu Academy, Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication June 2009.

Price Tk. 525.00
US $ 27.00

ISBN : 984-70076-0650-4

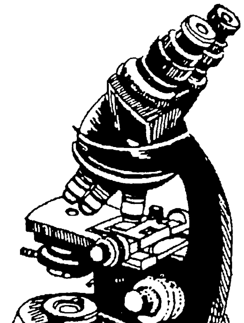

প্রচ্ছদ শিল্পী হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন হাশেম খান, মাহ্‌মুদা আখতার মনি, গোলাম রব্বানী শামীম, গোপেশ মালাকার, সিরাজুল হক

আলোকচিত্র রিয়াজ আহমেদ, কনক খান, আবু তাহের, টিপু কিবরিয়া

প্রথম খণ্ড

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ

অ থেকে ত

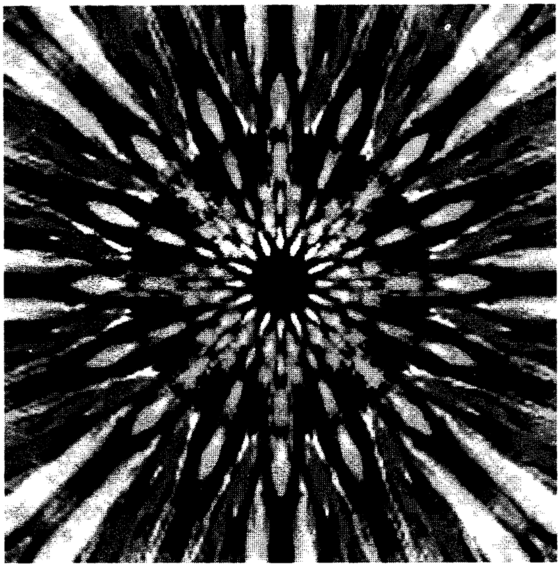

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী– ভূগোল, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পরিবেশবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা

আহমদ রফিক– চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান

শাহজাহান তপন– পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত

তপন চক্রবর্তী– উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান

সুব্রত বড়ুয়া– শৈলী সম্পাদনা

হাশেম খান– শিল্প সম্পাদনা ও বইনকশা

ব্যবস্থাপনা সহযোগী

সুজন বড়ুয়া

প্রকাশনা সহযোগী

মো. নাজিমউদ্দিন

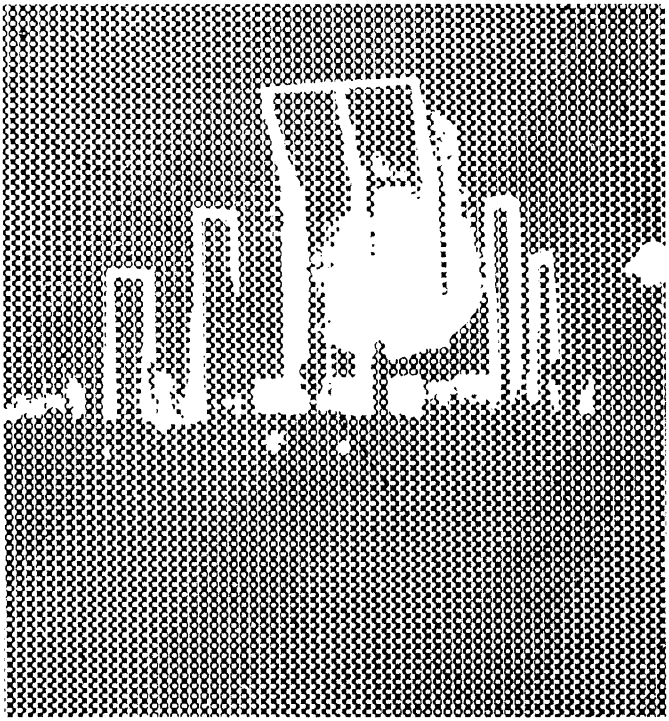

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা

সর্বস্তরে শিক্ষা অর্জনের জন্য
মাতৃভাষাকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করব ।
বিজ্ঞানচর্চার জন্য অন্যান্য ভাষা যত প্রয়োজন
তা আয়ত্ত করব ।

প্রসঙ্গ-কথা

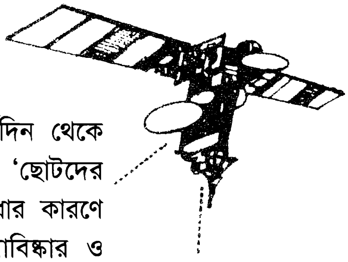

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি বিজ্ঞানকোষ গ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছিল। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেশ ক'বছর আগে। নানা অসুবিধার কারণে কোষগ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। তবে এই সময়-পরিসরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে যতদূর সম্ভব সেই পরিবর্তন ও অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত সংযোজনের চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অংশে পরিশিষ্ট হিসাবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত ও উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের কিছু নতুন ভুক্তি-বিষয় সংযোজিত হয়েছে। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছোটদের বিজ্ঞানকোষ গ্রন্থের ভুক্তি-বিষয় নির্বাচনে জোর দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়-অনুষঙ্গের উপর।

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তর ক্ষয় ইত্যাদি বিষয় যখন মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বিজ্ঞানমনস্ক নবীন প্রজন্ম গঠনের কোনো বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে নানা কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। এমন অনুকূল সময়ে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' প্রকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

যে কোনো ধরনের বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের জীবনকথা 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ'-এর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের কাছে পরিবেশন করার বিষয়ে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অসম্পূর্ণতা হয়তো রয়ে গেছে। তথ্যগত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে এ ধরনের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ'কে আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার প্রত্যাশা রইল।

'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' প্রণয়ন ও প্রকাশে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, লেখক ও শিল্পীবৃন্দসহ যেসব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আজকের এই শুভ মুহূর্তে আমার পূর্বতন পরিচালকদের স্মরণ করছি, যাঁরা ছোটদের বিজ্ঞানকোষ গ্রন্থের পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাকে এই বিশেষ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' পাঠের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরেরা বিজ্ঞানচর্চায় কিছুটা উদ্বুদ্ধ হলেও আমরা আমাদের এই আয়োজনের সার্থকতা খুঁজে পাব।

মো. তাজুল ইসলাম
পরিচালক
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

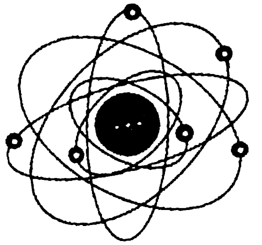

ভূমিকা

www.boighar.com

মানুষ তার জ্ঞানসাধনা এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও কারিগরি কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসভ্যতার সৃষ্টি করেছে। আর নিরন্তর সে সভ্যতার প্রসার ও উন্নয়নসাধন করে চলেছে তার অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে জ্ঞানের দ্বারা। সময় যতই এগিয়ে চলেছে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ততই আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে, মানুষ আরো বেশি জানতে পেরেছে, জ্ঞানের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষের এই জ্ঞানসাধনার ইতিহাসই মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাস। অতীতের মানুষের জ্ঞানের চেয়ে আজকের মানুষের জ্ঞান বেশি; ভবিষ্যতের মানুষের জ্ঞান হবে আরো বেশি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেখানে শেষ করেছেন আমরা সেখান থেকে শুরু করেছি। আমরা যেখানে শেষ করব আমাদের উত্তরসূরিরা সেখান থেকে শুরু করবে। এভাবেই জ্ঞান ক্রমপুঞ্জিত হয় এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বিশাল হয়ে ওঠে। আর সে জ্ঞান ব্যবহার করার জন্যও প্রয়োজন হয় বিশেষ দক্ষতা।

জ্ঞান আহরণের একেবারে সূচনালগ্নে মানুষ যা দেখেছে বা শুনেছে কিংবা স্পর্শ বা অন্য কোনোভাবে জেনেছে সেসবই ছিল মানুষের আহরিত জ্ঞান। ক্রমে তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে, চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয়েছে এবং সে ভাবতে শিখেছে কোন কারণে কী হয় অথবা কী হতে পারে। এভাবে একজন যা জেনেছে অন্যজনকে বা অন্যদের তা জানাতে চেয়েছে। তার পর চেষ্টা করেছে উত্তরকালের মানুষের জন্য তা রেখে যেতে। প্রথমে তা সম্ভব হয়েছে শ্রুতির মাধ্যমে। একজন যা শুনেছে তা আরেক জনকে জানিয়েছে এবং এভাবেই প্রজন্ম-পরম্পরায় তা উত্তরকালের মানুষের জ্ঞানসম্পদে পরিণত হয়েছে।

লিপি আবিষ্কার মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। মানুষ যখন লিখতে শিখল, তখন জ্ঞানের কথা লিখে রাখার সুযোগ তৈরি হল। ক্রমে জ্ঞানের বিশাল সম্পদ বিষয়ের ভিত্তিতে ভাগ করে রাখতে শিখল তারা। বাস্তব ব্যবহারের সঙ্গে সংগতি রেখে সেসব বিষয়ের নামকরণ করা হতে লাগল, যেমন– সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত ইত্যাদি। আর সেই সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারল তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের তথ্যগুলি শৃঙ্খলার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে না পারলে উত্তরকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এভাবেই পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কোষগ্রন্থ রচনার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। প্রথম দিকে কোষগ্রন্থ ছিল মূলত সঙ্কলনগ্রন্থ। তাতে বিন্যাসের কোনো একক নির্দিষ্ট নিয়ম যে অনুসৃত হয়েছে তা নয়। সংহিতা-রচনাকারী প্রধানত নিজ বিবেচনা অনুযায়ীই বিষয়বস্তুর বিন্যাস-সাধন করতেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বিষয়বিন্যাসের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে ও আরব দেশে রচিত ভেষজসংহিতা ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে

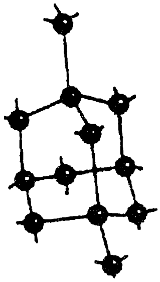

দীর্ঘকাল ধরে ভেষজবিদ্যা অধ্যয়ন ও অনুশীলনে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে প্রাচীন কালের এই কোষগ্রন্থ বা সংহিতা ছাড়াও বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞান আয়ত্ত করেছে তার কথাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখার চেষ্টাও মানুষ করে আসছে সেই বহু আগে থেকেই। এ ধরনের বইকে বলা হয় বিশ্বকোষ, ইংরেজিতে এনসাইক্লোপিডিয়া (encyclopaedia)। ইংরেজি ভাষায় প্রথম এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে। কিন্তু মানুষ বিশ্বকোষ রচনার চেষ্টা শুরু করেছে তারও বহু আগে থেকেই, যখন এমনকি কাগজের ব্যবহারও মানুষ শুরু করতে পারে নি। রোম দেশের পণ্ডিত প্লিনী দ্য এল্ডার (২৩-৭৯ খ্রি.) সেই বহুকাল আগে প্রথম বিশ্বকোষ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পরেও ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ও তার সামান্য পরে আরবি ও চৈনিক ভাষায় অনেক পণ্ডিত বিশ্বকোষ ধরনের বই লিখেছেন বলে জানা যায়। বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় রচিত সবচেয়ে সুখ্যাত বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। এখনো প্রায় প্রতি বছর এর নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' বেরোবার বছরখানেক পর বেরিয়েছিল ফরাসি ভাষায় বিখ্যাত জ্ঞানকোষ 'অঁসিক্লোপেদি'। এ বইটি সে সময়ে বুদ্ধিজীবী সমাজে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এ দু'টি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় বহু বিশ্বকোষ বেরিয়েছে। আবার সাধারণ বিশ্বকোষ ছাড়াও জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিয়ে বিশেষ ধরনের বিশ্বকোষও বেরিয়েছে অনেক।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ ধরনের বই লেখার প্রথম চেষ্টা হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ইংরেজ পাদ্রি উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি ১৮১৯-২১ সালে 'বিদ্যাহারাবলী' নামে দু'খণ্ডে প্রথম বাংলা বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। এ বই সঙ্কলনে তিনি ইংরেজি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন। ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' বইটি বিশ্বকোষ হলেও এতে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ, যেমন– ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, চর্ম, নখ, কেশ, মাংসপেশি, উদর, প্লীহা, ফুসফুস, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল। তবে ফেলিক্স কেরির ভাষা ছিল অত্যধিক সংস্কৃতঘেঁষা। সেজন্য 'বিদ্যাহারাবলী' যখন প্রকাশিত হয় তখন বেশ প্রশংসা পেলেও পরবর্তী কালে তা সাধারণ পাঠকদের কাছে তেমন আদরণীয় হয় নি। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের আজও মনে রাখা উচিত যে, বাংলা ভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ রচনার প্রয়াস ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় পরিবেশন করার লক্ষ্য নিয়েই।

বাংলা ভাষায় বর্ণমালার অনুক্রম অনুসরণ করে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ বা বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় সেটি বেরোয় ১৯০২ থেকে ১৯১১ সালে 'বিশ্বকোষ' নামে– নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামর্ণব-এর সম্পাদনায় ২২ খণ্ডে। ছোটদের জন্য বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় ঢাকার বিক্রমপুরের যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় 'শিশু ভারতী' নামে ১০ খণ্ডে– ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে। তবে বইটিতে বিষয়গুলি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয় নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় ৪ খণ্ডে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম-এর সম্পাদনায় ১৯৭২-৭৬ সালে 'বাংলা বিশ্বকোষ' নামে। ১৯৯৫ সালের জুন মাসে ৫ খণ্ডে 'শিশু-বিশ্বকোষ' প্রকাশ করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। অন্যদিকে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে 'বিজ্ঞানকোষ'– ৫ খণ্ডে। ১৯৫৪ সালের জুলাই

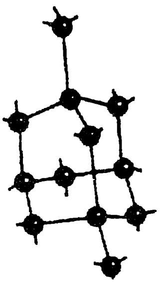

[illegible] প্রকাশিত শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সঙ্কলিত 'বিজ্ঞান ভারতী' সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞানকোষ। তবে সঙ্কলক এটিকে বিজ্ঞানকোষ বলে দাবি করেন নি, তাঁর দাবি বইটি বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান। ১৯৯৫ সালে 'শিশু-বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হলে সে বইটি পাঠকমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হওয়ায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃপক্ষ ১৯৯৯ সালে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়গুলোকে ৪টি প্রধান বিভাগে ভাগ করে ভুক্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে চারটি প্রধান বিভাগ হল (ক) ভূগোল, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পরিবেশবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা, (খ) চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান, (গ) পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত এবং (ঘ) উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান। এ চারটি বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী, ডা. আহমদ রফিক, ড. শাহজাহান তপন ও জনাব তপন চক্রবর্তী। শৈলী সম্পাদক ও শিল্প সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব সুব্রত বড়ুয়া ও শিল্পী হাশেম খান।

ছোটদের বিজ্ঞানকোষের ভুক্তি নির্বাচন ও ভুক্তি রচনা এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকাশিত শিশু-বিশ্বকোষকেই আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করা হয়েছে প্রায় সর্বতোভাবে। এসব ক্ষেত্রে নীতি হিসাবে যা অনুসরণ করা হবে বলে ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল তা হল

- বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রধান বিষয়গুলোকে গ্রহণ করা হবে যা মোটামুটিভাবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত পড়ানো হয় এবং এর বাইরে সেসব বিষয় যেগুলো আমাদের জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত;
- বিষয়াবলি উপস্থাপনের ভঙ্গি কোনোভাবেই পাঠ্যপুস্তকের রচনার মতো হবে না এবং চেষ্টা করা হবে যথাসম্ভব সহজভাবে সরল বর্ণনার মাধ্যমে তা তুলে ধরতে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয় উপস্থাপনকালে যথাযথতা রক্ষার স্বার্থে পরিভাষা ব্যবহার করা হলেও পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল শব্দও যথাসম্ভব বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হবে এবং পরিভাষা না পাওয়া গেলে মূল ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে ব্যবহার করা হবে।
- বিষয় নির্বাচনে বাংলাদেশের সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে;
- বাংলা বানানের সমতা বিধানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বানানের যে নিয়ম প্রবর্তন করেছে তাই অনুসরণ করা হবে, যেহেতু যাদের জন্য এ বই লেখা তারা সেই বানানেই বেশি অভ্যস্ত;
- বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের ওপরই প্রাধান্য দেওয়া হবে;
- ভুক্তিসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত চিত্রাবলি দেওয়া হবে; এবং সামগ্রিকভাবে বইটি যেন শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়াবলির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং নানা বিষয়ে জানার আগ্রহের নিবৃত্তি ঘটাতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে।
- একথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে, অভীষ্ট লক্ষ্য সব সময় অর্জিত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা কোনো ক্ষেত্রেই শতভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিকভাবে এতে ভুক্তিসংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা ১২৫০ ধরা হলেও শেষ পর্যন্ত সংখ্যার নির্দিষ্টতা অটুট থাকে নি। চূড়ান্তভাবে এতে ভুক্তির সংখ্যা প্রায় ১২০০। অন্যদিকে ভুক্তি রচনায় সর্বত্র সমতা বজায় থেকেছে

এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। আরো একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত হবে যে, এতে বেশ কিছু ভুক্তি 'শিশু-বিশ্বকোষ' থেকে হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে শ্রম ও সময় সাশ্রয়ের কথা মনে রেখে।

২.

'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। সে সময়ে ভুক্তি রচনা, প্রাথমিক সম্পাদনা ও অক্ষরবিন্যাসের কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও অপরিহার্য কিছু বিঘ্ন এসে উপস্থিত হওয়ায় বইটি প্রকাশের কাজ প্রায় দশ বছর বিলম্বিত হয়েছে। বিজ্ঞানের নিরন্তর অগ্রযাত্রার পথে দশ বছরে অনেক বিষয়ই নানাভাবে প্রযুক্তি ও তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। তার সব কিছু এখানে গ্রহণ করা গেছে এমন দাবি আমরা করতে পারব না। সবচেয়ে বড় কথা হল বইটির অন্যতম বিভাগীয় সম্পাদক ড. আবদুল্লাহ আল-মুতীকেও আমরা ইতোমধ্যে হারিয়েছি। বাংলাদেশের বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর অভাব কখনো পূরণ হবে বলে আমরা মনে করি না। তিনি বেঁচে থাকলে 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' আরো অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারত বলে আমাদের বিশ্বাস, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ আমাদের কম ক্ষতি নয়।

বইটির ভুক্তিবিন্যাস এবং অন্যান্য বিষয়ে যে নিয়ম আমরা অনুসরণ করেছি সংক্ষেপে তা হল

- ভুক্তিগুলো সাজানো হয়েছে বাংলা বর্ণমালার আদ্যক্ষর অনুসারে, বাংলা অভিধানে যে নিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে সেইভাবে।
- নামের ভুক্তি সাজাবার ব্যাপারে নামের যে অংশটা বেশি চলতি সেটা আগে ধরে সাজানো হয়েছে। যেমন 'আলবার্ট আইনস্টাইন'-এর বেলায় আগে এসেছে আইনস্টাইন (আইনস্টাইন, আলবার্ট); কিন্তু 'জগদীশচন্দ্র বসু'র বেলায় আগে এসেছে জগদীশচন্দ্র এবং পরে এসেছে বসু।
- অনেক সময় কোনো ভুক্তিতে এমন বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাবে যে বিষয়ে এই বিজ্ঞানকোষেই পৃথক ভুক্তি আছে। সে ক্ষেত্রে সে শব্দের পাশে (দ্র) লিখে দ্রষ্টব্য বোঝানো হয়েছে, যার অর্থ– এই বিষয়ে পৃথক ভুক্তি দেওয়া হয়েছে। আবার কখনো একটি ভুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্য ভুক্তির মধ্যে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মোটা হরফে সেই ভুক্তি শিরোনাম লিখে বিস্তারিত আলোচনা যে ভুক্তিতে পাওয়া যাবে তার শিরোনামের পাশে দ্র দিয়ে দ্রষ্টব্য নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন 'গ্রহাণুপুঞ্জ' সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো ভুক্তিতে আলোচনা করা হয় নি, প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে 'গ্রহাণু' ভুক্তিতে; তাই 'গ্রহাণুপুঞ্জ' স্বতন্ত্র ভুক্তি হিসাবে মোটা হরফে লিখে তার পাশে গ্রহাণু দ্র লেখা হয়েছে।
- বছর গণনার ক্ষেত্রে খ্রিস্টাব্দ বোঝাতে 'সাল' ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রতিটি ভুক্তির শেষে সেই ভুক্তির লেখকদের নামের আদ্যক্ষর দেওয়া হয়েছে। লেখকের নাম জানার জন্য বইয়ের শুরুতে নাম-সংক্ষেপের সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩.

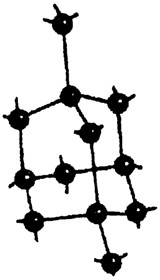

'শিশু-বিশ্বকোষ'-এর মতো 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ'-এরও বৈশিষ্ট্য হল কোনো দেশি বা বিদেশি বিজ্ঞানকোষকে অনুসরণ করে এটি তৈরি করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্য অন্যান্য বই থেকে তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সার্বিকভাবে কোনো হুবহু অনুসরণ এতে ঘটে নি। এতে যাঁরা ভুক্তি লিখেছেন তাঁরা নিজেদের অধ্যয়ন ও চর্চার বিষয়টি নিয়েই লিখেছেন। তাঁদের লেখা ব্যাপক পরিমার্জনার প্রয়োজনও হয় নি, তথ্য ও ভাষার সমন্বয় সাধনের জন্যই কেবল তাতে কিছুটা সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে। শিল্পী হাশেম খানের নেতৃত্বে এক দল শিল্পী বইটির বিভিন্ন ভুক্তির উপযুক্ত চিত্রসজ্জা সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস ও নিরলস শ্রম ছাড়া এ বইটির প্রকাশ সম্ভব হত না।

'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ'-এর মতো বই রচনা ও প্রকাশ একটি দুরূহ কাজ। প্রথম প্রয়াসেই সে কাজ শতভাগ সফল হবে এমন আশা করা উচিত নয়। আমাদের সন্তুষ্টি এখানে যে, এ কাজটি আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি, নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও। এ বইটি পড়া বা ব্যবহার করার সময় যদি কোনো ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতি কারো চোখে পড়ে তাহলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃপক্ষকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যাবে। বইটির গুণগত মান আরো উন্নত করার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ থাকলে তাও সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আমরা এখন একুশ শতকের প্রথম দশক পেরিয়ে যাচ্ছি। নতুন নতুন সঙ্কট ও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। সেগুলোর উত্তরণ ও সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। আমরা চাই, বিজ্ঞানমুখী সংস্কৃতির পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হবে এ দেশের শিশু ও কিশোরেরা। 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' তাতে প্রেরণা যোগাতে পারলে আমাদের শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করব।

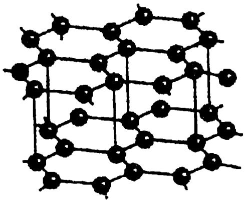

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ						
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ						
ট	ঠ	ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ				
ত	ৎ	থ	দ	ধ	ন					
প	ফ	ব	ভ	ম						
য	য়	র	(রেফ্)	ল						
শ	ষ	স	হ							

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ

অ	অং	অঃ	অঁ	অক	অক্ত	অক্ক	ইত্যাদি	
ক	কই	কউ	কও	কং	কঃ	কঁ		
কক	ককো	ককি	ককী	ককু	ককূ	ককৃ	ককে	ককৈ
	ককো	ককৌ	কক্					
কক্ক...	কক্ত...	কক্ব...	কক্য...	কক্র...	কক্ল...	কক্ষ		
কখ...	কঠ...	কড...	কড়...	কঢ...	কঢ়...	কণ...	কত...	কৎ...
	কথ...	কদ...	কধ...	কন...	কপ...	কফ...	কব...	কভ...
	কম...	কয...	কয়...	কর...	করৌ...	কর্...	কর্ক...	কর্ক্...
	কর্কট...	কর্হ...						
কল	কশ	কষ	কস	কহ...	কহৌ	ইত্যাদি		

গ. দেশি বা বিদেশি যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশি নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে– পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন– আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুন্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে আলবার্ট, জিগমুন্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (surname বা family name) আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার জগদীশচন্দ্র বসু বা আবদুস সালামকে পেতে হলে বসু বা সালামকে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'জগদীশচন্দ্র' ও 'আবদুস' খুঁজে বের করতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক– 'অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র' ভুক্তির রচনাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, গ্যাস, গ্যাসোলিন শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ এই বিজ্ঞানকোষের নির্দিষ্ট স্থানে উপর্যুক্ত তিনটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ

অ.	=	আলায়হিস্ সালাম
আনু.	=	আনুমানিক
কিমি	=	কিলোমিটার
কেজি	=	কিলোগ্রাম
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	=	খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
ব.	=	বঙ্গাব্দ
মি.	=	মিটার
মিমি	=	মিলিমিটার
রা.	=	রাদি'য়াল্লাহু আন্‌হু
শা.	=	শাসনকাল
স.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সিসি	=	কিউবিক সেন্টিমিটার
সে.	=	সেন্টিগ্রেড / সেলসিয়াস
সেমি	=	সেন্টিমিটার

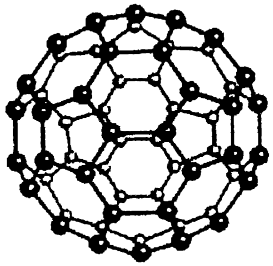

লেখকদের নাম-সঙ্কেত

অ. ব.	=	অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
আ. আ.	=	ড. আলী আসগর
আ. আ. মু.	=	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী
আ. আ. হা.	=	ডা. আফরোজা আখতার হালিদা
আ. কা.	=	আবু কায়সার
আ. ন. ম. আ. র.	=	ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান
আ. নূ. তু.	=	ডা. আব্দুন নূর তুষার
আ. র.	=	ডা. আহমদ রফিক
আ. হ. খ.	=	আবদুল হক খন্দকার
আ. হু.	=	আখতার হুসেন
খু. জা.	=	অধ্যাপক খুরশীদ জাহান
গৌ. র.	=	ডা. গৌতম রক্ষিত
ত. চ.	=	তপন চক্রবর্তী
ফ. মা.	=	ফরহাদ মাহমুদ
বি. ব.	=	বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মা. র.	=	ডা. মাসউদুর রহমান
মু. আ.	=	মুহাম্মদ আলী
মু. ই.	=	ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মু. এ.	=	মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন
মু. হা	=	মুনির হাসান
মো. ই.	=	মোজাহেদুল ইসলাম
রা. জা.	=	রাশেদুজ্জামান
রু. হা.	=	ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন
শ. খা.	=	শরীফ খান
শা. আ.	=	শামসুদ্দিন আহমদ
শা. ত.	=	ড. শাহজাহান তপন
শু. চৌ.	=	ডা. শুভাগত চৌধুরী
স. রা.	=	ড. সত্যব্রত রায়
সা. এ.	=	ডা. সাইফুদ্দীন একরাম
সি. না. হ.	=	ডা. সিকদার নাজমুল হক
সু. ব.	=	সুব্রত বড়ুয়া
সুজ. ব.	=	সুজন বড়ুয়া
সে. শা.	=	সেলিনা শাহজাহান
সৈ. আ. ই	=	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
সৈ. তা. আ.	=	সৈয়দা তাহমিনা আখতার
হা. উ. আ.	=	ডা. হাফিজ উদ্দীন আহমদ
হা. মা.	=	ড. হায়াৎ মামুদ
হো. আ.	=	হোসনে আরা

শুভেচ্ছা

অ

অক্টোপাস (octopus)

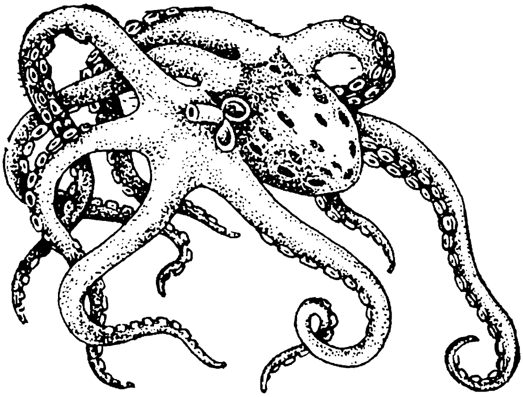

অক্টোপাস শামুক জাতীয় প্রাণী। অক্টোপাসের দেহ গোলাকৃতির। এদের মুখের চতুর্দিকে চার জোড়া পা রয়েছে। প্রতিটি পায়ে দু' সারি করে চোষক থাকে। শামুক জাতীয় প্রাণী হলেও অক্টোপাসের দেহে কোনো শক্ত আবরণ নেই, বরং এদের দেহ বেশ নরম এবং তুলতুলে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ প্রজাতির অক্টোপাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের সবাই সামুদ্রিক প্রজাতি। সবচেয়ে ছোট অক্টোপাস মাত্র ৫ সেন্টিমিটার, অন্যদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অক্টোপাস প্রায় ১০ মিটার লম্বা। এর নাম ডলফিনী অক্টোপাস। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এর বাস। অক্টোপাস নিশাচর ও মৃদু গতিসম্পন্ন প্রাণী। সাধারণ অবস্থায় এরা পা নেড়ে-চেড়ে মৃদু গতিতে সাঁতার কাটে। কিন্তু বিপদে পড়লে এরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। অক্টোপাসের দেহের পেছনে মাথার নিচে একটি নলাকৃতির 'ফানেল' থাকে। এই ফানেলটিকে ওরা জল দ্বারা পূর্ণ করে এবং পরে জোরে তা নিক্ষেপ করে। এতে দেহ প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে যেতে পারে। অক্টোপাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল রঙ বা বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতা। এর ত্বকে 'আঁচিলে'র মতো ফুসকুড়ি থাকে। ত্বকের নিচে অনেকগুলি ক্রোমাটোফোরে (chromatophore) আছে। ক্রোমাটোফোরের মধ্যে নানা রঙের কোষ থাকে। এসব কোষের

সাহায্যেও ওরা দেহের রঙ পাল্টায়। অক্টোপাসের দেহে 'কালি থলে' (ink sac) থাকে। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অক্টোপাস থলের কালি ছুঁড়ে কালো ধোঁয়ার মতো সৃষ্টি করে। কালি শত্রুর ঘ্রাণশক্তি সাময়িকভাবে বিকল করে দেয় এবং শত্রুর সামনে একটি আড়াল সৃষ্টি করে। স্ত্রী-অক্টোপাস প্রায় দেড় লাখ ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা বের হবার পর মা অক্টোপাস মারা যায়। অক্টোপাস ভয়ঙ্কর প্রাণী নয়। ওরা লাজুক ও ভীতু এবং মাংসাশী।

ত. চ.

অক্ষ (axis)

অক্ষ হচ্ছে কোনো বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি কল্পিত সরলরেখা, যার উপর বা যাকে ঘিরে বস্তুটি ঘোরে। যেমন, পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বরাবর একটি সরলরেখা কল্পনা করা হয়, যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। একে পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখা বলে। পৃথিবী তার অক্ষে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরতে ২৪ ঘণ্টা সময় নেয়।

যে রেখা কোনো সুষম বস্তু অথবা চিত্রকে দু'টি প্রতিসম অংশে বিভক্ত করে তাকে অক্ষ বলে। যেমন, বৃত্তের ব্যাস। গণিতে কোনো তথ্যের লেখচিত্র আঁকতে

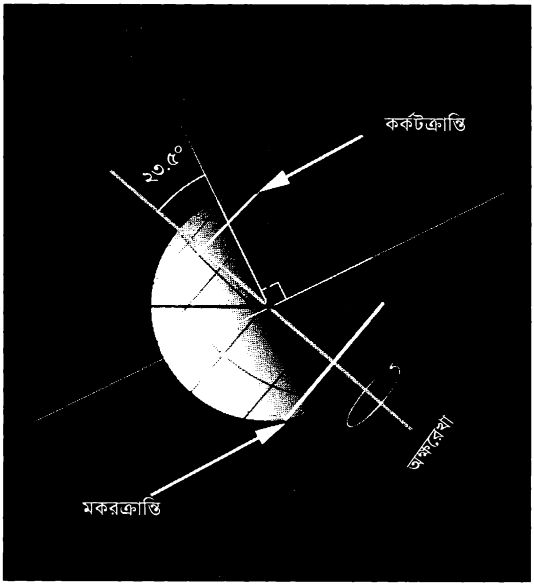

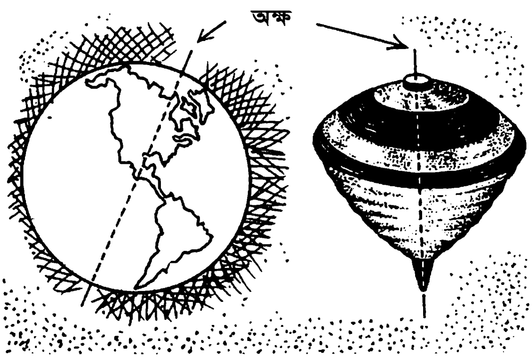

গেলে একটি অনুভূমিক ও একটি উল্লম্ব রেখা এমনভাবে আঁকতে হয় যেন তারা পরস্পরকে ছেদ করে। এই রেখা দু'টিকে অক্ষ বলে। এই অক্ষ দু'টি যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে মূল বিন্দু বলে।

হো. আ.

অক্সিজেন (oxygen)

অক্সিজেন স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ। এটি একটি অধাতব মৌল। প্রতীক O, আণবিক সঙ্কেত O_2। পারমাণবিক সংখ্যা ৮, পারমাণবিক ওজন ১৬। তিন রকম আইসোটোপ বা সমস্থানিক আছে, অক্সিজেন-১৬, অক্সিজেন-১৭ ও অক্সিজেন-১৮। প্রকৃতিতে অক্সিজেন মুক্ত ও যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওজন অনুপাতে ভূ-ত্বকে শতকরা ৪৮.৬ ভাগ এবং বাতাসে মুক্ত অবস্থায় অক্সিজেন আছে শতকরা ২০.৯ ভাগ অর্থাৎ বাতাসের আয়তনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। পানিতে সামান্য দ্রবণীয়। তরল অক্সিজেন ফিকে নীল রঙের হয়।

দহন ও শ্বাস কার্যের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। অক্সিজেন ছাড়া জীবজন্তুর জীবনধারণ অসম্ভব। খাদ্য ও পানির অভাবে আমরা কয়েক দিন বাঁচতে পারি, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচতে পারি না। গাছের সালোকসংশ্লেষণের সময় অক্সিজেন মুক্ত হয়। অক্সিজেন একটি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ। নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত সকল মৌল অক্সিজেনের সাথে যৌগ গঠন করে। অক্সিজেন জারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য মৌলের সাথে অক্সাইড গঠন করে। অক্সিজেন জীবদেহে হাইড্রোজেন, কার্বন ও অন্যান্য পদার্থের সাথে মিলিত অবস্থায় থাকে।

ওজোন অক্সিজেনের একটি বহুরূপ। ঊর্ধ্বাকাশে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন ওজোনে (O_3) পরিণত হয়। রকেট জ্বালানিতে অক্সি-অ্যাসিটিলিন ও অক্সি-হাইড্রোজেন শিখায় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।

ইস্পাত ও তামা, অ্যামোনিয়া, সংশ্লেষিত গ্যাস ও মিথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুতে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কাচ শিল্পেও অক্সিজেনের ব্যবহার রয়েছে। ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকে, খনিতে যে বায়ু থাকে তা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী নয় এবং মহাকাশে, খনিতে ও সমুদ্রতলে শ্বাস নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বায়ু পাওয়া যায় না বলে নভোচারী, খনি শ্রমিক ও ডুবুরিদের সাথে করে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিতে হয়। অক্সিজেন প্রাণিদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং দৈহিক ও মানসিক কাজ করার ক্ষমতা বা শক্তি যোগায়।

অক্সিজেনের তিনটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা গেছে। এগুলি হল অক্সিজেন-১৪, অক্সিজেন-১৫ ও অক্সিজেন-১৯। এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অর্ধায়ু (half-life) খুবই কম।

শা. ত.

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher)

আগুন নেভানোর যন্ত্র। পানি বা রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ একটি বিশেষ ধাতব পাত্র, যা সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য। আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগে এর দ্বারা অগ্নিশিখা আয়ত্তে আনা বা নিভিয়ে ফেলা যায়।

দাহ্য পদার্থ ও আগুনের প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন চার শ্রেণির। আগুনের শ্রেণি অনুসারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র তিন ধরনের–

(১) পানি নির্বাপক পানি দ্বারা পূর্ণ। এই শ্রেণির অগ্নিনির্বাপক সাধারণ দাহ্য পদার্থ কাঠ, কাগজ, কাপড় থেকে উৎপন্ন আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

(২) তরল ও গ্যাস নির্বাপক : কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) বা হ্যালন নামক গ্যাস দ্বারা পূর্ণ। এই শ্রেণির অগ্নিনির্বাপক গ্যাস (দ্র), তেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন (দ্র) প্রভৃতি তরল পদার্থ থেকে উদ্ভূত আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

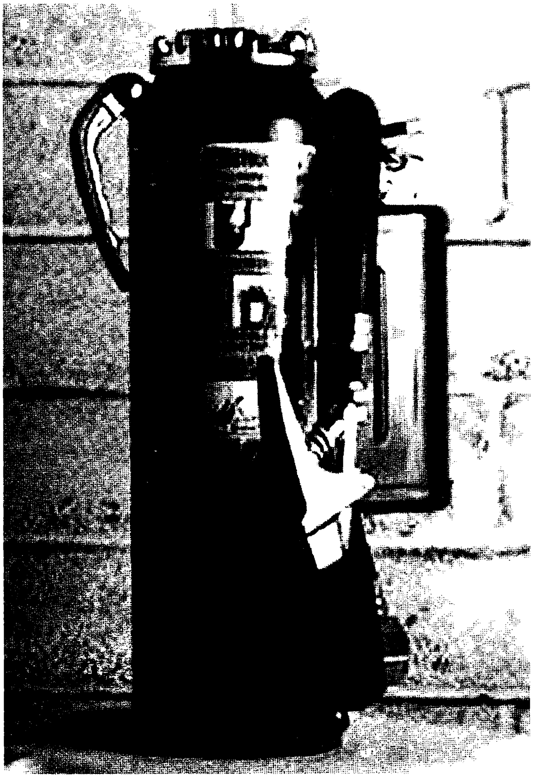

(৩) শুষ্ক রাসায়নিক নির্বাপক রাসায়নিক গুঁড়ো দ্বারা পূর্ণ। এই শ্রেণির অগ্নিনির্বাপক মোটর, সুইচ ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং ধাতব পদার্থ থেকে উৎপন্ন আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

অধিক পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত যন্ত্রটি হল কার্বন ডাই-অক্সাইড বা হ্যালন গ্যাস নির্বাপক। সিনেমা-হল, স্কুল, কলেজ, মিলনায়তন প্রভৃতির দেয়ালে প্রকাশ্য স্থানে একটি অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার ঝুলিয়ে রাখা হয়। সিলিন্ডারটি উচ্চ চাপে তরল গ্যাসে ভর্তি থাকে। অথবা গ্যাস উৎপাদনের জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়কগুলি সাজিয়ে রাখা হয়।

সিলিন্ডারটির সঙ্গে একটি হাতল, বায়ুমাপকযন্ত্র এবং একটি নজলযুক্ত হোসপাইপ লাগানো থাকে। বিশেষ পদ্ধতিতে হাতলটি চেপে ধরলে যন্ত্র থেকে গ্যাস নির্গত হয়। অগ্নিশিখার ওপর এই গ্যাস ধরলে শিখাটি স্তিমিত হয় এবং ধীরে ধীরে নিভে যায় প্রতিটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের গায়ে ব্যবহারের নির্দেশ লেখা থাকে।

স. রা.

অগ্ন্যাশয় (pancreas)

অগ্ন্যাশয় দেখতে অনেকটা ইংরেজি 'জে' অক্ষরের মতো। ওজন প্রায় ১৭০ গ্রাম। এর শীর্ষ অংশ ডিওডিনামের (duodenum) অর্ধবৃত্তাকার বাঁকের মধ্যে অবস্থিত। বাকি অংশ সেখান থেকে আড়াআড়িভাবে উদরগহ্বরের পিছন দিকে প্রসারিত।

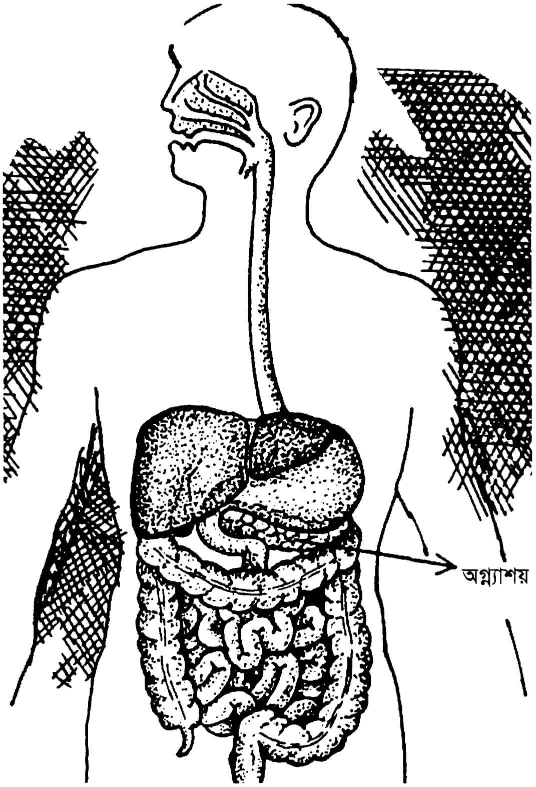

অগ্ন্যাশয় একই সঙ্গে অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচকরসের এনজাইম প্রোটিন, শ্বেতসার ও চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। অন্যদিকে অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত ল্যাঙ্গারহান্সের কোষপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত হরমোন (দ্র) গ্লুকাগন (আলফাকোষ থেকে), ইনসুলিন (বিটাকোষ থেকে) এবং সোমাটোস্ট্যাটিন ('ডি' কোষ থেকে) (দ্র) রক্তের শর্করা-মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্যই অগ্ন্যাশয়ের কোনো রোগে এই সব কোষ নষ্ট হলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ দেখা দেয় (অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্র)।

রু. হা.

অঙ্কুরোদ্‌গম (germination)

বীজের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ভ্রূণের জাগরণের ফলে চারাগাছের উৎপত্তি হয়। সুপ্তাবস্থার পরে ভ্রূণের চারাগাছে পরিণত হওয়াকে অঙ্কুরোদ্‌গম বলা হয়। তবে ভ্রূণের জাগরণ ও বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি শর্ত থাকে। যেমন, পানি ছাড়া অঙ্কুরোদ্‌গম সম্ভব নয়। পানি বীজত্বককে নরম করে, প্রোটোপ্লাজ্‌মকে উজ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল করে, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় সহজ করে, বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্য পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ভ্রূণের বর্ধনশীল অংশে পৌঁছানোয় সাহায্য করে। পানি দ্বারা ফুলে ওঠা ও বর্ধনশীল ভ্রূণের চাপে বীজত্বক ফেটে যায়। অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য আরো প্রয়োজন অক্সিজেন, তাপ ও আলো। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় কোষবিভাজন ঘটে। এতে ভ্রূণের কলেবর বৃদ্ধি পায়। কোষবিভাজন ও নতুন কোষসমূহের বৃদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বীজে সঞ্চিত খাদ্য থেকে শক্তি সঞ্চার হয় সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সবাত শ্বসনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। উপযুক্ত তাপ না থাকলে ভ্রূণ সক্রিয় হয় না এবং ভ্রূণের বিপাকক্রিয়াও দ্রুত সম্পন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বীজে অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য ন্যূনতম ৪° সে. এবং ঊর্ধ্বে ৪৫° সে. তাপমাত্রার দরকার। বেশির ভাগ বীজের জন্য উৎকৃষ্ট তাপমাত্রা হল ২৫° সে. থেকে ৩০° সে.। সকল বীজের জন্য নয়, কতকগুলো বীজ, যেমন তামাকের জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। আবার ধুতুরা উদ্‌গমের জন্য আঁধারেরও প্রয়োজন দেখা যায়। এ ছাড়া অঙ্কুরোদ্‌গমে প্রভাব সৃষ্টি করে খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য বা

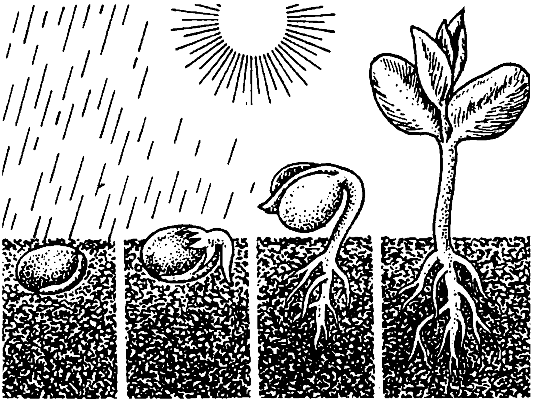

হরমোন, সুপ্তাবস্থা ও অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা। বীজে পর্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকা দরকার। অঙ্কুরোদ্গম নিয়ন্ত্রণ করে অক্সিন, জিবরালিন ও ডর্মিন নামক হরমোন। নির্দিষ্ট সুপ্তাবস্থা অতিক্রম না করলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায়।

ত. চ.

অজগর (python)

অজগর বা ময়ালকে ইংরেজিতে বলা হয় Indian Python C Boidae গোত্রভুক্ত সরীসৃপ। এদের দু'টি প্রজাতি বাংলাদেশে আছে– অজগর বা ময়াল (Python molurus) ও গোলবাহার সাপ (Python reticulatis)। অজগরের দেহ নাদুসনুদুস, সমস্ত দেহ মসৃণ আঁশে আবৃত। গায়ের উপরে ও পাশে হলুদ ও বাদামি রঙের দাগ। পেটের দিকের রঙ হালকা। পিঠের মূল রঙ হালকা হলুদ, ক্রিম, ধূসর বা বাদামি। দেহের তুলনায় লেজ অপেক্ষাকৃত ছোট। অজগর সাধারণত ৫-৬ মিটার লম্বা হয়। ওজনে ২ থেকে ২.৫ মণ বা সর্বোচ্চ ১০০ কেজি পর্যন্ত। এক সময় গ্রামের নির্জন স্থান ঝোপঝাড়ে এ অজগর বাস করত। বর্তমানে সিলেট, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগামের চিরসবুজ বন ও সুন্দরবনে পাওয়া যায়। অজগর আলসে ধরনের প্রাণী। খুবই আস্তে আস্তে চলাফেরা করে। অজগর ওৎ পেতে থাকে খাবারের জন্যে। এদের খাবারের মধ্যে আছে বিভিন্ন বন্য প্রাণী, ইঁদুর, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী। শীতের শেষে স্ত্রী-সাপ ১০০-১১০টি পর্যন্ত ডিম দেয়। ডিম ফুটতে ৬০-৮০ দিন সময় লাগে। ডিমের আকার সাধারণত হাঁসের ডিমের মতো। স্ত্রী-অজগর নিজে না খেয়ে সারাক্ষণ ডিমের যত্ন নেয়।

রা. জা.

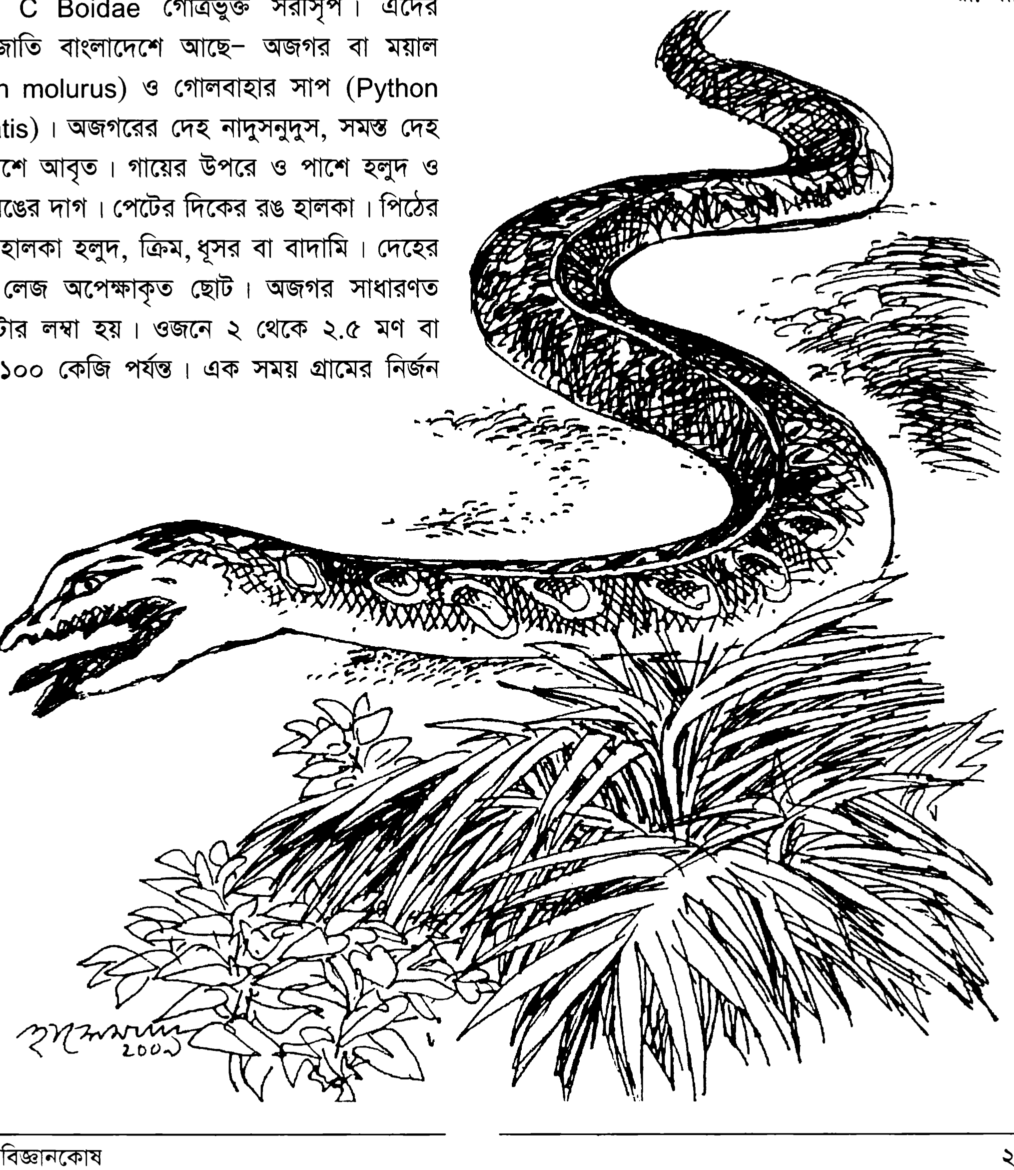

অটোক্লেভ (autoclave)

উচ্চ তাপ ও চাপে বাষ্পের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রটি মূলত একটি বদ্ধ ধাতব পাত্র, যা উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে। জীবাণুমুক্ত করার জন্য এ যন্ত্রের ভেতরে ফুটন্ত পানি থেকে নির্গত বাষ্পের উত্তাপকে কাজে লাগানো হয়।

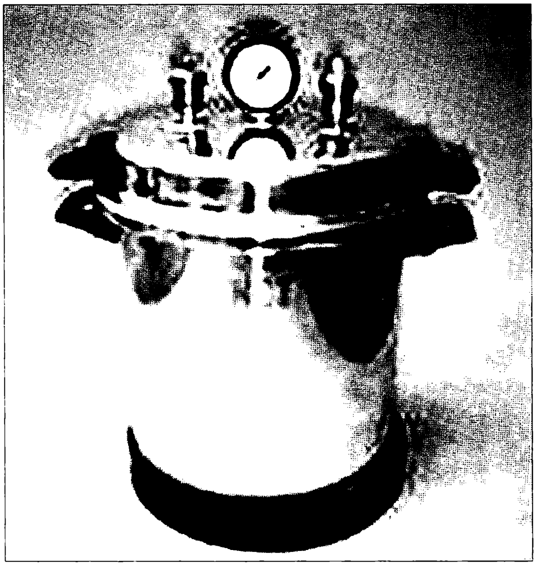

স্বাভাবিক বায়ুচাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু উচ্চচাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। অটোক্লেভে প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড চাপ সৃষ্টি করে পানির স্ফুটনাঙ্ক ১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উন্নীত করা যায়। যে সকল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা দরকার হয়, সেগুলোর জন্যই অটোক্লেভের ব্যবহার। সাধারণত শল্যচিকিৎসার (surgical) যন্ত্রপাতি, ড্রেসিং গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি অটোক্লেভের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

সি. না. হ.

অটোপ্‌সি (শবব্যবচ্ছেদ) (autopsy)

মৃতদেহের মেডিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকে অটোপ্‌সি (শবব্যবচ্ছেদ বা ময়নাতদন্ত) বলে। গ্রিক 'Autopsia' শব্দের মূল অর্থ 'নিজের চোখে দেখা'। শবব্যবচ্ছেদের আসল উদ্দেশ্য মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করা। এর

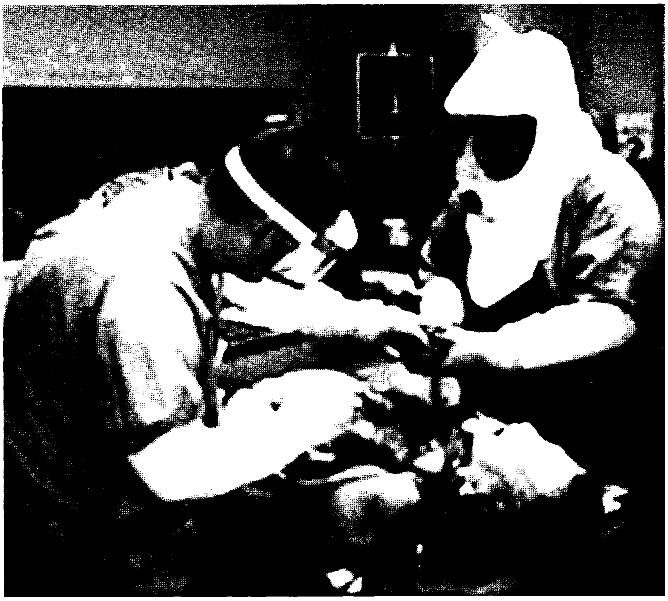

মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-সংক্রান্তজ্ঞান আহরণ করা যায়। রোগনির্ণয়ে কোনো ভুল হয়েছিল কিনা কিংবা চিকিৎসা সঠিক হয়েছে কিনা– এ সকল বিষয় শবব্যবচ্ছেদের সাহায্যে খতিয়ে দেখা যায়। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য অটোপ্‌সির কোনো বিকল্প নেই। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণের জন্যও শবব্যবচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শবব্যবচ্ছেদ করার সময় মৃতদেহের বাইরে এবং ভেতরে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে চিরে সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কোনো কোনো অঙ্গের টুকরো কেটে সংরক্ষণ করা হয়। শবব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার পর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাস্থানে রেখে কাটা স্থান সেলাই করে দেওয়া হয়।

সা. এ.

অণু (molecule)

মৌল বা যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা যা ঐ পদার্থের গুণাবলি অক্ষুণ্ন রেখে মুক্তভাবে অবস্থান করতে সক্ষম, তাকেই বলা হয় অণু। সাধারণত প্রতিটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের প্রতিটি অণুতে দু'টি পরমাণু থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি কার্বন ও দু'টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। কোনো কোনো

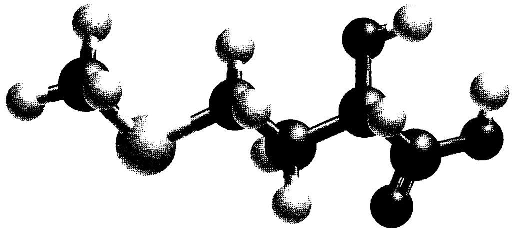

মৌলিক পদার্থ, যেমন– আর্গন, হিলিয়াম, সোডিয়াম, তামা প্রভৃতির পরমাণুগুলি স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এসব ক্ষেত্রে অণু এবং পরমাণু অভিন্ন। মৌলিক পদার্থ থেকে যে পরমাণু পাওয়া যায় তাদের ধর্ম একই এবং যৌগিক পদার্থ থেকে যে পরমাণু পাওয়া যায় তাদের ধর্ম ভিন্ন।

পরমাণু ও অণুর পার্থক্য

(১) অণু মৌল ও যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা, যার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে।

(২) অণু ভেঙে না গিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(৩) দুই বা ততোধিক একই মৌলের পরমাণু দিয়ে মৌলিক অণু এবং ভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে যৌগিক অণু গঠিত হয়।

(৪) মৌলিক অণু মৌলের এবং যৌগিক অণু যৌগের ধর্ম প্রকাশ করে।

আ. হ. খ.

অণুজীববিদ্যা (microbiology)

অণুজীববিদ্যা শব্দটি ইংরেজি মাইক্রোবায়োলজি (microbiology)-এর বাংলা প্রতিশব্দ। অণুজীববিদ্যার অর্থ অণুবীক্ষণেই দেখা যায় এমন অতি ক্ষুদ্র জীবের পরিচয়, ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে অনুশীলন ও জ্ঞান অর্জন। মানবদেহে অণুজীবসৃষ্ট রোগের কারণে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অণুজীববিদ্যার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। 'মাইক্রোবায়োলজি' শব্দটি যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রথম ব্যবহার করেন খ্যাতনামা ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (দ্র), তবু অণুবীক্ষণে অণুজীবের উপস্থিতি প্রথম শনাক্ত করেন হল্যান্ডবাসী অণুবীক্ষণবিদ্ আন্টোন ভান লিউয়েনহুক (দ্র) ১৬৭৫ সালে।

এর দীর্ঘকাল পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই শাখাটির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি তৈরি হয় লুই পাস্তুর, রবার্ট কক প্রমুখ গবেষকের হাতে। ক্ষুদ্রতম প্রাণী প্রোটোজোয়া, ছত্রাক (দ্র), খমির ও অন্যান্য পরজীবী এবং জীবাণু ও ভাইরাস নিয়ে অণুজীববিদ্যা চর্চা করে। সেই সঙ্গে সংক্রমণের কারণ, পদ্ধতি, মারীতত্ত্ব (epidemiology), গবেষণাগারে রোগনির্ণয়, অনাক্রম্যতা (imuniology) (দ্র) ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের চর্চাও অণুজীববিদ্যার অন্তর্গত।

বর্তমানে অণুজীববিদ্যার একাধিক শাখা রয়েছে। যেমন জীবাণুর ইতিহাস, বংশবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, রোগ উৎপাদনক্ষমতা, রোগের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য হয়েছে জীবাণুবিদ্যা (bacteriology); একইভাবে ভাইরাস গবেষণার জন্য ভাইরাসবিদ্যা (virology), পরজীবী ও ছত্রাক বিষয়ের জন্য যথাক্রমে প্যারাসাইটোলজি (parasitology) ও মাইকোলজি (mycology)। সম্প্রতি অনাক্রম্যতার নানা দিক নিয়ে

কাজ (অনাক্রম্যতত্ত্ব বা ইমিউনোলজি) এবং অণুজীবের জীনতত্ত্ব (জেনেটিক্স) নিয়ে গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪ সালে অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার অণুজীব গবেষণা, বিশেষ করে ভাইরাস গবেষণাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। সম্ভব হচ্ছে জীন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, যা নানাভাবে মানবকল্যাণে নিয়োজিত।

রু. হা.

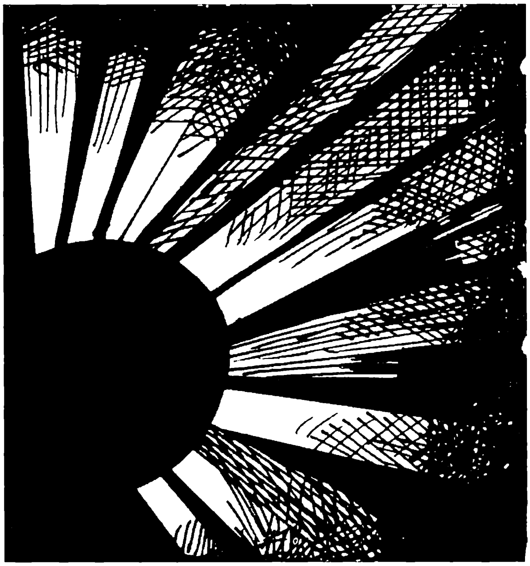

অণুপ্রভা (phosphoresence)

বাইরের উৎস দ্বারা উত্তেজিত হয়ে পরমাণু যে আলো নির্গমন ঘটায় তাকে অণুপ্রভা বলে। অণুপ্রভা এবং প্রতিপ্রভা প্রায় একই ধরনের ঘটনা হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিপ্রভা ততক্ষণ চলে যতক্ষণ পরমাণু উত্তেজিত থাকে, কিন্তু অণুপ্রভা পরমাণু উত্তেজিত হওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ অব্যাহত থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, উত্তেজনায় পশ্চাদ্ বিকিরণ ঘটতে থাকে (দ্র প্রতিপ্রভা)। ইলেকট্রন রশ্মির বর্ষণ, তেজস্ক্রিয় ভাঙন, চার্জযুক্ত কণিকার প্রতিক্রিয়া, রাসায়নিক বিক্রিয়া, আলোকিত রশ্মির শোষণ থেকে প্রারম্ভিক উত্তেজনা উদ্ভূত হয়।

উচ্চতাপমাত্রা ছাড়া আলো নির্গমন হয় বলে এই ঘটনাকে শীতল আলো নামেও অভিহিত করা হয়। শ্বেত ফসফরাস বাতাসের অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উত্তেজিত হয়। ফলে অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি ছড়ায়। এ ক্ষেত্রে তাপ উৎপন্ন হয় না। এটি রাসায়নিক অণুপ্রভা।

এক ধরনের জৈব অণুপ্রভা ঘটে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। কখনো কখনো সামুদ্রিক জীব থেকে বৃষ্টির রাতে পচা কাঠের উপর জমা বিশেষ ধরনের ছত্রাক থেকে এ ধরনের আলো দেখা যায়।

স. রা.

অণুবীক্ষণযন্ত্র (microscope)

ইংরেজি মাইক্রোস্কোপ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অণুবীক্ষণযন্ত্র। micro অর্থ ক্ষুদ্র, scope অর্থ দেখা। অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র জিনিসকে বড় করে দেখার যন্ত্র। এক বা একাধিক লেন্স বা পরকলা সহযোগে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। সতেরো শতকের শেষ দিকে এই যন্ত্র আবিস্কৃত হয়। তখন এ যন্ত্রে কোনো বস্তুকে তার দ্বিগুণ দেখা যেত। এর পর একে একে আবিস্কৃত হয়েছে জ্যানসেন অণুবীক্ষণযন্ত্র, রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণযন্ত্র, গ্রাটনের অণুবীক্ষণযন্ত্র ইত্যাদি। এসব অণুবীক্ষণযন্ত্রের প্রতিটি আগেরটির চেয়ে উন্নত। এভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে বর্তমানে স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রে একটি বস্তুকে তার মূল আকারের আড়াই লক্ষ গুণ বড় দেখা যাবে, অর্থাৎ সিকি বা পঁচিশ পয়সার মুদ্রাকে দেখা যাবে ঢাকা শহরের চেয়েও বড়।

১. আইপিস
২. কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট
৩. ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট
৪. অবজেকটিভ
৫. স্লাইড
৬. কনডেন্সর
৭. মিরর

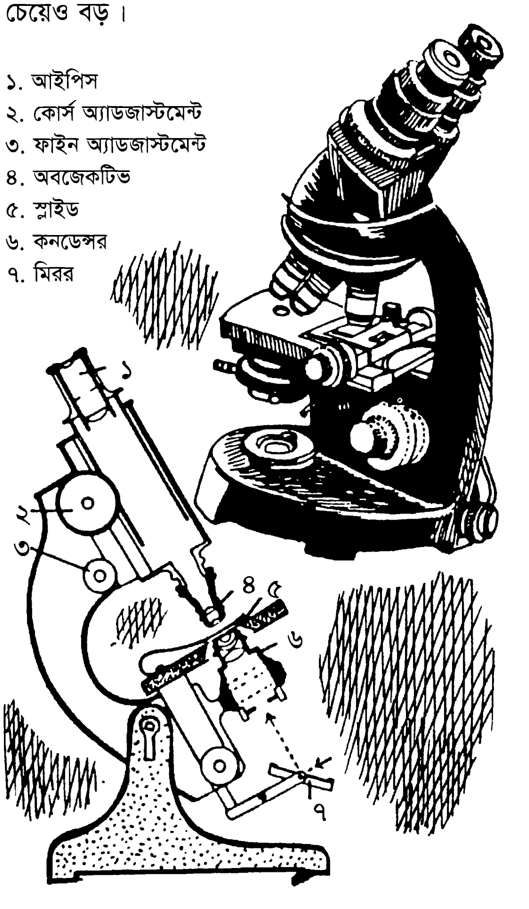

সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না বা ভালোভাবে বোঝা যায় না এ ধরনের বস্তু দেখার জন্যই অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে অণুবীক্ষণযন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আরো সূক্ষ্ম বস্তু দেখার জন্যই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধাতুর কাজেও অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এদের মেটালার্জিক্যাল অণুবীক্ষণযন্ত্র বলে। ধাতুর গঠনশৈলী পর্যবেক্ষণসহ ধাতুর বিভিন্ন কাজে মেটালার্জিক্যাল অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ত. চ.

অতিবেগুনি রশ্মি (ultra-violet ray)

সূর্যরশ্মির বর্ণালিতে দেখা যায় পর পর সাজানো সাতটি বর্ণরেখা। এই বর্ণালির এক প্রান্তের বর্ণরেখা বেগুনি এবং অন্য প্রান্তের বর্ণরেখা লাল। বেগুনি রশ্মির পরেও রশ্মি থাকে কিন্তু তা আমরা চোখে দেখতে পাই না, কারণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম (৪ ন্যানোমিটার থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার; ১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ সেন্টিমিটার)।

এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে। অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের দেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করার কাজে সাহায্য করে। জীবাণুনাশক হিসাবেও এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

সু. ব.

অদৃশ্য আলো (invigible ray)

তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ এবং এক্স-রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি। এদের বলা হয় অতিবেগুনি রশ্মি। মানুষের চোখে এই আলো বা রশ্মি দৃশ্যমান নয়। তাই একে অদৃশ্য আলো (invigible light) বলা হয়। একে কৃষ্ণ আলোও (black light) বলা হয়। ১৮০১ সালে জন রিটার আলোক রসায়ন পরীক্ষণকালে এই বিকিরণ শনাক্ত করেন। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ঊর্ধ্বসীমা $4x10^{-6}$ M এবং সর্বনিম্নসীমা $4X10^{-9}$ M। সূর্যের এই অদৃশ্য বা অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীর আচ্ছাদন বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয়। এই তরঙ্গ প্রাণের জন্য খুবই ক্ষতিকারক।

এই আলো বা রশ্মির প্রভাবে পায়ের চামড়া তামাটে বা পীতাভ হয়ে যায়। চোখ অন্ধ হয়ে যায়। শস্যকণা এবং যন্ত্রপাতির চিকিৎসা, ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

বাইরের শক্তির প্রভাবে পরমাণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে ঊর্ধ্বতন শক্তিস্তরে চলে যায়। ঐ ইলেকট্রন যখন তার সাম্য অবস্থান বা আদি অবস্থানে বা শক্তিস্তরে ফিরে আসে তখন দৃশ্যমান আলোর সাথে অতিবেগুনি রশ্মি বিকীর্ণ করে। ফ্লোরোফেট বাল্ব, মার্কারি বাল্ব থেকে অতিবেগুনি রশ্মি উৎপন্ন হয়।

স. রা.

অনাক্রম্যতা (immunity)

আমাদের চারপাশে অসংখ্য রোগজীবাণু রয়েছে। জীবাণু, পরজীবী, ভাইরাস– এদের হামলা শরীরের উপর আসছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু প্রতিরোধের জন্য শরীরের ভিতরেও ব্যবস্থা আছে। তাই শরীরের ভিতর নিরন্তর যুদ্ধ চলছেই। হামলাকারী জীবাণু দেখতে খুবই ছোট। দেহরক্ষীরা নীরবে এই শত্রুদের ধ্বংস করে চলেছে। এই দেহরক্ষীরা শরীরে গড়ে তুলেছে অনাক্রম্যতা।

রক্তে আছে শ্বেতকণিকা (দ্র)। শরীরের বাইরের রক্ষাব্যূহ ভেদ করে রোগজীবাণু যখন রক্তে প্রবেশ করে তখন শ্বেতকণিকারা ছুটে আসে, এদের ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে। শ্বেতকণিকার জন্ম অস্থিমজ্জায়। এরা হল গ্রাসককোষ এবং লসিকাকোষ। লসিকাকোষ দু' রকমের– 'টি'-কোষ ও 'বি'-কোষ। এদের কাজ হল অপরিচিত, আগন্তুক শত্রুদের চিহ্নিত করা ও ধ্বংস করা। গ্রাসককোষের কাজ হল রোগজীবাণু, ধূলি, ময়লা সব কিছু গিলে ফেলা। অপরিচিত শত্রুদের শরীরে যে চিহ্ন আছে তার নাম 'অ্যান্টিজেন'। টি-কোষ এই অ্যান্টিজেনকে চিনতে পারে এবং চিনে নিয়ে এদের ধ্বংস করে ফেলে। বি-কোষ তৈরি করে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের গায়ে সাপটে যায় এবং শত্রুকে ধ্বংস করে। ফলে আমরাও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। এমনি করে তৈরি প্রতিরোধব্যবস্থা তথা অনাক্রম্যতা কখনো তাৎক্ষণিক, কখনো স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন হাম (দ্র) বা জলবসন্ত (দ্র) রোগে স্থায়ী অনাক্রম্যতা তৈরি হয়।

আমাদের দেহরক্ষী সেনাদের দিয়ে সব রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই কৃত্রিমভাবে শরীরে অনাক্রম্যতা তৈরি করা হয়ে থাকে। এ জন্য আমরা 'টিকা' (দ্র) নিই। টিকাতে থাকে নির্দিষ্ট ধরনের জীবাণু বা ভাইরাস (দ্র)। তবে সে অণুজীব হয়ে থাকে মৃত অথবা দুর্বল যাতে এটি আমাদের শরীরে রোগ তৈরি করতে না পারে। টিকা দিয়ে আমাদের শরীরে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষা-শক্তি। এরাই রোগ থেকে রক্ষা করে আমাদের। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকা পেয়েছি। যেমন– ডিফথেরিয়া (দ্র), হুপিংকফ (দ্র), টিটেনাস (দ্র), পোলিও (দ্র), যক্ষ্মা (দ্র), হেপাটাইটিস-বি (দ্র), মাম্প্স্ (দ্র), জলাতঙ্ক (দ্র), বসন্ত (দ্র) ইত্যাদি।

শু. চৌ.

অনুপাত (ratio)

দু'টি পরিমাণের একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ বা একটি অপরটির কত অংশ তা দেখিয়ে ঐ দু'টি পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে অনুপাত। যেমন– আট লিটার দুধ দুই লিটারের তুলনায় চার গুণ (২ x ৪ = ৮) বেশি, আবার দুই লিটার আট লিটারের চার ভাগের এক ভাগ (৮ ÷ ৪ = ২)। এখানে ৮ লিটার ও ২ লিটারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। অনুপাত দিয়ে আসলে দু'টি সংখ্যা বা রাশির পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। রাশি দু'টি একই রকম বা একই এককে প্রকাশিত হতে হবে। যেমন, উপর্যুক্ত উদাহরণটিতে লিটারের সঙ্গে লিটারের তুলনা করা হয়েছে। তেমনি মাইলের (বা মিটারের) সঙ্গে মাইলের (বা মিটারের) তুলনা হয়; মাইলের সঙ্গে মিটারের নয়। অন্য কথায়, অনুপাতকে দু'টি একই জাতীয় বা একই এককে প্রকাশিত সংখ্যার ভগ্নাংশও (quotient) বলা যায়। ভগ্নাংশের সব নিয়মই অনুপাতের বেলায় খাটে।

অনুপাত প্রকৃত ও অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশই হতে পারে। অনুপাত প্রকাশের চিহ্ন 'ঃ'। দু'টি রাশির অনুপাত বের করতে হলে ১ম রাশিকে ২য় রাশি দিয়ে ভাগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ১ম রাশিকে পূর্ব-রাশি ও ২য় রাশিকে উত্তর-রাশি বলে। কাজেই, ৫ ও ৭-এর অনুপাত হবে $\frac{৫}{৭}$। একে অনুপাতের চিহ্ন ব্যবহার করে ৫ ঃ ৭

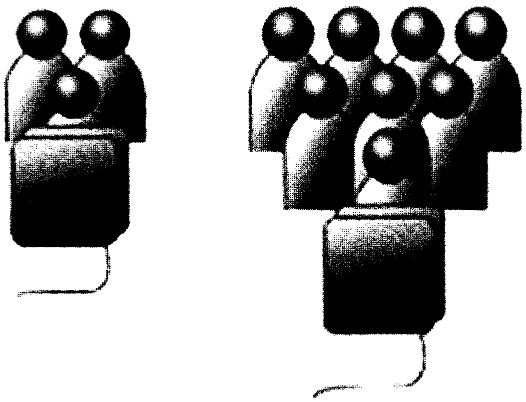

আকারে লেখা যায়। এখানে ৫ পূর্ব-রাশি এবং ৭ উত্তর-রাশি। কোনো অনুপাতের মান ১-এর কম হলে তাকে লঘু অনুপাত, ১-এর বেশি হলে তাকে গুরু অনুপাত এবং ১ হলে তাকে একানুপাত বলে। চারটি রাশি নিয়ে হয় সমানুপাত। এ ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাতের সমান হয়। অর্থাৎ, দু'টি অনুপাত সমান হলে তাদের সমানুপাত বলে। যেমন, ৫ ঃ ১৫ = ৬ ঃ ১৮ ($\frac{৫}{১৫} = \frac{৬}{১৮}$ বা $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৩}$) একটি সমানুপাত। সমানুপাতের বেলায় চারটি রাশি এক রকম হওয়ার দরকার পড়ে না। তবে প্রতিটি অনুপাতের রাশি দু'টি এক জাতীয় হতে হয়।

হো. আ.

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (endocrine glands)

দেহের যেসব কোষ বা যন্ত্র কোনো উপাদান নিঃসৃত করে তাকেই বলে গ্রন্থি। কোনো কোনো গ্রন্থি বহিঃস্রাবী, এদের নালি আছে, নিঃসৃত রস নালিপথে বেরিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী, এরা নালিহীন, এদের রস নিঃসৃত হয় সরাসরি রক্তে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দেহের নানা কাজকর্মের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক। এই সব গ্রন্থি থেকে যে রস রক্তস্রোতে নিঃসৃত হয়ে শরীরে পৌঁছায় তাকে বলা হয় 'হরমোন' (দ্র)।

দেহের ভেতর চলমান কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, যেমন– দেহের বৃদ্ধি, যৌন পরিপক্বতা, বংশবিস্তার ইত্যাদি। দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি মূলত ৭টি– পিটুইটারি, থাইরয়েড,

প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল, অগ্ন্যাশয়ের ল্যাঙ্গারহান্স কোষপুঞ্জ এবং স্ত্রী ও পুরুষ জননগ্রন্থি।

খুলির ভেতর মস্তিষ্কের নিচে একটি বড় মটরের আকৃতির 'পিটুইটারি' হল অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির পরিচালক। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় ৮টি হরমোন। দেহের বৃদ্ধি, স্তনের দুগ্ধক্ষরণ, দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা– এমনি অনেক কাজের কাজি এই গ্রন্থিটি। প্রতিটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এই ছোট্ট পিটুইটারি গ্রন্থি। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আলাদা পরিচালক তথা নিয়ন্ত্রক হরমোন।

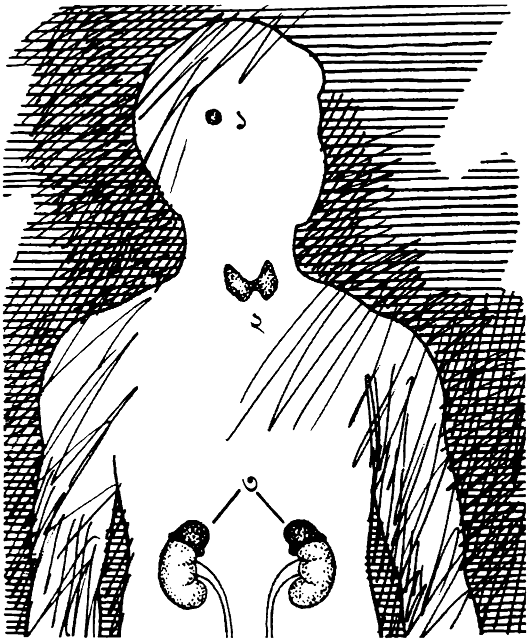

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি
১. পিটুইটারি, ২. থাইরয়েড, ৩. অ্যাড্রেনাল

গলদেশের সামনে শ্বাসনালিকে ঘিরে রয়েছে প্রজাপতি-আকৃতি 'থাইরয়েড'। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন 'থাইরক্সিন' দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরের বৃদ্ধি, ওজন, বুদ্ধির বিকাশ এমনি অনেক কাজের জন্য প্রয়োজন এই হরমোন। থাইরক্সিন তৈরিতে লাগে আয়োডিন (দ্র)। আয়োডিনের অভাব হলে গলগণ্ড রোগ হয়, মানুষ খর্বকায় ও বুদ্ধিহীন হয়ে যায়।

থাইরয়েডের দুই পাশে ডুবে আছে গম-শস্যের আকৃতির দুই জোড়া 'প্যারাথাইরয়েড'। এর হরমোন 'প্যারাথ্‌হরমোন' অস্থি ও রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ামের (দ্র) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে।

দু'টি কিডনির উপর অবস্থিত হলুদ-বাদামি রঙের মুকুটের আকৃতিবিশিষ্ট দু'টি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি। এর হরমোন অ্যাড্রেনালিন শরীরকে আপদ-বিপদ, চাপ মোকাবিলায় সাহায্য করে। এ ছাড়া এই গ্রন্থি থেকে আসে স্টেরোয়েড হরমোন। এই হরমোন দেহের পানি ও লবণের সমতা রক্ষা করে, খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করে, রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধব্যবস্থায় সহায়তা করে।

পাকস্থলীর নিচে ও পেছনে রয়েছে অগ্ন্যাশয় (দ্র)। এতে আছে বিশেষ ধরনের কোষপুঞ্জ, নাম ল্যাঙ্গারহান্স কোষ। এ থেকে নিঃসৃত হয় হরমোন ইনসুলিন (দ্র) ও গ্লুকাগন। এরা দেহের শর্করামান বজায় রাখে। ইনসুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস (দ্র) বা মধুমেহ দেখা দেয়।

নারীর তলপেটের দু'দিকে আছে স্ত্রী জননগ্রন্থি দু'টি ডিম্বাশয়। এর হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরোন নারীর যৌনচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষের জননগ্রন্থি শুক্রাশয়দ্বয়-এর হরমোন টেস্টোস্টেরোন পুরুষের যৌনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

শু. চৌ.

অপথ্যালমোলজি (opthalmology)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা চোখের গঠন, কাজকর্মের ধরন সম্পর্কে চর্চা এবং চক্ষুর রোগব্যাধির নির্ণয় ও চিকিৎসা অপথ্যালমোলজির (চক্ষুবিজ্ঞানের) অন্তর্গত। এতে ভেষজ এবং শল্য চিকিৎসা উভয় ব্যবস্থারই বিধান রয়েছে।

আগে চক্ষুবিজ্ঞান বা অপথ্যালমোলজিতে অসংখ্য লিমোস্কোপ, রেটিনোস্কোপ ইত্যাদি স্বল্পসংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, এখন সেখানে অনেক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন, ইনট্রা-অকুলার লেন্স স্থাপন, লেজার থেরাপি, কন্টাক্ট লেন্স স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সা. এ.

অপথ্যালমোস্কোপ (opthalmoscope)

চোখের ভেতরের বিভিন্ন অংশ দেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্রবিশেষ। শরীরের অনেক রোগেরই কিছু কিছু চিহ্ন চোখের রেটিনায় দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া রেটিনাতে টিউমারও হতে পারে। অপথ্যালমোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করলে এগুলি খুব সহজে শনাক্ত করা যায়। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চ রক্তচাপে ভুগলে রেটিনার রক্তনালিতে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। এ যন্ত্রের সাহায্যে এ সকল পরিবর্তন দেখে রোগের তীব্রতা অনুমান করা যায়।

অপথ্যালমোস্কোপের প্রধান অংশ একটি কলিমেটর (collimator) যা থেকে সমান্তরাল আলোকরশ্মি বের হয়ে একটি ছোট আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার পর চোখের ভেতরে রেটিনার ওপরে পড়ে। এই আয়নার কেন্দ্রে অবস্থিত একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে রেটিনা দেখা যায়। দক্ষ শল্য-চিকিৎসকগণ অপথ্যালমোস্কোপের সাহায্যে চোখের ভেতরে সূক্ষ্ম অপারেশন করতে পারেন। একইভাবে রেটিনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে লেজার রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা করা যায়। কম ক্ষমতাসম্পন্ন লেজার রশ্মি ব্যবহার করে রেটিনার রক্তনালিতে রক্ত প্রবাহের গতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সা. এ.

www.boighar.com

অপটিক্যাল ফাইবার (optical fibre)

অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত এক নতুন ধরনের তার। বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয় তামার তার। অর্থাৎ তামার তার দিয়ে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। টেলিফোন, কেব্‌ল্-টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রায় সব রকম যোগাযোগে তামার তার ব্যবহার হয়। এই তার

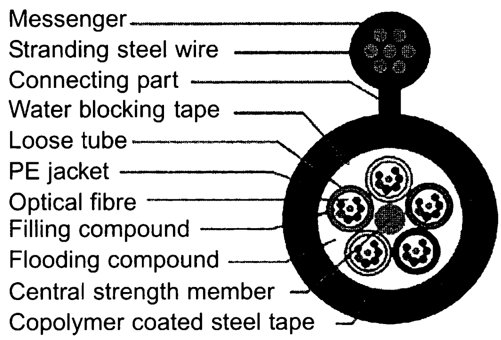

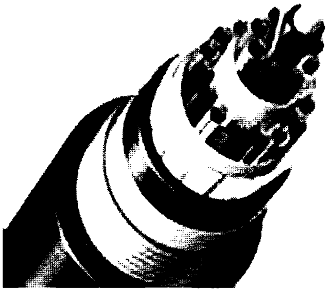

বিদ্যুৎরূপে তথ্য বা সংবাদ বহন করে। আলোকেও বিদ্যুতের মতো তার দিয়ে প্রবাহিত করানো যায়। তবে এই তার কাচের তৈরি, ধাতুর নয়। আলো চলাচলের জন্য যে কাচের তার ব্যবহার করা হয় তা চুলের মতো সরু। এর নামই অপটিক্যাল ফাইবার। বাংলায় একে আলোকতন্তু বলা যায়। এই তারে তথ্য বহনের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে আলো ব্যবহার করা হয়।

ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন টিন্ডেল ১৮৭০ সালে ফাইবার অপটিকসের (fiber optics) ধারণা উপস্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ১৯৫৫ সালে ড. নরেন্দর কাপানি লন্ডনের ইম্পেরিয়েল কলেজে কাচের অতি ক্ষুদ্র তন্তুর ডিজাইন করেন, যা অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু নামে পরিচিত। এটি খুবই নমনীয়– ইচ্ছামতো বাঁকানো বা দোমড়ানো যায়। ফলে কোনো বাঁক পেরিয়ে কোনো কিছু দেখতে হলে এর ব্যবহার অপরিহার্য। এই ধর্মের কারণে কোনো ব্যক্তির শরীরের ভেতরের ছবি তুলতে গ্যাসট্রোস্কোপযন্ত্রে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। কোনো ছবিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতেও এই তন্তু ব্যবহার করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে ৩৫ কিলোমিটার পুরু শিট সাধারণ জানালার কাচের

মতোই স্বচ্ছ দেখায়। চলাচলের সময় আলো তন্তু থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না, কারণ এতে একটি বহিরাবরণ দেওয়া থাকে। আলো এই তন্তুর ভেতর দিয়ে এদিক-সেদিক লাফিয়ে চলে বা প্রতিফলিত হয়ে অগ্রসর হয়। অতি আধুনিক ও অতি দামি অপটিক্যাল ফাইবারে আলো সরলরেখায় গমন করে। লেজার রশ্মি ব্যবহারের সময় এ ধরনের তন্তু ব্যবহার করা হয়। টেলিফোন যোগাযোগে এই তন্তুর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার জেনারেল টেলিফোন কোম্পানি টেলিফোন যোগাযোগে প্রথম অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে।

এর পর জাপানের ওসাকায় এবং কানাডার এলি (Elie) শহরে টেলিফোন যোগাযোগে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। তামা বা ধাতব তারের তুলনায় অপটিক্যাল ফাইবার অনেক বেশি তথ্য বহন করতে পারে। ভিডিও, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ভিডিওফোন ইত্যাদি যোগাযোগে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

শা. ত.

অপরাজিতা (butterfly pea)

গ্রাম বাংলার সুপরিচিত বহুবর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ অপরাজিতা Leguminoceae গোত্রের Papiliouacaac উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Clitorin ternetea* L. এবং ইংরেজি নাম বাটারফ্লাই পি (Butterfly Pea)। অপরাজিতা গাছ দেখতে অনেকটা মটরশুঁটি গাছের মতো। তবে অধিক

শক্ত, দীর্ঘ ও লতানো। অপরাজিতার ফুল ও শিম মটরশুঁটির ফুল ও শিমের মতো, কিন্তু আকারে বড়। তিন রঙের পাপড়িবিশিষ্ট অপরাজিতা দেখা যায়– গাঢ় নীল, হালকা নীল এবং সাদা। লতানে অপরাজিতা ঝাড়ে, বেড়ায়, মাচায় বা ঘরের ছাউনিতে বেয়ে উঠে বহুদূর ছড়িয়ে যেতে পারে। এর ফুল আকর্ষণীয় কিন্তু কোনো গন্ধ নেই। নীল অপরাজিতার পাপড়ি নির্যাস করে নীল রঙ পাওয়া যায় যা লিটমাসের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকেও নীল রঙ পাওয়া যায়।

অপরাজিতার শিকড় জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি মূত্রবর্ধক, বীজচূর্ণ আদার সঙ্গে মিশিয়ে রেচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনে এর শিকড় প্রদাহযুক্ত সন্ধিতে পুলটিস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

অবলোহিত রশ্মি (infrared ray)

বেতার-তরঙ্গ থেকে ছোট এবং দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ থেকে বড় অথবা বেতার-তরঙ্গ এবং দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের মধ্যবর্তী তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে অবলোহিত রশ্মি বলে। দৃশ্যমান লাল আলোক-তরঙ্গ থেকে এর কম্পাঙ্ক কম বলে একে অবলোহিত রশ্মি (infrared ray) বলা হয়। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর ০.৮ মাইক্রোমিটার থেকে ১.০ মাইক্রোমিটার (0.8 Mm থেকে 1.0 Mm)। অবলোহিত রশ্মি মূলত তাপ হিসাবে বিকীর্ণ হয়; তাই একে তাপরশ্মিও বলে। অবলোহিত রশ্মি অন্যান্য তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ন্যায় প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মেনে চলে। এই তরঙ্গ কুয়াশা বা অন্ধকার ভেদ করতে পারে যা সাধারণ আলো পারে না। তাই অবলোহিত রশ্মির সংবেদী পদার্থ দ্বারা তৈরি ফটোগ্রাফিক প্লেটে এমন ছবি তোলা যায় যা সাধারণ আলোতে ধরা পড়ে না। ফটোগ্রাফারেরা অন্ধকারে ছবি তুলতে এই নীতি কাজে লাগান। চর্মরোগ, আহত মাংসপেশির যন্ত্রণা, ব্যথা উপশমের জন্য অবলোহিত রশ্মির ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল উৎপন্ন তাপের হিসাব থেকে এই তরঙ্গ শনাক্ত করেন। সূর্যের বর্ণালি বিশ্লেষণ করে তিনি এর সন্ধান পান। সূর্যরশ্মির প্রায় ৬০% অবলোহিত রশ্মি।

স. রা.

অবেদন (anaesthesia)

শরীরের যে কোনো অংশে অনুভূতি লোপ বা অসাড়তা সৃষ্টির নাম অবেদন বা 'এনেস্থেসিয়া' (anaesthesia)। বেদনাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্থানিক অসাড়তা বা সংজ্ঞহীনতা তৈরি বোঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন কালে স্থূল উপায়ে এই কাজটি সম্পন্ন হত, যেমন সুরা বা ভেষজের সাহায্যে। ১৮৪৬ সালে মার্কিন দন্তচিকিৎসক গ্রিন মর্টন প্রথম দাঁত তোলার কাজে অবেদনিক (anaesthetic) হিসাবে ইথার-বাষ্প ব্যবহার করেন। একই বছর জেম্‌স্‌ ওয়ারেন ইথার ব্যবহার করে রোগীর গ্রীবাদেশ থেকে একটি টিউমার অপসারণ করেন। এর পর ১৮৪৭ সালে জেম্‌স্‌ সিম্পসন নামক একজন স্কুলচিকিৎসক ইথারের পরিবর্তে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার শুরু করেন। অস্ত্রোপচারে এর পর দীর্ঘদিন ইথার ও ক্লোরোফর্মের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান অবেদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অবেদন মোটামুটি হিসাবে চার ধরনের। যেমন– সাধারণ অবেদন (জেনারেল এনেস্থেসিয়া), যে ক্ষেত্রে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করা হয়; স্থানিক অবেদন, যে ক্ষেত্রে অবেদনিক ঔষধ সরাসরি অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। কোনো কারণে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করা যুক্তিযুক্ত না হলে মেরুদণ্ডের নালিতে ('স্পাইনাল ক্যানাল'-এ) ঔষধ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় অঙ্গে অসাড়তা সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'স্পাইনাল এনেস্থেসিয়া' (মেরুদণ্ডীয় অবেদন)। মেরুরজ্জু থেকে বেরিয়ে আসা নির্দিষ্ট স্নায়ুমূল বা স্নায়ুপথে অবেদনিক প্রয়োগ করে আঞ্চলিক অবেদন ('রিজিওনাল এনেস্থেসিয়া') সম্পন্ন করা যায়। এর ফলে এই নির্দিষ্ট স্নায়ু যেসব অঞ্চলে বিস্তৃত একমাত্র সেখানেই অসাড়তা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এক সময় স্থানীয় অবেদনিক হিসাবে কোকেন (দ্র) ব্যবহৃত হত, কিন্তু আসক্তির সম্ভাবনা থাকায় পরে কোকেনের বদলে প্রোকেন ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রোকেন এবং এর পরিবর্তিত একাধিক রূপের ঔষধ স্থানিক, আঞ্চলিক ও মেরুদণ্ডীয় অবেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। লিগনোকেন একটি বহুল ব্যবহৃত স্থানিক অবেদনিক ঔষধ।

বর্তমানে সব ধরনের অবেদনের কাজেই উন্নত ধরনের ঔষধ এবং পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

আ. র.

অভিযোজন (adaptation)

এই পৃথিবীর প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীই নিজ নিজ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে ও বংশবিস্তার করে। পরিবেশের পরিবর্তনে প্রতিটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীও নিজ নিজ স্বভাব ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করে নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। জীব তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পক্ষে পরিবেশ অনুযায়ী এই ধরনের সামঞ্জস্য বিধানকেই অভিযোজন বলা হয়।

অভিযোজন প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, কোনো জীবে অভিযোজনঘটিত বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হতে কয়েক পুরুষ বা বংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। জীব সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড় পদার্থের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের হয়। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন ক্ষমতা ভিন্ন ধরনের। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পর কয়েক পুরুষ একই পরিবেশে বসবাসের ফলে নিজেদেরকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। সে কারণেই ভিন্ন পরিবেশে বসবাসরত একই প্রকার জীবের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এ কারণেই বলা যায় যে, উত্তর মেরুর শ্বেত ভালুক হিমশীতল পরিবেশে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাদামি ভালুক উষ্ণ পরিবেশে বাস করলেও সম্ভবত লক্ষ বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব তথা অভিযোজনের তাগিদে তারা ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এমন দুই পরিবেশের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা নিজ নিজ পরিবেশ থেকে খাদ্য আহরণ ও প্রজননে সাফল্য লাভ করেছে।

তিমি একদা স্থলচর ছিল। কিন্তু দেহের বিপুল আয়তন এবং ওজনের জন্য তিমি সাগরের বুকে স্থান করে নেয়। এ জন্য তিমিকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অভিযোজিত হতে হয়েছে।

অ. ব.

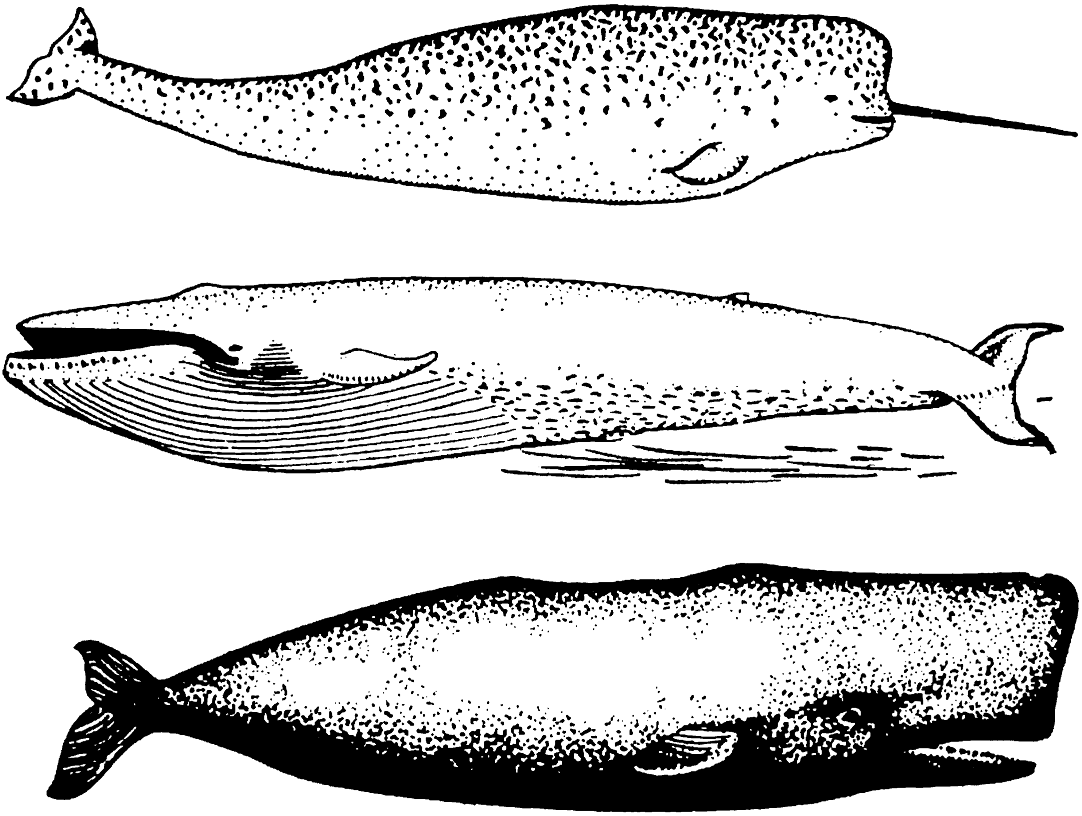

তিমির অভিযোজন প্রক্রিয়া

অভিস্রবণ (osmosis)

অভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রায় একই দ্রাবক (পানি)-বিশিষ্ট দু'টি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ (solution) পাশাপাশি অথচ একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা আলাদা থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্বের (পানির পরিমাণ বেশি ও দ্রবণ কম) এলাকা থেকে এর কম ঘনত্বের (পানির পরিমাণ কম ও দ্রবণ বেশি) এলাকার দিকে ব্যাপ্ত হয়, সেই প্রক্রিয়ার নাম অভিস্রবণ। দু'টি দ্রবণ একই ঘনত্বের দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূলের এককোষী মূলরোমগুলো মৃত্তিকার পানির সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের ভ্যাকুওলের ভেতরের কোষরস মৃত্তিকার পানির চেয়ে বেশি গাঢ়। ফলে মৃত্তিকার লঘু দ্রবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে।

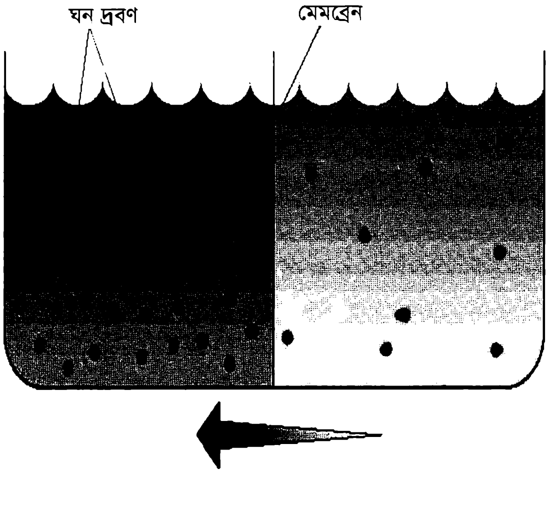

অভিস্রবণ

অভিস্রবণ দুই প্রকার–

ক. অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis) যে অভিস্রবণে দ্রাবক (পানি) বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে অন্তঃঅভিস্রবণ বলে।

খ. বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis) যে অভিস্রবণে দ্রাবক (পানি) কোষের ভেতর থেকে এর বাইরে গমন করে তাকে বহিঃঅভিস্রবণ বলে।

অভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রায় একটি দ্রবণ ও এর বিশুদ্ধ দ্রাবককে যদি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা রাখা হয়, তবে অর্ধভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের (পানির) বেশি ঘন দ্রবণে প্রবেশকে পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য বেশি ঘনত্বের দিক থেকে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের অভিস্রবণিক চাপ (osmotic pressure) বলে। দু'টি দ্রবণের ঘনত্বের মধ্যে যত বেশি পার্থক্য থাকবে অভিস্রবণিক চাপও তত বেশি হবে। পার্থক্য কম থাকলে চাপ কম হবে। ঘনত্ব সমান হলে কোনো অভিস্রবণ হবে না এবং কোনো চাপ থাকবে না।

মু. আ.

অভ্র (mica)

খনিজ পদার্থ। দেখতে স্বচ্ছ কাচের মতো। পাতলা পাতার মতো স্তরে স্তরে সঞ্চিত যৌগ। ইংরেজিতে একে 'মাইকা' বলে। প্রকৃতিতে সাত রকমের অভ্র পাওয়া যায়

(১) মাসকোডাইট বা পটাসিয়াম অভ্র, (২) প্যারাগোনাইট বা সোডিয়াম অভ্র, (৩) লেপিডোনাইট বা লিথিয়াম অভ্র, (৪) ফ্লাগাসাইট বা ম্যাগনেসিয়াম অভ্র, (৫) বায়োটাইট বা ম্যাগনেসিয়াম-লোহা অভ্র, (৬) জিনওয়ালডাইট বা লিথিয়াম-লোহা অভ্র, এবং (৭) লেপিডোমিলেন বা লোহা অভ্র।

অভ্রের তাপ ও বিদ্যুৎ-সহনক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। অভ্রের পাতা পরতে পরতে খুলে খুব মিহি পাতলা পাতায় বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই বিরল গুণের জন্য সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া রঙ বা পেইন্ট, রাবার, লুব্রিকেটিং, প্লাস্টিক শিল্পেও অভ্র ব্যবহৃত হয়।

ভারত, ব্রাজিল, আমেরিকা, তানজানিয়া,

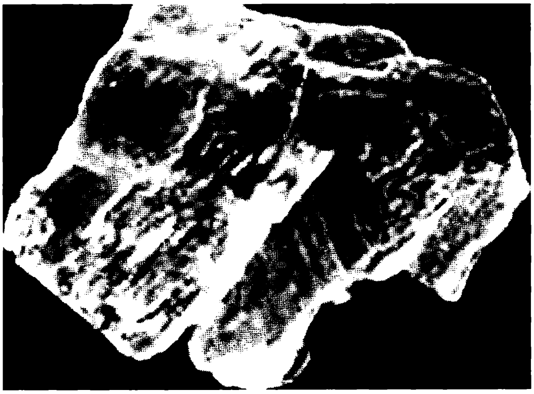

রোডেশিয়া এবং আর্জেন্টিনায় প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়। পাথরের স্তরে স্তরে প্রায়ই অভ্র মেলে।

স. রা.

অমেরুদণ্ডী প্রাণী (invertebrates)

যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া থাকে না, তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। মেরুদণ্ড প্রায় খাড়া একটি হাড়ের লাঠি। এটি অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডকে কশেরুকা বলা হয়। মেরুদণ্ড দেহকে খাড়া রাখতে এবং এদিক-সেদিক বাঁকাতে সাহায্য করে। যাদের দেহে মেরুদণ্ড নেই, তাদের দেহ দৃঢ় পেশির সাহায্যে মজবুত থাকে। অ্যামিবা, জেলিমাছ, কৃমি, কেঁচো, প্রজাপতি, বিছা, চিংড়ি, শামুক, তারামাছ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অণুবীক্ষণযন্ত্রে যেসব প্রাণীকে দেখতে হয়, সে ধরনের প্রাণীদেরকে রাখা হয়েছে প্রোটোজোয়া (Protozoa) পর্বে। প্রোটো মানে প্রথম, জোয়া মানে

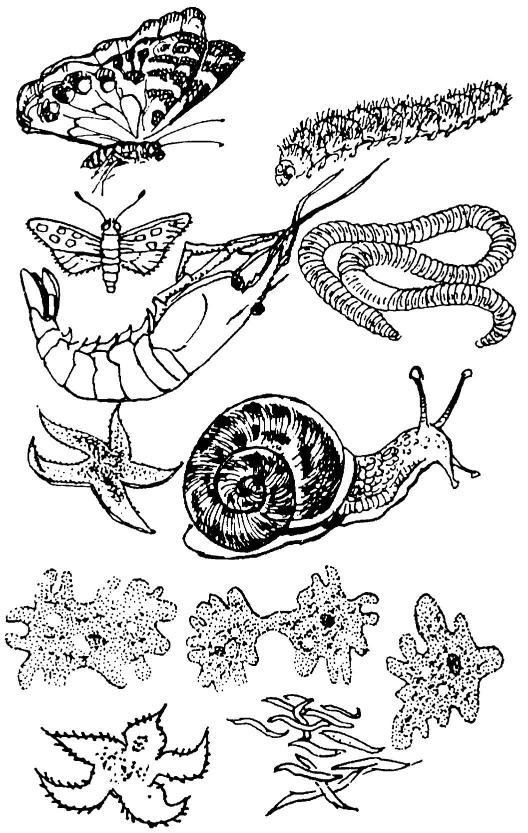

প্রাণী, অর্থাৎ প্রথম প্রাণী। অ্যামিবা, ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী। এদের থেকে একটু জটিল দেহের স্পঞ্জজাতীয় প্রাণীরা পরিফেরা (Porifera) পর্বে রয়েছে। জেলিমাছ, সমুদ্রসজারু, হাইড্রা ইত্যাদির দেহ আরো একটু জটিল। এরা সিলেন্টারেটা পর্বের (Coelenterata) প্রাণী। এর পর প্ল্যাটিহেলমিন্থিস (Platyhelminthes) পর্ব। ফিতাকৃমি জাতীয় প্রাণী এই পর্বের অধীন। আবার গোলকৃমিরা নিমাটোহেলমিন্থিস পর্বের প্রাণী। অনেলিডা (Annelida) পর্বের প্রাণীতেই প্রথম দেহকে খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। কেঁচো এই পর্বভুক্ত প্রাণী। তেলাপোকা, প্রজাপতি, চিংড়ি ইত্যাদির দেহে পা বা উপাঙ্গ রয়েছে। প্রাণিজগতে প্রথম পা-ওয়ালা প্রাণী আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের অন্তর্গত। শক্ত খোলসের ভেতরে গোটানো শামুকেরা মোলাস্কা (Mollusca) পর্বের প্রাণী। সর্বশেষ পর্ব একাইনোডার্ম্যাটা (Echinodermata)। এদের ত্বকে কাঁটার মতো বস্তু রয়েছে। একাইনো অর্থ কাঁটা, ডার্ম্যাটা মানে ত্বক। এদের তাহলে কণ্টকত্বকী প্রাণী বলা যায়। তারামাছ দেখলে এ সত্য বোঝা যায়।

ত. চ.

অরোরা বোরিয়ালিস (aurora borealis)

উত্তর গোলার্ধ, বিশেষ করে মেরুবৃত্তের ভেতরকার অঞ্চলে দীর্ঘ রাতের আকাশে দেখা দেয় এক রকম আলোকছটা। এটি অরোরা বোরিয়ালিস, 'উত্তরা আলো' অথবা 'মেরুজ্যোতি' নামে পরিচিত। এতে আকাশ-জোড়া নানা রঙের আলোর খেলা হঠাৎ-হঠাৎ ছটা দিয়ে যায়। কখনো বহু রেখা, কখনো বহু ফিতার সমন্বয়ে এটি যেন আকাশে আঁকাবাঁকা নিত্যকার নকশিকাঁথার পর্দা রচনা করে। মেরুবৃত্তের ভেতরে নিত্যকার ঘটনা হলেও এর বাইরে অনেক কম অক্ষাংশেও এটি মাঝে মাঝে দেখা গেছে। দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ আলোকে বলা হয় অরোরা অস্ট্রালিস (aurora australis)। রোমান উপকথায় অরোরা হচ্ছেন ভোরের দেবতা।

ধারণা করা হয়, মহাশূন্য থেকে বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন যেসব অসংখ্য কণিকা নিত্য বর্ষিত হয়, তাদের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কণিকার সংঘর্ষের ফলেই অরোরা সৃষ্টি হয়। টিউব লাইটের মধ্যে

যেভাবে আলো উৎপাদিত হয় প্রক্রিয়াটি অনেকটা সে রকম। চার্জসম্পন্ন কণিকাগুলোর উপর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে দুই মেরুর কাছেই এটি বেশি

দেখা যায় সৌর কলঙ্কের পর্যায়ক্রমিক উথলানোর সঙ্গে অরোরা বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে।

মু. ই.

অর্জুন গাছ (arjuna)

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র অর্জুন গাছ রয়েছে। অর্জুন গাছ নানা ধরনের রোগ নিরাময়ের কাজে আসে বলে মানুষ এই গাছ লাগায়। কম্ব্রোট্যাসী (Combratrasae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত অর্জুন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *টার্মিনালিয়া অর্জুনা (Terminalia arjuna)*। গাছটি বেশ বড় হয়। এর কাণ্ড দীর্ঘ, সরল, উন্নত, মসৃণ। বাকল ধূসরাভ ও পাতলা। বাকলের নিচের রঙ পাংশু। গাছের শাখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, দীর্ঘ। গাছের শীর্ষদেশ ছত্রাকৃতির, প্রসারিত ও ছায়াঘন। ভূমির কাছাকাছি কাণ্ড খাঁজযুক্ত। অর্জুনের পাতা লম্বা ডিম্বাকৃতির এবং একটু পুরু ও মসৃণ। অর্জুন পত্রমোচী বৃক্ষ। অর্থাৎ শীতে পাতা ঝরে পড়ে, বসন্তে নতুন পাতা গজায়। সেই সঙ্গে গাছে ফুল আসে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় গাছ। ছোট ছোট হালকা হলুদ উগ্রগন্ধী বা দুর্গন্ধযুক্ত ফুল। অর্জুনের ফুল মৌমাছিদের খুব প্রিয়। ফুল থেকে ফল হয়। ফল ডিম্বাকৃতির। এতে পাঁচটি খাঁজ থাকে। ফল বেশ শক্ত। ধরেও অজস্র। গাছের তলা ফলে ফলে ভরে যায়। অর্জুন গাছের কাঠ বেশ শক্ত, কিন্তু আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। নৌকা, ঘরের চৌকাঠ, পাল্লা ও গরুর গাড়িতে এই কাঠ ব্যবহার করা যায়। এর পাতায় তসর পোকার চাষ হয়। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বা ট্যানিং এবং রঞ্জন পদার্থে এর বাকল ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে আয়ুর্বেদী চিকিৎসায় এই গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে। হৃদ্‌রোগে খুব সুফলদায়ক বলে প্রমাণিত। বিশেষ করে এর বাকলই ভেষজ হিসাবে কাজে লাগে। বাকল পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বাকলের কষ পানিতে মেশে। রোগীকে এই কষ-মেশানো পানি খাওয়ানো হয়। এ ছাড়া অরেচক, ক্ষত ও রক্তশূন্যতায় অর্জুন খুব উপকারী। অর্জুন বাকল থেকে ঔষধ তৈরি হয় বলে মানুষ গাছটির বাকল প্রায়ই ছাড়িয়ে নেয়। অতিরিক্ত বাকল ছিলে নিলে গাছের ক্ষতি হয়।

ত. চ.

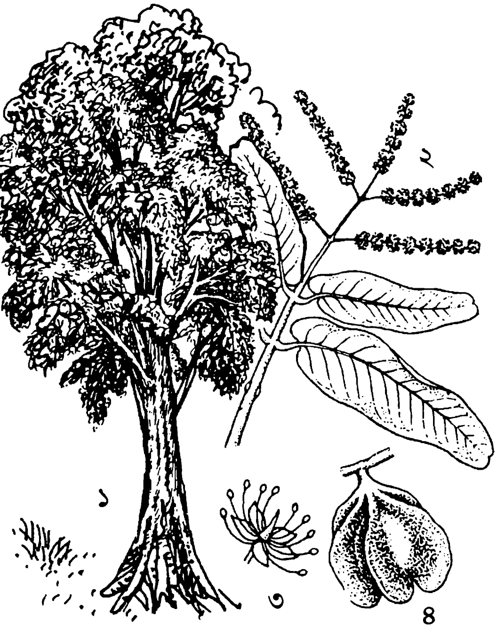

অর্জুন গাছ
১. গাছের আকৃতি, ২. পাতা ও মঞ্জরি, ৩. ফুল, ৪. ফল

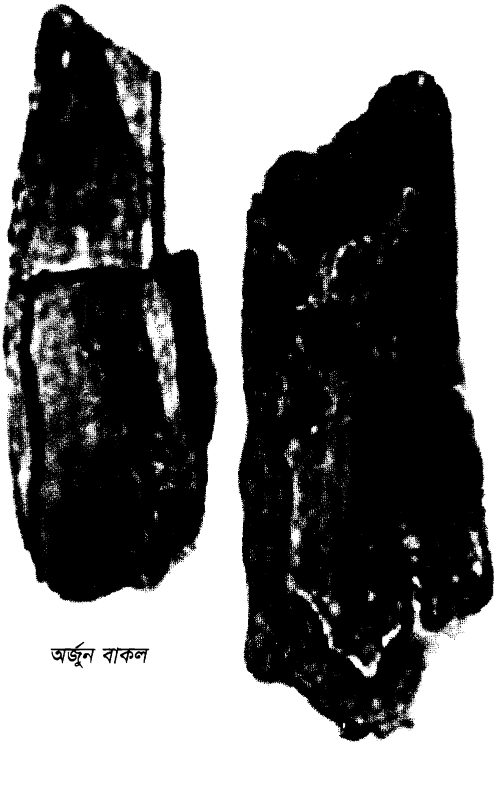

অর্জুন বাকল

অশোক (ashoka tree)

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান এই বৃক্ষের উৎসস্থল। Papilonaceae Leguminosac গোত্রের উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত অশোক-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Saraca indica* L। ইংরেজিতে অশোকা ট্রি (Ashoka tree) হিসাবে পরিচিত। অশোক ক্ষুদ্রাকৃতির বৃক্ষ, কাণ্ড মসৃণ, ধূসর, উন্নত শাখাযুক্ত। পাতা বড়। এর ফুল ছোট হলেও বহু পুষ্প সম্বলিত ছত্রাকৃতির মঞ্জরি বেশ বড়। মঞ্জরি বর্ণ ও সৌষ্ঠবে আকর্ষণীয়। সদ্য ফোটা ফুলের রঙ কমলা। বাসি ফুলের রঙ লাল। ফুলের গন্ধ প্রায় মধুর গন্ধের মতো। পুষ্পকুঁড়ির আকৃতি গদার মতো। প্রায় সারা বছরই এতে ফুল ফোটে। ফল চ্যাপটা, ত্বকের মতো নমনীয়। রঙ হালকা বেগুনি। বীজ থেকে সহজেই চারা হয়। বিবিধ স্ত্রীরোগ, অভ্যন্তরীণ রক্তমোক্ষণ, আমাশয় ও জ্বরে এর নানা অংশ ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

অশোক গাছ

অশ্বত্থ বা পিপ্পল (peepul)

ডুমুর জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ দ্বিতীয় বৃহত্তম। বট এই পরিবারের বৃক্ষগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রথম অবস্থায় এই গাছ প্রায়ই অন্য গাছে, ভাঙা দেয়ালে, কার্নিশে, ভাঙা দেউলে জন্মায়। পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে বীজ ছড়ায় বলে এভাবে জন্মাতে পারে। অশ্বত্থ ও বটের দড়ির মতো শেকড় ক্রমে বড় হয়ে আশ্রয়দানকারী গাছ বা দেয়ালকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। তাই ভাঙা দেউলে বা দেয়ালে এই গাছ সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। অশ্বত্থকে (উচ্চারণ অশ্‌শথ্‌থো) পিপ্পলও বলে। চলতি বাংলায় আমরা অশ্বত্থকে সর্বদা 'অশথ' বলে থাকি।

ছায়াতরু হিসাবে অশ্বত্থ রাস্তার ধারে রোপণ করা হয়। এই গোত্রের আর একটি গাছ পাকুড়, দেখতে অনেকটা অশ্বত্থের মতোই। অশ্বত্থের বৈজ্ঞানিক নাম *ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus religiosa* Linn), গোত্র মোরাসি (Moraceae)। এই ধরনের আর একটি গাছ হল নন্দীবৃক্ষ বা গয়া অশ্বত্থ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ফিকাস রামফি ব্লুম (Ficus rumphii Blume)*। সারা পৃথিবীতে এই পরিবারের ৬০০ প্রজাতি (species) আছে, বাংলাদেশ-ভারতে আছে ১২টি প্রজাতি।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অশ্বত্থের পাতা ঝরে যায়। এ

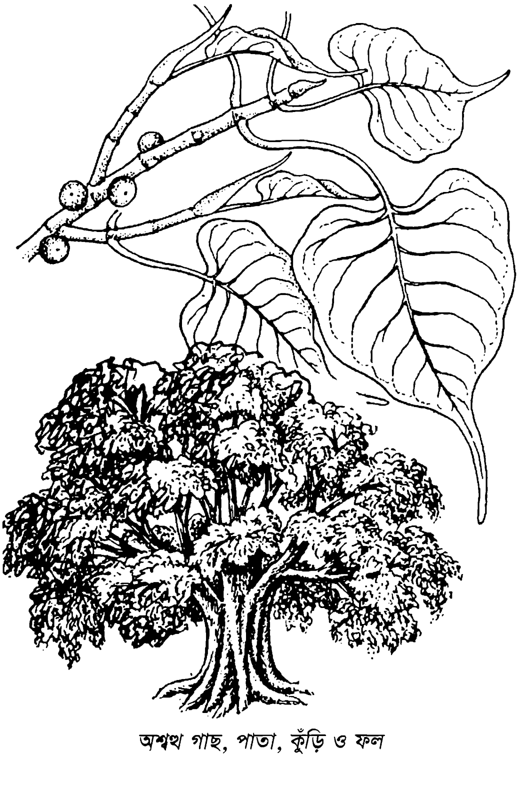

অশ্বত্থ গাছ, পাতা, কুঁড়ি ও ফল

সময় এবং কখনো কখনো একটু পরে ফুল আসে। চৈত্র-বৈশাখে নতুন তামাটে পাতায় গাছ ভরে যায়। ক্বচিৎ দু'-একটি গাছে সবুজ রঙের পাতা আসে। এই গাছের পাতার আগা হঠাৎ সুচালো হয়ে দীর্ঘ হয়। অশ্বত্থের পাতা দেখতে হৃৎপিণ্ডের মতো। বোঁটা দীর্ঘ বলে হাওয়ায় পতপত শব্দ করে। এই বৈশিষ্ট্য অনন্য। কিছু দিনের মধ্যেই পাতার তামাটে রঙ কচি সবুজ ও পরে ঘন সবুজে পরিণত হয়। এ জন্য একে বলে তাম্রপত্রী গাছ এবং এ থেকে সাদা ক্ষীর বের হওয়ার জন্য একে বলে ক্ষীরীবৃক্ষ। এই কষ বা ক্ষীর নানা রোগের ঔষধ। বর্ষার মধ্যে ফল পাকে। অশ্বত্থের ফল পাখিদের প্রিয়। অশ্বত্থের পাতা, ছাল, শেকড়, ক্ষীর নানা রোগের মহৌষধ।

বি. ব.

অশ্বশক্তি (horse-power)

শক্তি পরিমাপের একটি একক। ইংরেজিতে একে বলা হয় হর্সপাওয়ার (horse-power)। ৫৫০ পাউন্ড ওজনের কোনো বস্তু এক সেকেন্ডে এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হয় তাকেই বলে এক অশ্বশক্তি। এর মান প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ ফুট পাউন্ড। ডায়নামো, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রের কাজ করার শক্তি এই হর্সপাওয়ার বা অশ্বশক্তি এককে প্রকাশ করা হয়। ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট = ০.৭৫ কিলোওয়াট (প্রায়)।

সু. ব.

অস্টিওমায়েলাইটিস (osteomyelitis)

হাড় এবং হাড়ের মজ্জায় ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক জাতীয় জীবাণু সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহ। সাধারণত এর সঙ্গে ত্বকে কিংবা শরীরের অন্য কোনো অংশে একই জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ থাকে। আঘাত পেলে, হাড় ভেঙে গেলে কিংবা শল্য চিকিৎসার পরে সরাসরি অস্থিমজ্জায় জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। তা ছাড়া রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়েও জীবাণু অস্থিমজ্জায় পৌঁছাতে পারে। শিশুদের এ রোগ হঠাৎ হতে পারে। পা এবং হাতের লম্বা হাড়ের দু' মাথায় এটা বেশি ঘটে। এর ফলে তীব্র জ্বর, কাঁপুনি, আক্রান্ত হলে তীব্র ব্যথা এবং হাড়ে

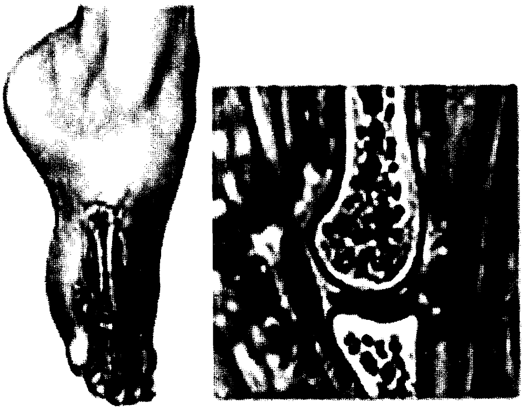

অস্টিওমায়েলাইটিসে আক্রান্ত অস্থিমজ্জা

পুঁজ জমে ফোড়া হতে পারে। বড়দের বেলায় এ রোগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে পারে এবং কোমর ও মেরুদণ্ডের হাড়ে সংক্রমণ বেশি ঘটে থাকে। মেরুদণ্ডের কশেরুকাতে এ রকম জীবাণু সংক্রমণের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেলে রোগীর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

সা. এ.

অস্টিওম্যালাসিয়া (osteomalacia)

শিশুদের ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবজনিত রোগকে রিকেট্‌স্ বলে। বড়দের ক্ষেত্রে তা অস্টিওম্যালাসিয়া নামে পরিচিত। ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে হাড়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কমে গিয়ে এই রোগ দেখা দেয়।

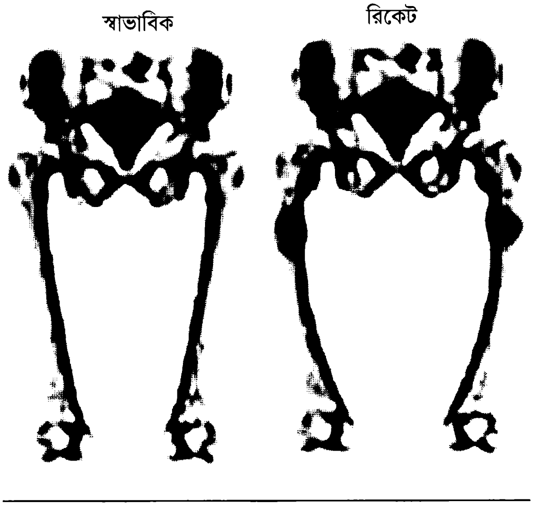

দীর্ঘদিন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, যেমন– মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি না খেলে, আন্ত্রিক রোগ থাকলে কিংবা সূর্যের আলোর সংস্পর্শে না এলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে হাড়ে ব্যথা হয়, পেশি দুর্বল হয়ে যায়, তাতে খিঁচুনি হতে পারে এবং হাড় সহজেই ভেঙে যেতে পারে।

হাড়ের এক্স-রে এবং রক্ত পরীক্ষা করে এ রোগ শনাক্ত করা যায়। সাধারণত ভিটামিন 'ডি'-এর সাহায্যে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। মাঝে মাঝে গায়ে রোদ লাগানো এবং দুধ-ডিম, মাছ-মাংস পরিমাণ মতো খেলে সহজেই অস্টিওম্যালাসিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

সা. এ.

অস্ট্রালোপিথেকাস (australopithecus)

বহু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে অস্ট্রালোপিথেকাস হল মানব জাতীয় জীবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এরা আফ্রিকায় বসবাস করত। চল্লিশ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে এরা জীবিত ছিল।

অস্ট্রালোপিথেকাস শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ অস্ট্রালিস (অর্থ 'দক্ষিণ') এবং গ্রিক শব্দ পিথেকাস (অর্থ 'এপ্') থেকে। এদেরকেই প্রথম হোমিনিড বলা হয়। হোমিনিড বলতে প্রাগৈতিহাসিক মানবসদৃশ জীবদের বোঝায়।

অনেকে চার ধরনের অস্ট্রালোপিথেকাসের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেন ১. অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস (afarensis)– চল্লিশ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসী ছিল এরা, ২. অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (africanus)– পঁচিশ লক্ষ বছর আগে এরা দক্ষিণ আফ্রিকায় জীবিত ছিল, ৩. অস্ট্রালোপিথেকাস বোইসেই (boisei)– পঁচিশ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায় এদের দেখা যেত, এবং ৪. অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস (robustus)– বিশ লক্ষ বছর আগে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করত।

অস্ট্রালোপিথেকাস সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং দু' পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত। এরা ছিল চার থেকে পাঁচ ফুট (১২০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার) দীর্ঘ। আধুনিক

১. অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস, ২. অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস, ৩. অস্ট্রালোপিথেকাস বোইসেই, ৪. অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস

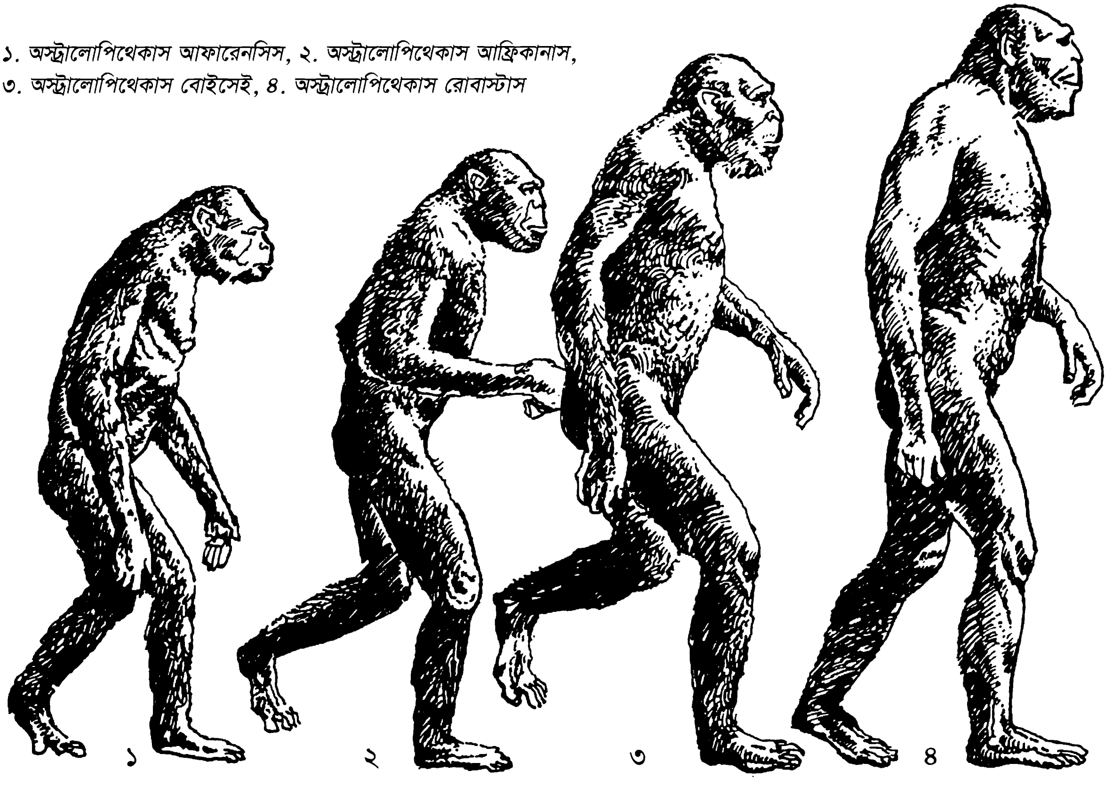

মানুষের মস্তিষ্কের তিন ভাগের এক ভাগ ছিল এদের মস্তকের পরিমাপ। বহু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, ক্ষুদ্র অস্ট্রালোপিথেকাস থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে।

১৯২৪ সালে এদের ফসিল বা জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায়। অস্ট্রেলীয় নৃতত্ত্ববিদ রেমন্ড আর্থার ডার্ট (Raymond Arthur Dart) একটি শিশুর মাথার খুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় পান। তিনি একে হোমিনিডভুক্ত জীব বলে মনে করেন, কিন্তু অনেকে আবার একে অবলুপ্ত 'এপ্'-এর শেষ চিহ্ন বলে মনে করেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসিল থেকে এদের বর্তমানে হোমিনিড (hominid) বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। ইথিওপিয়া, তানজানিয়া ইত্যাদি অঞ্চলেও এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এসব ফসিল দেখে মনে হয় মানবসদৃশ এই সব জীব মানুষ কর্তৃক অস্ত্র তৈরির আরো বহু আগে থেকেই, প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগেই, সোজা খাড়াভাবে হাঁটতে পারত।

সৈ. আ. ই.

অস্থি (bone)

অস্থি বা হাড় দেহের অন্যতম সংযোজক কলা। দেহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এই কোষকলা অস্থিকোষ ও আন্তঃকৌষিক উপাদানে তৈরি। শেষোক্ত অংশ কোলাজেন ও ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্বারা গঠিত। অস্থির কঠিন আবরণটির নাম 'পেরিঅস্টিয়াম'। কাঠিন্য অনুযায়ী অস্থি কঠিন ও স্পঞ্জি এই দুই ভাগে বিভক্ত।

অস্থিকোষ তিন ধরনের– গঠনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকর্তা; এদের নাম যথাক্রমে অস্টিয়োব্লাস্ট, অস্টিয়োসাইট এবং অস্টিয়োক্লাস্ট। এই তিনের সমন্বিত ক্রিয়া অস্থির গঠন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।

অস্থির কাজ একাধিক। দেহকাঠামো গঠনের মাধ্যমে দৈহিক আকৃতি বজায় রাখা, গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রকে (যেমন মস্তিষ্ক) সুরক্ষিত অবস্থানে রাখা, খনিজ পদার্থের (যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস) উৎস হিসাবে কাজ করা, রক্তকোষ তৈরির উৎস লোহিত মজ্জা ধারণ, পেশি চালনায় সাহায্য করা ইত্যাদি। অস্থিগঠন এবং অস্থিসংক্রান্ত যাবতীয় অনুশীলন অস্থিবিদ্যার অন্তর্গত। অস্থির উল্লেখযোগ্য রোগের মধ্যে রয়েছে অস্থির টিউমার, ক্যান্সার ও যক্ষ্মা, রিকেট্স, অস্টিওমায়েলাইটিস ইত্যাদি।

রু. হা.

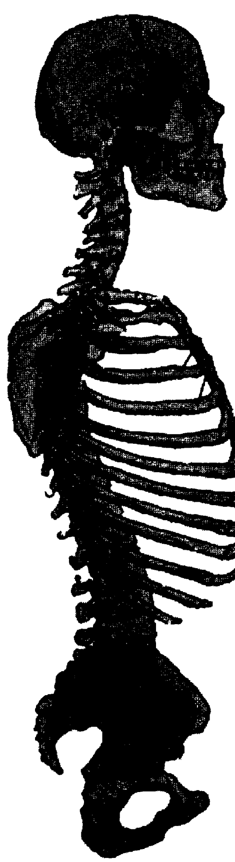

অস্থিসন্ধিরোগ (joint disease)

দেহের সংযোজক কলা অস্থি ও অস্থিসন্ধির রোগসমূহকে সাধারণভাবে রিউমেটিক রোগ বা বাতরোগ বলা হয়, যদিও এই নামকরণের বিষয়েও সবাই একমত নন। এসব রোগের প্রধান লক্ষণ দেহকাঠামোর বিভিন্ন অংশে ব্যথা ও জড়তা; ফলে সংশ্লিষ্ট অংশের তৎপরতা হ্রাস। বর্তমানে এই সব রোগ প্রধানত রোগতাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রদাহী, বিপাকীয় এবং অবক্ষয়ী এই তিন গ্রুপে চিহ্নিত করা হয়।

প্রদাহজনিত রোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রিউমেটয়েড সন্ধিপ্রদাহ (rheumatoid arthritis) এবং সংক্রমণজনিত সন্ধিপ্রদাহ। বিপাকীয় গোলযোগের কারণে সৃষ্ট রোগের মধ্যে রয়েছে বহুপরিচিত গাউট বা গেঁটে বাত। অন্য দিকে অবক্ষয়ী রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্টিওআর্থ্রোসিস (osteoarthrosis) এবং স্পন্ডাইলোসিস (spondylosis)। এগুলোর

প্রাদুর্ভাব মোটেই কম নয়। আমাদের দেশে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব সত্ত্বেও বিদেশি পরিসংখ্যানে এদের গুরুত্ব বোঝা যায়। ব্রিটেনের মতো স্বল্প জন বসতির দেশেও বছরে দুই কোটি লোক বিভিন্ন ধরনের রিউমেটিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রিউমেটয়েড সন্ধিপ্রদাহের কারণ স্পষ্ট নয়। তবে এতে অনাক্রম্যতাত্ত্বিক কারণ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে বলে আজকাল মনে করা হচ্ছে। সাধারণত হাত-পায়ের আঙুলের সন্ধি এই রোগে আক্রান্ত হয়। সন্ধিগুলো গরম হয়, ফুলে ওঠে এবং নাড়াচাড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। সঙ্গে জ্বরও থাকে। লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে দেখা দেয়; দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সন্ধিগুলোর গঠনবিকৃতি। যে কোনো বয়সে এই রোগ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসায় নিরাময় ঘটে না, তবে লক্ষণের সাময়িক উপশম ঘটে এবং রোগের অগ্রগতি কমে আসে।

সংক্রমণজনিত সন্ধিপ্রদাহ আকস্মিকভাবে দেহের যে কোনো সন্ধিতে দেখা দিতে পারে। সন্ধিতে আঘাত বা ইনজেকশন, দেহে অস্ত্রোপচার এবং অনুরূপ পটভূমিতে জীবাণু সংক্রমণের কারণে সন্ধিপ্রদাহ প্রকাশ পায়। জ্বর, সন্ধিবেদনা, সন্ধিস্ফীতি সচরাচর লক্ষণ। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু এই সংক্রমণে অংশ নিয়ে থাকে। উচ্চমাত্রায় সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকের দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং সন্ধির বিশ্রামে সুফল পাওয়া যায়।

দেহে প্রোটিনজাতীয় পিউরিন উপাদানের বিপাকক্রিয়ার গোলযোগ গাউট-এর প্রধান কারণ। এই রোগে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা সন্ধির কোমলাস্থিতে সঞ্চিত হতে থাকে। গাউট কমবয়সীদের রোগ। পরিবেশ ও বংশগত ত্রুটি এর কারণ বলে বিবেচিত। হাত-পায়ের, বিশেষ করে পায়ের আঙুলের সন্ধি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। জানু, গোড়ালি, কনুইসন্ধিও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত সন্ধি উত্তপ্ত ও রক্তিম হয়ে ওঠে। ফোলা সন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। সঙ্গে জ্বর এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ উপস্থিত থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের রেচনবর্ধক ও বেদনানাশক ঔষধে রোগের উপশম ঘটে।

অস্টিওআর্থ্রোসিস বার্ধক্যের রোগ। মেরুদণ্ড, কাঁধ, জানু ইত্যাদি ভারবহনকারী সন্ধি সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। সন্ধির কোমলাস্থি ও অন্যান্য অংশ অবক্ষয়ের প্রভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে রোগের প্রকাশ ঘটায়। ক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন অস্থি ও সংযোজক কলার গঠন অস্থিসন্ধিতে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। অস্টিওআর্থ্রোসিসের কারণও সঠিকভাবে জানা যায় না। এ রোগের প্রধান লক্ষণ সন্ধিতে ব্যথা, ক্রমে সন্ধি ব্যবহারে অসুবিধা। এই দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত সন্ধির স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যায় এবং সন্ধি আর ব্যবহারযোগ্য পর্যায়ে থাকে না। এর সন্তোষজনক কোনো চিকিৎসা নেই। বেদনানাশক ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট পেশির ব্যায়াম রোগের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে মাত্র। গ্রীবাদেশের কশেরুকায় (দ্র) এই অবক্ষয়ী প্রক্রিয়া সচরাচর দেখা যায়, নাম সার্ভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) স্পন্ডাইলোসিস। যেমন দেখা যায় কটিদেশের কশেরুকায় (সাধারণ নাম লাম্বাগো), তেমনি কাঁধের সন্ধিতে (shoulder joint)। শেষোক্ত অবস্থাটির সাধারণ নাম 'ফ্রোজেন শোল্ডার'। আক্রান্ত সন্ধিতে এসব ক্ষেত্রে তাপপ্রয়োগ ('আলট্রাভায়োলেট' কিংবা 'শর্টওয়েভ') এবং ব্যায়াম অবস্থা আয়ত্তে রাখে, ব্যথার উপশম ঘটায়।

আ. র.

অ্যাকসেলারেটর / কণাত্বরক (accelerator)

তড়িৎ চার্জযুক্ত মৌলিক কণিকা এবং আয়নসমূহের গতিশক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কণাত্বরক (Particle Accelerator)। এসব মৌলিক কণিকা হল ইলেকট্রন, প্রোটন অথবা চার্জযুক্ত পারমাণবিক নিউক্লিয়াস। (চার্জহীন বলে নিউট্রন এ যন্ত্র দ্বারা ত্বরিত হবে না)। নিউক্লীয় এবং কণিকা-পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পদ্ধতির চিকিৎসায় এর ব্যবহার ব্যাপক।

প্রথম ত্বরকযন্ত্র ব্যবহার করা হয় ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে। এটি তৈরি করেন জে. ডি. ককক্রফট (Cockcroft) এবং ই. টি. এম. ওয়ালটন (Walton)। লিথিয়ামকে প্রোটন কণা দ্বারা আঘাত করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। ১৯২৮ সালে নরওয়েতে রফ ওয়াইডরো (Rolf Wideroe) অন্য আর এক ধরনের কণাত্বরক তৈরি করেন যার নাম লিনিয়ার একসেলারেটর। বর্তমানে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কণাত্বরক তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ক্রমশ উন্নতমানের কণাত্বরক

তৈরিতে কৃতকার্য হচ্ছেন। দু' ধরনের কণাত্বরক উল্লেখযোগ্য- সরলরৈখিক (Linear accelerator) এবং বৃত্তাকার (Cyclic accelerator)।

সরলরৈখিক ত্বরক বেতার কম্পাঙ্কের সীমার মধ্যে পর্যাবৃত্ত তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করে কণাকে ত্বরিত করে। বৃত্তাকার বা চক্রত্বরক চৌম্বক বল প্রয়োগ করে আয়নকে কুণ্ডলী আকৃতি পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গতিশক্তি বৃদ্ধি করে। এ ধরনের ত্বরকের নাম সাইক্লোট্রন, সিনক্রোট্রন এবং বিটাট্রন। সম্প্রতি ১৯৯০ এর দশকে এ ক্ষেত্রে আবিস্কৃত যন্ত্র হচ্ছে অত্যাধুনিক স্টোরেজ রিং (Storage Ring)।

স. রা.

অ্যাকোয়া রিজিয়া (aqua regia)

এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও তিন ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)-এর সংমিশ্রণে এটি তৈরি হয়। স্যাকরারা সোনা গলাতে এটি ব্যবহার করে। সোনা (দ্র), রুপা (দ্র) প্রভৃতি নোব্‌ল্ মেটাল (noble metal) এতে গলে যায়, যা অপর কোনো অ্যাসিড (দ্র) এককভাবে পারে না। এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বাতাসের (দ্র) সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায়, নাইট্রোসিল ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। এটি প্রস্তুতের জন্য আমরা অ্যালকেমিস্টদের কাছে ঋণী। সোনার একমাত্র দ্রাবক হল এই অ্যাকোয়া রিজিয়া। সোনা গলানোর এই অ্যাসিড মিশ্রণটি প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরাই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তাঁদের দেওয়া অ্যাকোয়া রিজিয়া নামটি এখানো চলছে। অ্যাকোয়া রিজিয়াতে দ্রবীভূত সোনা গোল্ড ক্লোরাইড নামক লবণের হলদে দানার আকারে দ্রবণ (দ্র) থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সোনার এই ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণ ফটোগ্রাফের ছবি পরিস্ফুট করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আ. হ. খ.

অ্যাকোয়ারিয়াম (aquarium)

অ্যাকোয়া শব্দটি ল্যাটিন। এর অর্থ জল। স্থির জলাধারে বা পুষ্করিণীতে নানা প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করে। মানুষ মুখ্যত শখের বশে কৃত্রিম জলাধার বা পুষ্করিণীতে এ সকল জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর চাষ করে। এই কৃত্রিম জলাধারের নাম অ্যাকোয়ারিয়াম।

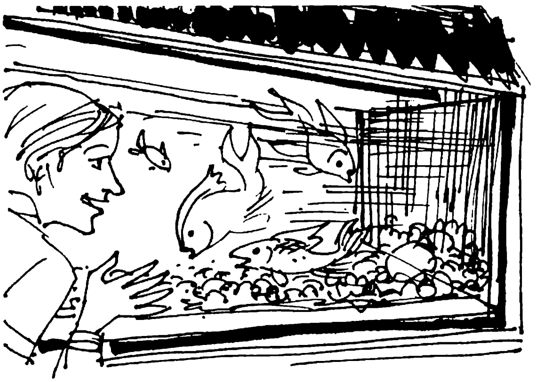

অ্যাকোয়ারিয়ামের কাঠামো লোহা, অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা যায়। কাঠামো প্রস্থে ২.৫৪ সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। যে ঘরে এটি রাখা হবে সেই ঘরের আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাঠামো নির্মাণ করা হয়। কাঠামোর কাচ ৬-৯ মিলিমিটার পুরু হওয়া চাই। কাঠামোতে কাচ সংযুক্ত করার পর একে শক্ত স্ট্যান্ডের উপর স্থাপন করতে হয়। স্ট্যান্ডে স্থাপিত কাঠামোর ভিতরে বালি ও নুড়ি পাথর এবং পানি দিতে হবে। কাঠামোতে পানির উপরে কিছু অংশ ফাঁকা থাকবে। কাঠামোর ঢাকনার নিচে পানির উপরে একটি ৪০-৬০ ওয়াটের বাল্ব প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা জ্বালাতে হয়। সূর্যের আলো ও তাপের বিকল্প হল এই বৈদ্যুতিক আলো এবং আলোসৃষ্ট তাপ। কাঠামোর ভিতরে তাপমাত্রা ৭২°-৮০° ফারেনহাইট হওয়া উচিত। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে বাতাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ু থেকে অক্সিজেন পাবে।

শখের জন্য অ্যাকোয়ারিয়ামে ছোট মাছ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণী পোষা হলেও বর্তমানে প্রাণীর জাত, বংশবৃদ্ধি, আচরণ, জীবনেতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার কাজে অনেকে এটি ব্যবহার করছেন।

পানির তাপমাত্রা, বায়ু সঞ্চালন, আলো, মাছ ও উদ্ভিদের প্রজাতি নির্বাচন, সংখ্যা, বংশবৃদ্ধি, রোগ-ব্যাধি-চিকিৎসা, পানি বদলানো, অ্যাকোয়ারিয়ামের পোষ্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম ব্যবহারকারীর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

ত. চ.

অ্যানজিওগ্রাম (angiogram)

কথাটির অর্থ ধমনির এক্স-রে-চিত্র। ধমনির অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরগাত্রে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমা হলে ধমনির ভেতরের আয়তন কমে যায়, এবং ওই সব ধমনির মধ্য দিয়ে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধমনির এ ধরনের অবস্থা বা তার জন্মগত ত্রুটি অ্যানজিওগ্রামের সাহায্যে জানা যায়। করোনারি ধমনির অবস্থা জানার জন্য করোনারি অ্যানজিওগ্রাম করা হয়। এ জন্য কার্ডিয়াকে ক্যাথিটার নামে এক রকম সরু প্লাস্টিকের নলের সাহায্যে ধমনির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের তরল রঞ্জক পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরে এক্স-রে দেখে ধমনির অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি করা হবে, নাকি বাই-পাস অপারেশন করা হবে। কিডনির ধমনির অবস্থা জানার জন্যও অ্যানজিওগ্রাম করা হয়। বস্তুত যে কোনো ধমনির অবস্থা জানার জন্য অ্যানজিওগ্রাম করা যেতে পারে।

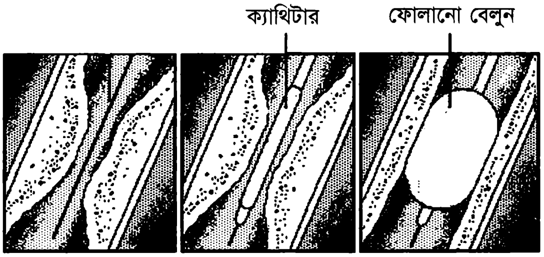

অ্যানজিওগ্রাম ও বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি

সা. এ.

অ্যানজিওপ্লাস্টি (angioplasty)

শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো হৃৎপিণ্ডেরও দরকার অক্সিজেন এবং আরো নানা রকম পুষ্টি উপাদান। করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড রক্ত সরবরাহ পায়। করোনারি ধমনির ভেতরের আয়তন কোনো কারণে সরু কিংবা তা বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সরবরাহ ব্যাহত বা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত কোলেস্টেরল এবং অন্যান্য স্নেহজাতীয় পদার্থ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে করোনারি ধমনির ভেতরটা সরু হয়ে যায়। একে 'আথেরোস্ক্লেরোসিস' (ধমনিতন্তুবতা বা ধমনি কাঠিন্য) বলে। 'বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি' নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করোনারি ধমনির অভ্যন্তরস্থ সরু হয়ে যাওয়া অংশ চাপ দিয়ে বড় করে দেওয়া হয়। এর ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে রক্ত চলাচলের পথ প্রশস্ত হয়।

'বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি'র জন্য হাত কিংবা পায়ের কোনো ধমনির অ্যানজিওপ্লাস্টির মধ্য দিয়ে লম্বা সরু একটি প্লাস্টিকের নল মহাধমনি পথে করোনারি ধমনিতে প্রবেশ করানো হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি ফ্লুরোস্কোপ নামের এক বিশেষ ধরনের এক্স-রে-টিভি ক্যামেরার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ঐ নলের মধ্য দিয়েই আরো সরু একটি প্লাস্টিকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় নলের মাথায় একটি ছোট চুপসানো বেলুন লাগানো থাকে। বেলুনটি করোনারি ধমনির নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছানোর পরে ফোলানো হয়। বেলুনের চাপের ফলে সরু হয়ে যাওয়া অংশ প্রশস্ত হয়ে যায়। এর পর নল দু'টিকে ধীরে ধীরে বের করে নেওয়া হয়।

বেলুন অ্যানজিওপ্লাস্টি জনপ্রিয় হলেও এক শ' ভাগ কার্যকরী নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে করোনারি ধমনির বড় করে দেওয়া অংশ আবার সরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন আবার একইভাবে অ্যানজিওপ্লাস্টি করতে হতে পারে।

সা. এ.

অ্যানালজেসিক (analgesic)

অ্যানালজেসিক হচ্ছে সেই সব ঔষধ যেগুলো শরীরে ব্যথার উপশম ঘটায়। মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগ ও প্রদাহের একটি অন্যতম লক্ষণ ব্যথা। চিকিৎসকেরা ব্যথা নিরাময় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যানালজেসিক ঔষধ ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে রয়েছে নারকোটিক এবং নন-নারকেটিক জাতীয় ঔষধ। নারকোটিক বা

আসক্তিকর অ্যানালজেসিকগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কাজ করে এবং স্নায়ুকে নিস্তেজ করার মাধ্যমে ব্যথা কমায়। অন্য দিকে নন-নারকোটিক অ্যানালজেসিকগুলো সাধারণত প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র অথবা বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। নারকোটিক অ্যানালজেসিক-এর মধ্যে রয়েছে মরফিন, পেথেডিন, কোডিন ইত্যাদি। আর নন-নারকোটিক অ্যানালজেসিক-এর উদাহরণ হল প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম এই সব। নারকোটিক অ্যানালজেসিকগুলোর বড় একটি অসুবিধা হল রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ ঔষধগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে এতে তার আসক্তি জন্ম নেয়। আর নন-নারকোটিক অ্যানালজেসিক বিশেষ করে পেপটিক আলসার তৈরি করতে পারে। এগুলো সর্বদাই খাবার গ্রহণের ঠিক পরেই খেতে হয়।

আ. নূ. তু.

অ্যান্টাসিড (antacid)

যেসব ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থ অম্লকে প্রশমিত করে, তাদের বলা হয় অ্যান্টাসিড। অ্যান্টাসিড জাতীয় ঔষধ মূলত পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রশমনের মাধ্যমে পাচক রসের অন্তর্গত পেপসিনকে নিষ্ক্রিয় করে থাকে। বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টাসিড সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা সোডিয়াম-এর ক্ষারীয় যৌগ। সাধারণত দু'টি যৌগের মিশ্রণ হিসাবে অ্যান্টাসিড ব্যবহৃত হয়। এই দু'টি যৌগ হল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়ামের ট্রাইসিলিকেট বা হাইড্রোক্সাইড।

অ্যান্টাসিড প্রধানত পাকস্থলীর ডিওডিনামের আলসার এবং কখনো কখনো ডিসপেপসিয়া ও অনুরূপ অসুবিধায় ব্যবহৃত হয়। এক সময় খাবার সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট অ্যান্টাসিড হিসাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু নানা বিরূপ কারণে এখন আর এটি অ্যান্টাসিড হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

আ. নূ. তু.

অ্যান্টিজেন (antigen)

আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি মূল উপাদান অ্যান্টিবডি (প্রতিরক্ষকতা)। এগুলো দেহে আপনা থেকে তৈরি হয় না। এমন কিছু পদার্থ আছে, যা শরীরে প্রবেশ করলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উদ্দীপ্ত হয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এই উদ্দীপক পদার্থগুলোকেই বলা হয় অ্যান্টিজেন। গ্রিক ভাষায় অ্যান্টি (anti) কথাটির অর্থ বিরুদ্ধে। আর জেনান (genan) অর্থ তৈরি করা। এখান থেকেই এসেছে অ্যান্টিজেন নামটি।

অ্যান্টিবডি তৈরি হলে অ্যান্টিজেনগুলো তার সঙ্গে ক্রিয়া করে। শরীরে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মূল ভিত্তি। অ্যান্টিজেন বলতে যেমন সব ধরনের অণুজীবকে বোঝায়, তেমনি জৈব বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিনকেও বোঝায়, যারা অ্যান্টিবডি তৈরি করে। অর্থাৎ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা যে টিকা নেই এই টিকাগুলো শরীরের পক্ষে এক ধরনের অ্যান্টিজেন।

অর্থাৎ যে কোনো পদার্থ শরীরে প্রবেশের পর শরীরের পক্ষে অচেনা (ফরেন) বিবেচিত হলে এবং শ্বেতকণিকার সংস্পর্শে এসে অ্যান্টিবডি তৈরি করলে তাকে অ্যান্টিজেন বলে এবং ঐ অ্যান্টিবডির সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় মিলিত হয়ে থাকে।

আ. নূ. তু.

অ্যান্টিডোট (antidote)

এই শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার antidoton শব্দ থেকে। এর অর্থ কারো বিরুদ্ধে কিছু দেয়া বা করা। অ্যান্টিডোট হচ্ছে সেই সব পদার্থ যা বিষাক্ত বস্তুর সাথে ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বিষক্রিয়া নষ্ট করে অথবা তা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অ্যান্টিডোট অনেক রকমের হয়।

রাসায়নিক যেসব অ্যান্টিডোট বিষের সঙ্গে ক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলোকে নিরাপদ রাসায়নিক যৌগে পরিণত করে, তা রাসায়নিক অ্যান্টিডোট। যেমন– খাবার লবণ সিলভার নাইট্রেটকে সিলভার ক্লোরাইড-এ পরিণত করে। ফলে নাইট্রেট-এর বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল– এরা বিষাক্ত পদার্থের সঙ্গে কোনো ক্রিয়া করে না। বরং বিষ যাতে শরীরে শোষিত না হয়, সে ব্যবস্থা করে। যেমন– দুধ, ডিমের সাদা অংশ, চারকোলের মিহি গুঁড়ো, চর্বি, তেল এসবই মেকানিক্যাল অ্যান্টিডোট।

শারীরবৃত্তিক বা ফিজিওলজিক– এই ধরনের অ্যান্টিডোটগুলো বিষ যে ধরনের কাজ করে, ঠিক তার উল্টো কাজ করে। বিষের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যেমন– যেসব বিষে খিঁচুনি হয়, এমন বিষের বিরুদ্ধে ঘুমের ঔষধ দিলে খিঁচুনি বন্ধ হয়।

সর্বজনীন বা ইউনিভার্সাল– প্রতিটি অ্যান্টিডোট সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষের বিরুদ্ধেই কাজ করে। তবে কতকগুলো অ্যান্টিডোটকে এক সঙ্গে মিশিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে এমন একটি সর্বজনীন অ্যান্টিডোট তৈরি করার, যা খেলে অনেকগুলো বিষ নিষ্ক্রিয় হবে। যেমন– দুই ভাগ সক্রিয় চারকোল, এক ভাগ ট্যানিক অ্যাসিড ও এক ভাগ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড-এর মিশ্রণ এমনি একটি অ্যান্টিডোট।

আ. নু. তু.

অ্যান্টিবডি (antibody)

অ্যান্টিজেনের প্রতিক্রিয়ায়, তারই সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করতে শরীরে কিছু আমিষ জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়। একেই বলা হয় অ্যান্টিবডি (প্রতিরক্ষিকা)। সব অ্যান্টিবডিই একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন বা আমিষ দলভুক্ত। এদের নাম ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin)। শরীরে কোনো প্রদাহ হলে, ভাইরাস বা জীবাণুর আক্রমণ হলে টিকা গ্রহণ করলে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।

আবার মায়ের শরীর থেকে কিছু কিছু অ্যান্টিবডি গর্ভস্থ শিশুর শরীরে যায়। যেমন– ধনুষ্টংকারের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি আছে, মায়ের টিকা নেয়া থাকলে, সেগুলো শিশুর শরীরে আসে। অ্যান্টিবডিগুলোর মূল কাজ আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ করা। অ্যান্টিজেন-এর উৎপাতের ফলে এরা তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু এরা অ্যান্টিজেনকেই বিনষ্ট করে। ফলে শরীর রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

আ. নু. তু.

অ্যান্টিবায়োটিক্স্ (antibiotics)

নির্দিষ্ট কোনো অণুজীবের বংশবৃদ্ধিতে অন্য কোনো অণুজীবের বাধা দেওয়ার শক্তি ও প্রক্রিয়ার নাম 'অ্যান্টিবায়োসিস' (এই গ্রিক শব্দটির অর্থ জীবন-বিরোধিতা তথা অণুজীব-বিরোধিতা)। জীবাণু (দ্র), ছত্রাক (দ্র) বা অন্য কোনো অণুজীবে উপস্থিত এ জাতীয় অণুজীব-বিরোধী উপাদানের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ জীবাণু, ছত্রাক বা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করা অথবা তাদের বিনাশ করা।

প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের গৌরব ইংরেজ চিকিৎসক আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (দ্র)-এর। ১৯২৯ সালে আকস্মিকভাবে তিনি পেনিসিলিয়াম গ্রুপের ছত্রাকের মধ্যে জীবাণুনাশক পেনিসিলিনের অস্তিত্ব শনাক্ত করেন। কিন্তু তখন বিশুদ্ধ ও মানবদেহে ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ রূপে এর নিষ্কাশন সম্ভব হয় নি।

এর পর ১৯৪০ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি (Sir Howard Walther Florey ১৮৯৮-১৯৬৮) এবং আর্নেস্ট চেইন (Ernst Boris Chain : ১৯০৬-১৯৭৯) পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন এবং ১৯৪১ সাল থেকে জীবাণু-ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে পেনিসিলিনের ব্যবহার শুরু হয়।

পেনিসিলিন (penicillin) আবিষ্কারের পথ ধরে তখন শুরু হল ব্যাপক গবেষণা এবং একের পর এক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার। ১৯৪৪ সালে ওয়াক্সম্যান (Selmam Waksman ১৮৮৮-১৯৭৩) স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাক থেকে যক্ষ্মার চিকিৎসায় কার্যকর স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin) আবিষ্কার করেন। এর পর ১৯৪৭ সালে টাইফয়েড জ্বরে ব্যবহার্য ক্লোরামফেনিকল এবং ১৯৪৮ সালে ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, ১৯৫২ সালে টেট্রাসাইক্লিনের আবিষ্কার। এখন আমরা ইরিথ্রোমাইসিন, জেন্টামাইসিন, সেফালোস্পোরিন গ্রুপের একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক, এমনকি ছত্রাক ও ভাইরাস-বিরোধী অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহৃত হতে দেখছি। এক দিকে অণুজীব (দ্র) অ্যান্টিবায়োটিক থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে সহনশীলতা অর্জন করছে, অন্য দিকে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ক্রমাগত নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিস্কৃত হয়ে অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই নিশ্চিত করছে।

যদিও জীবাণু-বিরোধী ঔষধ কেমোচিকিৎসা-উপাদান এবং অ্যান্টিবায়োটিক– এই দুই নামে বিন্যস্ত,

তবু মৌল কার্যকারিতার প্রকৃতি বিচারে এরা একই গোষ্ঠীর। এদেরকে অনায়াসে অণুজীব-বিরোধী ঔষধ (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ্‌স্) নামে চিহ্নিত করা চলে। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের প্রবণতাও সেই দিকে।

রু. হা.

অ্যান্টিমনি (antimony)

মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাদা ও ভঙ্গুর। আকার স্ফটিকের মতো। সাধারণত অক্সাইড ও সালফাইড অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি খনিজ দ্রব্য। অ্যান্টিমনি সালফাইডের বাংলা নাম সুর্মা। চোখের ভ্রু কালো করার জন্য সুর্মা ব্যবহার করা হয়। ছাপার টাইপ তৈরির সময় সিসার সঙ্গে অ্যান্টিমনি মেশানো হয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন Sb (স্টিবিয়াম)। অ্যান্টিমনির ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ অ্যান্টিমনি ব্যবহার করে আসছে বলে ধারণা করা হয়। এর পারমাণবিক ওজন ১২১.৭৬ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৫১।

সু. ব.

অ্যান্টি-হিস্টামিনস (antihystamines)

অ্যান্টি-হিস্টামিনস হল সেই সব ঔষধ যেগুলো শরীরে হিস্টামিন জাতীয় পদার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। হিস্টামিন শরীরের কোষের মধ্যেই থাকে। আঘাত পেলে, অ্যালার্জিতে এবং অন্যান্য অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি প্রতিক্রিয়ায় কোষের মধ্যে থাকা এই হিস্টামিন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোষ ভেঙে বেরিয়ে আসে। এর ফলে আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে ফুলে যায় বা চুলকায় এবং ক্লোমনালির পেশি সঙ্কোচনের ফলে প্রতিক্রিয়া তীব্র হলে প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

অ্যান্টি-হিস্টামিনগুলো হিস্টামিন-এর ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। এরা প্রধানত তিন ভাগে কাজ করে। কোনো কোনো অ্যান্টি-হিস্টামিনের রয়েছে হিস্টামিনের বিপরীত ক্রিয়া। আবার কোনোটি হিস্টামিন যেখানে আক্রমণ করবে, সেসব জায়গা আগে থেকে দখল করে রাখে, ফলে হিস্টামিন সেখানে কাজ করতে পারে না। কিছু কিছু অ্যান্টি-হিস্টামিন কোষ থেকে হিস্টামিনকে বেরই হতে দেয় না। অ্যান্টি-হিস্টামিন হিসাবে বহু ব্যবহৃত ঔষধের মধ্যে রয়েছে ক্লোরফেনিরামিন, ডাইফেন হাইড্রামিন, প্রোমেথাজিন, সেট্রিজিন ইত্যাদি।

সাধারণ লক্ষণ হিসাবে জ্বর, মাথাব্যথা, ক্লোমনালি সঙ্কোচনের ফলে শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

আ. নু. তু.

অ্যান্টেনা (antena)

একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যখন পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ওখান থেকে চারিদিকের স্থানের (space) মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তনের ভঙ্গিটি বহন করে নিয়ে যায়। রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচার এই নীতিতেই সম্ভব হয়। সম্প্রচারের সময় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার জন্য সুবিধাজনক যে বিদ্যুৎপরিবাহী ব্যবহার করা

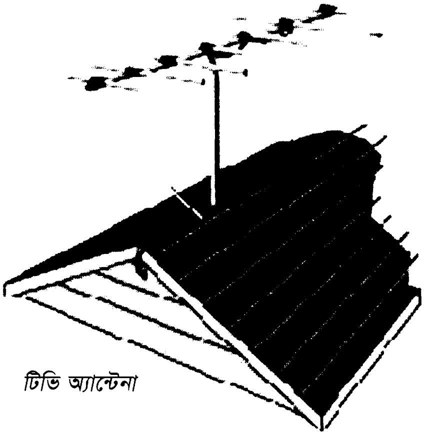

টিভি অ্যান্টেনা

হয়, সেটি সম্প্রচার অ্যান্টেনা। সম্প্রচারিত তরঙ্গ যখন আমরা রেডিও বা টেলিভিশন সেটে গ্রহণ করি তখন অনুরূপ আর একটি অ্যান্টেনা ব্যবহার করি। এর উপর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এসে পড়লে এতে আদি পরিবর্তনশীল প্রবাহের ভঙ্গিতে দুর্বল বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এটি গ্রাহক অ্যান্টেনা। এই দু' রকম অ্যান্টেনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

বহু অ্যান্টেনায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গটি এটি সম্প্রচার বা গ্রহণ করবে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান লম্বা একটি ধাতব দণ্ডই হয় অ্যান্টেনা। তবে এর ঠিক মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে। ফাঁকের দুই পাশে দণ্ডের দুই অংশের সঙ্গে সংযুক্ত তার বেয়েই পরবর্তী তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হয়।

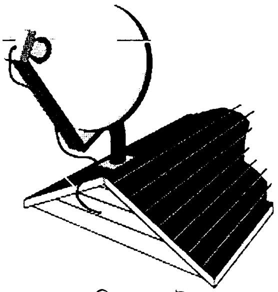

ডিশ অ্যান্টেনা

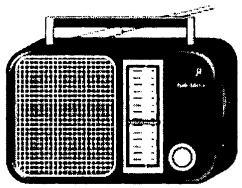

রেডিও অ্যান্টেনা

টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে বাইরের অ্যান্টেনা বেশি জরুরি বলে টেলিভিশনের অ্যান্টেনা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। টেলিভিশন সম্প্রচারে ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট বলে মাঝখানে বিভক্ত খাটো দৈর্ঘ্যের একটি ধাতুদণ্ডই অ্যান্টেনার কাজ করে। অবশ্য এর সঙ্গে এর সামনে আরো একটি খাটো এবং পেছনে একটি দীর্ঘতর দণ্ড দেওয়া থাকতে পারে, যা তার-সংযোগবিহীন। সামনেরটা তরঙ্গের পথনির্দেশক হিসাবে এবং পেছনেরটা এর প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে। এতে টেলিভিশন টাওয়ারের (যার উপর সম্প্রচার অ্যান্টেনা থাকে) দিকে অভিমুখ করে সর্বোত্তমভাবে গ্রাহক অ্যান্টেনা ব্যবহার করা যায়। আজকাল সাধারণ রেডিওতে ভেতরেই একটি ফেরাইট দণ্ডের উপর কুণ্ডলী পাকানো তারের এক রকম অ্যান্টেনা থাকে। কুণ্ডলীর পাশটা (প্রান্ত নয়) যদি রেডিও সম্প্রচার অ্যান্টেনার দিকে থাকে, তাহলে সর্বোত্তম কাজ হয়।

মু. ই.

অ্যান্ড্রোমিডা (andromeda)

পৃথিবী থেকে খালি চোখে যে গ্যালাক্সিগুলো দেখা যায় তার একটি হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা। এটি উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। আমাদের পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডার্ দূরত্ব প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ।

'অ্যান্ড্রোমিডা' নামটি এসেছে গ্রিক পুরাণ কাহিনী থেকে। অ্যান্ড্রোমিডা ছিলেন ইথিউপিয়ার রাজা সেফেউস ও রানী ক্যাসিওপিয়ার কন্যা। রানী ক্যাসিওপিয়া তাঁর

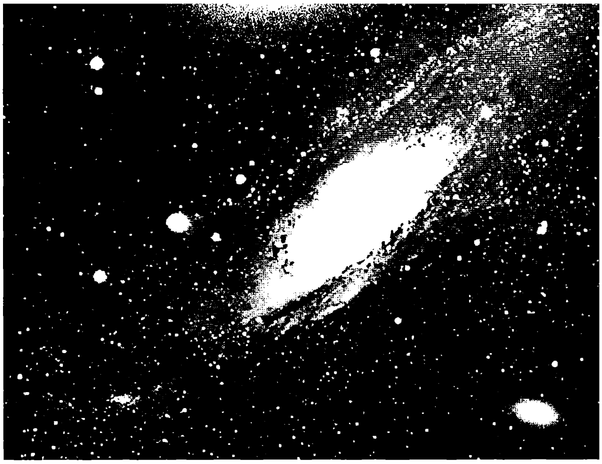

সৌন্দর্যের জন্য খুব অহঙ্কার করতেন। সে জন্য সমুদ্রদেবতা পোসাইডন ক্রুদ্ধ হয়ে ইথিউপিয়া ধ্বংস করতে উদ্যত হন। তখন দেবতা আমনের অনুরোধে ও প্রজাদের দাবিতে রাজা তাঁর মেয়েকে পোসাইডনের নিকট সমর্পণ করেন। তিনি রাজকন্যাকে সমুদ্রশিলার সাথে বেঁধে রাখেন। পারসিয়াস মেডুসার মাথা নিয়ে যাওয়ার সময় রাজকন্যাকে উদ্ধার করেন। মেডুসার মাথা দেখিয়ে তিনি সমুদ্রদেবতাকে পাথরে পরিণত করেন। পারসিয়াস অ্যান্ড্রোমিডাকে বিয়ে করেন। মৃত্যুর পর অ্যান্ড্রোমিডার স্থান হয় আকাশে, মায়ের পাশে।

বাংলায় অ্যান্ড্রোমিডার নাম ধ্রুবমাতা।

সু. ব.

অ্যানোড (anode)

তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ভোল্টামিটারে প্রবেশ করে বা যে তড়িৎদ্বার ক্যাথোডের তুলনায় ধনাত্মক বিভবে থাকে, তাকে অ্যানোড বলা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণ হল কোনো দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলিকে ধনাত্মক (পজিটিভ) ও ঋণাত্মক (নেগেটিভ) আয়নে বিভক্ত করার পদ্ধতি। সহজ ভাষায় অ্যানোড হল ধনাত্মক ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার। যে কোনো বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় যেমন ক্ষরণ নল অথবা অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা কৌশলে (device) যে প্রান্ত বা তড়িৎদ্বার থেকে ইলেকট্রন বের হয় বা নির্গত হয় তাকে বলা হয় অ্যানোড। শুষ্ক বিদ্যুৎকোষে

অ্যানোড হল পজিটিভ টার্মিনাল বা ধনাত্মক প্রান্ত। অ্যানোডের বিপরীত তড়িৎদ্বার হল ক্যাথোড। এটি হল ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার। কোনো উষ্ণায়নিক (thermoionic) ভাল্‌ভ্ বা টিউবের অ্যানোডে প্রবাহিত কারেন্ট বা তড়িৎপ্রবাহকে বলা হয় অ্যানোড কারেন্ট বা অ্যানোড প্রবাহ। অ্যানোড ভোল্টেজকে অ্যানোড প্রবাহ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় অ্যানোড রোধ। অ্যানোড প্রবাহ ও অ্যানোড ভোল্টেজের অনুপাতকে অ্যানোড বৈশিষ্ট্য বলে। কোনো ক্ষরণ নলে অ্যানোড থেকে যে ধনাত্মক আয়ন নিঃসৃত হয়, তাকে বলে অ্যানোড রশ্মি (anode ray)।

শা. ত.

অ্যাপেনডিসাইটিস (appendicitis)

ক্ষুদ্রান্ত্র শেষ হয় সিকামে। সিকাম বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ। সিকামের নিচের অংশ থেকে একটি সরু, ছোট কেঁচোর মতো অংশ ঝুলে থাকে। এর নাম অ্যাপেনডিক্স

ভারমিফরমিস। জীবাণু সংক্রমণসহ যে কোনো কারণে এতে প্রদাহের সৃষ্টি হলে অ্যাপেনডিসাইটিস বলা হয়। সময় মতো অপারেশন না করানো হলে এর ফলে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, এমনকি জীবন বিপন্ন হতে পারে।

অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা সাধারণত প্রথমে নাভির চারপাশে শুরু হয় এবং কিছু সময় পরে তা তলপেটের ডানদিকে সরে আসে। সঙ্গে জ্বর থাকে এবং বমি হতে পারে। অবিলম্বে চিকিৎসা না করলে অ্যাপেনডিক্সে পচন ধরে, ফেটে কিংবা ছিদ্র হয়ে পুরো উদর-আবরণীতে জীবাণু সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে রোগীর প্রাণসংশয় ঘটাতে পারে। সাধারণত শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্স অপসারণ করে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সা. এ.

অ্যাবাকাস (abacus)

অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ গণনার কাজে নানা কৌশল ব্যবহার করে আসছে। হাতের আঙুল গুনে, পাথর বা কাঠ পর পর সাজিয়ে বা দড়িতে গিঁট দিয়ে তারা সংখ্যা গণনা করত। মনে করা হয়, পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা প্রথম আবিষ্কার করে যে ধুলাবৃত কোনো বোর্ডের উপরে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে গণনা করা শুধু আঙুল ব্যবহার করে গণনা করার চেয়ে সুবিধাজনক। সংখ্যা গণনার এই কৌশলই পরে অ্যাবাকাস নামক প্রাচীন গণনা-যন্ত্রের জন্ম দেয়। এই গণনা-যন্ত্রটি সরল হলেও অত্যন্ত কার্যকর। ফলে আধুনিক কালেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এশিয়ার অনেক দেশে। চীন দেশেই সম্ভবত এর উন্নতি সাধিত হয়েছে বর্তমানের রূপ লাভ করার আগে।

অ্যাবাকাসে সারিবদ্ধভাবে সাজানো লম্বা কাঠির মধ্যে ছিদ্রযুক্ত গুটিকা বা পুঁতিকে চলাচল করানো হয়। একটি ফ্রেমের মধ্যে কাঠিগুলো লাগানো থাকে। একটি অনুভূমিক কাঠি এই ফ্রেমকে দুই ভাগে ভাগ করে। উপরের অংশে একটি করে

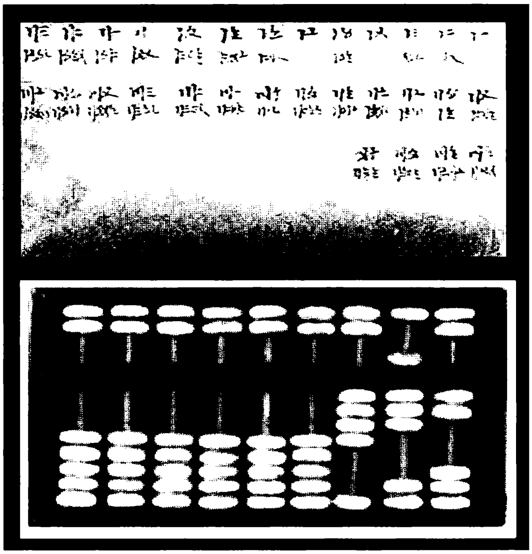

গুটিকা প্রতি কাঠির মধ্যে চলাচল করানো যায়। ফ্রেমের নিচের অংশের প্রতিটি কাঠির মধ্যে চারটি করে গুটিকা চলাচল করানো যায়। অনেক অ্যাবাকাসে এই গুটিকার সংখ্যা অনেক বেশিও হতে পারে। কাঠির মধ্যে গুটিকা চলাচলের ব্যবস্থাও ভিন্ন হতে পারে। কোনো একটি গুটিকার মান কত তা নির্ধারিত হয় কোন স্তম্ভে এর অবস্থান তা থেকে।

আ. আ.

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র (Avogadro's Law)

১৮১১ সালে ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী এমিডিও অ্যাভোগেড্রো একটি প্রকল্প (hypothesis) উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটি অ্যাভোগেড্রোর প্রকল্প নামে পরিচিত। প্রকল্পটি বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে তা অ্যাভোগেড্রোর সূত্র নামে প্রতিষ্ঠিত। সূত্রটি হল একই তাপমাত্রায় এবং চাপে সম-আয়তনবিশিষ্ট সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে।

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র রাসায়নিক গবেষণা ও রসায়নশাস্ত্রচর্চার উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন– অণুর ধারণা এবং অণু-পরমাণুর পার্থক্য নির্দেশ করেছে। ডালটনের পরমাণুবাদ তত্ত্বের ত্রুটি দূর করেছে। রাসায়নিক বিক্রিয়া উপলব্ধি ও সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। গ্যাসের আণবিক ভর নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। মৌলের পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সূত্র থেকে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা হল

(১) নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া অন্যান্য মৌলিক গ্যাসের অণুসমূহ দ্বি-পরমাণুক।

(২) যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ।

(৩) একই তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের মৌলের আয়তন সমান এবং প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় তা ২২.৪ লিটার।

এক মৌল কোনো বস্তুতে উপস্থিত অণু বা পরমাণুর সংখ্যাকে বলা হয় অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবক। এর মান ৬.০২২৫২x১০^{২৮}।

স. রা.

অ্যাভোমিটার (avometer)

বর্তমানে মাল্টিমিটার নামে পরিচিত। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ অথবা কারেন্ট পরিমাপের যন্ত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পাল্লার ভোল্টেজ বা কারেন্ট মাপা যায়। এর অভ্যন্তরে সাধারণত একটি শুষ্ক কোষ বা ব্যাটারি থাকে, যার সাহায্যে রেজিস্ট্যান্স বা রোধ পরিমাপ করা যায়। প্রায় সব মাল্টিমিটার মূলত একটি চলকুণ্ডলী যন্ত্র, যাতে থাকে একটি সুইচ। এই সুইচের সাহায্যে শ্রেণিবদ্ধ রোধক বা সমান্তরাল রোধক (resistor) সার্কিটে সংযুক্ত করা যায়। ভোল্টেজ মাপার বেলায় রোধককে শ্রেণি সংযোগে সংযুক্ত করতে হয়। কারেন্ট বা বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপার সময় রোধক সংযুক্ত করতে হয় সমান্তরাল সংযোগে।

শা. ত.

অ্যামপ্লিফায়ার (amplifier)

অ্যামপ্লিফায়ার হল একটি ডিভাইস (সংযুক্তি) বা সার্কিট (বর্তনী), যা কোনো সঙ্কেত গ্রহণ করে, কোনোরূপ পরিবর্তন না করে একে বর্ধিত বা জোরালো করে এবং পুনরায় ত্যাগ বা প্রদান করে। অর্থাৎ অ্যামপ্লিফায়ারের অন্তর্গামী প্রান্তে বা প্রবেশপ্রান্তে যে সঙ্কেত প্রদান করা হয়, বহির্গামী প্রান্তে তা অপরিবর্তিত অথচ বর্ধিতরূপে ফিরে পাওয়া যায়। যেমন– অন্তর্গামী প্রান্তে যদি এ.সি. ভোল্টেজ দেওয়া হয়, তাহলে বহির্গামী প্রান্তেও বর্ধিতরূপে এ.সি. ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

অ্যামপ্লিফায়ার বলতে সেই যন্ত্র বুঝায়, যা দিয়ে সঞ্চরণত কোনো ইলেকট্রনিক সঙ্কেতকে বিবর্ধন করা হয়। এটি রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে শব্দকে জোরালো করার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার মূলত ইলেকট্রন টিউব অথবা অর্ধপরিবাহী ডিভাইসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সবচেয়ে সরল যে ইলেকট্রন টিউবটি অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেটি হল ট্রায়োড (triode)। বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে ইলেকট্রন টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টরের মতো অর্ধপরিবাহী সার্কিট উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটি ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারে ট্রানজিস্টর কারেন্ট বা ভোল্টেজের উৎস হিসাবে কাজ করে। অ্যামপ্লিফায়ারে প্রাপ্ত সঙ্কেতের (কারেন্ট বা ভোল্টেজ) বর্ধন প্রযুক্ত সঙ্কেতের অনুপাতকে অ্যামপ্লিফায়ারের লাভ বা গেইন (gain) বলে। এই লাভ বা গেইন সব সময় ১-এর বেশি হয়। ফ্রিকুয়েন্সি বা স্পন্দনহারের পরিসরের উপর ভিত্তি করে অ্যামপ্লিফায়ারকে অডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। অ্যামপ্লিফায়ারকে ধাপে ধাপে সংযুক্ত করে শব্দ বা সঙ্কেতের বিবর্ধনকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো করা যায়। এখানে এক ধাপে প্রাপ্ত সঙ্কেত পরবর্তী ধাপে প্রযুক্ত সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শা. ত.

অ্যামিটার (ammeter)

তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপের যন্ত্রকে বলা হয় অ্যামিটার। অ্যাম্পেয়ার মিটার (ampere meter)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে অ্যামিটার। এই যন্ত্রে অ্যাম্পেয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করা হয়। অত্যন্ত নিম্ন তড়িৎপ্রবাহ মাপা হয় মিলিঅ্যাম্পেয়ার ও মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ার এককে। মিলিঅ্যামিটার মিলিঅ্যাম্পেয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করে। মাইক্রোঅ্যামিটার মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করে। এক হাজার মিলিঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক অ্যাম্পেয়ার এবং এক হাজার মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক মিলিঅ্যাম্পেয়ার। সুতরাং দশ লক্ষ মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক অ্যাম্পেয়ার। অ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুক্রম বা সিরিজ সংযোগে যুক্ত করতে হয়। অ্যামিটারকে অনুক্রম সংযোগে যুক্ত করতে হয় বলে এর নিম্নরোধ থাকতে হয়। অ্যামিটার চলকুণ্ডলী (moving coil) ও চললৌহ (moving iron) ধরনের হতে পারে। তড়িৎপ্রবাহের পাল্লা বৃদ্ধির জন্য চলকুণ্ডলী অ্যামিটারকে শান্ট রোধসহ ব্যবহার করতে হয়। পরিবর্তী প্রবাহের জন্য রেক্টিফায়ারের ব্যবহার দরকার হয়। চললৌহ অ্যামিটার এ.সি. ও ডি.সি. উভয় ধরনের প্রবাহের জন্য ব্যবহার করা যায়।

উত্তপ্ততার যন্ত্র (অ্যামিটার)-এর সাহায্যে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক মাপা হয়। এ.সি. ও ডি.সি. বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপের জন্য থার্মোঅ্যামিটারও

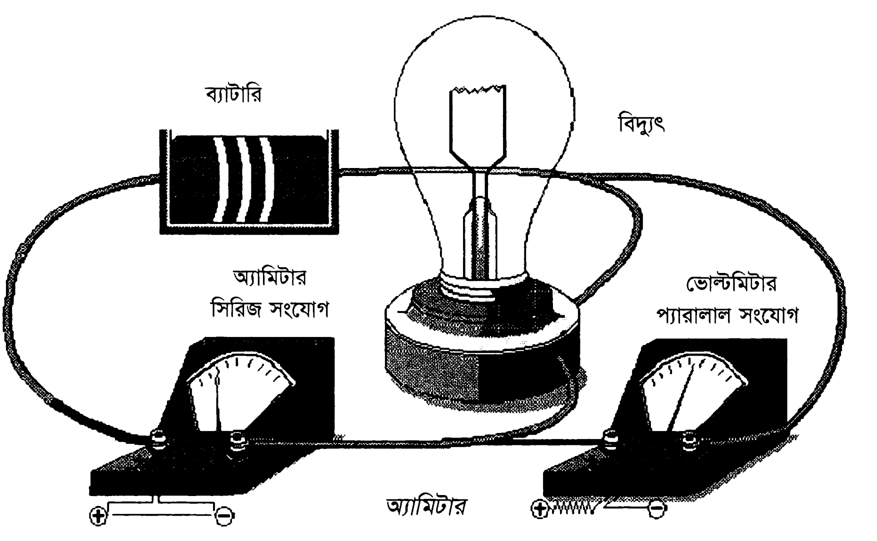

ব্যবহার করা যায়। এখানে তড়িৎকে একটি রোধক (resistor) দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। তড়িৎপ্রবাহ রোধককে উত্তপ্ত করে। রেক্টিফায়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করে চলকুণ্ডলী অ্যামিটারকে খুব বেশি সংবেদী করা যায়। এরা তখন এ.সি. ও ডি.সি. উভয় ধরনের তড়িৎপ্রবাহ এবং সেসবের সামান্য পরিবর্তনও পরিমাপ করতে সক্ষম হয়।

শা. ত.

অ্যামোনিয়া (ammonia)

অ্যামোনিয়া একটি বর্ণহীন ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস। এটি বাতাসের চেয়ে হালকা এবং পানিতে খুবই দ্রবণীয়। আণবিক সঙ্কেত NH_3, আণবিক ওজন ১৭ এবং ঘনত্ব ৮.৫। এর জলীয় দ্রবণকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH)। এটি একটি ক্ষার জাতীয় পদার্থ।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়। কয়লা থেকে কোল গ্যাস তৈরি করার সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া-তরল (liquor ammonia) পাওয়া যায়। ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলি নিশাদল (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড) ও চুন একত্রে মিশিয়ে উত্তপ্ত করে ১৭৭৫ সালে সর্বপ্রথম এই গ্যাস তৈরি করেন এবং এর নামকরণ করেন ক্ষারীয় বায়ু। আরবেরা মিশরীয় দেবতা 'অ্যামন'-এর নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন 'অ্যামোনিয়া'।

সাধারণত যে কোনো অ্যামোনিয়া লবণ যে কোনো ক্ষারের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। ল্যাবরেটরিতে প্রধানত নিশাদলের সঙ্গে চুন বা কলিচুন মিশিয়ে উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয়।

কয়লা থেকে কোল গ্যাস তৈরির সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে অ্যামেনিয়া-তরল (liquor ammonia) পাওয়া যায়, তার সঙ্গে চুন মিশিয়ে তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিজ্ঞানী হেবার অ্যামোনিয়া তৈরির এই সংশ্লেষণপদ্ধতি আবিষ্কার করেন তখন জার্মানিতে বিস্ফোরক তৈরি করবার জন্য প্রচুর পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানী হেবার বাতাস থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি করায় তা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করার এক পরম সুযোগ হল জার্মানির। এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ১ ঃ ৩ অনুপাতে (নাইট্রোজেন তরল বাতাস থেকে এবং হাইড্রোজেন পানি থেকে তৈরি করে নেওয়ার পর) মিশ্রিত করে ২০০ বায়ু চাপে সঙ্কুচিত করার পর ৫০০-৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে উত্তপ্ত সূক্ষ্ম লোহার প্রভাবক (catalyst) এবং মলিবডেনাম (molybdenum) প্রভাবকসহায়ক (promoter)-এর মিশ্রণের ওপর দিয়ে চালিত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

জমির সার, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং নানা বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করার জন্য অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রিফ্রিজারেটারেও প্রচুর পরিমাণে তরলায়িত অ্যামোনিয়ার ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

অ্যাম্পেয়ার (ampere)

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের একক। সঙ্কেত A। দু'টি অসীম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অত্যন্ত পাতলা ও সোজাসুজি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহিত অবিচল বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ, যখন পরিবাহী দু'টি একটি অপরটি থেকে এক মিটার দূরত্বে শূন্যস্থানে রাখা থাকে এবং পরিবাহীদ্বয়ের মধ্যে এর ফলে ২x১০$^{-৭}$ নিউটন বল সৃষ্টি হয়। এই এককের নামকরণ করা হয়েছে অঁদ্রে মারি অঁপ্যার (André Marié Amperé ১৭৭৫-১৮৩৬) নামে একজন ফরাসি বিজ্ঞানীর নামানুসারে।

সু. ব.

অ্যারোসল (aerosol)

তরল কিংবা কঠিন পদার্থকণার গ্যাসীয় অবস্থা কিংবা বাতাসে মোটামুটি স্থিতিশীল সাসপেনশন (suspension) অ্যারোসল নামে পরিচিত।

ধোঁয়া ও কুয়াশা অ্যারোসলের উদাহরণ। তবে আজকাল বোতল কিংবা কৌটায় রাখা বিভিন্ন স্প্রে, ফেনা কিংবা ক্রিমকেও অ্যারোসল বলা হয়। সাধারণত ধাতু, প্লাস্টিক কিংবা কাচের তৈরি পাত্রে অ্যারোসল অতিরিক্ত চাপযুক্ত অবস্থায় থাকে। ফলে একটি ভাল্‌ভ্

খুলে দিলে পদার্থটি নজ্‌ল্‌ দিয়ে বের হয়ে আসে। দুর্গন্ধনাশক (deodorant), চুলের স্প্রে, রঙ, কীটনাশক ঔষধ, জুতোর কালি ইত্যাদি অনেক কিছুই আজকাল এভাবে প্রস্তুত করা হয়।

চাপসৃষ্টিকারী পদার্থ (propellants) কক্ষ-তাপমাত্রায় তরল কিংবা গ্যাসীয় হতে পারে। এগুলি পাত্রের পদার্থকে নির্গত হতে এবং সেটাকে স্প্রে কিংবা ফেনায় পরিণত হতে সাহায্য করে। আগে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) প্রোপেল্যান্ট হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর নষ্ট করে দেয় বলে অনেক দেশেই এর ব্যবহার আজকাল নিষিদ্ধ।

সা. এ.

www.boighar.com

অ্যালকোহল (alcohol)

অতি প্রাচীন কালেও অ্যালকোহল তৈরি করার পদ্ধতি জানা ছিল। গুড়, ফলের রস, ভাত ইত্যাদি পচিয়ে এবং গাঁজিয়ে অর্থাৎ খমিরণ (ferment) করে অ্যালকোহল তৈরি করা হত।

সাধারণ হাইড্রোকার্বনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রক্সিল মূলক (OH) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে যে যৌগটি তৈরি হয় তাকে বলা হয় অ্যালকোহল। হাইড্রোকার্বনের নাম অনুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন– মিথেন থেকে মিথাইল অ্যালকোহল, ইথেন থেকে ইথাইল অ্যালকোহল, প্রপেন থেকে প্রপাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি।

হাইড্রক্সিল মূলকের সংখ্যা অনুসারে তিন ধরনের অ্যালকোহল হয়। যেমন– একটি হাইড্রক্সিল মূলক থাকলে মনোহাইড্রিক, দু'টি থাকলে ডাইহাইড্রিক এবং তিনটি মূলক থাকলে ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল বলে। (সাধারণত একাধিক মূলক সংযুক্ত থাকলে তাকে পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল বলে)।

অ্যালকোহলগুলিকে আরো একভাবে গ্রুপ হিসাবে শনাক্ত করা যায়। যেমন, একটি গ্রুপ (CH_2OH) থাকলে তাকে প্রাইমারি, দু'টি থাকলে তাকে সেকেন্ডারি, তিনটি থাকলে তাকে টারশিয়ারি অ্যালকোহল বলা হয়।

অ্যালকোহল মাত্রই বর্ণহীন, প্রশম (neutral) পদার্থ। অল্প আণবিক ওজনের অ্যালকোহলগুলি তরল, কিন্তু বেশি ওজনেরগুলি হয় কঠিন। তরল অ্যালকোহলে বিশেষ এক রকমের গন্ধ থাকে। খেলে গলা জ্বালা করে। এরা পানিতে মোটামুটি দ্রবণীয়। বেশি আণবিক ওজনের অ্যালকোহলগুলির স্বাদ, গন্ধ ও পানিতে দ্রবণীয়তা তুলনামূলকভাবে কম হয়।

মিথাইল অ্যালকোহল বা মিথাইল একটি বর্ণহীন উদ্বায়ী, দাহ্য ও প্রশম পদার্থ। কাঠের টুকরাকে অন্তর্ধূম পাতনের (destructive distillation) সাহায্যে তৈরি করা হয়। অন্তর্ধূম পাতন হল আবদ্ধ পাত্রে প্রায় বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনো পদার্থকে অত্যন্ত উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে তার রাসায়নিক বিয়োজন ঘটানোর একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে ঐ পদার্থের বিভিন্ন উপাদান পাতিত হয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। মিথাইল অ্যালকোহল খুবই বিষাক্ত একটি পদার্থ। এটি খেলে লোক অন্ধ হয়ে যায়। তাই ইথাইল অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করার জন্য অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো হয়। বাজারে মেথিলেটেড স্পিরিট নামে যে জিনিসটি পাওয়া যায় সেটিতে শুধু যে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো থাকে তা নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু ভেজাল, যেমন পিরিডিন, বেগুনি রঙ ইত্যাদি মেশানো হয়।

ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করতে হলে চিনিকে খমিরিত করে (ওয়াইন তৈরি করতে হলে) কিংবা শিল্প-পদ্ধতিতে শ্বেতসারযুক্ত জিনিস, যেমন– আলু, ভাত, ভুট্টা, কাউন প্রভৃতিতে ঈস্ট (খমির)-এর সাহায্যে খমিরিত (ferment) করে তৈরি করা হয়।

ইথাইল অ্যালকোহল বর্ণহীন ও উদ্বায়ী, জ্বালালে নীল রঙ ও উচ্চ তাপের সৃষ্টি করে। মিথাইল অ্যালকোহলের চেয়ে এটি কিছুটা কম বিষাক্ত, তবে খেলে নেশা হয়। বিশুদ্ধ অ্যালকোহল অবশ্য খুবই বিষাক্ত। নেশার জন্য যেসব মদ খাওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে কমবেশি ইথাইল অ্যালকোহল থাকেই।

গ্লাইকল নামের অ্যালকোহলটি বর্ণহীন, মিষ্টি স্বাদের এবং সিরাপের মতো, যা ঠাণ্ডার দেশে অ্যান্টিফ্রিজ হিসাবে মোটরগাড়ির রেডিয়েটারে ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিন বা গ্লিসারোল, যা সাবান তৈরির কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়, সেটি গ্লাইকলের চেয়েও বেশি ঘন এবং মিষ্টি। অ্যান্টিফ্রিজ হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও এটি আরো অনেক রকমের কাজে, যেমন– নাইট্রো গ্লিসারিন ও ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক তৈরির কাজে লাগে।

আ. হ. খ.

অ্যালক্যালি (alkali)

অ্যালক্যালি হল ক্ষার জাতীয় জিনিস, যা পানিতে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারের তীব্র জলীয় দ্রবণ যেমন তিক্ত তেমনি হাতে সাবানের মতো পিচ্ছিল অনুভূত হয়। এর দ্রবণ অন্যান্য দ্রব্যকে ক্ষয় করে। এ জন্য একে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার। একটি ক্ষার জাতীয় জিনিসকে সহজেই বোঝা যায় যখন এর পানি-দ্রবণ লাল লিটমাস কাগজকে নীল লিটমাস কাগজে রূপান্তরিত করে। যখন অ্যাসিড এবং ক্ষার একত্রে পানিতে মেশে তখন লবণ তৈরি হয়। যখন শুষ্ক অ্যাসিড এবং শুষ্ক ক্ষার মেশানো হয়, তখন কোনো রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। যেমন সাধারণ বেকিং পাউডারে শুষ্ক অ্যাসিড এবং শুষ্ক ক্ষার মেশানো থাকে, কিন্তু এদের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না।

শক্তিশালী অ্যালক্যালি নানা প্রকার দ্রব্য পরিষ্কার করতে এবং সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। খুব ভালো জাতের অ্যালক্যালি হল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH)। KOH নরম সাবান ও ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় এবং NaOH শক্ত সাবান ও ঔষধ তৈরির কাজে লাগে। তা ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন ছবি তোলার ফিল্ম প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয় NaOH-এর সাহায্যে। ক্ষার চামড়ার পক্ষে অস্বস্তিকর ও দহনকারী। এর pH সাতের বেশি।

আ. হ. খ.

অ্যালুমিনিয়াম (aluminium)

নীলাভ সাদা ধাতু। প্রতীক Al। পারমাণবিক গুরুত্ব ২৬.৯৭। পারমাণবিক সংখ্যা ১৩। অ্যালুমিনিয়াম মৌলাবস্থায় প্রাকৃতিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এটির বহু রকমের যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বস্তুত সমস্ত ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণই ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি। এর অধিকাংশই মাটি-পাথরে সিলিকেট হিসাবে থাকে। এমারি (emery), অভ্র (mica), চিনেমাটি (kaslin), ক্রাইয়োলাইট (cryolite), আলট্রামেরিন (ultramarine), কোরান্ডাম (corundum) রূপে অ্যালুমিনিয়াম প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয় এবং নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর উৎপাদনপ্রণালী খুব বেশি দিনের নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়ামই সিলিকেট হিসাবে থাকে, কিন্তু এই সিলিকেট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। ১৮৮৬ সালে চার্লস মার্টিন হল (Charles Martin Hall) নামে ২২ বছরের এক মার্কিন যুবক ও পল এরু (Paul Heroult) নামে এক ফরাসি রসায়নবিদ প্রায় একই সময়ে সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করার এক তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বক্সাইট নামের আকরিক থেকে আমাদের প্রয়োজনের সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে বক্সাইটের সঙ্গে ক্রাইয়োলাইট নামের অ্যালুমিনিয়ামের আরেকটি আকরিকও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি দেখতে সাদা ও এতে সামান্য নীলাভ দ্যুতি আছে। একে পিটিয়ে পাত তৈরি করা যায় বা তারের আকার দেওয়া হয়। এর তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবহণ ক্ষমতা খুবই বেশি। আর্দ্র বাতাসে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর এর অক্সাইডের একটি পাতলা আবরণ পড়ে। এই অক্সাইডের জন্য ধাতুটির ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে এবং ভিতরের অ্যালুমিনিয়ামকে অক্সিজেনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

লজেন্স, চকোলেট, চুয়িংগাম মুড়বার পাত থেকে শুরু করে উড়োজাহাজ তৈরি করতেও অ্যালুমিনিয়াম দরকার হয়। ধাতুসঙ্কর তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। বাস, রিকশা, মোটরগাড়ি, এমনকি সামুদ্রিক জাহাজ, সেতু, সিঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের ধাতুসঙ্করগুলির প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতু ডার-অ্যালুমিনিয়াম (duraluminium) দিয়ে মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি ও বিমান নির্মাণ করা হয়। তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী বলে বিদ্যুতের তার, রান্নার বাসনকোসন ইত্যাদি তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারও প্রচুর। তিসির তেলের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়ো মিশিয়ে যে বার্নিশ তৈরি করা হয় তা বেশ উজ্জ্বল এবং চকচকে। ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য লোহা ইত্যাদি ধাতুর ওপর এই রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। পালিশ করা অ্যালুমিনিয়াম দুরবিনের আয়নায় ব্যবহার করা হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসবেস্টস (asbestos)

যে বিশেষ গুণটির জন্য অ্যাসবেস্টস-এর কদর তা হল, ৫০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলেও এটি পোড়ে না, এমনকি আরো কিছু বেশি তাপমাত্রাতেও এটি পোড়ে না এবং নষ্ট হয় না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও চীন দেশের লোকেরা এই জিনিসটির ব্যবহার জানত। তারা অ্যাসবেস্টস দিয়ে কাপড় এবং মাদুর বুনত আর এই সব কাপড় দিয়ে রাজ-রাজড়াদের মৃতদেহ ঢাকত তাঁদেরকে সমাধিস্থ করার জন্য। মার্কো পোলো (দ্র) নামে বিখ্যাত পর্যটক সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় আকস্মিকভাবে অ্যাসবেস্টস-আকরিকের সন্ধান পেয়েছিলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আকরিক থেকে অ্যাসবেস্টস তৈরি করার পদ্ধতি এবং অ্যাসবেস্টসের আঁশ দিয়ে কাপড় বোনার কৌশলও আবিষ্কার করেছিলেন।

অ্যাসবেস্টসের আঁশ আকরিকের মধ্যে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি এবং এলোমেলোভাবে জড়ানো থাকে। আঁশগুলিকে তাই অতি সাবধানে ছাড়াতে হয়, নইলে তা ভেঙে যায়। আকরিক থেকে ছাড়ানো আঁশ দেখতে অনেকটা পেঁজা তুলার মতো। অ্যাসবেস্টস একটি জটিল

অ্যাসবেস্টসের কারখানা

রাসায়নিক পদার্থ। এতে আছে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং কয়েকটি ধাতব সিলিকেট। আঁশের রঙ হতে পারে ধবধবে সাদা, ধূসর, সবুজ, হলুদ, লাল, এমনকি কালোও। আঁশের পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। অগ্নিরোধক পোশাক তৈরি করার জন্য অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁশযুক্ত জিনিসের সঙ্গে অ্যাসবেস্টস মিশিয়ে আজকাল নানা রকমের অ্যাসবেস্টস শিট তৈরি করা হচ্ছে। জাহাজের টারবাইন ও জেট ইঞ্জিন এবং নানা ধরনের অগ্নিরোধক কাগজ, রঙ এবং প্লাস্টার তৈরি করতেও প্রচুর পরিমাণে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটাইলিন (acetylene)

অ্যাসিটাইলিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (CH≡CH), ইথিলিনের চেয়েও বেশি অসম্পৃক্ত যার দু'টি কার্বন পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি ত্রিবন্ধন, যাকে অ্যালকাইন শ্রেণিভুক্ত করা হয় আর এই অ্যালকাইন শ্রেণির প্রথম যৌগটির নাম হল অ্যাসিটাইলিন। আণবিক সঙ্কেত C_2H_2। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় অ্যাসিটাইলিন পাওয়া যায় না। কোল গ্যাসে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিটাইলিন থাকে। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম খনিতে অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে এই গ্যাসটিও বের হয়ে আসে।

সাধারণ উষ্ণ পানির সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিটাইলিন উৎপন্ন হয়।

একটি শক্ত কাচের নলে দু'টি গ্যাস-কার্বন তড়িৎদ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত করলে তড়িৎদ্বারের কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যাসিটাইলিন তৈরি হয়।

অ্যাসিটাইলিন মিষ্টি গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। এটি ০° সে. তাপে ও সাধারণ চাপে সমপরিমাণ আয়তনের পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে অ্যাসিটোনে এটি আরো বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করে এ গ্যাসটিকে অতি সহজেই তরল করা যায়। কিন্তু তরল অবস্থায় ঝাঁকুনিতে এটি সহজেই বিস্ফোরিত হয় বলে স্থানান্তরে পাঠানোর জন্য অ্যাসিটাইলিনকে অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করার পর উচ্চচাপে সিলিন্ডারে ভরা হয়। অক্সি-অ্যাসিটাইলিন টর্চে অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাসিটাইলিন গ্যাস মিশিয়ে জ্বালালে অতি উচ্চতাপসম্পন্ন যে অক্সি-অ্যাসিটাইলিন-শিখা (প্রায় ৩০০০° সে. তাপমাত্রা) পাওয়া যায়, যা দিয়ে ধাতুর পাত কাটা কিংবা জোড়া দেওয়ার কাজ অতি সহজেই সুসম্পন্ন করা যায়। অ্যাসিটাইলিন খুবই সক্রিয় একটি গ্যাস বলে এর সহায়তায় নানা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপকভাবে তৈরি করা

যেতে পারে। যেমন, পানির সঙ্গে প্রভাবকের উপস্থিতিতে তৈরি হয় অ্যাসিট্যালডিহাইড, যাকে জারিত করে পাওয়া যেতে পারে অ্যাসিটিক অ্যাসিড। অ্যাসিটাইলিনের সাহায্যে ভিনাইল জাতীয় প্লাস্টিক তৈরি করা যেতে পারে, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে পলিভিনাইল ক্লোরাইডের (P.V.C.)। এমনি বহু জাতের মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য অ্যাসিটাইলিনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, গ্যাসটির অধিক মাত্রায় সক্রিয় হওয়ার কারণে।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটেট (acetate)

অ্যাসিটিক অ্যাসিডের লবণ বা এস্টার, যেমন– সোডিয়াম অ্যাসিটেট ও ইথাইল অ্যাসিটেট।

সকল স্বাভাবিক অ্যাসিটেট পানিতে দ্রবণীয়। কতকগুলি ক্ষারকীয় অ্যাসিটেট পানিতে অদ্রবণীয়। সোডিয়াম অ্যাসিটেট কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। লেড অ্যাসিটেট বা সুগার অব লেড এবং বেসিক লেড অ্যাসিটেট ব্যবহৃত হয় সিসার বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন 'সাদা সিসা' তৈরি করতে। পানিতে দ্রবীভূত লেড অ্যাসিটেট অনেক সময় 'লেড লোশন' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বেসিক কপার অ্যাসিটেট, যার শিল্পে ব্যবহারিক নাম ভার্ডিগ্রিস, এটি সবুজ রঙ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, লোহা এবং তামার স্বাভাবিক অ্যাসিটেটসমূহ মর্ড্যান্ট বা প্রতিরোধক হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটোন (acetone)

শিল্পক্ষেত্রে অ্যাসিটোন একটি মূল্যবান পদার্থ হিসাবে বিবেচিত।

অ্যাসিটোন একটি বর্ণহীন, দাহ্য, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর স্ফুটনাঙ্ক ৫৬.৫° সে.। এটি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসাবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাজে লাগে। বিশেষত রেয়ন অর্থাৎ কৃত্রিম রেশম তৈরির জন্য সেলুলোজ অ্যাসিটেট-এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। চর্বি ও রঞ্জন জাতীয় পদার্থ অ্যাসিটোনে গলে যায়। পানি, অ্যালকোহল এবং ইথারে এটি সর্বতোভাবে দ্রবণীয়। অ্যাসিটোন একটি মূল্যবান দ্রাবক এবং উচ্চ শ্রেণির বার্নিশ তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যাসিটাইলিন সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠ থেকে রেজিন, রঙ এবং বার্নিশ তোলার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরোফর্ম, সালফোনাল, আইওডোফর্ম, আয়োনন এবং সংশ্লেষিত রাবার তৈরির কাজেও এর বিশেষ ব্যবহার রয়েছে।

পাইরো লিগনিয়াস অ্যাসিডকে আংশিক পাতন করে অ্যাসিটোন পাওয়া যায়। মাসেরে নামক জীবাণু দ্বারা স্টার্চের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া অবলম্বনের সূত্রে অ্যাসিটোন প্রস্তুত করা যায়। ৩০০° থেকে ৩৫০° সে. উত্তাপে অ্যালুমিনা বা থোরিয়ামের ওপর দিয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বাষ্প চালনা করলে অ্যাসিটোন উৎপন্ন হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসিড (acid)

ধাতু বা ধাতুসম মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেনবিশিষ্ট যৌগ যা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে এবং দ্রবীভূত অবস্থায় নীল লিটমাসকে লাল করে তাকে অ্যাসিড বলা হয়।

অম্ল বা টক জাতীয় স্বাদের জিনিসকেই বলা যেতে পারে অ্যাসিড। লেবুর রস টক, কেননা এতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড, যার স্বাদ টক। তেমনি ভিনিগারের স্বাদ টক, কারণ এতেও থাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যার স্বাদ টক। লেবু এবং ভিনিগারের মধ্যে এত কম পরিমাণে অ্যাসিড থাকে যে এগুলো শরীরের কোনো ক্ষতি তো করতেই পারে না, অধিকন্তু উপকারই করে। অন্য দিকে হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড (HF) এমন শক্তিশালী যে সেটি ধাতুকে যেমন ক্ষয় করতে পারে, তেমনি ধাতু এবং কাচকেও দ্রবীভূত করতে পারে।

অ্যাসিডকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, জৈব অ্যাসিড ও অজৈব অ্যাসিড। জৈব অ্যাসিডে থাকে কার্বনের পরমাণু, কিন্তু অজৈব অ্যাসিডে কোনো কার্বনের পরমাণু থাকে না। সকল অ্যাসিডের মধ্যে একটি মিল আছে। পানিতে দ্রবীভূত হলে তারা হাইড্রোজেন আয়নে বিশ্লেষিত হয়। হাইড্রোজেন আয়ন হল হাইড্রোজেন পরমাণু যেগুলো পজিটিভ

বিদ্যুৎসম্পন্ন। যে সমস্ত বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন পানিতে বেশি পরিমাণে বিশ্লেষিত হয়, সেগুলো শক্তিশালী অ্যাসিড। যেমন– হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ইত্যাদি। কিন্তু যে অ্যাসিড পানিতে খুব কম পরিমাণে বিশ্লেষিত হয় তারাই দুর্বল অ্যাসিড। যেমন– সাইট্রিক, অ্যাসিটিক, কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি। শক্তিশালী অ্যাসিডের (যেমন HCl) সব পরমাণু হাইড্রোজেন আয়নে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। রসায়নবিদেরা মিশ্রণে হাইড্রোজেন আয়নের শক্তি নির্ণয় করতে পারেন, যাকে মিশ্রণের pH বলা হয়। অ্যাসিডের pH শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত হতে পারে। (pH যত কম হবে ততই শক্তিশালী অ্যাসিড বোঝাবে)।

যে কোনো একটি নির্দেশক (indicator) দ্বারা জিনিসটি অ্যাসিড কিনা তা নির্ণয় করা যেতে পারে। নির্দেশক হল এমন একটি দ্রব্য, যা অ্যাসিডের সংস্পর্শে রঙের পরিবর্তন দেখাতে পারে। যেমন– অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাস কাগজ লাল লিটমাস কাগজে পরিণত হতে পারে। কিন্তু জিনিসটি অ্যাসিড কিনা তা জানার জন্য জিভ দিয়ে স্বাদ যাচাই করা কখনো উচিত নয়। কোনো অ্যাসিড যেমন জিভকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তেমনি হতে পারে বিষাক্ত, এমনকি কোনোটি গায়ের চামড়া পুড়িয়ে ফেলে ক্ষতেরও সৃষ্টি করতে পারে।

অনেক খাবারের জিনিস রেখে দিলে টক হয়ে নষ্ট হতে পারে। যেগুলোর মধ্যে শ্বেতসার এবং চিনি থাকে সেগুলো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়। যেমন দুধে ল্যাকটোজ নামে চিনি থাকে তা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)-এর মতো শক্তিশালী অ্যাসিডও আমাদের প্রয়োজন শিল্পের জন্য। প্রতি বছর শত শত টন এই অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। লোহার মরিচা পরিষ্কার করার জন্য (যাকে বলা হয় 'পিকলিং') খুবই দরকার হয় এই অ্যাসিডের। তা ছাড়া জমির সার, নানা রকমের রঞ্জক (dye), প্লাস্টিক, সংশ্লেষিত নানা রকমের জিনিস তৈরির কাজে নানা প্রকার অ্যাসিডের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। এমনকি যেমন প্লাটিনাম ধাতুকে দ্রবীভূত করার জন্য অ্যাকোয়া রিজিয়ার (দ্র) ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

আ. হ. খ.

আ

আই. কিউ. (I.Q.)

আই. কিউ. শব্দটি ইংরেজি ইনটেলিজেনস্ ক্যোউশন্ট (Intelligence Quotient)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর বাংলা প্রতিশব্দ বুদ্ধ্যঙ্ক। এটি আই. কিউ. হিসাবে অধিক পরিচিত। বুদ্ধ্যঙ্ক (বুদ্ধি+অঙ্ক) বা আই. কিউ. হচ্ছে বুদ্ধির পরিমাপ। আই. কিউ. একটি সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সূত্র অনুসারে কোনো ব্যক্তির আই. কিউ. হল–

$$\text{আই. কিউ.} = \frac{\text{ঐ ব্যক্তির মানসিক বয়স}}{\text{ঐ ব্যক্তির প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

প্রকৃত বয়স হল জন্মগ্রহণের পর থেকে যে সময়ে কোনো ব্যক্তির আই. কিউ. হিসাব করা হচ্ছে সেই সময় পর্যন্ত তার বয়স। যেমন, কারো বয়স ১২ বৎসর; কারো ১২ বৎসর ৩ মাস; কারো ১২ বৎসর ৬ মাস ইত্যাদি হতে পারে।

মানসিক বয়সকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সাত বৎসর বয়সের একটি শিশুর বুদ্ধি যদি ১০ বৎসরের শিশুর মতো হয়, তাহলে ঐ শিশুটির মানসিক বয়স ১০ বৎসর, কিন্তু প্রকৃত বয়স ৭ বৎসর। ঐ শিশুটির আই. কিউ. হবে $\frac{১০}{৭} \times ১০০ = ১৪৩$। আই. কিউ. আসলে মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত (দ্র)। এই অনুপাতটি নির্ণয় করলে একটি ছোট ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। নির্ণীত ভগ্নাংশকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে এটি পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত হয়। এতে সুবিধা হয়। সব মানুষের বুদ্ধি সমান নয়, তাই বিভিন্ন মানুষের আই. কিউ.ও বিভিন্ন হয়। তাত্ত্বিকভাবে মানুষের আই. কিউ. শূন্য থেকে ২০০ অথবা এর অধিক হতে পারে। তবে কোনো স্বাভাবিক মানুষের আই. কিউ. শূন্য হতে পারে না। কারো আই. কিউ. ১০০ হলে তাকে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, ১০০-এর কম হলে নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন, বেশি হলে উন্নত বুদ্ধিসর্ম্পন্ন বলা যায়। ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রে বিনে (Alfred Binet) এবং তাঁর সহকর্মী ডা. সিমঁ (Simon) ১৯০৫ সালে বুদ্ধি পরিমাপের টেস্ট সর্বপ্রথম তৈরি করেন। এই টেস্ট থেকে ব্যক্তির মানসিক বয়স পরিমাপের ধারণা পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে প্রথম

জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভিল্‌হেল্‌ম্‌ স্টার্ন (Wilhelm Stern) আই. কিউ.-এর ধারণা প্রকাশ করেন।

হো. আ.

আইনস্টাইন, আলবার্ট [১৮৭৯-১৯৫৫]

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)-এর জন্ম জার্মানির উল্‌ম্‌ শহরে, ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ। ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেন মিউনিক শহরে। ষোল বছর বয়সে চলে যান মিলান। কয়েক মাস সেখানে থাকার পর ভর্তি হন সুইজারল্যান্ডে জুরিখের পলিটেকনিক স্কুলে। গণিতে তাঁর ছিল অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় আইনস্টাইন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি ঠিকই, তবে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা পড়তে থাকেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে।

জুরিখের পলিটেকনিক স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনোর পর চাকুরি পেলেন বার্ন-এর পেটেন্ট অফিসে। কেরানির চাকুরি। অবসর সময়ে পড়াশোনা করতেন গতিবিদ্যা, তাপবিজ্ঞান এবং মহাকর্ষ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে। ১৯05 সালে প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব 'আপেক্ষিকতাবাদ' (Relativity)। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি। ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন আইনস্টাইন। ১৯১৩ সালে নিযুক্ত হলেন বার্লিনের 'কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক। ১৯২১ সালে আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা প্রদান করে লাভ করেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার।

জার্মানিতে ইহুদিদের উপর অত্যাচার শুরু হবার পর ১৯৩৩ সালে গোপনে জার্মানি ছেড়ে চলে যান।

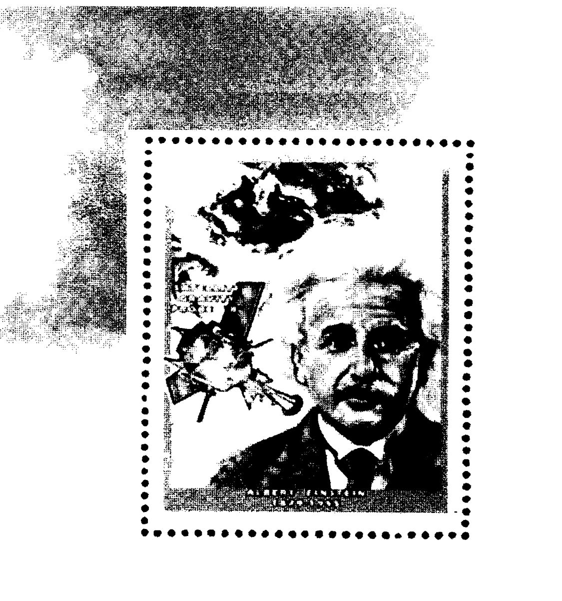

তিনি নিজেও ছিলেন ইহুদি। তার পর বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমেরিকায় আসেন। অধ্যাপনা শুরু করেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে ৭৬ বছর বয়সে মারা যান।

আইনস্টাইনের অন্যতম যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে ভর-শক্তি সমীকরণ $E = mc^2$। এখানে E = শক্তি, m = ভর এবং c = আলোর গতিবেগ।

সু. ব.

আইরিস / কনীনিকা (iris)

অক্ষিগোলকে লেন্সের সামনে যে পেশিবহুল রঙিন পর্দা থাকে, তাকে বলা হয় আইরিস বা কনীনিকা। বাংলায় চোখের তারা বা মণি বলা হয়। কনীনিকা কালো,

কনীনিকার রঙ অনুযায়ী চোখের তারা বা মণি বিভিন্ন রঙের দেখায়। কনীনিকার মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যার নাম পিউপিল (তারারন্ধ্র)। মাংসপেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের কারণে তারারন্ধ্রটি ছোট-বড় হয় এবং এর মাধ্যমে চোখে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। উজ্জ্বল আলোতে এই প্রবেশপথটি ক্ষুদ্র থাকে এবং কম আলোতে এটি বড় হয়।

আ. নূ. তু.

আইসক্রিম (icecream)

সব বয়সের মানুষের নিকট আইসক্রিম একটি প্রিয় খাবার। দুধ (দ্র) এবং অন্যান্য উপাদানে তরল মিশ্রণকে জমিয়ে আইসক্রিম বানানো হয়। আইসক্রিমের মধ্যে দুধ ছাড়া ক্রিম, চিনি (দ্র), কর্ন সিরাপ, ডিম (দ্র), সুগন্ধি দ্রব্য এবং আরো অনেক উপাদান থাকে। জমানোর সময় এর

মধ্যে আটকে পড়া বাতাসের পরিমাণ আইসক্রিমের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আইসক্রিম তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপাদান এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ড করা হয়। পরে এই তরল মিশ্রণকে পাস্তুরিত (দ্র) করা হয় এবং মিশ্রণকে শীতল করে জমানো হয়। সুগন্ধি সাধারণত শীতল করার আগে যোগ করা হয়। আইসক্রিমের ওপর ফল, ক্যান্ডি, বাদাম, চকলেট ইত্যাদি জমানোর পরে যোগ করা হয়। আইসক্রিমে যেন বড় মোটা বরফকণা না জমে এ জন্য স্ট্যাবিলাইজার (stabilizer) এবং এর দানা মিহি-কোমল রাখার জন্য ইমালসিফাইয়ার (emulsifier) ব্যবহার করা হয়।

১২৯৫ সালে মার্কো পোলো (দ্র) দূরপ্রাচ্য থেকে ইতালিতে ফিরে প্রথম ইউরোপে আইসক্রিম খাওয়ার অভ্যাস চালু করেন। আইসক্রিমের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে ইতালির অবদান। ১৮৫১ সালে আইসক্রিম তৈরি করা একটি পুরোপুরি শিল্পে পরিণত হয়। এ সময় জ্যাকব ফাসেল (Jacob Fussell) নামে বাল্টিমোরের একজন দুধ-ব্যবসায়ীর উৎপাদন ও সরবরাহ এমন বেড়ে যায় যে তিনি বাধ্য হয়ে প্রচুর আইসক্রিম বানাতে শুরু করেন। এখন শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর ৮০ কোটি গ্যালন আইসক্রিম বিক্রি হয়। এখন আইসক্রিমের সমঝদার দুনিয়াজোড়া।

সা. এ.

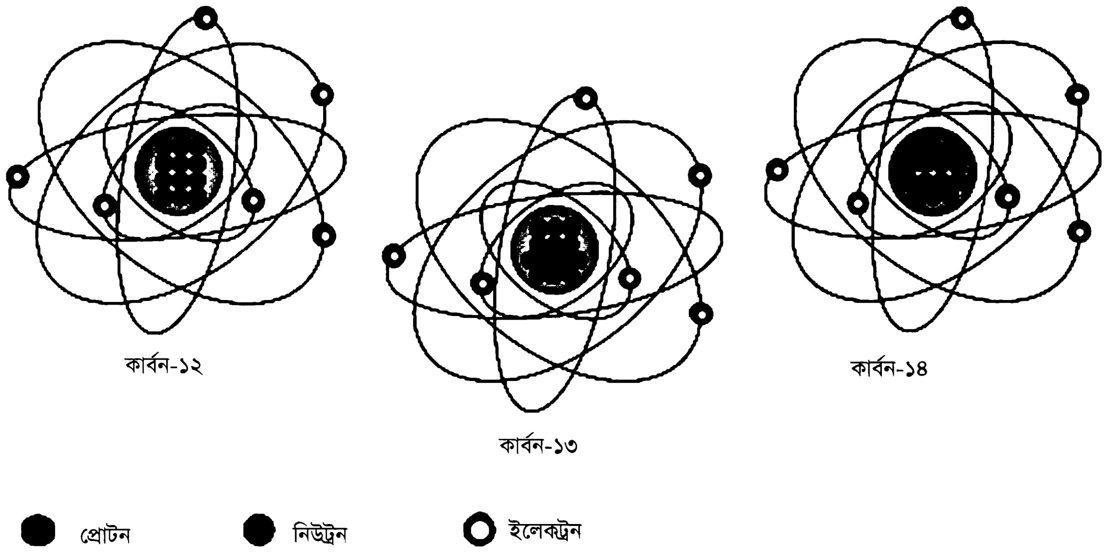

আইসোটোপ (isotope)

একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুতে সাধারণত সমান সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। অর্থাৎ এদের ভরসংখ্যা সমান হয়। ভরসংখ্যা হল পরমাণুর প্রোটনসংখ্যা ও নিউট্রনসংখ্যার যোগফল; পরমাণুর প্রোটনসংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে। যে সকল পরমাণুর প্রোটনসংখ্যা সমান, কিন্তু ভরসংখ্যা সমান নয় তাদের বলা হয় আইসোটোপ।

আইসোটোপগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা সমান, কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক হয়। নিউট্রনসংখ্যার পার্থক্যের কারণে পারমাণবিক ভরে পার্থক্য হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের বেলায় পরমাণুর ভরের এই পার্থক্য দেখা যায়। এ ধরনের একই মৌলিক পদার্থের পৃথক পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট পরমাণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে বলা হয় ঐ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ।

যেমন কার্বন-১২ ($_6C^{12}$) এবং কার্বন-১৪ ($_6C^{14}$) উভয়ই কার্বন। উভয়ের পারমাণবিক সংখ্যা ৬ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের পরমাণুতে ৬টি করে প্রোটন রয়েছে। কিন্তু কার্বন-১২-এর ভরসংখ্যা ১২ এবং কার্বন-১৪-এর ভরসংখ্যা ১৪। অর্থাৎ কার্বন-১২-এর নিউট্রনসংখ্যা ৬ এবং কার্বন-১৪-এর নিউট্রনসংখ্যা ৮।

গ্রিক ভাষায় আইসো (iso) অর্থ 'সম' এবং টোপ (tope) অর্থ 'স্থান' বা 'ঘর'। সুতরাং আইসোটোপ বলতে বোঝায় 'সমস্থানিক' বা 'সমঘর'। পর্যায় সারণিতে (periodic table) মৌলিক পদার্থের তালিকায় এদের স্থান একই ঘরে; তাই এদের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকম। কোনো মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম ঐ মৌলিক পদার্থেরই অনুরূপ। কিন্তু এদের ভৌত ধর্মে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের একাধিক আইসোটোপ থাকতে পারে; যেমন হাইড্রোজেনের (দ্র) রয়েছে তিনটি আইসোটোপ– এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এগুলো হল প্রোটিয়াম (ভরসংখ্যা ১), ডয়টেরিয়াম (ভরসংখ্যা ২) এবং ট্রিটিয়াম (ভরসংখ্যা ৩)। এ রকম অক্সিজেনেরও (দ্র) আছে তিনটি আইসোটোপ অক্সিজেন-১৬, অক্সিজেন-১৭ ও অক্সিজেন-১৮, এবং ইউরেনিয়ামেরও আছে তিনটি আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-২৩৪, ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও ইউরেনিয়াম-২৩৮। অনেক স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থে তাদের বিভিন্ন আইসোটোপ মেশানো থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরিও করা যায়। কোনো কোনো আইসোটোপ আবার তেজস্ক্রিয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে।

শা. ত.

আইসোমার (isomer)

যেসব যৌগের আণবিক সঙ্কেত একই কিন্তু গাঠনিক সঙ্কেত ভিন্ন হয় সেসব যৌগের একটিকে অপরটির আইসোমার বা সমাণুক বলা হয়। গাঠনিক সঙ্কেত ভিন্ন হওয়ার ফলে আইসোমার যৌগসমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH) ও ডাই মিথাইল ইথার (CH_3-O-CH_3) উভয়ের আণবিক সঙ্কেত C_2H_6O, কিন্তু উভয়ের গাঠনিক সঙ্কেত ভিন্ন এবং দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের যৌগ। এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মও সম্পূর্ণ আলাদা।

সৈ. তা. আ.

আকরিক (ore)

যে খনিজ পদার্থ থেকে কম খরচে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাই আকরিক। যেমন বক্সাইট (আকরিক) থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। চুনাপাথর, বক্সাইট, হেমাটাইট প্রভৃতি আকরিকের উদাহরণ। সকল আকরিকই খনিজ পদার্থ, কিন্তু সকল খনিজ পদার্থ আকরিক নয়।

মৌল আকরিক (Native ore) কোনো আকরিকে মুক্ত বা মৌল অবস্থায় ধাতু অবস্থান করলে ঐ আকরিককে মৌল আকরিক বলা হয়। প্রকৃতিতে সোনা, রুপা, প্ল্যাটিনাম, তামা প্রভৃতি ধাতু অল্প পরিমাণে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রধানত আকরিকের প্রকৃতি, আকরিকস্থিত ধাতুর বৈশিষ্ট্য এবং আকরিকে অবস্থিত অপদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

আ. হ. খ.

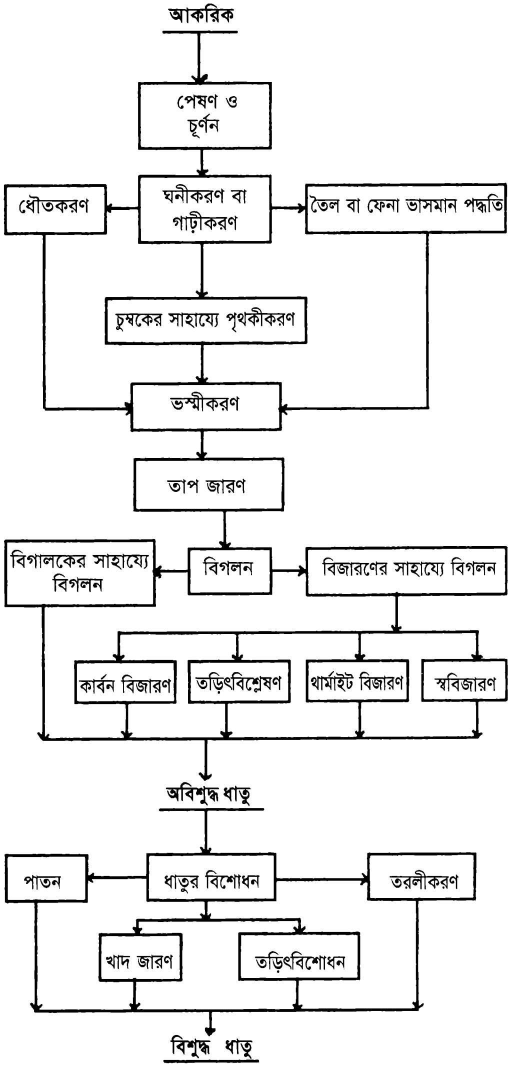

আকাশ (sky)

খোলা জায়গায় মাথার ওপরে দিনরাত আমরা আকাশ দেখতে পাই। গাছপালা, নদীনালা দুনিয়ায় কোথাও আছে, কোথাও নেই। এমনকি ঘরবাড়ি, জীবজন্তু, মানুষও সব জায়গায় না থাকতে পারে। কিন্তু আকাশ নেই ভূপৃষ্ঠে এমন জায়গা কল্পনা করা শক্ত।

দিনের বেলা সোনার থালার মতো সূর্য তার কিরণ ছড়ায় চারপাশে। এমনি সময়ে সচরাচর আকাশ নীল। কখনো সাদা বা কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে নামে রঙের বন্যা। কখনো-বা সারা আকাশ ভেসে যায় লাল আলোতে। রাতের আকাশ সচরাচর কালো, কিন্তু সেই কালো চাঁদোয়ার

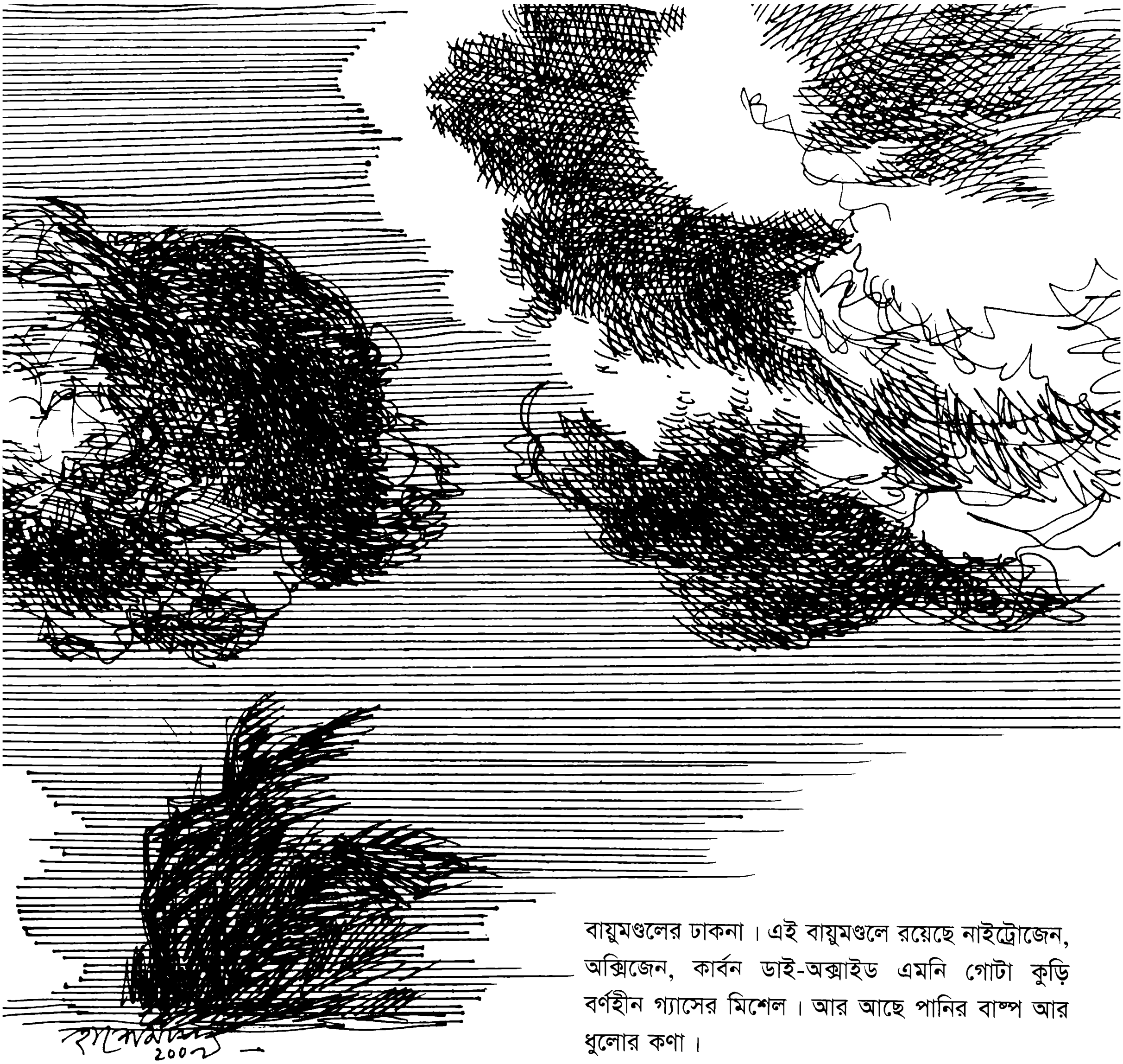

গায়ে জ্বলতে থাকে রুপালি চাঁদ আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা আর গ্রহ।

আগেকার দিনে লোকে ভাবত, আকাশটা বুঝি পৃথিবীর ওপর একটা কিছু কঠিন ঢাকনা। কখনো তারা ভাবত, আকাশটা পরতে পরতে ভাগ করা।

আজ আমরা জানি, আকাশের নীল চাঁদোয়াটা সত্যি সত্যি কঠিন কোনো জিনিসের তৈরি নয়। আসলে এ নিতান্তই গ্যাস ভরতি ফাঁকা জায়গা। হরহামেশা আমরা যে আকাশ দেখি তা হল আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঢাকনা। এই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এমনি গোটা কুড়ি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল। আর আছে পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা।

আকাশ যদি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল, তবে তা নীল দেখায় কেন? মাঝে মাঝে সাদা আর লাল রঙের খেলাই বা দেখি কী করে? আসলে সাদা মেঘে রয়েছে জলীয় বাষ্প জমে তৈরি অতি ছোট ছোট অসংখ্য পানির কণা। কখনো মেঘে এসব কণার গায়ে বাষ্প জমার ফলে ভারী হয়ে বড় পানির কণা তৈরি হয়। তখন সূর্যের আলো তার ভেতর দিয়ে আসতে পারে না, আর তাই সে মেঘের রঙ হয় কালো।

কিন্তু সারাটা আকাশ সচরাচর নীল রঙের হয় কী করে? আকাশ নীল দেখায় বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অণু

ছড়িয়ে আছে বলে। এই সব গ্যাসের কণা খুব ছোট মাপের আলোর ঢেউ সহজে ঠিকরে ছিটিয়ে দিতে পারে। এই ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলোই আমরা দেখি নীল রঙ হিসাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর হাওয়ার স্তর আছে বলেই পৃথিবীতে আকাশকে নীল দেখায়।

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় আকাশের রঙ হুবহু এক রকম থাকে না। এরও কারণ হল পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডল। সূর্য থেকে যে আলো আমাদের চোখে পড়ে, তাকে পৃথিবীর ওপরকার বিশাল হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। দুপুর বেলা এই আলো আসে সরাসরি অর্থাৎ প্রায় লম্বভাবে হাওয়ার স্তর ফুঁড়ে। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় এই আলো আসে তেরছাভাবে হাওয়ার স্তর পেরিয়ে। তাতে আলোকে হাওয়ার কণা ডিঙাতে হয় দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি।

সকালে বা সন্ধ্যায় মেঘ আর হাওয়ার ধুলোর কণার ভেতর দিয়ে লম্বা পথ পেরিয়ে আসতে পারে শুধু সূর্যের লাল আলোর ঢেউগুলো। সে মেঘকে তখন দেখায় লাল। ঘন বৃষ্টি-মেঘের বড় বড় কণারা যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন তার ভেতর দিয়ে আলো পেরিয়ে আসতে পারে না, তাই সে মেঘকে দেখায় কালো।

আগেকার দিনে আমাদের ওপরকার আকাশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন শূন্যে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্রপাতিসুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে। আজ মানুষ নিজেই মহাকাশযানে চেপে সফর করছে পৃথিবীর ওপরে বহু দূর পর্যন্ত। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে চাঁদে। পৃথিবীর ওপর দেড় শ' দু' শ' মাইল বা তারও অনেক বেশি ওপর দিয়ে ঘুরছে অসংখ্য মহাকাশযান। যেখান দিয়ে ঘুরছে সেখানে হাওয়া নেই বললেই চলে।

মহাকাশযান থেকে দিনরাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবি। জানা যাচ্ছে কোথায় কখন আবহাওয়া কেমন হবে, কোন দেশে কেমন ফসল হচ্ছে। মহাকাশযান থেকে ঠিকরে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন আর টেলিভিশনের সঙ্কেত। তাই দূরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

আ. আ. মু.

আকুপাংচার (acupuncture)

ব্যথা ও রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত চীনদেশীয় প্রাচীন এক ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির নাম আকুপাংচার। এ পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সরু, লম্বা সুঁই ফুটিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে আকুপাংচারের ফলে মস্তিষ্ক থেকে 'এন্ডোরফিন' (endorphin) নামক রাসায়নিক উপাদানের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় বলে ব্যথার উপশম ঘটে।

চীনা দার্শনিকদের মতে, শরীরে প্রাকৃতিক উপাদানের ভারসাম্যহীনতার ফলে রোগ ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। আকুপাংচার এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখে। অধিকাংশ চীনদেশীয়ের ধারণা–

শরীরে মোট বারোটি মধ্যরেখা (meridian) দিয়ে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়। এই মধ্যরেখাস্থিত বিভিন্ন বিন্দুতে আকুপাংচারের সুঁই ফুটিয়ে রোগ সারানো সম্ভব।

ব্যথানিরাময়সহ অস্থিসন্ধিপ্রদাহ, মিগ্রেন (migraine) নামক তীব্র আধকপালে মাথাধরা, দৃষ্টিক্ষীণতা, হাঁপানি (দ্র), ক্ষত এবং কোনো কোনো মানসিক অসুস্থতা সারানোর জন্য আকুপাংচার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর চেতনানাশের জন্য চীনা চিকিৎসকেরা ১৯৬০ সাল থেকে আকুপাংচার পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে আকুপাংচার প্রচলিত রয়েছে। আমেরিকা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও বর্তমানে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রচলন শুরু হয়েছে।

সি. না. হ.

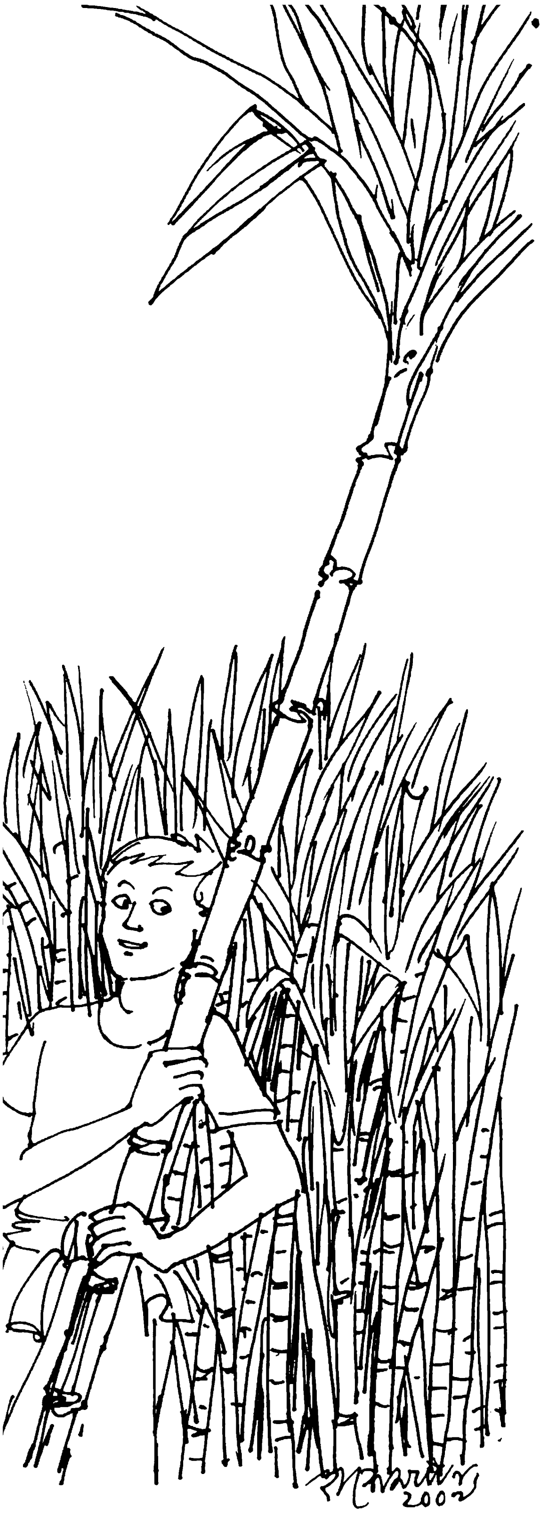

আখ (sugarcane)

বহুবর্ষজীবী তৃণ। ভালো বাংলা 'ইক্ষু'। উষ্ণ ও অনতিউষ্ণ অঞ্চলে আখ জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *Saccharum Officinarum*, গোত্র গ্রামিনী (Graminae)। আখের রস থেকে চিনি, গুড়, 'রাম' নামে মদ, সুরাসার এবং ইক্ষুদণ্ড থেকে পশুখাদ্য, শক্ত বোর্ড ও কাগজ উৎপন্ন হয়।

আখের প্রতি পর্বে (গাঁটে) শেকড় বের হয়। ওই পর্বগুলোসহ আগার অংশ চৈত্র-বৈশাখ মাসে ক্ষেতে রোপণ করা হয়। গাছ লম্বায় ৯-১০ মিটার হতে পারে। গাছের পর্ব খাটো ও লম্বা হয়ে থাকে। কাণ্ড গোলাকার। আয়তনে ১২-১৬ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পাতা লম্বা ও খসখসে। গাঁটের 'চোখ' থেকে গাছ হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে চিনি বা গুড় তৈরি হয় এবং গরমের শুরুতে তা শেষ হয়। কারণ গরমে আখে শর্করার পরিমাণ কমতে আরম্ভ করে। আখ কাটবার উপযোগী হয়েছে কিনা তা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায় অথবা আখের গায়ে আঘাত করলে যদি ভারী আওয়াজ হয় এবং রঙ যদি ফিকে হলুদ হয় তবে কাটার সময় হয়েছে বুঝতে হবে।

চিনিশিল্পের সঙ্গে যেসব সহযোগী শিল্প গড়ে উঠতে পারে তা হল– গুড়, মদ্য, সুরাসার এবং ছিবড়া থেকে কাগজ ও বোর্ড শিল্প। বাংলাদেশে আখ থেকে চিনির পাশাপাশি প্রচুর গুড়ও তৈরি হয়।

বি. ব.

আগুন (fire)

বিজ্ঞানীরা বলেন আগুন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণত এতে বাতাসের অক্সিজেন (দ্র) এবং জ্বালানির কার্বন (দ্র) ও হাইড্রোজেন (দ্র) মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। তাপ এবং আলোর মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া শক্তিকে প্রকাশ বা মুক্ত করে। আগুন জ্বলার জন্য তিনটি জিনিস দরকার– জ্বালানি, অক্সিজেন এবং উত্তাপ। শুধু জ্বালানি (দ্র) এবং অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে পারে না। যখন জ্বালানি অক্সিজেনের সঙ্গে ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয় তখন শুধু তাপই সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে সংযুক্তি এত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় যে তখন তাপ আর তেমন বোধগম্য হয় না,

যদিও তাপ-সৃষ্টি বন্ধ থাকে না কখনো। এই ব্যাপারটাই ঘটে যখন লোহায় মরচে ধরে। এ ক্ষেত্রে লোহার পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয়। লোহায় মরচে ধরা এক ধরনের মৃদু জ্বলন বা দহন। যখন জ্বলন খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। এটা তখনই ঘটে যখন বেশির ভাগ জ্বালানি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। জ্বালানির সমস্ত শক্তি তখন একই সময়ে মুক্ত হয়।

কখনো কখনো মৃদু দহন দ্রুত সম্পন্ন হয়ে জ্বলনকে ত্বরান্বিত করে, ফলে আগুন জ্বলে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত দহন অনেক সময় ভেজা খড়ের গাদায় কিংবা কিছুটা তৈলাক্ত শুকনো ছালার গাদায় ঘটতে দেখা যায়। মৃদু দহনের তাপ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত তাপকে যদি কোনো বায়ুপ্রবাহ গাদা থেকে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম না হয় তবে ঐ সঞ্চিত তাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গাদার প্রজ্বলন তাপে (ignition temperature) পৌঁছে যাবে। ফলে হঠাৎ করে ঐ গাদায় তখন আগুন জ্বলে উঠবে। ১৯০৬ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তখন সারা শহরে বেশ কিছু স্থানে আগুন ধরে যায়।

মানুষ কবে থেকে আগুন ব্যবহার করে আসছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে দু' লক্ষ বছর থেকে মানুষ যে আগুন ব্যবহার করছে তা জানা গেছে। চীন দেশের পিকিং মানুষেরা আগুন ব্যবহার করত। আগুনের ব্যবহার মানুষকে নানাভাবে নানাদিকে প্রভাবিত করেছিল। আগুনে মাংস সেঁকে মানুষ বুঝেছিল এতে খাবার বেশ উপাদেয় হয়– সহজে তা হজম হয়, স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হওয়া যায়। রোগ-ব্যাধিও হয় কম। নিজেকে সে বেশ নিরাপদ ভাবতে শিখেছিল– হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা চমৎকার উপায় সে বের করেছিল। নানা জীব-জন্তু, পশু-পাখি শিকার করার জন্য নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা সে শিখেছিল। রান্না করা খাবার বেশি দিন ভালো থাকে জেনেছিল বলে কোথাও যাওয়ার সময় পথে খাওয়ার জন্য এই রান্না করা খাবারই বয়ে নিয়ে যেত সঙ্গে করে।

মাটির তৈরি জিনিসপত্র আগুনে পোড়ালে সেগুলি যে শক্ত ও টেকসই হয় তা একদিন জানার পর মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটল নানা স্থানে। এর সূচনা প্রায় সাত হাজার বছর আগে।

আগুন সম্পর্কে একটা সুন্দর কথা বলা হয়ে থাকে দাস হিসাবে আগুন খুবই ভালো, কিন্তু প্রভু হিসাবে নয়। অর্থাৎ আগুন আমাদের জন্য ততক্ষণই বেশ কাজের যতক্ষণ তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে– নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সমূহ বিপদ– দাবানলে পরিণত হয়ে নিমেষে সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে ছাইভস্মে পরিণত করবে।

আ. হ. খ.

আগ্নেয়গিরি (volcano)

ভূপৃষ্ঠের ভিতর থেকে নির্গত লাভার (দ্র) পাহাড়কে আগ্নেয়গিরি বলে। মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূগর্ভস্থ গরম বাতাস, জলীয়

বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, গলিত শিলা, কাদা, ছাই, গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে নির্গত এসব পদার্থ ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রতলের ওপর শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে খুব তাড়াতাড়ি শীতল ও কঠিন হয়। এসব পদার্থের কিছুটা ফাটল বা ছিদ্রপথের মুখের চারপাশে স্তূপের আকারে জমা হয় ও ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে। ফলে ঐ জায়গাটি শঙ্কু বা মোচাকৃতি (conical) লাভ করে। তখন একে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভূগর্ভস্থ পদার্থের নির্গমনকে বলে অগ্ন্যুৎপাত।

আগ্নেয়গিরির বাইরের দিকের যে মুখটি দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তাকে জ্বালামুখ বলে। ভূত্বকের কোনো ফাটল, দুর্বল জায়গা বা ছিদ্রপথ, ভূগর্ভের তরল শিলা ও চাপের বৃদ্ধির জন্য অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শান্ত ও তীব্র হতে পারে। আগ্নেয়গিরি হতে পারে জীবন্ত বা সক্রিয়, হতে পারে সুপ্ত; এবং হতে পারে মৃত বা নির্বাপিত। এ ছাড়াও লাভার প্রকৃতি, গ্যাসের পরিমাণ ও চাপ অনুসারে আগ্নেয়গিরিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। কিছু কিছু আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছাই ও গ্যাসের মেঘ তৈরি হয়। কোনো কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে লাল তপ্ত লাভার বাষ্প বেরিয়ে নিচের দিকে আগ্নেয়গিরির ধার ধরে স্রোতের মতো নেমে যায়। আগ্নেয়গিরি সমভূমিতে অথবা সমুদ্রসমতলে গঠিত হতে পারে।

সে. শা.

আঙুর (grape)

রসাল সুস্বাদু আঙুরের বৈজ্ঞানিক নাম *Vitis vinifera*। লতানে উদ্ভিদ। লতা থেকে পাকানো আঁকশি পেরিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্য গাছে বা মাচায় উঠে পড়ে। লতা বেশ শক্ত। পাতার ওপরটা লোমশ, দেখতে অনেকটা উচ্ছের পাতার মতো, তবে গোড়ার দিকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং কিনারা করাতের মতো। ফুল সবুজ ও সুগন্ধ, ফোটে লতার আগায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত গুচ্ছবদ্ধ ফল হয়। শীতপ্রধান দেশে আরো পরে ফুল ও ফল হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইদানীং মিষ্টি আঙুর ফলানো সম্ভব হয়েছে। আঙুরের অন্য নাম দ্রাক্ষা।

ছোট আকারের আঙুর শুকিয়ে কিসমিস হয়। আকারে বড় ও ২-৩টি বীজ থাকে যে আঙুরে তা শুকালে হয় মনাক্কা। ঘন বেগুনি রঙের বড় ও ছোট আঙুরও আছে। এই তিন রকম আঙুর মোটামুটি আমাদের দেশে আমদানি হয়।

বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের দিক থেকে আঙুরকে ভাগ করা হয় এভাবে– মদ তৈরির আঙুর, কিসমিস আঙুর, টেবিল আঙুর, রস তৈরির আঙুর এবং টিনজাত করার আঙুর। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকে কয়েক রকম আঙুরের চাষ হয়ে আসছে। এ ছাড়া আলজিরিয়া, মরক্কো, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক

দেশে ব্যাপকভাবে আঙুরচাষ হচ্ছে। প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সর্বত্র আঙুর আনন্দ ও উৎসবের প্রতীক।

বি. ব.

আতা (custard-apple)

আতার বৈজ্ঞানিক নাম *Anona squamosa,* গোত্র Anonaceae। বহু শাখাময় মাঝারি গাছ। ১০-১৫ ফুট উঁচু হয়। ছাল ধূসর রঙের, কাঠ তেমন শক্ত নয়। পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, এক-দেড় ইঞ্চি চওড়া, আগা ক্রমশ সরু। কচি কাণ্ড ও পাতার সংযোগস্থলে এক-একটি অথবা জোড়া-জোড়া খুব হালকা সবুজ রঙের বাঁকা ফুল হয়, লম্বায় এক ইঞ্চি এবং তিনটি পাপড়িযুক্ত। ফল দেখতে সুন্দর, গোলাকার কিন্তু বৈশিষ্ট্যময় এবড়ো-খেবড়ো, গায়ের রঙ সবুজ। পাকলে সুগন্ধি বের হয়, ফেটেও যায়, স্বাদ মধুর। ফলের ভেতর মাংসল নরম কোয়া আছে। প্রত্যেক কোয়ায় একটি করে বীজ থাকে। বীজ ঈষৎ ডিম্বাকৃতি ও চ্যাপটা, রঙ কালো। চৈত্র মাসে ফুল আসে, পাকে জ্যৈষ্ঠে। আতার পাতা, বীজ ও কাঁচা ফলের মিহি গুঁড়ো পতঙ্গনাশক। উকুন, ছারপোকা মারা যায়। এ ছাড়া আমাশয়ে, রক্তবৃদ্ধিতে, অপুষ্টিতে আতা খুব উপকারী। আতাকে গাণ্ডপাত্র, সীতাফল ও শরিফা বলে। বাংলাদেশের সর্বত্র কম-বেশি আতা জন্মে।

আর এক রকম আতা আছে, তার নাম নোনা আতা বা নোনা। যশোর-খুলনা অঞ্চলে এটি প্রচুর জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *Anona Roticulata*, গোত্র ঐ

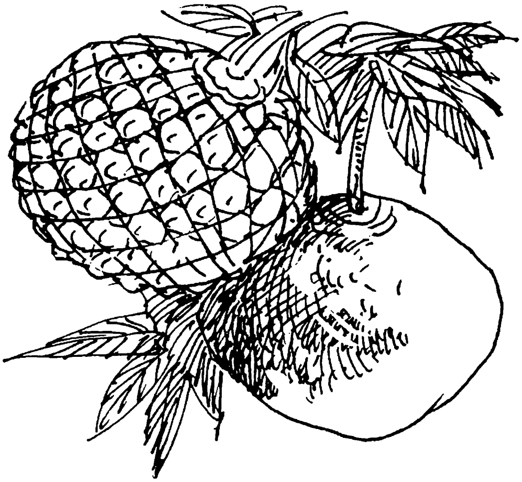

আনোনাসি। এই গাছ ৩০-৩৫ ফুট উঁচু হয়, পাতা ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২-৩ ইঞ্চি। ফল মসৃণ, ধূসর, পাকা অবস্থায় বাদামি। আকার অনেকটা আপেলের মতো, কখনো কখনো লম্বাটে। বোঁটা বেশ মোটা। পাকা নোনা অম্ল-মধুর স্বাদে ভরা। মিহি দানাদার, আতার মতো একেবারে মিহি ও মিষ্টি নয়। কাঁচা অবস্থায় কষায়। গাছও অনেক বেশি ঝাঁকড়া।

বি. ব.

আদা (zinzer)

আদা প্রধানত ভেষজ উদ্ভিদ। আদার ইংরেজি নাম Zinzer, Zinziberaceae caesalpinae গোত্রের আদার বৈজ্ঞানিক নাম *Zinziber officinate* Rosc। আদার পাতা লম্বা এবং সরু। পাতার বোঁটার গোড়ার দিকটা চ্যাপটা হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে 'রাইজোমের' উপর কৃত্রিম গোলাকৃতি নরম কাণ্ড গঠন করে। রাইজোমই আদা। রাইজোমের নিচের দিক থেকে গুচ্ছমূল বের হয়। আদার ফুল একটি পাতাবিশিষ্ট দণ্ডের মাথায় গুচ্ছাকৃতিতে জন্মে। পাপড়ির রঙ সাদা এবং গোলাপি ছোপবিশিষ্ট। আদা আসলে পরিবর্তিত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। মাটির সংস্পর্শে এলে বা উপযুক্ত পরিবেশে আদা থেকেই চাঁরা বের হয়। আদার নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। আদা সংরক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। কেননা অধিক পানি থাকলে আদা দ্রুত পচে যায়। আদার পানি শুকিয়ে ফেললে ক্রেতাতা ক্রয়করে না। সে জন্য আদা বাজারে সরস অবস্থায় বা শুষ্ক চিপস-এর মতো অবস্থায় বিক্রয়

হয়। আদা সর্দি, কাশি, স্বরভঙ্গ, পেটের গোলমালে ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

আধান (charge)

আধান শব্দটির ইংরেজি charge (চার্জ)। আধান হল কিছু প্রাথমিক কণিকার ধর্ম যার ফলে এরা পরস্পরের ওপর বল প্রয়োগ করে। আধান দু' রকমের– ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ও ধনাত্মক বা পজিটিভ। ঋণাত্মক আধানের সর্বনিম্ন ইউনিট একটি ইলেকট্রনের (দ্র) আধানের সমান। প্রোটনে (দ্র) থাকে সমপরিমাণ ধনাত্মক আধান। পরস্পরের ওপর বলপ্রয়োগের প্রকৃতি দ্বারা ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধানের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এর অর্থ একটি ধনাত্মক আধান অপর ধনাত্মক আধানকে এবং একটি ঋণাত্মক আধান অপর ঋণাত্মক আধানকে বিকর্ষণ করে। বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এর অর্থ হল, ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধানকে এবং ঋণাত্মক আধান ধনাত্মক আধানকে আকর্ষণ করে। কোনো বস্তু বা অঞ্চলের আধান বোঝা যায় ঐ বস্তু বা অঞ্চলে প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত দ্বারা। কোনো বস্তু বা অঞ্চলে প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকলে ঐ বস্তু বা অঞ্চলকে ধনাত্মকভাবে আহিত (positively charged) বলা হয় এবং প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন বেশি থাকলে বলা হয় ঋণাত্মকভাবে আহিত (negatively charged)। আধান পরিমাপের একক কুলম্। (কুলম্ শব্দটি বিজ্ঞানী শার্ল ওগুস্ত্যাঁ দ্য কুলঁ (দ্র)-র নাম থেকে এসেছে)। ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ ১.৬০২১৯২×১০^{-১৯} কুলম্। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহকে বলা হয় তড়িৎপ্রবাহ। $\text{তড়িৎপ্রবাহ} = \frac{\text{আধান}}{\text{সময়}}$।

শা. ত.

আনারস (pine-apple)

আনারসের বৈজ্ঞানিক নাম *Ananas comosus* Merr., গোত্র Bromeleaceae। এটি গুল্ম জাতীয় গাছ। আনারসের পাতা ২-৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ২-৩

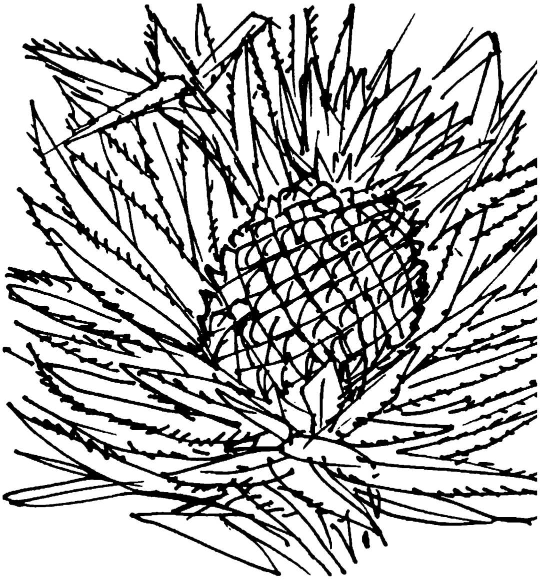

ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। দু' দিকের কিনারায় করাতের মতো কাঁটা। পাতা দেখতে অনেকটা তলোয়ারের মতো। এর পাতাময় কাণ্ডের আগায় পুষ্পদণ্ড বের হয় এবং ঐ দণ্ডে একটি মাত্র ফল হয়। ফলের গায়ে চোখের মতো অনেক চিহ্ন থাকে। এ জন্য বলা হয় আনারসের সারা গায়ে চোখ। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে হলদে হয় এবং সুগন্ধে ভরে যায়। কাঁচা ফল টক, পাকলে অম্লমধুর। আনারসের মাথায় একটি ও বোঁটার চারদিকে কয়েকটি চারাগাছ বের হয়। এগুলো লাগালে নতুন গাছ হয় এবং তাতে ফল হয়। আনারসেও বীজ হয়, কিন্তু তা থেকে গাছ জন্মে না। গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফুল ও ফল হয়ে থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ থেকে পাকতে শুরু করে।

আনারসের প্রধান জাত কিউ বা জায়েন্ট কিউ। এদের পাতায় কাঁটা থাকে না। আমাদের দেশে এই জাতের ক্যালেন্ডার আনারস জন্মে সিলেটে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে। এ ছাড়া জলঢুবি আনারসও জন্মে এই জেলাগুলোতে। জলঢুবি আনারস কুইন জাতের অন্তর্গত। এদের পাতার কিনারায় কাঁটা আছে এবং এরা কিউ অপেক্ষা আকারে ছোট হলেও অনেক বেশি মিষ্টি। এ ছাড়া দেশি জাতের আনারস ভিটের আনাচে-কানাচে জন্মে থাকে। এই আনারস বেশি মিষ্টি হয় না।

বি. ব.

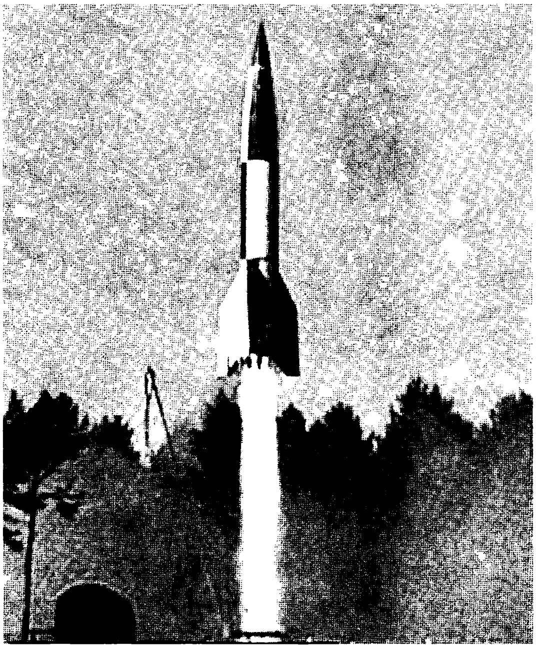

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM)

ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের লক্ষ্যমাত্রায় নিক্ষেপের এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। ইংরেজিতে এর নাম Intercontinental Ballistic Missile বা সংক্ষেপে ICBM। হাইড্রোজেন বোমা (দ্র) আবিষ্কারের সঙ্গে এই ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন ও উন্নয়নের বিকাশের অনেক সম্পর্ক রয়েছে। একে হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের পর আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক গবেষণা চালায়। এসব গবেষণার ফলাফল তারা তাদের মহাকাশ অভিযানের কাজে লাগায়। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা প্রচুর ও ভয়াবহ। পৃথিবীর যে কোনো শহরকে ধ্বংস করার ক্ষমতা পশ্চিমী দেশগুলোর ক্ষেপণাস্ত্রের রয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো স্থানের যে কোনো লক্ষ্যে এটি নিক্ষেপ করা যায়। এদের রেঞ্জ বা পাল্লা বিশ্বব্যাপী। আবার কোনো ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা সীমাবদ্ধ। এসব ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণত কোনো না কোনো যুদ্ধাস্ত্র বহন করে থাকে। যাতে রেডার (দ্র) বা অন্য কোনো যন্ত্রে ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতি ধরা না পড়ে সে জন্য এরা ওড়ে খুব নিচু দিয়ে। ক্ষেপণাস্ত্র কখনো আকাশ থেকে আকাশে, বিমান থেকে শত্রুবিমানে, ভূমি থেকে আকাশে, আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুবিমান বা অন্য কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সবচেয়ে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র। আমেরিকা 'পোলারিস' নামে এক শ্রেণির ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা জাহাজ থেকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করা যায়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র স্কাড ও প্যাট্রিয়ট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই যুদ্ধ হয়েছিল ইরাক ও সৌদি আরবের মধ্যে।

শা. ত.

আন্তর্জাতিক পরিমাপ
(international system of units)

যে কোনো ভৌতরাশি পরিমাপের জন্য একক দরকার হয়। একক ব্যতীত ভৌত পরিমাপের কোনো তাৎপর্য নেই। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্প্রদায় পরিমাপের এককের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছেন। এর নাম এস. আই. (S. I.) পদ্ধতি। পারমাণবিক স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড (এম. কে. এস.) পদ্ধতির আধুনিকায়ন হল আন্তর্জাতিক পদ্ধতি। ফরাসি শব্দবন্ধ 'সিস্ত্যাম্ অ্যাঁতার্নাসিওনাল্ দুনিতে'– Systéme International d'Unités– (International System of Units) থেকে এসেছে এস. আই. (S. I.) বা আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি। এম. কে. এস. এককে মৌলিক এককগুলো হল দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক। এগুলো যথাক্রমে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড। এগুলোর সঙ্গে আরো চারটি মৌলিক একক যোগ করে তৈরি হয়েছে এস. আই. বা আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি। নতুন এককগুলো হল তড়িৎবিদ্যায় অ্যাম্পেয়ার (দ্র), তাপীয় গতিবিদ্যায় কেলভিন, দীপ্তিমিতিতে ক্যান্ডেলা এবং পদার্থের পরিমাণ পরিমাপে মোল। নিচে আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতির বিভিন্ন একক এবং এদের সঙ্কেত দেওয়া হল–

ভৌতরাশি	একক	সঙ্কেত
দৈর্ঘ্য	মিটার	m
ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকেন্ড	s
তাপমাত্রা	কেলভিন	K
তড়িৎপ্রবাহ	অ্যাম্পেয়ার	A
উজ্জ্বলন তীব্রতা	ক্যান্ডেলা	cd
পদার্থের পরিমাণ	মোল	mol.

আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করত। যেমন– আমাদের দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপে গজ, ফুট, ইঞ্চি; দূরত্ব পরিমাপে মাইল; ভর পরিমাপে সের, মণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ দেশে আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়ছে।

শা. ত.

আন্তর্জাতিক মোর্স কোড
(international morse code)

টেলিগ্রাফের (দ্র) সাহায্যে সঙ্কেতায়নের জন্য বা সংবাদ পাঠাবার জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। সংবাদের মোর্স কোড (morse code) তৈরির জন্য ডট ও ড্যাশ এই দুই ধরনের সঙ্কেত (signal) ব্যবহার করা হয়। ডট সঙ্কেতের চেয়ে ড্যাশ সঙ্কেত তিন গুণ সময় বেশি স্থায়ী হয়। বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা বা বিরামচিহ্নের জন্য ডট ও ড্যাশ সঙ্কেত এবং শূন্যস্থানের বিভিন্ন দল বা সমন্বয় সৃষ্টি করে তৈরি হয় এই মোর্স কোড। প্রথম দিকের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে সংবাদের প্রতিটি বর্ণ পাঠাবার জন্য আলাদা আলাদা তার ব্যবহার করার দরকার হত। আমেরিকার স্যামুয়েল মোর্স (Samuel F. B. Morse) ১৮৩৮ সালে কোড ব্যবহার করে একটি তারের মধ্য দিয়ে সংবাদ পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মোর্স বিদ্যুতের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ গুচ্ছ বা স্পন্দ (short and long bursts of current) ব্যবহার করেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণের জন্য সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ গুচ্ছগুলোর বিভিন্ন সমন্বয় তৈরি করে একটির পর আরেকটি পাঠান। বিদ্যুৎগুচ্ছের এই সমন্বয়গুলো তারের শেষ প্রান্তের তড়িৎ-চুম্বকের (eletromagnet) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে পরে একটি কলমের মাধ্যমে কাগজের টেপের

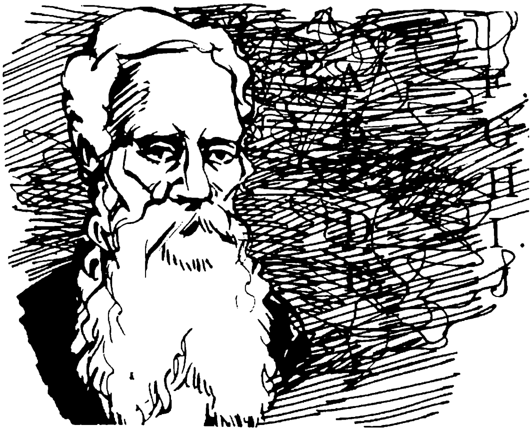

টেলিগ্রাফ মোর্স কোডের জনক এফ. বি. মোর্স

(paper tape) উপর ডট ও বিন্দু হিসাবে সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ বিদ্যুৎগুচ্ছগুলোর বিভিন্ন সমন্বয়ের ছাপ পড়ে। এভাবে ডট ও বিন্দুর সমন্বয়ে তৈরি কোডকে স্যামুয়েল মোর্সের নামানুসারে মোর্স কোড বলে। বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা ও বিরামচিহ্নের নির্দিষ্ট কোড থেকে মূল সংবাদ জানা যায়। নিচে বিভিন্ন বর্ণ ও সংখ্যার মোর্স কোড দেওয়া হল।

A ·	J	S	2
B -	K -	T -	3
C	L	U	4 ·
D -	M - -	V	5
E	N -	W	6 -
F	O - - -	X -	7 - -
G - -	P	Y -	8 - - -
H	Q - -	Z - -	9 - - - -
I	R	1 - - - -	0 - - - - -

১৯০০ সালে সমুদ্রগামী জাহাজে মোর্স কোড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। আধুনিক কালে জরুরি সংবাদ পাঠাবার কাজে মোর্স কোড ব্যবহৃত হয়। এই মোর্স কোড রেডিও স্পিকারের ব্লিপ অথবা ল্যাম্প/টর্চের আলোর ঝলকানির (flash) সাহায্যেও সৃষ্টি করা যায়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের মোর্স কোড–

Distress signal (SOS)
Attention signal -
Understood
Received

হো. আ.

আপেক্ষিক তাপ (specific heat)

বিভিন্ন বস্তুর তাপ ধারণের ক্ষমতা বা উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন। বস্তুর ভর, উপাদান ও তাপমাত্রার উপর তার তাপ ধারণের বা উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। কোনো বস্তুর একক ভরের তাপমাত্রা একক পরিমাণে বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপধারণ-ক্ষমতা বা সংক্ষেপে আপেক্ষিক তাপ বলে।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেলভিন (সেলসিয়াস) বৃদ্ধির জন্য যত জুল (দ্র) তাপশক্তি প্রয়োজন তা-ই ঐ বস্তুর আপেক্ষিক তাপ। আপেক্ষিক তাপের একক জুল প্রতি কিলোগ্রাম ডিগ্রি কেলভিন (J/kg^oK)। নিচে কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ উল্লেখ করা হল

আপেক্ষিক তাপের সারণি (J/kg^oK)

অ্যালুমিনিয়াম	৯০০	পারদ	১৪০
তামা	৪০০	দস্তা	৩৮০
পিতল	৩৮০	বরফ	২১০০
কাচ	৬৭০	লোহা	৪৬০
সিসা	১৩০	পানি	৪২০০
মেথিলেটেড স্পিরিট	২৪০০	সমুদ্রের পানি	৩৯০০

স. রা.

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (theory of relativity)

গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আরিস্টোটল মনে করতেন, পৃথিবী স্থির এবং তা মহাবিশ্বের কেন্দ্র। গালিলেও প্রথম আপেক্ষিক গতির ধারণা উপস্থিত করে দেখালেন যে, কোনো বস্তুর পরম স্থির অবস্থান বা পরম গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রেও এটা স্পষ্ট হয় যে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে পরম গতি আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মনে একটি পরম ও অবিচল স্থানের ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সময় সম্পর্কেও ধারণা ছিল যে কোনো কিছুর উপর নির্ভর না করে সময় আপন গতিতে প্রবাহিত হয়। পরম স্থানের প্রতিনিধি রূপে তাঁরা আলোর তরঙ্গ প্রবাহিত হবার কাল্পনিক মাধ্যম হিসাবে ইথারের ধারণা তুলে ধরলেন। ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন ও মর্লি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন কাল্পনিক ইথারের মধ্যে পৃথিবীর গতির জন্য আলোর গতির কোনো পার্থক্য হয় কিনা। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষায় পৃথিবীর গতির জন্য আলোর গতির কোনো পার্থক্য পাওয়া গেল না। এই পটভূমিতে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব প্রচলিত স্থান ও কালের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। এই তত্ত্বের ভিত্তিরূপে আইনস্টাইন দু'টি স্বীকার্য গ্রহণ করেন। প্রথমটি হল– যেসব পর্যবেক্ষকের মধ্যে সুষম আপেক্ষিক গতি আছে পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্রই তাদের ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে। দ্বিতীয়টি হল– শূন্যের মধ্যে আলোর দ্রুতি অপরিবর্তী এবং তা পর্যবেক্ষক অথবা আলোর উৎসের দ্রুতির উপর নির্ভর করে না। এই তত্ত্ব অনুসারে একজন পর্যবেক্ষকের তুলনায় কোনো বস্তু যদি v দ্রুতিতে চলে, পর্যবেক্ষকের কাছে তা সঙ্কুচিত মনে হবে ও এর দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে $L = L_o\sqrt{1 - v^2/c^2}$ যেখানে L হচ্ছে স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং c হচ্ছে আলোর দ্রুতি। পর্যবেক্ষকের কাছে চলন্ত ঘড়ির সময়ও ধীর গতিতে চলবে। ফলে পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির কোনো ঘড়িতে t_o যদি সময়ের ব্যবধান হয় দুটো ঘটনার মধ্যে, চলন্ত ঘড়িতে সেই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ধরা পড়বে $t = \frac{t_o}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ রূপে। দৈর্ঘ্যের এই সঙ্কোচন ও কালের প্রসারণ পারস্পরিক। অর্থাৎ একটি চলন্ত ট্রেন থেকে প্লাটফর্মকে সঙ্কুচিত মনে হবে এবং প্লাটফর্মে ঘড়ি মন্থর গতিতে চলছে বলে ধরা পড়বে। আবার প্লাটফর্ম থেকে চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত এবং এর ঘড়ির গতি মন্থররূপে ধরা পড়বে। এই দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন ও কালের প্রসারণ শুধু গাণিতিক ব্যাপার নয়। পরীক্ষাগতভাবেও এগুলো ধরা পড়েছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আর একটি ফল হল– পর্যবেক্ষকের তুলনায় কোনো বস্তু v দ্রুতিতে চললে এর আপেক্ষিক ভর বৃদ্ধি পেয়ে হবে $m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ এখানে m_o হচ্ছে স্থির অবস্থায় বস্তুর ভর। নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে বস্তু ও শক্তির নিত্যতার নীতি পৃথকভাবে কাজ করে। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে শক্তি বস্তুতে এবং বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ভর ও শক্তির মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরের যে সূত্র তা হল $E = mc^2$; এখানে E হচ্ছে নির্গত শক্তি, m হচ্ছে আপেক্ষিক ভর

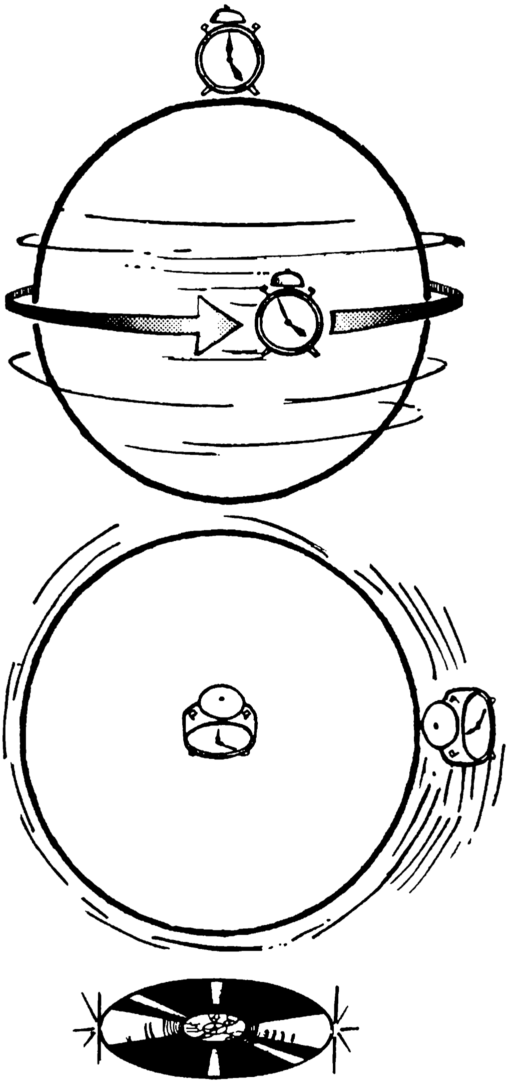

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হল, চলন্ত ঘড়ির চেয়ে স্থির ঘড়ি তাড়াতাড়ি চলবে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, 'হুবহু একই রকম দুটো ঘড়ির একটা যদি থাকে পৃথিবীর বিষুবরেখায় আরেকটা পৃথিবীর কোনো মেরুবিন্দুতে তা হলে বিষুবরেখারটি সামান্য একটু হলেও ধীরে চলবে।' এটা পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এইচ. জে. হে (H. J. Hay) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীটা যেন একটা পাতলা চাকতি; তার কেন্দ্রে রয়েছে উত্তর মেরু আর কিনারে বিষুবরেখা। এর পর এমনি এক ঘুরন্ত চাকতির মাঝখানে আর কিনারে রাখা হল দু'টি অতি নিখুঁত তেজস্ক্রিয়তাচালিত ঘড়ি। তাতে দেখা গেল, মাঝখানের ঘড়িটির চেয়ে কিনারের ঘড়িটি চলছে সামান্য ধীরগতিতে। একটি রেকর্ড প্লেয়ারে যখন কোনো লং-প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে তখন তার কিনারের চেয়ে কেন্দ্রের বয়স তাড়াতাড়ি বাড়ছে।

এবং c আলোর দ্রুতি। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সামান্য ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলেও প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। পারমাণবিক বোমায় এই শক্তি নির্গমন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সাধারণভাবে কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির তুলনায় খুব কম হয় তখন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গুরুত্ব ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন কোনো কণিকার গতি আলোর গতির কাছাকাছি যায় তখন এর গুরুত্ব ধরা পড়ে।

আ. আ.

আফিম (opium)

পপি ফুলের (পপি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *প্যাপাভের সোমনিফেরাম Papaver somniferum)* বীজাধার বা ক্যাপসুল থেকে নিঃসৃত সাদা আঠা জাতীয় পদার্থের নাম আফিম। শব্দটি বাংলায় আফিং বা অহিফেন এবং ইংরেজিতে ওপিয়াম নামে পরিচিত। অশোধিত আফিম পরিশোধন করে তা থেকে চিকিৎসাকার্যে ব্যবহার্য ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ১৮০৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জার্টুর্নার (F. W. A. Serturner) আফিম থেকে ব্যথানাশক ঔষধ মরফিন আবিষ্কার করেন। আফিম থেকে একাধিক অ্যালকালয়েড জাতীয় উপাদান,

পপি ফুলের বীজাধার থেকে নিঃসৃত সাদা আঠা জাতীয় পদার্থের নাম আফিম

যেমন– মরফিন, কোডিন, প্যাপাভেরিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ উপাদানগুলো চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

দীর্ঘদিন আফিম ব্যবহারে মানুষ এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আফিমের অবৈধ উৎপাদন ও বিক্রয় আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় ৩০০০ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম আফিম ব্যবহার শুরু হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে আফিমের ব্যবহার অনেক পুরানো। খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই গ্রিক ও রোমান চিকিৎসকগণ রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আফিম ব্যবহার করতেন বলে জানা গেছে।

সি. না. হ.

আবদুল্লাহ আল-মুতী [১৯৩০-১৯৯৮]

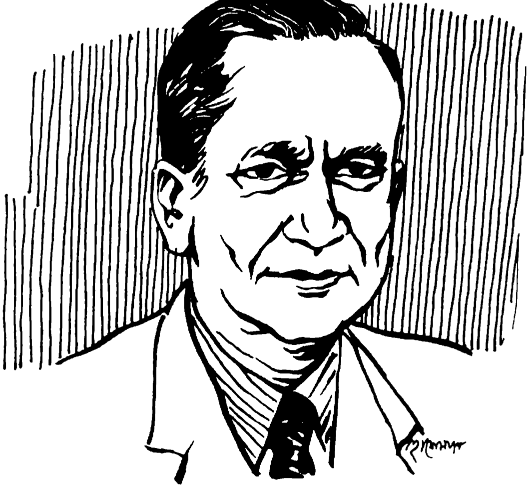

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী লেখক, ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের ফুলবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন ও মাতা হালীমা শরফুদ্দীন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসায়। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৪৭ সালে আই.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে একাদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. সম্মান (পদার্থবিজ্ঞান) ও ১৯৫৩ সালে এম.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক, আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কারে ভূষিত, জাতীয় শিশু সংগঠন কচিকাঁচার মেলার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আল-মুতী

আবদুল্লাহ আল-মুতী ১৯৫৩ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পরবর্তী কালে শিক্ষা প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব হিসাবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ আল-মুতী ছাত্র-জীবনেই লেখালেখি শুরু করেন। সারা জীবন অনুপম ভাষায় বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিষয়ে অবিরাম লিখে গেছেন তিনি। বিশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিবিড় পরিচয় ঘটানোই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেয়ে সহজ সরল উপস্থাপনার কৌশলকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি, যাতে নবীন প্রজন্মসহ সকল শ্রেণির মানুষকে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ও উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা যায়। জনপ্রিয় বিজ্ঞান (পপুলার সায়েন্স) রচনার পাশাপাশি শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন কয়েকটি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' (১৯৫৫), 'আবিষ্কারের নেশায়' (১৯৬৯), 'রহস্যের শেষ

নেই' (১৯৬৯), 'শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (১৯৭৫), 'জানা অজানার দেশে' (১৯৭৬), 'সাগরের রহস্যপুরী' (১৯৬৯), 'মেঘ বৃষ্টি রোদ' (১৯৮১), 'তারার দেশের হাতছানি' (১৯৮৪), 'আমাদের শিক্ষা কোন পথে' (১৯৯৬), 'তাজবোর বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ' (১৯৯৬), 'মহাকাশে কী ঘটছে' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংগঠনের সঙ্গেও আবদুল্লাহ আল-মুতী যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮-৯০ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি এবং ১৯৮৬-৯০ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। 'ইউনেস্কো ক্যুরিয়ার'-এর বাংলা সংস্করণ 'ইউনেস্কো বাতায়ন'-এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তিনি। এ ছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'শিশু-বিশ্বকোষ'-এর অন্যতম সম্পাদক এবং বাংলা একাডেমী 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' ১ম খণ্ডের প্রধান সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আবদুল্লাহ আল-মুতী দেশে বিদেশে নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এসব পুরস্কারের মধ্যে লোকশিক্ষা বিষয়ক সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ বিষয়ে অবদানের জন্য ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে একুশে পদক, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার ও ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবদুল্লাহ আল-মুতী ১৯৯৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

আবদুস সালাম [১৯২৬-১৯৯৬]

পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝাং শহরে। পাঞ্জাবে পড়াশোনা শেষে বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে পড়তে যান। সেখানে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

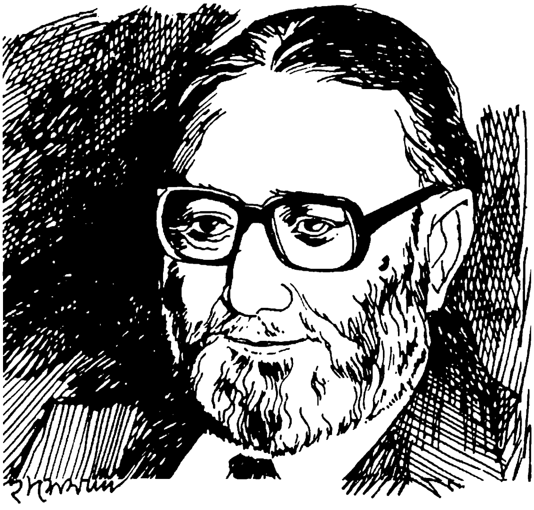

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দুই অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্ব এবং ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটি-লঙ্ঘন; ক্ষীণ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক পরিমাপ একত্রীকরণ; ক্ষীণ আধানহীন প্রবাহ এবং 'ডব্লিউ' ও 'জেড' কণার ভবিষ্যদ্বাণী; মৌলিক কণার প্রতিসাম্য; পুনঃসাধারণীকরণ তত্ত্ব; অভিকর্ষ তত্ত্ব প্রভৃতির জন্য পদার্থবিজ্ঞানে আবদুস সালামের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বস্তুজগতে চারটি বলের (দ্র) মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ক্ষীণ বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল যে একই ক্ষীণ-বিদ্যুৎ বলের দুটো প্রকাশ তা প্রথম জানা যায় সালাম-ভাইনবার্গের যৌথ গবেষণা ও গ্লাসহাউ-এর গবেষণা থেকে। এই অবদানের জন্য আবদুস সালাম, স্টিফেন ভাইনবার্গ (Steven Weinberg) ও গ্লাসহাউ (Sheldon L. Glashow) ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে ইতালির ত্রিয়েস্তে (Trieste)-তে সালাম 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স' স্থাপন করেন। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেখানে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন যা পূর্বে মোটেই সম্ভব ছিল না।

১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৯৬ সালের ২১শে নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মু. হা.

আবহবিদ্যা (meteorology)

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুমণ্ডলীর অবস্থার বিভিন্নতা নিয়ে যে বিজ্ঞান তার নাম আবহবিদ্যা। আবহবিদগণ বায়ুর বেগ, তাপমাত্রা, চাপ, বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, শিশির, কুয়াশা, তুষারপাত, বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক পদার্থ (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন) ইত্যাদির পরিমাণ পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করেন, আবহাওয়া সম্পর্কে অনুমান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

আবহবিদদের মধ্যে কেউ পর্যবেক্ষক, কেউ পূর্বাভাসদাতা, কেউ গবেষক। পর্যবেক্ষকগণ নিয়ামকগুলির তথ্য সংগ্রহ করে আবহাওয়া-মানচিত্র প্রস্তুত করেন। আবহাওয়া-মানচিত্র বা কম্পিউটার-তথ্য থেকে পূর্বাভাসদাতাগণ ভবিষ্যৎ আবহাওয়া অনুমান করেন এবং তা ঘোষণা করেন। গবেষকগণ তথ্য

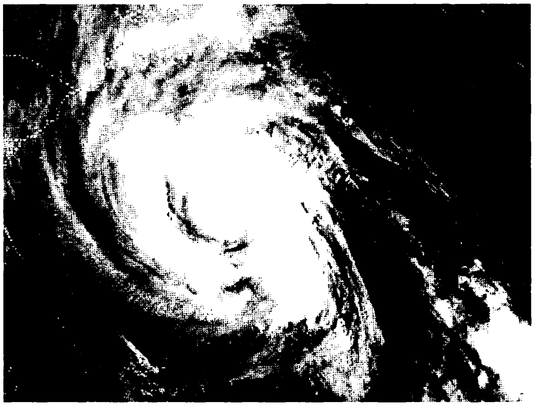

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ

সংগ্রহের জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকেন। আবহাওয়ার তথ্য পরিমাপের জন্য চাপমানযন্ত্র, হাইগ্রোমিটার (আর্দ্রতামাপক যন্ত্র) এবং তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আগে বেলুন, ঘুড়ি, উড়োজাহাজের সাহায্যে ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল থেকে এসব যন্ত্র ব্যবহার করে আবহাওয়ার তথ্য আনা হত। ১৯৫০-এর মধ্যে রেডার (দ্র) উদ্ভাবন এবং ১৯৬০-এর মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের ফলে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ সহজ ও নির্ভুল হতে থাকে। এখন কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহার আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাস প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স. রা.

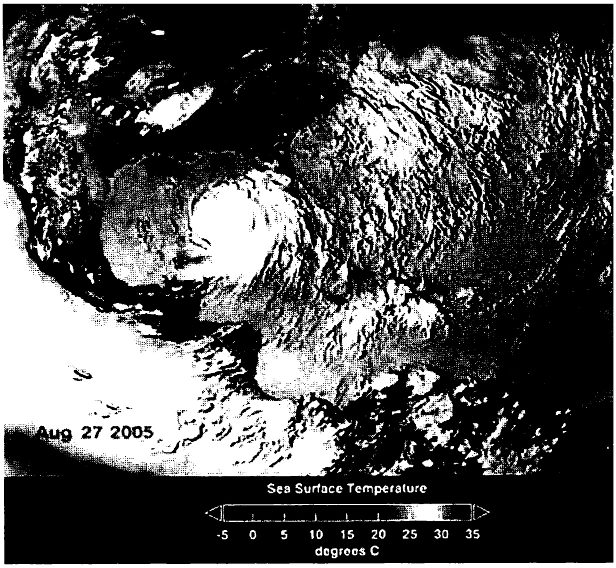

আবহাওয়া (weather)

'আব' অর্থ পানি (দ্র), 'হাওয়া' অর্থ বাতাস (দ্র)। বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও জলীয় বাষ্পের দৈনন্দিন অবস্থাকে বলে আবহাওয়া। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের গতি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা, আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলে এসব উপাদানের অবস্থা থেকে ঐ স্থানের ঐ সময়ের আবহাওয়া জানা যায়। কোনো স্থান বা অঞ্চলের ২৫ বা ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে বলা হয় ঐ স্থানের জলবায়ু। তাই আবহাওয়ার উপাদানগুলিই জলবায়ুর উপাদান। এগুলো হল বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি।

কোনো স্থানের আবহাওয়া ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পৃথিবীর শস্য উৎপাদন, মাটি (দ্র), পানির উৎসকে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের উদ্যম ও কর্মপ্রবণতাও আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহণ ইত্যাদি আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা বরফ-যুগ, সমুদ্রতলের উচ্চতার পরিবর্তন, দুর্ভিক্ষ, মানুষের দেশান্তর, খরা, বন্যা (দ্র) ইত্যাদির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি।

স. রা.

আবেশ (induction)

সাধারণ কোনো ক্ষেত্রের (তড়িৎক্ষেত্র, চৌম্বকক্ষেত্র ইত্যাদি) সাথে মিথস্ক্রিয়ার (ক্রিয়া-বিক্রিয়া) ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হওয়া বা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হওয়া। যেমন কোনো বহিঃস্থ ক্ষেত্রের দ্বারা কোনো পদার্থে চৌম্বকক্রম উৎপাদন, যেমন চৌম্বক আবেশ। কোনো চুম্বককে অন্য কোনো চৌম্বক পদার্থের নিকট আনলে চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। একে বলা হয় চৌম্বক আবেশ। বহিঃস্থ তড়িৎক্ষেত্রের দ্বারা কোনো পদার্থের মধ্যে তড়িৎচার্জ বা আধানকে পৃথক করাও এক ধরনের আবেশ। এই ঘটনাকে বলা হয় স্থিরতড়িৎ আবেশ। আবেশের আরো একটি উদাহরণ হল তাড়িতচৌম্বক আবেশ। পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা কোনো পরিবাহকে তড়িচ্চালক শক্তি (বা তড়িৎপ্রবাহ) উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় তাড়িতচৌম্বক আবেশ।

শা. ত.

আম (mango)

ভারতীয় উপমহাদেশ আমের জন্মস্থান। ভালো জাতের পাকা আমের স্বাদের তুলনা নেই। আবার টক ও পোকায় ধরা আমও কম নেই। আমাদের দেশে খাওয়ার উপযোগী উন্নত শ্রেণিতে পড়ে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের কিছু আম। এই সুস্বাদু জাতের আমের বৈজ্ঞানিক নাম *ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা (Mangifera indica* Linn), গোত্র আনাকার্ডিয়াসি (Anacardiaceae)। রাজশাহী থেকে পুব দিকে আম ক্রমশ টক হতে থাকে। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের আম আরো টক আর পোকাধরা। এই জাতের আমকে বলা হয় খাওয়ার অনুপযুক্ত এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম *ম্যাঙ্গিফেরা সিলভাটিকা (Mangifera sylvatica* Roxba)। লতানে আমও এই পর্যায়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, আসাম, ত্রিপুরা এই আমের অঞ্চল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে আমের কাহিনী পাওয়া যায়।

এঙ্গলার ও প্র্যান্টস নামের দুই উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ১৮৯৭ সালে ৩২ প্রকারের রসাল আমের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। ১৮৯৫ সালে হুকার ও জ্যাকস করেছিলেন ৬৫ প্রকারের সুস্বাদু আমের তালিকা। ১৯৪৯ সালে

ভারতীয় আম্রতত্ত্ববিদ মুখার্জি ৪১ রকমের সুখাদ্য আমের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এখন আমেরিকার ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালটা, আফ্রিকার নাটাল ও মিশরে এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে আম উৎপন্ন হচ্ছে। একমাত্র বাংলাদেশ ও ভারতে অন্তত ৫০০ রকমের আমের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এসবের মধ্যে অনেক আমের একটি থেকে আরেকটি তফাত করা খুব মুশকিল।

জামালপুরে ১৩০০ থেকে ১৩২৯ সন পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহের একটি নার্সারি ছিল। সেই নার্সারিতে ১২৮ জাতের আমের চারা পাওয়া যেত। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের আমের তালিকায় *বোম্বাই আলফানসো (বা আলফানজো)* ছিল। এই আম ঘরে অনেক দিন রাখা যেত, পাকত জুলাই মাসে। তখন ঐ আমের একটি চারার দাম ছিল ৫০ পয়সা। সারা বছর ফলদায়ী বা বারোমেসে আমের প্রতিটি চারার দাম ছিল ১০ টাকা। সে সময়কার বিখ্যাত আম ছিল– বৃন্দাবনী, দুধিয়া, গোপালভোগ, ফজলী, খীর্সপাতি, কোহিতুর, মোহনভোগ, শ্রীধন, পিয়ারী, ল্যাংড়া, ফার্নান্ডিয়ান, আগা সাহেব, বাদানী, জালীবান্দা, বেগমপসন্দ, কাঁচামিঠা,

বেনারস, কাঁচামিঠা-ঈশ্বর গুহ, কালাপাহাড়, মালদহ-সিঙ্গাপুর, মুলতানি। এর মধ্যে কয়েকটি আম ছিল বারোমেসে। এখন আমাদের দেশে মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে মাঘ-ফাল্গুন মাসে আম আসে আমদানি হয়ে।

চাষ করা আমের মধ্যে বোম্বাইয়ের *আলফানসো* উৎকৃষ্ট আমের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বিশ্বের বাজারে এই আমের খুব চাহিদা। বাংলাদেশে গুলাবখাস, বোম্বাই ও ল্যাংড়াকে উৎকৃষ্ট আম বলা হয়। কেউ কেউ ফজলীকে এই শ্রেণিভুক্ত করেন। এ ছাড়া মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতে *নীলাম ও বাঙ্গানপল্লী;* অন্ধ্রে *মালগোয়া* ও *সুবর্ণরেখা;* যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে *চৌসা, দশেরী* ও *ল্যাংড়া* প্রসিদ্ধ। আকারের দিক থেকে বাংলাদেশে ফজলী সবচেয়ে বড়, ওজনে কোনো কোনোটি ১.৫ কেজি। ভারতের অন্ধ্রের *টেনেরু* লম্বায় ২০ সেমি ও ওজন ১.৬ কেজি, তবে সেই আম সুস্বাদু নয়।

কবিরাজি ভাষায় কচি আম রক্তপিত্তকর, ডাঁসা আম পিত্তকর এবং পাকা আম শরীরের রঙ, মাংস ও বলবর্ধক। হজম শক্তি দুর্বল হলে বেশি আম খেতে নেই, তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। পাকা আমের মধ্যেও তফাত আছে। শহরে যে আম বিক্রি করা হয়, তা আসলে পাছপাকা নয়, এঁচড়ে পাকা। কাজেই এই আম কাঁচা আমের দোষ থেকে মুক্ত নয়; এ জন্য বলে আম খেলে ফোড়া হয়। আমাদের দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও উত্তরবঙ্গ ছাড়া কোথাও তেমন আমবাগান নেই। আমবাগানে ফাগুন মাসে বোলের পাগল-করা ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

আমের মঞ্জরি হলদেটে-সবুজ ও এতে গোলাপি-বেগুনির ছোপ থাকে। কোনো কোনো মঞ্জরি সাদাটে ধরনের আবার কোনোটি হালকা বেগুনি জাতের। বোলের গন্ধ শুঁকে বলা যায় কোন আম গুণে অতুলনীয় হবে। এই গুণ নির্ভর করে শাঁসের সুগন্ধ ও আঁশহীনতার ওপর। আমের সাধারণ আকৃতি হৃৎপিণ্ডের মতো।

ভালো জাতের আম থেকে বংশ বাড়াতে চাইলে কলম করাই উত্তম। সর্বোৎকৃষ্ট জাতের আমের বীজ পুঁতলেও যে চারা হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। এ জন্য কৃষি-ফার্ম থেকে ভালো জাতের ভালো কলম সংগ্রহ করা উচিত। এ ছাড়া আমের রোগও আছে। আমগাছে পরগাছা হয় খুব। এ জন্য পরজীবীর রোগ যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ক্ষতিকর পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সব সময় সযত্নে অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছেঁটে ফেলা উচিত।

আমের পাতা চিবিয়ে তা দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত নড়ে না, পড়েও না। আমের কুশি (কচি আমের আঁটির শাঁস) থেঁতো করে পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে ঐ পানি শুকনো চুলের গোড়ায় লাগালে চুল পড়া বন্ধ হয়। আমের কুশি ও হরীতকী একসঙ্গে দুধে বেটে ছেঁকে মাথায় লাগালে খুশকি কমে যায়। আরো অনেক রোগে আমের কুশি, পাতা ও ছাল ঔষধের কাজ করে।

আমের থেকে চাটনি, আচার ও অম্বল তৈরি করে খাওয়া যায়। পাকা আমেরও চমৎকার চাটনি হয়, আমসত্ত্ব হয়। পাকা আমে দুধ-চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পানীয় হয়, এই পানীয় সারা বছর রাখা যায়। আমের রস টিনজাত করে, রসের পানীয় তৈরি করে সারা বছর ব্যবহৃত হচ্ছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আমের রসের গুণগান পাওয়া যায় সাহিত্যে ও ধর্মগ্রন্থে।

বৌদ্ধ ও হিন্দুরা আমগাছকে বিশেষ পবিত্র মনে করে। বিবাহ, মঙ্গল-উৎসব অথবা দেবদেবীর পূজায় আমের পল্লব অপরিহার্য। পুরানো আমগাছের কাঠ দিয়ে দরজা, কপাট, ছাদের তক্তা ও আসবাবপত্র তৈরি হয়। এ রকম উপকারী গাছ, ফলদায়ী বৃক্ষ, ছায়াময় চিরসবুজ তরু, ঔষধিগুণে ভরা এমন কল্পতরু আর দু'টি নেই।

বি. ব.

আমলকী (myrobalau)

Euphorbiaceae গোত্রের আমলকীর বৈজ্ঞানিক নাম *Phyilanthus embelica* L। মধ্যম আকৃতির বৃক্ষ, ডালপালা হালকা হলেও পাতা ঘন। বাকল স্থূল, নরম, মসৃণ, ম্লান ধূসর এবং ভিতর দিক গাঢ় লাল। কাণ্ড গাঁটযুক্ত, পাতা একক, হালকা সবুজ। শীতে আমলকীর সব পাতা প্রায় একসঙ্গে ঝরে যায়। বসন্তের শুরুতেই হালকা সবুজ কচি পাতায় গাছ ভরে ওঠে। কচি পাতার কোলেই হালকা হলুদ ফুলে সারা গাছ ভরে যায়। সে জন্য ফুল ছোট হওয়া সত্ত্বেও ফুলের প্রাচুর্যে আমলকী গাছ সুন্দর, শোভন। এর ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। কিন্তু একই গাছে স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল ফোটে। এ গাছের ফলই সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হালকা শিরবিশিষ্ট গোলাকৃতি, মাংসল। রসাল প্রায় স্বচ্ছ হালকা হলুদ-সবুজে মেশানো

রঙের ফল সব বয়সের মানুষের প্রিয়। প্রতিটি ফলের মধ্যে যে শক্ত একটি আঁটি থাকে তা আসলে ছয়টি বীজের সমষ্টি। ফলে উষ্ণ তিতায় মেশানো। আমলকী হরিণের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। এর আচার বেশ মুখরোচক। ভিটামিন 'সি'-এর সমৃদ্ধ উৎস। এর রস যকৃৎ, পেটের পীড়া, অজীর্ণ, বদহজম এবং কাশিতে উপকারী। শুকানো ফল ক্ষার গুণসম্পন্ন এবং শ্যাম্পু, কলম ও কালির উপাদান। কাঠ হয় রক্তবর্ণ এবং তা দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি হয়।

শা. আ.

আমাশয় (dysentery)

আমাশয় বৃহদন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ। এ রোগের লক্ষণ প্রধানত ডায়রিয়া, মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা, রক্ত ও পুঁজ নির্গমন। জীবাণু, ভাইরাস, পরজীবী, কৃমি, রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে আমাশয় রোগ দেখা দেয়। দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে।

'অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা' (Entamoeba histolytica) জাতীয় পরজীবী সংক্রমণের ফলে অ্যামিবীয় আমাশয় (amoebic dysentery) দেখা দেয়। অ্যামিবীয় আমাশয়ের প্রধান লক্ষণ– দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা, এমনকি রক্ত নির্গমন এবং সেইসঙ্গে কখনো সামান্য জ্বর। মেট্রোনিডাজোল (metronidazole) জাতীয় ঔষধ এ ধরনের আমাশয় নিরাময় করে।

'শিগেলা' (Shigella) জাতীয় জীবাণু সংক্রমণের ফলে ব্যাসিলারি আমাশয় (bacillary dysentery) দেখা দেয়। এ জাতীয় আমাশয়ে মলের তুলনায় শ্লেষ্মা, রক্ত, পুঁজ নির্গমন বেশি হয় এবং তলপেটে তীব্র খিঁচুনিসহ ব্যথা, উদাভাব (dehydration), জ্বর প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। শিশুরাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে এ রোগ যে কোনো বয়সেই দেখা দিতে পারে। ব্যাসিলারি আমাশয় নিরাময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ধরনের আমাশয়ের চিকিৎসাও কারণভিত্তিক।

সি. না. হ.

আয়তন (volume)

কোনো বস্তু বা পদার্থ যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তাকে ঐ বস্তু বা পদার্থের আয়তন বলে। সুষম কঠিন বস্তুর আয়তন এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা গুণ করে পাওয়া যায়। অসম কঠিন বস্তুর আয়তন বের করতে হলে একে সম্পূর্ণরূপে পানিপূর্ণ কোনো পাত্রে ডোবাতে হয়। যে পরিমাণ পানি উপচে পড়ে তার আয়তন বস্তুটির আয়তনের সমান। অসম ক্ষুদ্র বস্তুকে পানিভর্তি মাপচোঙে ডুবিয়ে পানির আয়তনের পরিবর্তন বা পার্থক্য বের করে অসম বস্তুটির আয়তন নির্ণয় করা যায়।

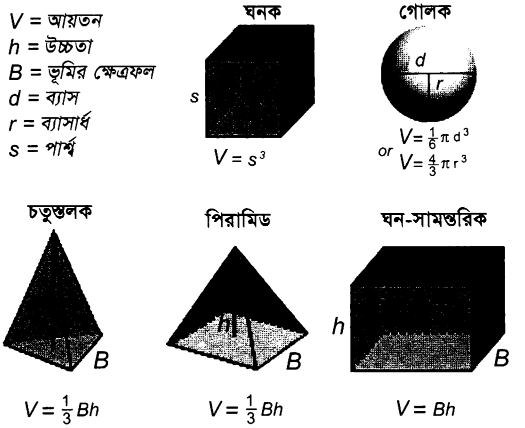

আয়তন পরিমাপের সি জি এস (cgs = centimetre-gramme-second) একক হল সিসি (cc = cubic-centimetre) যাকে বাংলায় ঘন সেন্টিমিটার বলে।

আন্তর্জাতিক এককে আয়তন মাপা হয় ঘনমিটারে। কোনো তরল পদার্থের আয়তন বের করতে হলে একে কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের দাগ-কাটা পাত্রে ঢেলে পরিমাপ করতে হবে।

হো. আ.

আয়ন (ion)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ যদি এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সেই পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়ে আয়নে পরিণত হয় এবং ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে। অন্য দিকে পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ

করে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়নে পরিণত হয়ে অ্যানায়ন উৎপন্ন করে। কোনো পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ যতটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নে ততটি ধনাত্মক আধান থাকে। অপরদিকে পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ যতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে আয়নে ততটি ঋণাত্মক আধান থাকে। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জ সংখ্যা মৌলের যোজনী নির্দেশ করে।

সৈ. তা. আ.

আয়নমণ্ডল (ionosphere)

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। সূর্যকিরণের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মি এই স্তরের বায়ুকে আয়নায়িত করে। এর ফলে আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়। আয়নমণ্ডলে মুক্ত ইলেকট্রন থাকায় বেতার-তরঙ্গ এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই পৃথিবীতে অনেক দূরের স্থানেও বেতার-তরঙ্গ পাঠানো সম্ভব হয়। আন্তঃমহাদেশীয় বেতার যোগাযোগ স্থাপনে তাই আয়নমণ্ডল খুব কাজে আসে। তবে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এতে কিছু অসুবিধাও হয়। কারণ মহাশূন্য থেকে আসা বিকিরণের বেশির ভাগই আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আয়নমণ্ডলের তিনটি স্তর ডি-স্তর (৫০-৯০ কিলোমিটার); ই-স্তর (৯০-১৫০ কিলোমিটার); এবং এফ-স্তর (১৫০-১০০০ কিলোমিটার)।

সু. ব.

আয়না (mirror)

আয়না বলতে এমন একটি তলকে বোঝানো হয়ে থাকে যার ওপরে আপতিত আলো প্রচুর পরিমাণে প্রতিফলিত হয় ও প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এখানে লক্ষণীয় যে সব বস্তুই আলোকে প্রতিফলিত করে না। কাঠ, কাপড়, গাছের পাতা বা কালো বস্তুর উপরে যে আলো পড়ে তা বেশির ভাগই শোষিত হয়। কাচ বা স্বচ্ছ কোনো বস্তুর উপরে পতিত আলোর প্রতিসরণ ঘটে। অন্য দিকে পারদ-মাখানো কাচ বা মসৃণ ধাতব পাতের উপরে আপতিত আলো প্রতিফলিত হলেই তা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না। প্রতিফলনকারী তলকে যথেষ্ট মসৃণ হতে

হবে যাতে প্রতিফলিত আলোর রশ্মিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে না পড়ে। চুনকাম করা সাদা দেয়াল বা বালুর চর আলোকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না। কারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হিসাবে এদের পৃষ্ঠদেশ মসৃণ নয় বলে আলোর বিক্ষেপণ ঘটে এসব তল থেকে।

সবচেয়ে পরিচিত আয়না হচ্ছে সমতল আয়না। সমতল আয়নার সামনে কোনো উজ্জ্বল বস্তু রাখলে আয়নার পিছন দিকে অসদবিম্ব সৃষ্টি হয়। এই বিম্ব বস্তুর সমমাপের এবং বস্তুটি আয়নার যতটা সামনে বিম্বটি আয়নার ততটা পিছনে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিম্বটিতে পার্শ্বিক উৎক্রম ঘটে। অর্থাৎ বাঁ দিকটা ডান দিক ও ডান দিকটা বাঁ দিক হয়। বক্র আয়না প্রতিবিম্বের আকৃতিকে বদলে দিতে পারে। বক্র আয়না হতে পারে গোলীয় অথবা উপবৃত্তাকার, উত্তল বা অবতল।

আ. আ.

আয়নায়ন (ionization)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো নিরপেক্ষ (neutral) পরমাণু ইলেকট্রন লাভ করে বা হারিয়ে আহিত হয় অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় কোনো অণু বা পরমাণু আয়নিত হয়। অণু ভেঙেও এই ঘটনা ঘটতে পারে অর্থাৎ ভগ্নাংশগুলোর প্রতিটির মধ্যে অসমান সংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান (চার্জ) থাকতে পারে। অত্যধিক তাপেও আয়নায়ন ঘটতে পারে। বায়ুর ভিতর দিয়ে আলফা-

কণিকার গমন বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে আয়নিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস, তরল বা কঠিন পদার্থের অণু দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে দুই ধরনের আয়ন অর্থাৎ অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নে পরিণত হয়। এই বিয়োজনের মাত্রাটি নির্ভর করে অণুটির প্রকৃতি, দ্রাবকের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর। গ্যাসের অণু বা পরমাণুর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ বা তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে অণু বা পরমাণু আয়নে পরিণত হয়। এর উদাহরণ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু ভেঙে সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরিন আয়নে পরিণত হওয়া।

NaCl (Na+Cl) কেলাসিত যৌগে দু'টি বিপরীতধর্মী চার্জের আয়নের মধ্যকার আকর্ষণ বলকে বলা হয় আয়নিক অনুবন্ধ বা আয়নিক বন্ধন (ionic bond)। আমাদের খাবার লবণে (NaCl) সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়ন আয়নিক বন্ধনের ফলে তাদের অবস্থানে থাকে।

যে কেলাসের কেলাসজালক বা ল্যাটিসে অবস্থিত মৌলগুলি আয়ন রূপে (আধানে আহিত) থাকে এবং আয়নগুলো স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল দ্বারা পরস্পরকে ধরে রাখে তাকে আয়নিক/আয়নীয় কেলাস (ionic crystal) বলা হয়।

শা. ত.

আয়রন (iron)

বাংলা ভাষায় লৌহ বা লোহা নামে পরিচিত। এটি মৌলিক ধাতব পদার্থ। লোহা কঠিন পদার্থ। খাঁটি লোহা খুব কম পাওয়া যায়। সাধারণত অক্সাইড রূপেই খনিতে পাওয়া যায়। লোহা আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। সেকালে লোহা ছিল খুব দামি ধাতু। যুদ্ধ ও শিকারের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে লোহা খুব বেশি ব্যবহার করা হত। তবে লোহার আকরিক থেকে লোহাকে আলাদা করার উপায় জানতে মানুষের অনেক সময় লেগেছিল। এ পদ্ধতি প্রথমে আবিষ্কৃত হয়েছিল মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায়, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে।

লোহা উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল চুল্লি আবিষ্কার। এই চুল্লিতে লোহা গলানো হত। তার পর গলিত লোহা দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হত।

বিশুদ্ধ লোহা একটু নরম। কার্বন বা বিশেষ ধরনের ধাতু মিশিয়ে একে কঠিন করা হয়। কঠিন লোহাই আমাদের নানা কাজে লাগে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন মিশিয়ে লোহাকে ইস্পাত বানানো হয়ে থাকে। লোহার একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, এটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তড়িৎ-চুম্বক তৈরিতেও লোহা ব্যবহৃত হয়।

লোহার লাতিন নাম *ফেরাম (Ferrum)*। তাই এর রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন Fe। লোহার পারমাণবিক ওজন ৫৫.৮৫। বায়ু ও পানির সংস্পর্শে লোহা এক রকম লাল যৌগ গঠন করে। একে মরিচা বলে।

সু. ব.

আয়ু (longevity)

মানুষ কিংবা অন্যান্য জীবের মোট জীবনকালকে আয়ু বলে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীন (দ্র)-গত বৈশিষ্ট্যের জন্য আয়ু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভালো পরিবেশে রাখলেও দেখা যায়, গড়ে ইঁদুর সর্বোচ্চ ৩.৫ বছর বাঁচে; কুকুর ৩৪ বছর, মানুষ ১১৫ বছর এবং কচ্ছপ ১৫০ বছর বেঁচে থাকতে পারে। জীবনকালের প্রথম তৃতীয়াংশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ সবচেয়ে ভালো থাকে। মধ্য তৃতীয়াংশে শরীরে প্রতিরক্ষা শক্তি, হরমোনের কার্যকলাপ এবং প্রজননক্ষমতা কমতে শুরু করে।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ উদ্ভিদ কয়েক বছর থেকে কয়েক শ' বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে সেকুইয়া (Sequoia) বৃক্ষ–এ গাছ ৩০০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

বয়সের পরিবর্তন ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে সব পর্যায়েই ঘটে; এটা বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অণু থেকে শুরু করে অঙ্গাণু, কোষ, কলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা পুরো জীব পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধি কমে যাওয়ায় মানুষের অকালমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে।

সা. এ.

আয়ুর্বেদশাস্ত্র *(Ayurvedic science)*

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাব্যবস্থার নাম আয়ুর্বেদশাস্ত্র। ব্রহ্মাকে মনে করা হয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রথমে প্রজাপতি, পরে তাঁর কাছ থেকে দু' জন অশ্বিনীকুমার এবং এ দু' জনের নিকট থেকে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। এর পর ঋষি ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক (দ্র), সুশ্রুত (দ্র) প্রমুখ ঋষি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদচিকিৎসার ক্ষেত্রে চরক ও সুশ্রুতের অবদান সবচেয়ে বেশি।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অগ্নিবেশ সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করে তা 'অগ্নিবেশসংহিতা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এর পর চরক অগ্নিবেশসংহিতা বিশেষভাবে সঙ্কলন করেন, যা 'চরকসংহিতা' নামে পরিচিত। চরকের পর সুশ্রুত তাঁর আয়ুর্বেদ বিষয়ক জ্ঞান 'সুশ্রুতসংহিতা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। আয়ুর্বেদচিকিৎসার ক্ষেত্রে শল্যবিদ্যার (দ্র) প্রয়োগ সুশ্রুতের উল্লেখযোগ্য অবদান।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র মোট ৯টি ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হল ১. কায়বিদ্যা বা সর্বাঙ্গব্যাধিবিদ্যা, ২. শল্যচিকিৎসা, ৩. শালাক্যচিকিৎসা বা কণ্ঠার হাড়ের উপরিভাগস্থ অংশের (যেমন– নাক, কান, গলা, চক্ষু ইত্যাদি) অস্ত্রোপচার, ৪. ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসা, ৫. কৌমারভৃত্য বা শিশুরোগবিদ্যা, ৬. অগদচিকিৎসা বা বিষক্রিয়ার চিকিৎসা, ৭. রসায়নশাস্ত্র, ৮. বাজীকরণ বা প্রজনন বিষয়ক চিকিৎসা, এবং ৯. পশুচিকিৎসা।

ভারতবর্ষ থেকে আয়ুর্বেদশাস্ত্র আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদের খলিফা হারুন-উর-রশীদ আয়ুর্বেদচিকিৎসার অনুরক্ত ছিলেন বলে কথিত আছে। 'চরকসংহিতা' এবং 'সুশ্রুতসংহিতা' শীর্ষক আয়ুর্বেদগ্রন্থদ্বয় আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

সি. না. হ.

আয়োডিন (iodine)

গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক ওজন ১২৬.৯২, পারমাণবিক সংখ্যা ৫৩।

উদ্বায়ী পদার্থ। বাতাসে উন্মুক্ত রাখলে বেগুনি পদার্থে পরিণত হয়ে উবে যায়। পানিতে প্রায় গলে না, কিন্তু অ্যালকোহল সহযোগে সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। এই দ্রবকে বলে টিংচার (tincture) আয়োডিন যা কাটা-ছেঁড়ায় জীবাণু-প্রতিরোধক হিসাবে লাগানো হয়। টিংচার আয়োডিন হচ্ছে সমপরিমাণ আয়োডিন, পটাসিয়াম আয়োডাইড, পানি ও ৯৫% রেক্টিফায়েড স্পিরিটের মিশ্রণ। বিভিন্ন সামুদ্রিক শেওলায় ও চিলি সল্টপিটার (Salt-petre) নামক একটি খনিজ পদার্থে যৌগ রূপে তা পাওয়া যায় এবং তা থেকে বিশুদ্ধ আয়োডিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে এর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন আয়োডাইড সল্ট সৃষ্টি হয়। অনেক খাদ্যবস্তুতে সামান্য আয়োডিন থাকে। খাদ্যে এর অভাবে গলগণ্ড (দ্র) রোগ হয়। বিভিন্ন আয়োডাইড সল্ট ঔষধ হিসাবে এবং আলোকচিত্র-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আয়োডিন বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। সাগরের পানিতে, সামুদ্রিক শৈবালে, প্রাণীর থাইরয়েড গ্রন্থিতে এবং চিলির সোনার খনিতে। ফরাসি দেশে বের্নার কুর্তোয়া (Bernard Courtois) নামে এক রসায়নবিদ ছিলেন। ১৮১১ সালে তিনিই সর্বপ্রথম আয়োডিন প্রস্তুত করেন। সাগরের গভীর পানিতে শৈবাল জাতীয় কয়েক রকমের উদ্ভিদ জন্মে। ঐ সব উদ্ভিদের মধ্যে আয়োডিন বেশি পরিমাণে থাকে। এমন একটি উদ্ভিদের নাম *ল্যামিনারিস প্টেনোফাইলা*। এতে আয়োডিন থাকে শতকরা ০.৪৮ ভাগ। *ল্যামিনারিস ডিজিটাটা* নামে আরেকটি সামুদ্রিক উদ্ভিদে আয়োডিনের পরিমাণ হল শতকরা ০.৪০ ভাগ। এ জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই আয়োডিন বের করেন কুর্তোয়া। গ্রিক ভাষায় ioeides নামে একটি শব্দ আছে। তার মানে বেগুনি রঙ। কুর্তোয়ার আবিষ্কৃত নতুন ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটিও বেগুনি রঙের। তাই তিনি ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটির নাম দেন 'আয়োডিন'।

আ. হ. খ.

আরশোলা (cockroach)

আরশোলা বা তেলাপোকা একটি অতি পরিচিত সন্ধিপদী প্রাণী। ইংরেজিতে বলে ককরোচ (cockroach)। মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর (দ্র) সব জায়গাতেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। নিশাচর এই পতঙ্গটি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে গরম স্থানে থাকতে পছন্দ করে। এদের প্রায়

৪০০০ প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে *পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা (Periplaneta americana)*এবং *ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস (Blatta orientalis)* আমাদের দেশের দু'টি সাধারণ প্রজাতি।

হালকা বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি রঙের আরশোলার দেহ লম্বা, চ্যাপটা এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। দেহ কাইটিনজাত পদার্থের একটি আবরণে মোড়ানো। একে বহিঃকঙ্কাল বলা হয়। এদের দেহ বাইরে থেকে খণ্ডিত এবং মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি অংশে বিভক্ত। আরশোলার প্রায় একই ধরনের তিন জোড়া পা এবং দু' জোড়া পাখা থাকে। এদের বেশ লম্বা দু'টি শুঙ্গ বা অ্যান্টেনা (দ্র) থাকে। অ্যান্টেনা স্পর্শ এবং গন্ধ নেওয়ার ইন্দ্রিয় রূপে কাজ করে। তেলাপোকার

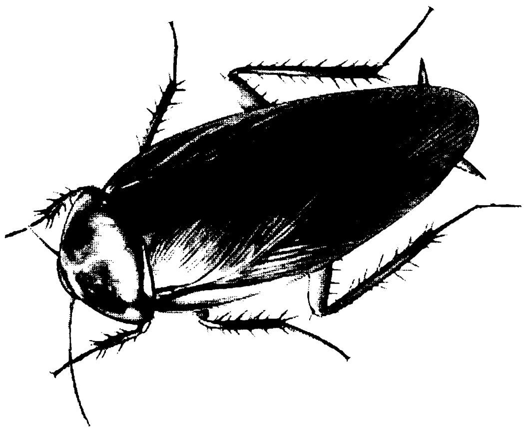

মাথার সামনে দু' পাশে দু'টি কালো অর্ধবর্তুলের মতো পুঞ্জাক্ষি থাকে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি আসলে অসংখ্য সরলাক্ষির সমষ্টি। প্রত্যেকটি সরলাক্ষিকে *অসিলাস (ocillus)* বা *ওমাটিডিয়াম (ommatidium)* বলা হয়। কোনো বস্তুর সামান্য নড়াচড়াও পুঞ্জাক্ষিতে ধরা পড়ে।

আরশোলা সর্বভুক প্রাণী। এরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু থেকে শুরু করে কাগজ, কাপড়, তুলা, চামড়া ইত্যাদি খায়। তেলাপোকার পরিপাকনালি এবং দেহ-প্রাচীরের মাঝখানে *প্রকৃত সিলোম (true-coelom)* থাকে না। এটাকে *হিমোসিল (haemocele)* বলা হয়, যা আসলে রক্তসংবহন তন্ত্রের (দ্র) অংশ। তেলাপোকার রক্ত বর্ণহীন। কারণ এতে কোনো শ্বাসরঞ্জক বা হিমোগ্লোবিন (দ্র) থাকে না।

তেলাপোকা একলিঙ্গ (unisexual) প্রাণী। পুরুষ তেলাপোকার নবম খণ্ডের নিচে একজোড়া কাঁটার মতো কূর্চ (anal style) থাকে। স্ত্রী তেলাপোকায় এটা থাকে না। এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে সহজেই পুরুষ ও স্ত্রী তেলাপোকা শনাক্ত করা যায়। তেলাপোকা যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে।

স্ত্রী আরশোলার নিষিক্ত ডিম্বাণুর ওপর কোলেটারাল গ্রন্থি (collateral glands) থেকে নিঃসরণ জমা হয়ে একটি আবরণী তৈরি করে এবং এটি পরে শক্ত হয়ে কালচে বাদামি থলি তৈরি করে, যাকে উথিকা (ootheca) বলা হয়। একটি স্ত্রী তেলাপোকা অন্তত ৩০টি উথিকা তৈরি করতে পারে। উথিকা ডিমসমূহকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। *পেরিপ্লানেটা আমেরিকানার* প্রতিটি থলিতে সাধারণত দু' সারিতে ১০টি করে মোট ২০টি ডিম থাকে। *ব্লাটা ওরিয়েন্টালিসের* ক্ষেত্রে দু' সারিতে ১৬টি ডিম থাকে। উথিকা লম্বালম্বি ফেটে গেলে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ থেকে একটি করে শিশু তেলাপোকা (nymph) বের হয়ে আসে। একটি শিশু তেলাপোকা কয়েক বার খোলস পাল্টানোর পর পূর্ণাঙ্গ আরশোলায় পরিণত হয়। খোলস বদলানোকে একডাইসিস (ecdysis) বা মৌল্টিং (moulting) বলে।

তেলাপোকা একটি অপকারী পতঙ্গ। এরা খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, কাগজপত্র ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিস নষ্ট করে। অনেক সংক্রামকব্যাধি বিস্তারেও এদের ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য এদের উপকারী ভূমিকাও রয়েছে। যেমন– এরা শুধু হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবেই নয়, কোনো কোনো দেশে মানুষের খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়। মাছ ধরার জন্য বড়শিতে টোপ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। জীববিজ্ঞানের গবেষণাগারে ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণের জন্য তেলাপোকার ব্যবহার রয়েছে।

সা. এ.

আর্কবাতি (electric arc)

কোনো তড়িৎ-বর্তনীর মাঝখানে অতি সামান্য শূন্যস্থান বা ফাঁক সৃষ্টি হলে সেখানে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-চার্জ লাফিয়ে ঐ ফাঁকা স্থান অতিক্রম করে, বর্তনী পূর্ণ হয়। বর্তনীর ফাঁকের দুই প্রান্তকে বলে মেরু। দুই মেরুর

মাঝখানে বিভবপার্থক্য সৃষ্টি হলে এদের মধ্যবর্তী স্থানের বায়ু (গ্যাস) আয়নিত (চার্জযুক্ত) হয়। এ ক্ষেত্রে চার্জ (দ্র) একটি মেরুদ্বার থেকে অন্য মেরুদ্বারে যাওয়ার সময় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। এই স্ফুলিঙ্গ সরলরেখা বরাবর না গিয়ে বৃত্তচাপের মতো বাঁকা পথে মেরু দু'টিকে যুক্ত করে। তাই একে বলে ইলেকট্রিক আর্ক, সংক্ষেপে আর্কবাতি। ১৮০৮ সালে স্যার হামফ্রি ডেভি সর্বপ্রথম দু'টি কার্বনদণ্ডকে মেরুদ্বার হিসাবে ব্যবহার করে অত্যুজ্জ্বল আর্কবাতি উদ্ভাবন করেন।

আর্কের বিস্তৃতি বিভবপার্থক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর্কবাতির মেরুদ্বার তৈরি হয় ধাতু, গ্রাফাইট (দ্র) অথবা গ্রাফাইটমিশ্রিত ধাতুদণ্ড দিয়ে। এই দণ্ডের প্রান্তগুলো থাকে অত্যন্ত সুচালো। একটি তড়িৎদ্বার থেকে অন্য তড়িৎদ্বারে চার্জ লাফিয়ে যাওয়ার সময় বাষ্প, তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় এবং দণ্ডটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দণ্ডের মধ্যে ফাঁক সব সময় সমান রাখলে তড়িৎপ্রবাহ ও বাতির উজ্জ্বলতা সমান থাকে। এটা করা হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। যেসব কাজে অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন, যেমন– সার্চলাইটে, থিয়েটারের স্পটলাইটে, চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণে, ক্যামেরার ফ্লাশগান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্কবাতি ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

আর্কিমিডিস [খ্রি.পূ. ২৮৭-২১২]

আর্কিমিডিস (Archimedes) প্রাচীন গ্রিসের অধিবাসী। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী এবং যন্ত্রকৌশলী। জন্ম আনুমানিক ২৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে। সম্ভবত তিনি সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে জন্মগ্রহণ করেন। গণিত ও বিজ্ঞানে তিনি অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানচর্চার বেশির ভাগ তথ্যই হারিয়ে গেছে। যে সামান্য তথ্য এখনো পাওয়া যায় তা থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব নয়।

তিনি লিভারের সূত্র, প্লবতার নীতি বা তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ওজনহীনতা ও ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। স্থিতিবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি স্থিতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভারকেন্দ্রের ধারণা দেন। তিনি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের

সম্পর্ক r-এর মান $\frac{২২}{৭}$ পুনঃনির্ধারণ করেন। তিনি এক ধরনের পানি তোলার পাম্প তৈরি করেন, এর নাম 'আর্কিমিডিসের স্ক্রু'। শত্রুবাহিনীর ওপর ছোঁড়ার জন্য তিনি বিশেষ ধরনের ক্ষেপণযন্ত্র, দূর থেকে শত্রুজাহাজে আগুন ধরানোর জন্য প্রতিফলক দর্পণ ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত তিনি তৎকালীন মিশরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে ৯টি গবেষণা-প্রবন্ধ এখনো বিদ্যমান। রোমক বাহিনী খ্রি.পূ. ২১২ অব্দে সিসিলি দখল করে। রোম সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ ছিল আর্কিমিডিসকে জীবিত গ্রেফতার করার, কিন্তু জনৈক সৈন্য চিনতে না পেরে তাকে হত্যা করে বসে।

স. রা.

আর্গন (argon)

একটি মৌলিক গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ০.৯ শতাংশ। আর্গন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস

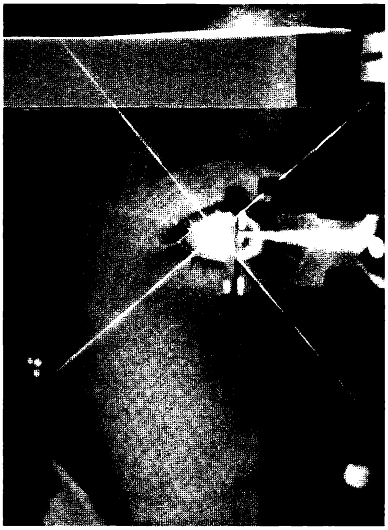

অর্থাৎ সহজে অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে এটি রাসায়নিকভাবে মিলিত হতে পারে না। আর্গন গ্যাস সাধারণত বৈদ্যুতিক বাল্বে ব্যবহার করা হয়।

গ্রিক ভাষায় আর্গন শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে তেমন সক্রিয় নয় বলেই গ্যাসটির এই নাম রাখা হয়। আর্গনের রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন প্রথমে A রাখা হয়, পরে তা Ar করা হয়। এর পারমাণবিক ওজন ৩৯.৯৪।

সু. ব.

আর্থার সি. ক্লার্ক বিজ্ঞান কল্পকথা দ্র

আর্দ্রতা (humidity)

পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে সব সময় পানির কিছু অণু জলীয় বাষ্প রূপে বাতাসে মিশছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রা হল এর আর্দ্রতা। বাতাসের একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে ও চাপে এটি সর্বাধিক কতখানি জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট। এ রকম সর্বাধিক জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসকে সম্পৃক্ত অবস্থায় রয়েছে বলা হয়। উত্তাপ বাড়লে বাতাস আরো বেশি জলীয় বাষ্প নিতে পারে। সচরাচর আর্দ্রতার যে-পরিমাপ ব্যবহৃত হয় তাতে আর্দ্রতাকে সম্পৃক্ত অবস্থার সঙ্গে শতকরা হিসাবে তুলনা করা হয়। একে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা। সম্পৃক্ত অবস্থায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঐ উত্তাপে সম্পৃক্ত অবস্থার অর্ধেক হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫০%। আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রকে বলা হয় হাইগ্রোমিটার (hygrometer)। সচরাচর ব্যবহৃত একটি হাইগ্রোমিটারে পাশাপাশি দু'টি থার্মোমিটার রাখা থাকে। এর একটির বাল্ব ভেজা সলতের মধ্যে জড়িয়ে সব সময় ভেজা রাখা হয়। সলতে থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে এই বাল্বটিকে ঠাণ্ডা করে ফেলে বলে অন্য থার্মোমিটারটির তুলনায় এই থার্মোমিটারে উত্তাপ খানিকটা কম হয়। এই পার্থক্য থেকে একটি চার্টের মাধ্যমে আপেক্ষিক আর্দ্রতা জানা যায়। বাতাস কম আর্দ্র হলে বাষ্পীভবন বেশি হবে বলে ভেজা ও শুষ্ক থার্মোমিটারে দেখানো উত্তাপে পার্থক্যও বেশি হবে।

বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের এবং সার্বিকভাবে আবহাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যও বাতাসের আর্দ্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হলে ঘাম সহজে শুকায় না, তখন আমাদের গা চটচটে হয় ও আমরা অস্বস্তি বোধ করি। আবার আর্দ্রতা খুব কমে গেলে ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে যায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো নয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের একটি কাজ হল বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়িয়ে-কমিয়ে আর্দ্রতাকে আরামপ্রদ অবস্থায় রাখা। অধিক আর্দ্রতা স্যাঁতসেঁতে অবস্থা সৃষ্টি করে, যা জিনিসপত্র ও কোনো কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের অনুকূল নয়।

মু. ই.

আর্সেনিকদূষণ (arsenic pollution)

আর্সেনিক এক প্রকার খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক এই পদার্থকে বাংলায় বলা হয় সেঁকাবিষ। আর্সেনিকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন As, এর আণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং আণবিক ওজন ৭৪.৯২। এটিকে দু'টি স্ফটিকের আকৃতিতে দেখা যায়। একটি ধূসর ধাতব এবং অন্যটি হলুদ অধাতব। ধূসর ধাতব (metallic) আর্সেনিক গলে না। অর্থাৎ তরলে রূপান্তরিত হয় না। এটি কঠিন থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম উদ্বায়ন (sublimation)। বাষ্পে পরিণত হয় ৬১৩° সেলসিয়াস (১১৫৩° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায়। ধূসর আর্সেনিকের আপেক্ষিক ঘনত্ব (specific density) ৫.৭। হলুদ অধাতব (non-metallic) আর্সেনিক ভঙ্গুর (non-stable) এবং এটি সহজে তরলে রূপান্তরিত

হয়। এর আপেক্ষিক ঘনত্ব ১.৯৭। প্রধানত ঘন লাল সালফাইড খনিজেই আর্সেনিক পাওয়া যায়। এই খনিজের নাম রিয়্যালগার (realgar) এবং অপর যে খনিজে এটি পাওয়া যায় তার নাম মিসপিকেল (mispichel)।

অধিকাংশ আর্সেনিক যৌগ বিষাক্ত। আর্সেনিকের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ হল প্যারিস গ্রিন ও লেড আর্সেনেট। কাচ, রঙ ও কীটনাশক তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ফসলের মাঠে দীর্ঘদিন ধরে ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ এবং ঘরে-বাইরে ইঁদুর বিনাশে আর্সেনিক যৌগ মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখনো হচ্ছে। কাচ, রঙ ও কীটনাশক উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র স্তূপাকারে জমানো হচ্ছে এবং রাসায়নিক বর্জ্য নদী ও সমুদ্রের পানিতে ফেলা হচ্ছে। ফলে মাটি ও পানিতে আর্সেনিকের দূষণ ঘটছে। পঙ্গপাল রোধে ও মশা নিবারণে আর্সেনিক বাষ্পাকারে ছিটানো হচ্ছে। এতে বায়ুও দূষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে দূষণের পরিমাণ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে অসংখ্য মানুষ আর্সেনিকজনিত রোগের শিকার হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী এক লিটার পানিতে ০.০১ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতে এক লিটার পানিতে রয়েছে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের শরীরে আর্সেনিক জমা হতে থাকলে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দেহ থেকে আর্সেনিক নিষ্কাশনে সহায়তা করে কিডনি বা বৃক্ক। আর্সেনিক পরিমাণে বেশি জমা পড়লে বৃক্ক তা নিঃসরণ করতে পারে না। আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের বুকে, পিঠে, মাড়িতে, হাতে, পায়ে কালো দাগ পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় মেলানোসিস। রোগের বাড়াবাড়ি হলে আক্রান্ত স্থলে আঁচিলের মতো উদ্ভেদের সৃষ্টি হয়। এই উদ্ভেদ থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে। অবিরাম আর্সেনিক দূষণের দরুন প্লীহা, যকৃৎ ও বৃক্ক আকারে বড় হয় এবং এতে ম্যালিগন্যান্ট বা জীবননাশী টিউমারের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছে। আরো ৫-৭ কোটি মানুষের জীবন আর্সেনিক দূষণের মুখোমুখি বলে জানা গেছে।

ত. চ.

আল-রাযি [১১৪৯-১২০৯]

আল-রাযির পুরো নাম ফাখর্ আল-দীন আবূ আব্দ আল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন্ উমার ইব্ন্ আল হুসায়ন। তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও দার্শনিক। তাঁর জন্ম ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে, ইরানের আল-রা'য নামক স্থানে।

আল-রাযি প্রথমে তাঁর জন্মস্থান আল-রা'য শহরে এবং পরে বাগদাদে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

তিনি ১৫০টিও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'এল হাওয়াই' নামক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থটি 'লিবার কন্টিনেন্স' (Liber Continens) নামে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আল-রাযির চিকিৎসা-বিষয়ক আরেকটি ছোট গ্রন্থের নাম 'মানসুরী' বা 'লিবার আলমান্সোরিস্' (Liber Almansoris)। এ বইটি তিনি মানসুর ইব্নে ইসহাক নামে জনৈক শাসককে উৎসর্গ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ভ্রমণকারীদের জন্য চিকিৎসা-উপদেশ, বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের প্রতিকারসহ অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আল-রাযি তাঁর চিকিৎসাগ্রন্থে গুটিবসন্ত এবং হাম রোগের লক্ষণসমূহের সঠিক বিবরণ এবং পার্থক্য লিপিবদ্ধ করেন, যা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত চিকিৎসাগ্রন্থটি অন স্মল পক্স অ্যান্ড মিজ্ল্স্ (On Small-pox and Measles) নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল।

আল-রাযি চিকিৎসা ছাড়াও জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যামিতি, ধর্মীয় দর্শন, খনিজবিদ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সি. না. হ.

কয়লা, কাঠ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি ■ **রাসায়নিক বিযোজন** ➡ নতুন উপাদান কোক, গ্যাস, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

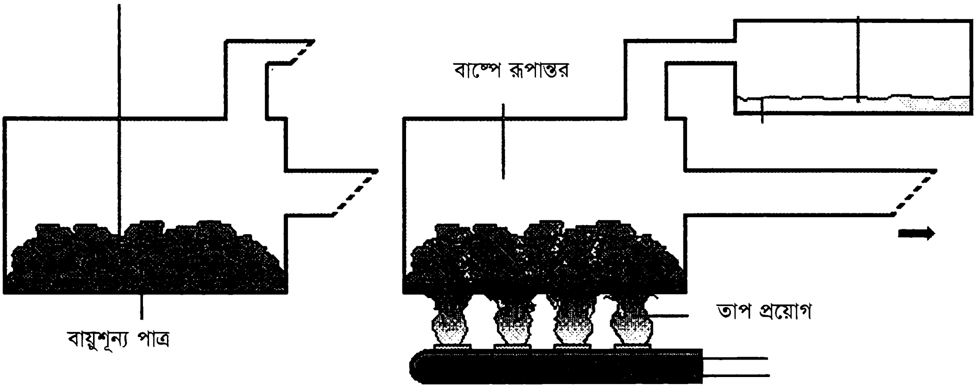

আলকাতরা তৈরির প্রক্রিয়া

আলকাতরা (coal-tar)

কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) করলে নানা প্রকার মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে আলকাতরা অন্যতম। এক কালে অবশ্য আলকাতরার কোনো ব্যবহার জানা ছিল না বলে তাকে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হত। তদুপরি এটি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় একমাত্র সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তরুণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরি পার্কিন (William Henry Perkin) আলকাতরার একটি পদার্থ থেকে কুইনাইন তৈরি করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন 'মভ' (mauve) নামের একটি কৃত্রিম রঞ্জক (dye)। সেই থেকে শুরু হল আরো নানা রকমের রঞ্জক বাদেও হরেক রকমের জিনিস উৎপাদন– সুগন্ধি সুমিষ্ট দ্রব্য তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল নানা রকমের প্লাস্টিক (দ্র), রজন, ঔষধপত্র (দ্র), জীবাণু (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) দ্রব্য এবং আরো কত কি যে আলকাতরা দিয়ে তৈরি হতে লাগল তার হিসাব নেই। দিনে দিনে যেমন তার দাম বাড়ল, তেমনি কদরও বাড়ল এবং তা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে পরিগণিত হল।

আলকাতরায় সূক্ষ্ম কণা ছাড়াও থাকে নানা রকমের জটিল পদার্থ। লোহার বড় ট্যাঙ্কে আলকাতরা ভরে বিভিন্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে উদ্বায়ী বাষ্পগুলিকে সংগ্রহ করে মোটামুটি বারো রকমের তেলে পৃথক করা হয়, যেমন–

উষ্ণতা ডিগ্রি সেলসিয়াস	প্রধান উপাদান
১. লাইট অয়েল ১৭০° সে.	বেনজিন
২. কার্বলিক অয়েল ২৩০° সে.	ফিনোল, ন্যাপথালিন
৩. ক্রিয়োজোট অয়েল ২৭০° সে.	ক্রেসোল
৪. অ্যানথ্রাসিন অয়েল ৩৬০° সে.	অ্যানথ্রাসিন

এদের প্রত্যেক অংশ নিয়ে পুনঃপুন আংশিক পাতন (fractional distillation) দ্বারা তা শোধিত করে বিভিন্ন পদার্থে পৃথক করা হয়। লাইট অয়েল নিয়ে তাকে আবার পাতিত করা হয়। প্রথমে ৭০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাষ্পগুলিকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়। ৭০° সে. এর অধিক উষ্ণতায় পাতিত পদার্থে প্রায় ৭০% বেনজিন থাকে। H_2SO_4 এবং NaOH দ্রবণ দ্বারা শোধিত ও পরিষ্কার করে আবার আংশিক পাতন করলে বেনজিন পাওয়া যায়। এই বেনজিন থেকে বহু মূল্যবান পদার্থ, যেমন– টলুইন, ন্যাপথালিন, কার্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন প্রভৃতি এবং আলকাতরার উপজাত দ্রব্যাদি থেকে প্লাস্টিক, ঔষধ, বীজাণুবারক, বিস্ফোরক, স্যাকারিন প্রভৃতি কত যে বিভিন্ন ও বিচিত্র দ্রব্য পাওয়া যায় তার হিসাব দেওয়া কঠিন।

আ. হ. খ.

www.boighar.com

আলকেমি (alchemy)

বহু কাল আগে মিশর দেশকে আরবি ভাষায় বলা হত 'অল্-কিমিয়া'। অল্-কিমিয়া থেকে 'আলকেমি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য 'আলকেমি' অর্থে

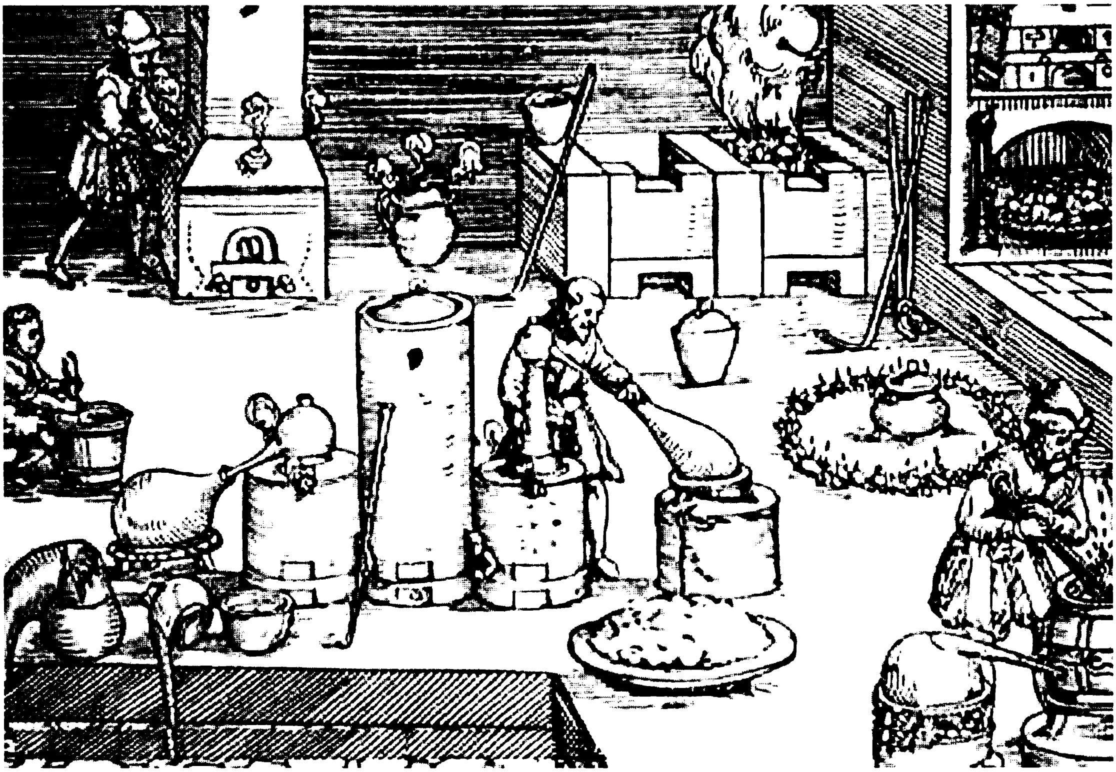

আলকেমির পরীক্ষাগার

বুঝানো হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের রসায়নচর্চা।

এ সময়ে মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রিস, চীন প্রভৃতি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ সভ্য ছিল। এসব দেশে তামা (দ্র), সিসা (দ্র), লোহা (দ্র) প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু সোনাকে তারা অন্য সব ধাতুর চেয়ে বেশি পছন্দ করত। কারণ সোনার উজ্জ্বল রঙ যেমন সুন্দর তেমনি অনেক দিনেও নষ্ট হত না। কিন্তু তা হলে হবে কি, সোনা তারা বেশি পেত না, আর তার পরিমাণ ছিল খুবই কম। এ জন্য রসায়নবিদেরা বেশি সোনা পাওয়ার লোভে সাধারণ ধাতুকে, যেমন– লোহা, সিসা, তামা প্রভৃতিকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্য দিকে লতাপাতা ও ধাতুভস্মের গুঁড়ো ব্যবহার করে অমৃতরস তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলেন– উদ্দেশ্য সেই অমৃতরস পান করে তাঁরা অমর হবেন, বেঁচে থাকবেন চিরকাল। আর সেই থেকে শুরু হল আলকেমি বা কিমিয়াবিদ্যার চর্চা। এই বিদ্যার চর্চাকারীদের বলা হত আলকেমিস্ট (alchemist)। আলকেমিস্টেরা তাঁদের কাজের ফল পাওয়ার জন্য গোপনে জাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতেন, সেই সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাতেন। তাঁরা একটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস মেশাতেন, পোড়াতেন, সেদ্ধ করতেন। কখনো গুপ্ত গাছ-গাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি করতেন এবং তা প্রয়োগও করতেন। কিন্তু তাঁদের কাজের বিজ্ঞানসম্মত কোনো পদ্ধতি ছিল না। তবে এসব পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক না কেন, তাঁরা এর গোপনীয়তা রক্ষা করতেন এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে তা লিখে রাখতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের আশা বা চেষ্টা কোনোটাই সফল হয় নি। লোহা বা তামাকে তাঁরা কখনো সোনায় পরিণত করতে সক্ষম হন নি, খুঁজে পান নি অমৃতরস। সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখার ফলও ভালো হয় নি। পরের যুগের মানুষেরা এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। তাই হাজার বছর ধরে তাঁরা কিমিয়াবিদ্যার চর্চা করে এলেও আসলে রসায়ন-বিদ্যার কোনো উন্নতিই হয় নি। তবে এই আলকেমিস্টদের দেখাদেখি এক দল মানুষ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কিমিয়াবিদ্যাকে মানুষের

কল্যাণে কাজে লাগাতে। এদের মধ্যে জাবির, ইবনে সিনা, রজার বেকন (Roger Bacon)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক দল বিজ্ঞানী কিমিয়াবিদ্যা থেকে জাদুবিদ্যাকে আলাদা করে রসায়নবিদ্যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গতিশীল করে তুলেছিলেন। ফলে গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা, যার নাম রসায়নশাস্ত্র (দ্র) বা কেমিস্ট্রি।

আ. হ. খ.

আলট্রাসাউন্ড (ultrasound)

সাধারণত শব্দতরঙ্গের হার প্রতি সেকেন্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ হলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু শব্দতরঙ্গের হার ২০,০০০ হার্টজ্-এর বেশি হলে আর শোনা যায় না। এ রকম উঁচু তরঙ্গ-হারের শব্দকে আলট্রাসাউন্ড বলা হয়। পিজো ইলেকট্রিক স্ফটিক (Piezo electric crystal)-এর মধ্য দিয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে আলট্রাসাউন্ড তৈরি হয়।

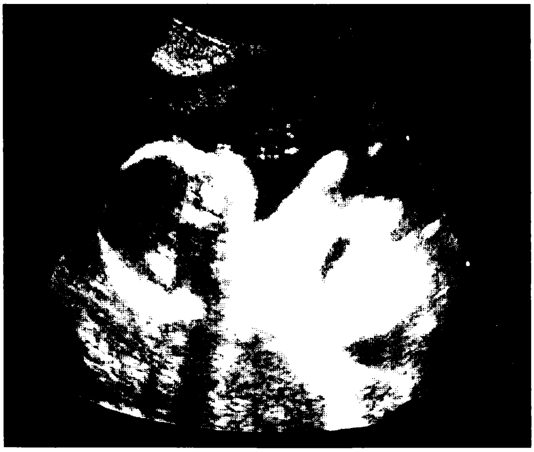

ফিল্মে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি প্রিন্ট

চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজকাল আলট্রাসাউন্ডের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যকৃৎ কিংবা পিত্তথলির রোগ নির্ণয় করতে, গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা জানতে, কিডনির পাথর শনাক্ত করতে, মূত্রাশয় কিংবা কিডনির পাথর ভাঙতে আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়। দুধের জীবাণু ধ্বংস করতে কিংবা সাগরের পানির গভীরতা মাপার জন্যও আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

আলফা কণিকা (alpha particle)

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) আলফা কণিকা আবিষ্কার করেন। তিনি তখন কাজ করতেন কানাডার মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছাড়াও তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারের প্রধান। ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য পদার্থের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কয়েক বছর কাজ করে তিনি দেখলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের যে বিকিরণ ঘটে তাতে কয়েক ধরনের রশ্মি থাকে। এর মধ্যে একটি হয় ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধানবিশিষ্ট রশ্মিকণার সমষ্টি। এই রশ্মির নাম দিলেন তিনি আলফা-রশ্মি আর আলফা-রশ্মির কণার নাম আলফা কণিকা। আলফা কণিকা হচ্ছে হিলিয়াম (দ্র)-এর নিউক্লিয়াস। এর চার্জ +২ এবং ভর +৪। এর আধান $৩.২x১০^{-১৯}$ কুলম্। আলফা-রশ্মি চৌম্বক ও তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়, তীব্র আয়নায়ন সৃষ্টি করে। ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং জিঙ্ক সালফাইড পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। আলফা কণিকার ভর হাইড্রোজেনের চার গুণ।

সু. ব.

আলফা সেন্টোরি (alpha centauri)

সৌরজগতের নিকটতম তারাপুঞ্জ (star system)। তিনটি তারার সমন্বয়ে এই তারাপুঞ্জ গঠিত। পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ (দ্র) দূরে তারা তিনটির অবস্থান। তিনটির মধ্যে দু'টি আবার যুগ্মতারা বা বাইনারি স্টার। পরস্পর থেকে ২৩.১ জ্যোতির্বিদ্যা-একক (জ্যোতির্বিদ্যা-একক হল পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব) দূরত্বে এগুলো পরস্পরকে ৭৯.৯ বছরে একবার

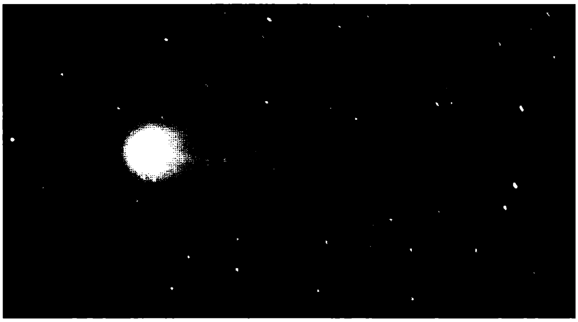

প্রদক্ষিণ করছে। এই দু'টির একটির ভর সূর্যের ভরের সমান ও অপরটির ভর সূর্যের ভরের ০.৯ গুণ। আলফা সেন্টোরির অপর তারাটি ১১ উজ্জ্বলতার একটি ছোট তারা। তিনটি তারাই বামন তারা। উজ্জ্বলতার বিচারে প্রধান ৫টি উজ্জ্বল তারকামণ্ডলীর অন্যতম আলফা সেন্টোরি।

মু. হা.

আলবেরুনী [৯৭৩-১০৪৮]

বিখ্যাত পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, পর্যটক, ঐতিহাসিক, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও বিশ্বকোষপ্রণেতা।

তাঁর পুরো নাম আবু রায়হান মুহম্মদ ইব্‌নে আহমদ আলবেরুনী। তবে সাধারণভাবে তিনি আলবেরুনী নামে পরিচিত। মধ্য-এশিয়ার খোরেজ্‌ম্ বা খারিজ্‌মের খিবায় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। আফগানিস্তানের গজনি বা সিজিস্তানে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনার (দ্র) সমসাময়িক ছিলেন।

আলবেরুনী দীর্ঘকাল এই উপমহাদেশে অবস্থান করেন। গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ দখল করার পর মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র খারিজ্‌মও জয় করেন। এ সময় সুলতান মাহমুদ খারিজ্‌মের জ্ঞানী-গুণী, গণ্যমান্য নাগরিকদের বন্দি করে তাঁর রাজ্য গজনিতে নিয়ে আসেন। এই বন্দিদের মধ্যে আলবেরুনীও ছিলেন। আলবেরুনীকে সুলতান মাহমুদ গজনির দরবারে রাজজ্যোতিষী নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে সুলতান তাঁকে রাজদায়িত্ব পালনের জন্য ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে থাকার সময়ে আলবেরুনী গভীর অভিনিবেশ ও আগ্রহের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি 'কিতাবুল হিন্দ্' অর্থাৎ ভারততত্ত্ব নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এর মূল আরবি নাম হল 'কিতাব ফি তাহকিক মালিল হিন্দ্ মাকুলাৎ মাকবুলাৎ ফি আল আকল উ মরযুলাৎ'। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়– বুদ্ধিবিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর গ্রহণযোগ্য নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তাপদ্ধতির সঠিক বর্ণনা। এর আনুমানিক রচনাকাল ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ। এটি দশম-একাদশ শতকের ভারতীয় জ্ঞান, সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানকোষবিশেষ। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অতুলনীয় উপাদানের জন্য এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি আজ পৃথিবীব্যাপী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব' নামে এই গ্রন্থটি মূল আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ (১৯৭৪) করেছেন। সাহিত্যিক সত্যেন সেন আলবেরুনীর ভারত আগমন এবং তাঁর জ্ঞানসাধনাকে ভিত্তি করে ১৯৬৯ সালে 'আলবেরুনী' নামক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।

আলবেরুনী হিন্দু-দর্শন বিশেষত 'ভগবদ্‌গীতা' দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হন। তিনি সংস্কৃত থেকে ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহিরের দু'খানা গ্রন্থসহ ছোটবড় ২২টি ভারতীয় পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরবি ভাষায় ভূগোল, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল– 'কিতাবুল আত্‌হার আল-বাকিয়া আনিল করূন' (প্রাচীন জাতিসমূহের ঘটনাপঞ্জি বা অতীতের পদচিহ্ন); 'আল্ কানুন্ আল্ মাস্‌উদী-ফীল-হাইয়া-ওয়াল-নূজুম (জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিশ্বকোষ); আল্-তাফ্‌হীম্ লি-আওয়াইল সিনা আত্ আল্-তান্‌জীম্' (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার)।

আলবেরুনী ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতির বিবরণও লিপিবদ্ধ করেন। কোণ (angle)-কে সমানভাবে বিভক্ত করার নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য যে সকল জ্যামিতিক সম্পাদ্য রুলার ও

কম্পাসের সাহায্যে সমাধানের নিয়ম ছিল না, তিনি সেসব সম্পাদ্য সমাধান করেন। সেগুলো পরবর্তী কালে 'আলবেরুনীর সম্পাদ্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

আলবেরুনী নিখুঁতভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন এবং জরিপের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের অনুসন্ধান চালিয়ে ১৮টি মূল্যবান প্রস্তর ও ধাতুর নির্ভুল আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন। শব্দের গতির তুলনায় আলোকের গতি যে অনেক গুণ বেশি তিনি তাও প্রমাণ করেছিলেন।

আলবেরুনীর সমালোচনাদক্ষতা, সহনশীলতা, সত্যানুরাগ এবং মানসিক সাহস অতুলনীয় ছিল মধ্যযুগে। তাঁকে সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গণ্য করা হয়।

সুজ. ব.

আলু (potato)

আলু বলতে সাধারণত গোল আলুকে বোঝানো হয়, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Solanum tuberosum* L। এর গোত্র Solanaceae। এর গাছের বৈশিষ্ট্য ভূনিম্নস্থ পরিবর্তিত কাণ্ড (স্টলন) যা ভোজ্য টিউবার (আলু) উৎপন্ন করে। আলুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্টলনের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আলুর মূল অস্থানিক, কাণ্ড নরম, ধীরে ধীরে শাখায়িত হয়। পাতা বিজোড় পক্ষল কর্তিত এবং শীর্ষের পত্রকাটি সবচেয়ে বড়, ফুল ছোট, সাদা এবং কিছুটা গোলাপি থেকে বেগুনি আভা থাকে। ফল গুটিকাকৃতি রেরি। এক একটি ফলে অসংখ্য পাতলা, চ্যাপটা ডিম্বাকৃতি বীজ থাকে। আলুর আকার, আকৃতি, বর্ণ, চক্ষুর গভীরতা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যার উপর নির্ভর করে জাত উদ্ভাবিত। বড়, মধ্যম এবং ছোট আকারের আলুর মধ্যে প্রথমোক্তটির মধ্যে ফাঁকা থাকে বলে এবং শেষোক্তটি বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আলুর ছাল মসৃণ বা শল্কযুক্ত হতে পারে। ছালের রঙ হালকা ঘিয়ে থেকে লাল, খয়েরি, বেগুনি হতে পারে। আলুর গায়ে ছোট বড় গর্ত আকৃতির থাকে যাতে কুঁড়ি থাকে। এগুলোকে চোখ বলা হয়। এক একটি চোখে বেশ কয়েকটি কুঁড়ি থাকতে পারে। আলুর ভিতরের শাঁসটা সাদাটে, হলুদ, মাখন রঙের বা লালচে হতে পারে, তবে মাখন রঙেরটাই অধিক জনপ্রিয়। শাঁসটা হতে পারে আঠাল বা বেলে ধরনের। বিশ্বের বহু দেশে আলু অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসাবে আবাদ করা হলেও আমাদের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে এর চাষ সম্প্রসারণে বড় বাধা এর সংরক্ষণ। আলু সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত হিমঘর বা কোল্ড স্টোরেজ নেই।

আলুতে ৬৫-৮০ ভাগ শ্বেতসার থাকে। সদ্য আহরিত পরিণত আলুতে খুব কম পরিমাণ চিনি থাকে এবং বড় আলুর চেয়ে ছোট আলুতে অধিক চিনি থাকে। এ চিনির মধ্যে রয়েছে ক্রোজ, গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ। আলু এনজাইম সমৃদ্ধ। কয়েক রকমের এনজাইম এতে পাওয়া যায়।

শা. আ.

আলেয়া *(*will-o-the-wisp*)*

রাতের আঁধারে নির্জন জলাভূমি কিংবা আবর্জনাপূর্ণ খোলা প্রান্তরে আলেয়া (*Ignus fatuus* বা will-o-the-wisp) দেখা যায়। এর অপর নাম ভুতুড়ে আলো বা ভৌতিক আলো। সাধারণত মাটি (দ্র) থেকে কয়েক হাত উঁচুতে অগুনের শিখা অগ্নিগোলকের মতো হয়ে এদিক-ওদিকে ঘুরতে থাকে। এমনকি বৃষ্টির পানিতেও এই আগুন নিবতে চায় না।

আলেয়া সৃষ্টির সঠিক কারণ বলা মুশকিল। মনে করা হয়, জলাভূমিতে পানির নিচে নানা জাতের গাছপালা পচনের ফলে মিথেন (দ্র) গ্যাস তৈরি হয়। জলাভূমিতে তৈরি হয় বলে একে মার্শ গ্যাস (marsh gas)-ও বলা হয়। এই গ্যাস জ্বলার ফলে আলেয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু মার্শ গ্যাসের আপনাআপনি জ্বলার ক্ষমতা নেই। সে জন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা, উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ পদার্থ পচনের ফলে সৃষ্ট ফসকিন PH_3 বা ফসফোরেটেড হাইড্রোজেন নামের আরেক রকম গ্যাস আলেয়া সৃষ্টির আসল কারণ। কেননা পরীক্ষাগারে অন্ধকারে ফসকিন গ্যাস তৈরি করলেও আলেয়ার নমুনা পাওয়া যায়।

আ. হ. খ.

আলো (light)

এক প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, যা মানুষ চোখে দেখতে পায়। এই বিকিরণ কোনো বস্তুর উপর পড়ার পর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের লেন্সে ফিরে এলে

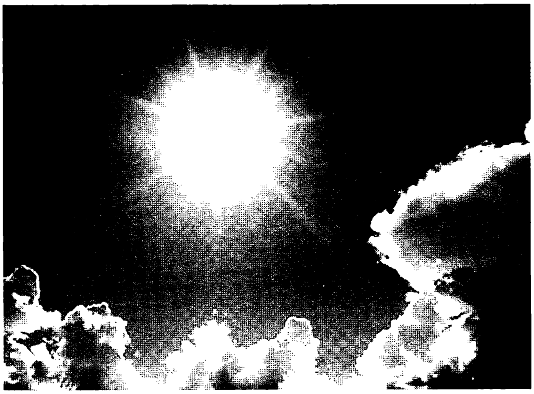

আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। প্রতিফলন ঘটে বস্তুর আকার ও আকৃতি অনুযায়ী। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য $৪x১০^{-৭}$ মিটার থেকে $৮x১০^{-৭}$ মিটার। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,৩২৬ মাইল বা $২.৯৯৭৮x১০^{-৮}$ মিটার। আলো এক প্রকার শক্তি। আলো ছাড়া ছবি তোলা যায় না এবং সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ তাদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। সূর্য থেকে যে আলো আমরা পাই তা সাতটি রঙের সমষ্টি– বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

সু. ব.

আলোক নিঃসারক ডায়োড
(light emitting diode)

আলোক নিঃসারক ডায়োড এর সংক্ষিপ্ত নাম LED নামেই বেশি পরিচিত। গ্যালিয়াম আর্সেনিক অর্ধপরিবাহী পদার্থের তৈরি একটি সম্মুখী ঝোঁক বিশিষ্ট p-n ডায়োড দিয়ে আলোক নিঃসারক ডায়োড (LED) তৈরি হয়। সাধারণ বা স্বাভাবিক ডায়োডের মতোই ইলেকট্রন তাড়িত হয় p অঞ্চলে এবং হোল তাড়িত হয়ে n অঞ্চলে প্রবেশ করে। ইলেকট্রন-হোল যুগলের পুনর্মিলন অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন করে যা আলো হিসাবে নিঃসৃত হয়। আলোর তীব্রতা অন্তর্গামী প্রবাহের সমানুপাতিক।

বিভিন্ন রঙের LED পাওয়া যায়। এটি হতে পারে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রঙের। LED

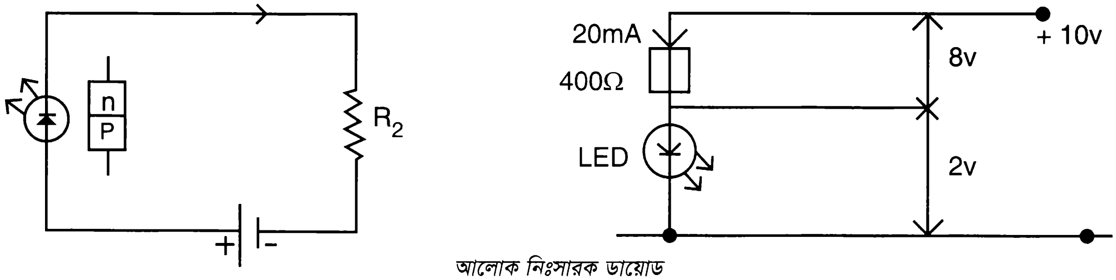

আলোক নিঃসারক ডায়োড

দিয়ে প্রবাহ সীমায়িত রাখা এবং একে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য একটি অনুক্রম রোধক (R) ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, লাল রঙের জন্য দরকার হবে 20mA প্রবাহ, 20mA-এ সম্মুখী ভোল্টেজ হয় 400Ω রোধক, 10v উৎস।

LED যখন উচ্চ ভোল্টেজে কাজ করে তখন একে অর্ধপরিবাহী লেজার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে p ও n অঞ্চল তৈরি হয় যথাক্রমে গ্যালিয়াস আর্সেনাইড ও গ্যালিয়াস অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইড দিয়ে। অর্ধপরিবাহীকে আলোকীয়ভাবে চ্যাপটা করে উদ্দীপিত নিঃসরণ উৎপাদন করা হয়, যাতে গ্যাস লেজারের মতো কিছু আলো প্রতিফলিত হয়ে বার বার ফিরে আসতে পারে।

LED ভোল্টেজ লেভেল নির্দেশ করতে পারে। এটি ফুটবল ম্যাচ বা কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদর্শনকারী ডিসপ্লে বোর্ডে ব্যবহৃত হয়। যথোপযুক্ত অর্ধপরিবাহী বস্তু থেকে ডায়োড তৈরি করা হলে ইলেকট্রন ও হোল p-n জংশনের এক দিক থেকে অপর দিকে গিয়ে যথাক্রমে হোল ও ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হয়। এই পুনর্মিলনের ফলে কিছু পরিমাণ শক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়, ফলে ডিসপ্লে বোর্ডে আমরা ফলাফল দেখতে পাই।

শা. ত.

আলোকবর্ষ (light-year)

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্বের একক। আলো এক বছরে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাই-ই আলোকবর্ষ নামে অভিহিত। এই দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় $৯.৪৬০ x ১০^{১৫}$ মিটার অথবা $৬ x ১০^{১২}$ মাইল। বহু কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির দূরত্ব প্রকাশের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই একক ব্যবহৃত হয়।

সু. ব.

আলোর প্রতিফলন (reflection of light)

আলো একটি তরঙ্গ (দ্র)। কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো নির্দিষ্ট বেগে, সোজা পথে চলে। কিন্তু আলো যখন মাধ্যম পরিবর্তন করে বা করতে চায়, তখন তিনটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়

ক. আলো দু' মাধ্যমের বিভাজন তল থেকে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে, এটি আলোর প্রতিফলন;

খ. কিছু আলো দ্বিতীয় মাধ্যমটি শোষণ করে; এবং

গ. আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ভিন্ন পথে চলতে থাকে।

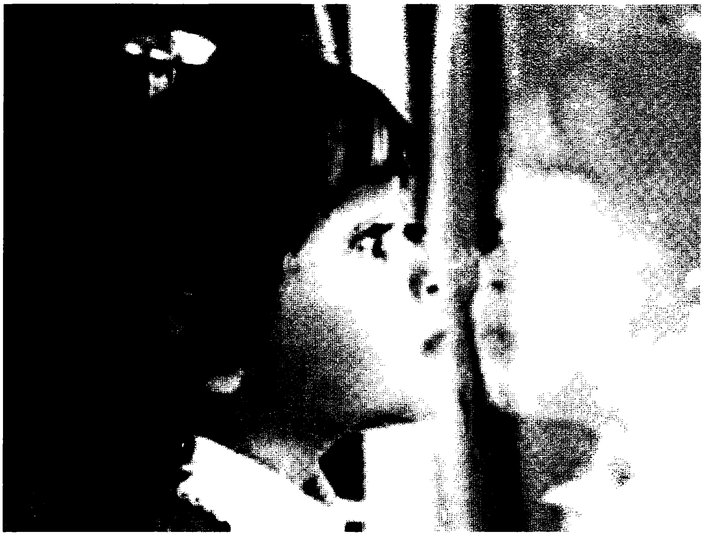

কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে আলোর প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসার ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলা হয়।

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সাধারণ ধর্ম হিসাবে আলোর প্রতিফলনও দু'টি নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয় মাধ্যমে যে বিন্দুতে আলো আপতিত হয় সে বিন্দুতে একটি কল্পিত লম্বকে বলা হয় অভিলম্ব। নিয়মানুযায়ী আপতিত আলো, প্রতিফলিত আলো ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রতিফলিত আলোও অভিলম্বের সঙ্গে সমান কোণ তৈরি করে।

প্রতিফলনের নিয়ম ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের দর্পণ বানানো হয়ে থাকে।

মু. হা.

একই সমতলে থাকে।

খ. দুটো নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মির প্রত্যেকে অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাদের জ্যামিতিক সাইন (sine)-এর অনুপাত (দ্র) সর্বদা ধ্রুব থাকে। এই ধ্রুব সংখ্যাটিই মাধ্যম দু'টির একটির সাপেক্ষে অপরটির প্রতিসরাঙ্ক।

প্রতিসরণের জন্য আলোর বেগই দায়ী। একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর বেগ অভিন্ন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগ ভিন্ন। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের ভিন্নতাই প্রতিসরণের জন্য দায়ী। প্রতিসরণের কারণে সূর্যোদয়ের কিছু আগে সূর্যকে (দ্র) দেখা যায়।

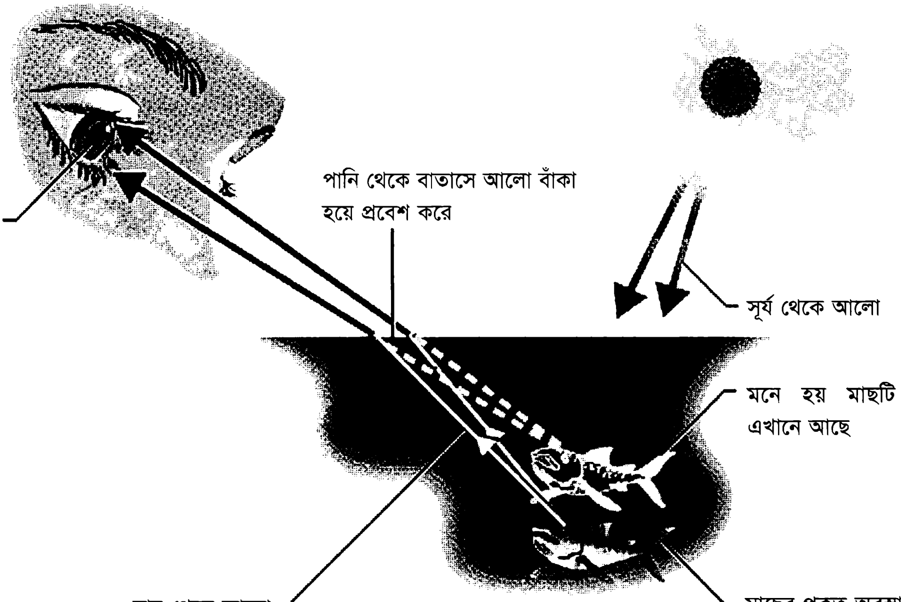

আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিসরণ (refraction of light)

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাবার সময় দু' মাধ্যমের সংযোগস্থলে গতিপথ পরিবর্তন করে। এই ব্যাপারটিকে আলোর প্রতিসরণ বলে। প্রতিসরণের জন্য পানিতে আংশিক ডোবানো কোনো সোজা দণ্ডকে বাঁকা দেখায়।

আলোর প্রতিসরণ দু'টি নিয়ম মেনে চলে

ক. আপতিত আলো, প্রতিসৃত আলো ও অভিলম্ব

বহুদূরের নক্ষত্র (দ্র) থেকে আসা আলো বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুমাধ্যমের মধ্য দিয়ে আসার সময় অনবরত দিক পরিবর্তন করে। ফলে দর্শকের কাছে কখনো বেশি আলো ও কখনো কম আলো এসে পৌঁছায়। এ কারণে নক্ষত্রের আলো ঝিকমিক করে। গ্রহগুলো পৃথিবীর (দ্র) অপেক্ষাকৃত কাছে বলে এদের আলোর (আসলে সূর্যের আলো গ্রহের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে) বাড়া-কমা বোঝা যায় না। তাই গ্রহের আলো স্থির।

মু. হা.

ই

ই-মেইল (e-mail)

ই-মেইল হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে কম খরচে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম। ইলেকট্রনিক মেইলকে সংক্ষেপে বলা হয় ই-মেইল। ই-মেইল ব্যবস্থা আসলে ডাটা কমিউনিকেশন ও ওয়ার্ড প্রসেসিং এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিস্টেম। ই-মেইল হল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ। এটি করা হয় যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার নাম ইন্টারনেট। ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করে দেশে বা বিদেশে যে কোনো ঠিকানায় ই-মেইল পাঠানো যায়। কেউ যদি কাউকে কোনো চিঠি বা খবর পাঠাতে চায় তাহলে তা কম্পিউটারে টাইপ (ওয়ার্ড প্রসেসিং) করে তার নিজের কম্পিউটার থেকে প্রাপকের কম্পিউটারে পাঠাতে পারে। প্রাপক কম্পিউটারের পর্দা থেকে চিঠি বা খবরটি পড়ে নিতে পারে অথবা প্রিন্টারের সাহায্যে কাগজে প্রিন্ট করে নিতে পারে। তবে এই খবর বা চিঠি আদান-প্রদানের জন্য অবশ্যই প্রেরকের ও প্রাপকের কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ বা নেটওয়ার্ক থাকতে হবে। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিভিন্নভাবে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের বিষয়টি লিখিত লিপি হলে ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে দ্রুত গতিতে লিপি তৈরি করা সম্ভব। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রাপকের হাতে লিপি পৌঁছানোর জন্য সময় ও খরচ বেশি লাগে। অর্থ ও সময় বাঁচানোর জন্য ইলেকট্রনিক মেইল প্রসেসর দিয়ে তৈরি লিপি দ্রুত প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। এ জন্য তৈরির পর লিপিটিকে প্রাপকের কম্পিউটার টার্মিনালে পাঠাতে হয়। এ সময় টার্মিনালে প্রাপক অনুপস্থিত থাকলে লিপি প্রাপকের চৌম্বক ডিস্কে জমা হয়। www.boighar.com

এক বা একাধিক টার্মিনালে ইলেকট্রনিক মেইল প্রেরণ করা যায়। নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত টার্মিনালসমূহে সংবাদ পাঠানোর জন্য টার্মিনালের শনাক্তকারী নম্বর ব্যবহার করতে হয়। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্কিং করা হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। পৃথিবীর প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণ করে থাকে। অন্যান্য ইলেকট্রনিক মেইলের আওতায় আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

শা. ত.

ইসিজি / হৃদ্‌লেখচিত্র (ecg)

হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালনের জন্য বিশেষভাবে গঠিত পাম্পবিশেষ। পাম্প চালানোর জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি দরকার। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রসারণও বিদ্যুৎশক্তি-নির্ভর। প্রতিবার হৃদ্‌স্পন্দনের ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটে তা শরীরের বাইরের যন্ত্রপাতির সাহায্যে রেখায়িত (রেখাবদ্ধ) করা যায়। সে জন্য বিশেষ ধরনের ছক-কাটা কাগজ বা গ্রাফ পেপার ব্যবহার করা হয়। ছক-কাটা কাগজের রেখাচিত্রকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (electrocardiogram) বা সংক্ষেপে ইসিজি। রেকর্ড করার যন্ত্রকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ (electrocardiograph) এবং এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি।

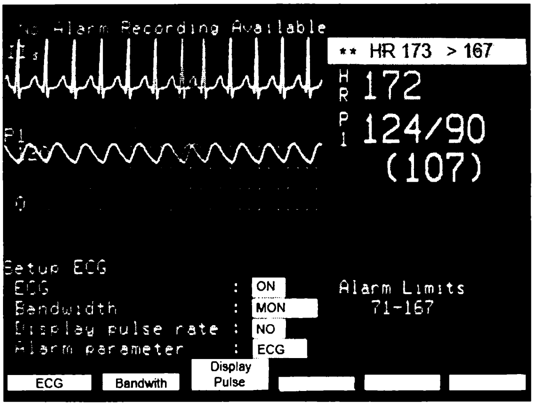

হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহের সম্পর্ক প্রথম প্রমাণ করেন কলিকার (Kolliker) এবং মুলার (Muller) ১৮৫৬ সালে। আর হৃদ্‌স্পন্দনের ফলে সংঘটিত বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের প্রথম নিখুঁত লেখচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয় ১৯০১ সালে। উইলিয়াম আইনথোভেন (W. Einthoven) একটি বিশেষ গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে এই লেখচিত্র গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে সেটাই ইসিজি যন্ত্রে পরিণত

হয়েছে। আজকাল নানা রকম স্বয়ংক্রিয় ইসিজি যন্ত্রও পাওয়া যায়।

মৌলিক শারীরবৃত্তীয় এবং পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ভিত্তিতে মানব হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের রেকর্ড বিশ্লেষণ করে রোগনির্ণয় করা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায়, তাকে ক্লিনিক্যাল ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ বলা হয়।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পরিবহণের গোলযোগ, হৃৎপ্রকোষ্ঠের অতিবৃদ্ধি, হৃৎপেশিতে রক্ত সরবরাহের ঘাটতিজনিত সমস্যা, হৃৎপেশির ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এ ছাড়া হৃদ্‌স্পন্দনের কোনো প্রকার ছন্দপতনও সহজেই এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। হৃদ্‌রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসায় ইসিজির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সা. এ.

ইউএফও (ufo)

মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকাশে দেখা যায় বিস্ময়কর আগন্তুক আলো বা বস্তু। এগুলো কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে, কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করে আবার দ্রুত উড়ে যায়। দেখতে কোনোটি লম্বা চুরুটের মতো, কোনোটি চ্যাপটা থলের মতো। এগুলো কী, কোথা থেকে আসে আজ পর্যন্ত তা শনাক্ত করা যায় নি। তাই এদের বলা হয় Unidentified Flying Object, সংক্ষেপে UFO বা অজানা উড়ন্ত বস্তু।

বহু যুগ থেকেই মানুষ আকাশে এ ধরনের বস্তু দেখেছে। ৩,৪০০ বছর আগে মিশরের ফারাও ও তাঁর সৈন্যসামন্ত এরূপ বস্তু দেখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউএফও দেখার ঘটনা খুব বেড়ে যায়। অনেক সামরিক-বেসামরিক পাইলট ইউএফও দেখতে পান। তাঁরা এর নাম দেন foo-fighter। কেউ বলেন ফ্লাইং সসার (flying saucer) বা উড়ন্ত পিরিচ। পত্র-পত্রিকায় এর ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়।

এই ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ১৯৪৭

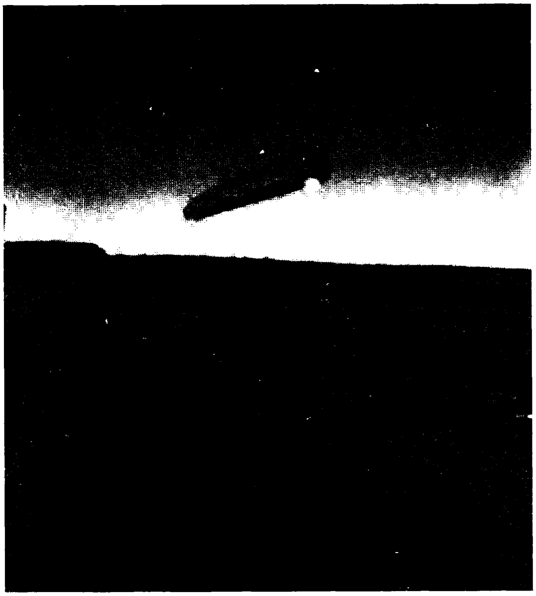

সালে প্রজেক্ট ব্লু-বুক নামে ইউএফও অনুসন্ধানের কর্মসূচি নেয়। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ১২ হাজারেরও অধিক ইউএফও দর্শনের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বস্তুগুলি শনাক্তকরণে ব্যর্থ হলে ১৯৬১ সালে প্রজেক্টটি বন্ধ হয়ে যায়। বলা হয়, ইউএফও জাতীয় নিরাপত্তায় কোনো হুমকি নয়। কলেরোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী গবেষণা (১৯৬৬-১৯৬৮) চালিয়ে ইউএফও শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। ১৯৭৩ সালে আরেক দল বিজ্ঞানী ইউএফও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স. রা.

ইউক্লিড [আনু. ৩০০ খ্রি.পূ.]

একজন গ্রিক গণিতবিদ। তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল জ্যামিতি। জ্যামিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইউক্লিড (Euclid) অধিক সুপরিচিত। জ্যামিতির উপর তাঁর রচিত 'জ্যামিতির উপাদানসমূহ' আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক। বলা হয়ে থাকে, খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ ছিল এই বই। এটি এত বেশি সাড়া জাগিয়েছিল যে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রচলিত অন্য বইগুলোর কথা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। দু' হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুলের শিশুরা এই বইকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করে। এমনকি বর্তমানে জ্যামিতি

বিষয়ে যেসব বই চালু আছে, সেগুলোও ইউক্লিডের জ্যামিতি-শিক্ষণপদ্ধতিতে রচিত। ইউক্লিড অন্যান্য বইও লিখেছিলেন, তবে সেগুলোর সন্ধান মেলে নি।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এই প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদের জীবন সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি নি। এমনকি তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, কোন শহর বা মহাদেশে তিনি জন্মেছিলেন তাও জানা যায় নি। জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন। মহামতি আলেকজান্ডার মিশর দখল করে নেওয়ার পর আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি শহর তৈরি করেন। সুবিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ায় চমৎকার সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। শহরটি তখন পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে ওঠে। বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানপাগল গণিতবিদ ইউক্লিড তখন অধ্যয়নের জন গ্রিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন ও পরবর্তী কালে সেখানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। যদিও ইউক্লিডের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি, তথাপি জ্যামিতি তথা গণিতে অবদানের জন্য তাঁর নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

হো. আ.

ইউগ্লেনা (euglena)

ইউগ্লেনা এক বা একাধিক ফ্লাজেলাবিশিষ্ট এককোষী প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত জীব। ফ্লাজেলা (flagella) দেখতে চুলের মতো। ফ্লাজেলা দেহের সামনের দিকে অবস্থিত। ইউগ্লেনার দেহ লম্বাটে ধরনের। এর দেহের দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। অনেকটা চটি জুতোর সুখতলার মতো দেখতে। তাই বিজ্ঞানীরা একে 'স্লিপার এনিমলকিউল' নাম দিয়েছেন। ইউগ্লেনার দেহের ভিতরে সবুজ রঙের এক রকম কণা থাকে। এই কণা গাছের সবুজ পাতা বা কাণ্ডের ক্লোরোফিল (দ্র) বা পত্রহরিতের মতো। সবুজ কণার সাহায্যে গাছ যেমন পাতায় বা কাণ্ডে খাদ্য তৈরি করতে পারে, তেমনি ইউগ্লেনাও দিনের আলোয় দেহের সবুজ কণা দিয়ে খাদ্য তৈরি করে। এ কারণে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ইউগ্লেনাকে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ বলে দাবি করে থাকেন। আবার এরা প্রাণীর মতো দেহকোষ দিয়ে

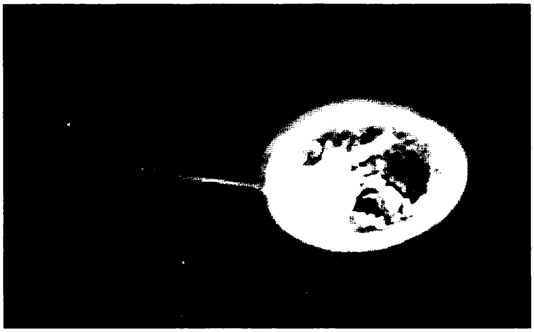

তৈরি খাদ্যও গ্রহণ করতে পারে। বিপাক-ক্রিয়াসহ অন্যান্য ক্রিয়া উচ্চতর প্রাণীতে যেমনটি হয়ে থাকে, ইউগ্লেনাতেও অনুরূপভাবে তা সম্পন্ন হয়। ফলে, প্রাণিবিজ্ঞানীদের জোর দাবি এই যে ইউগ্লেনা উদ্ভিদ নয়, প্রাণী। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, ইউগ্লেনা না উদ্ভিদ না প্রাণী, এটি উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। ইউগ্লেনা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। অর্থাৎ কোষের নিউক্লিয়াস দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটো ইউগ্লেনায় পরিণত হয়।

ত. চ.

ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতি
(Unani system of medicine)

ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত প্রাচ্যদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইউনানি অন্যতম। একে হাকিমি চিকিৎসা বলা হয়। প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির জনক হিপোক্রেটিস (দ্র) গ্রিস দেশে জন্মেছিলেন বলে

প্রাচীন গ্রিসের আরবীয় নাম 'ইউনান' অনুসরণে ইউনানি চিকিৎসার নামকরণ।

ইউনানি শাস্ত্রে হিপোক্রেটিস ও রোমদেশীয় চিকিৎসক গালেন (দ্র)-এর চিকিৎসাতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। তবে এ চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও চীনদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মূলনীতিও বহুলাংশে অনুসৃত।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মতো ইউনানি পদ্ধতিও বায়ু, পিত্ত ও কফ– এই তিনটি উপাদানের অস্বাভাবিকতার ফলে শরীরে রোগ সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের দু'টি প্রধান অংশ রয়েছে প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব; দ্বিতীয় অংশে রয়েছে রোগ, রোগের কারণ, রোগের লক্ষণগুলোর চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি এবং চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশ। ইউনানি চিকিৎসায় শরীরে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পথে ওষুধ প্রয়োগের বিধান রয়েছে।

ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির সূচনালগ্নে এ পদ্ধতি শুধু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই এ চিকিৎসার সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ চিকিৎসাপদ্ধতি সর্বত্র এবং সব শ্রেণির মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ঔষধনীতির মাধ্যমে ইউনানি, আয়ুর্বেদী চিকিৎসাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা চলছে।

সি. না. হ.

ইউরিয়া (urea)

কার্বনিক অ্যাসিডের ডাই অ্যামাইড। এটা সাদা, স্ফটিকাকৃতির, পানিতে দ্রবণীয় যৌগ। গলনাঙ্ক ১৩২.৭° সে.; রাসায়নিক ফর্মুলা $H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2$। প্রাণী এবং মানবদেহে প্রোটিন বিপাকের ফলে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণত দুই অণু অ্যামোনিয়া (দ্র) এবং এক অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) বিক্রিয়ার ফলে এক অণু ইউরিয়া তৈরি হয়। এই জটিল বিক্রিয়াটি ঘটাতে কমপক্ষে সাতটি এনজাইম (দ্র) দরকার হয়।

প্লাস্টিক তৈরি করতে এবং অনেক বিস্ফোরক দ্রব্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। আগে রেচকরূপেও ইউরিয়া ব্যবহার করা হত। এতে প্রচুর নাইট্রোজেন (দ্র) থাকায় সার হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশে ঢাকার অদূরে আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানায় এবং সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়।

কিডনির অনেক রোগের কারণ রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যাওয়া। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৫-৪০ মিলিগ্রাম ইউরিয়া থাকে।

সা. এ.

ইউরেনাস (Uranus)

সূর্যের (দ্র) একটি গ্রহ। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত আকাশের দেবতা 'ইউরেনাস'-এর নামানুসারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন ইউরেনাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল (Sir William Herschel ১৭৩৭-

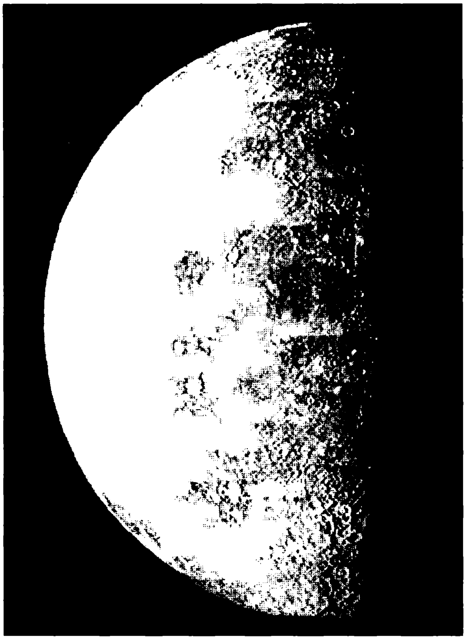

সৌরজগতের গ্রহ ইউরেনাস

১৮২২) ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহদের মধ্যে ইউরেনাসের স্থান সপ্তম। সূর্য থেকে ইউরেনাসের গড়

দূরত্ব প্রায় ২৮৫ কোটি কিমি (১৭৮ কোটি মাইল)। এই দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর (দ্র) গড় দূরত্বের প্রায় ১৯ গুণ বেশি। ইউরেনাসের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের এক চতুর্থাংশ এবং এর ভর (দ্র) পৃথিবীর ভরের ১৪.৭ গুণ বেশি।

ইউরেনাসের আকৃতি অন্য গ্রহগুলোর মতোই গোল। এর ব্যাস ৪৮ হাজার কিমি বা ৩০ হাজার মাইলের কিছু কম। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর ৮৪ বছরের কিছু বেশি সময় লাগে। ইউরেনাস নিজের অক্ষরেখার চারপাশ ১০ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময়ে এক বার আবর্তন করে।

বৃহস্পতি (দ্র) ও শনিগ্রহের (দ্র) মতোই ইউরেনাসের ভিতরের প্রধান অংশ পাথরে এবং বাইরের অংশ বা পৃষ্ঠদেশ পুরু বরফে রচিত। ইউরেনাসে বায়ুমণ্ডল আছে, আর সে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন (দ্র) ও মিথেন (দ্র) গ্যাস বিদ্যমান।

ইউরেনাসের উপগ্রহ ১৫টি। এগুলোর মধ্যে ২টি উপগ্রহ উইলিয়াম হার্শেল নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় ইউরেনাস সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ পায়। তা হল শনির মতো ইউরেনাসের চারপাশেও একাধিক 'বলয়' (ring) আছে।

সুজ. ব.

ইউরেমিয়া (uraemia)

বিপাক ক্রিয়ার ফলে মানুষের শরীরে ইউরিয়া নামে নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ তৈরি হয়। রক্তে স্বাভাবিক ইউরিয়ার পরিমাণ প্রতি লিটারে ২.৫ থেকে ৬.৬ মিলি মোল। কিডনির সাহায্যে শরীর থেকে ইউরিয়া মূত্রের সাথে নিষ্কাশিত হয়। কোনো কারণে কিডনি তার কাজ ঠিকমতো করতে না পারলে রক্তে ইউরিয়া থাকে। একে বলা হয় 'ইউরেমিয়া'। ইউরেমিয়া হলে রোগীর বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন দুর্বলতা, অরুচি, বমি ভাব, মাথাব্যথা। এ ছাড়া কারো কারো দৃষ্টির অসুবিধা, চুলকানি, শরীরের নানা স্থানে দাগ পড়া, এসবও হয়। এ ছাড়াও স্নায়বিক বৈকল্য, উচ্চ রক্তচাপ, মাংসপেশির দুর্বলতা দেখা দেয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ইউরেমিয়া নিজে কোনো রোগ নয়। বরং বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট রোগের লক্ষণ। তাই ইউরেমিয়ার সঠিক চিকিৎসা এর কারণের চিকিৎসা বা কারণ দূর করা। সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

আ. নূ. তু.

ইঁদুর (rat)

ইঁদুর অতি পরিচিত ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র)। এদের ছোটগুলোকে নেংটি ইঁদুর (mouse) ও বড়গুলোকে ধেড়ে ইঁদুর (rat) বলে। নেংটি ইঁদুরের ও ধেড়ে ইঁদুরের বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে *mus musclulus* ও *rathesrattus*। ঘরে-বাইরে, মাঠে-বাগানে, বনে-জঙ্গলে সবখানেই এদের দেখা মেলে। পৃথিবীতে প্রায় ১২০ প্রজাতির ধেড়ে ও ১০০ প্রজাতির নেংটি ইঁদুর রয়েছে। বৃহত্তম প্রজাতির নেংটি ইঁদুর ক্ষুদ্রতম প্রজাতির ধেড়ের থেকেও ছোট। ক্ষেতে সাদা ইঁদুর ফসলের বহু

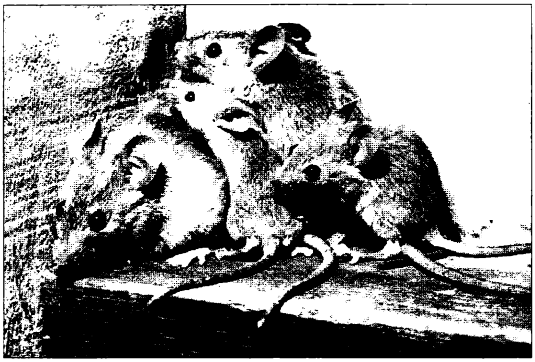

ক্ষতি করে। এর রঙ সাদা ও ধূসরে মেশানো। লেজে চুলের গোছার মতো লোম গজায়। সাদা ইঁদুরের বৈজ্ঞানিক নাম *Rattus Noruegious.*।

ইঁদুরের নাক চোখা। চিকন লেজটি লম্বা। গায়ের লোম নরম। সামনের দাঁতগুলো অত্যন্ত ধারালো, সারা জীবন ধরে বাড়ে; ইঁদুর যদি সর্বক্ষণ দাঁত দিয়ে কেটেকুটে তছনছ না করত, তো তার দাঁত বেড়ে অনেক লম্বা হত। প্রজাতিভেদে ইঁদুরের আকার, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। কালো ধেড়েগুলো বৃহত্তম। ওজন প্রায় ২৪০ গ্রাম। শরীর ১৮-২০ সেন্টিমিটার। লেজ শরীর থেকেও লম্বা। ঘরের

নেংটিগুলো মাত্র ১৪-১৮ গ্রাম। শরীর ৬.৫-৯ সেন্টিমিটার, লেজও প্রায় সমান লম্বা।

এরা যা পায় তা-ই খায়, এমনকি সাবান, টুথপেস্ট, আঠাও খেতে পারে। এরা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও উষ্ণ জায়গায় বাসা বানায়। সারা বছরই এদের বাচ্চা হয়। ১৮-২১ দিন গর্ভধারণের পর স্ত্রী-ইঁদুর তিন থেকে সাতটি অন্ধ লোমহীন গোলাপি বর্ণের বাচ্চার জন্ম দেয়। দশ দিনে এদের লোম গজায়, চৌদ্দ দিনে চোখ ফোটে। এটি দেড়-দুই মাসে প্রজননক্ষম হয়। এক থেকে তিন বছর বাঁচে।

ইঁদুর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। খাদ্যদ্রব্য, ফসল, জিনিসপত্র নষ্ট করা ছাড়াও এরা বিভিন্ন রোগের জীবাণু, বিশেষ করে মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি প্লেগের জীবাণু ছড়ায়।

আ. ন. ম. আ. র.

ইগলু (igloo)

পূর্ব দিকে গ্রিনল্যান্ড থেকে শুরু করে পশ্চিমে বেরিং সাগর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগে এবং বেরিং প্রণালীর কাছাকাছি সাইবেরিয়া অঞ্চলে ও আমেরিকার আলাস্কায় এস্কিমো নামে এক বিশেষ জাতি বাস করে।

এস্কিমোরা চিরতুষারের দেশে বাস করে এবং সেখানে শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়– প্রায় নয় মাস। তাই তাদের চারিদিকে দিনের পর দিন জমে থাকে বরফ। এত হাড়কাঁপানো শীতেও এস্কিমোদের বাস করতে তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা যেমন বাঁশ, কাঠ, খড়, ইট, সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করি, এস্কিমোরাও তেমনি বরফ দিয়ে ঘর তৈরি করে। তাদের এই বাড়ির নামই ইগলু। ইগলু তৈরি করতে এস্কিমোরা খুবই পটু।

লম্বা ছুরি দিয়ে বরফকে সুবিধামতো আকারে কেটে নিতে হয়। সাধারণত ১ মি. লম্বা, ১/২ মি. প্রস্থ ও ১/৬ মি. পুরু আকারের বরফ প্রয়োজন হয় ইগলু তৈরি করতে। ইগলু দেখতে মসজিদের গম্বুজের মতো দেখায়। এর পরিধি প্রায় ৩ মি. হয়ে থাকে। ইগলু ভিতর থেকেই তৈরি করতে হয়। তৈরির সময় এর দরজা বা জানালা থাকে না। তবে ইগলু তৈরি শেষ হয়ে গেলে যে লোকটি ইগলু তৈরি করছিল সে ঘরের নিচের দিক দিয়ে একটা দরজা কেটে হামাগুড়ি

দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরে এই দরজা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর ভেতরটা অন্ধকার, ধোঁয়ায় ভরা ও নোংরা। সীল মাছের তেল দিয়ে কুপি জ্বালিয়ে এস্কিমোরা ইগলু গরম রাখে। আমাদের কাছে ইগলু তেমন আরামদায়ক হবে না।

চৌকি হিসাবে এস্কিমোরা প্রায় ১/২ মি. উঁচু বরফখণ্ড ব্যবহার করে। সেই বরফের উপর তারা পুরু করে শেওলা ও পশুর চামড়া বিছায়। শোওয়ার সময় চামড়ার পোশাক পরে নেয় এবং একেবারে কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে শুয়ে থাকে। শীতকাল শেষ হয়ে গেলে গ্রীষ্মের উত্তাপে বরফ গলতে আরম্ভ করে এবং ইগলু গলে যায়। তখন এস্কিমোরা তাঁবুতে আশ্রয় নেয়।

মু. এ.

ইগুয়ানা (iguana)

ইগুয়ানা এক ধরনের সরীসৃপ। দেখতে অনেকটা বড়সড় টিকটিকি বা গুইসাপের মতো। ইগুয়ানার দেহ বিশাল এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ক্রমশ মোটা থেকে সরু।

ইগুয়ানা দল বেঁধে বসবাস করতে পছন্দ করে

মাথার অংশ বেশ মোটা ও স্থূল। গলার অংশে একটি থলের মতো ঝোলানো অঙ্গ থাকে। অনেক সময় এই থলেকে ফুলিয়ে ইগুয়ানা শত্রুকে ভয় দেখায়। ইগুয়ানার পিঠে সারবাঁধা কাঁটা রয়েছে। প্রথম দিকের কাঁটাগুলো আকারে লম্বা, কিন্তু তা ক্রমশ ছোট হয়ে লেজের ওপর পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, একই সাথে গলার থলে ফুলিয়ে এটি এমন এক রূপ ধারণ করে যা দেখে শত্রু ভয় পায়। ইগুয়ানার চারটি পা, সামনের পাগুলো ছোট এবং প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে। পেছনের পায়ের আঙুল লম্বা। পাথুরে এলাকায় চলাচলের জন্য এ ধরনের আঙুল খুব কাজে আসে। প্রতিটি প্রজনন ঋতুতে ইগুয়ানা এক বা একাধিক ডিম পাড়ে। ওরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

ইগুয়ানা দল বেঁধে বসবাস করতে পছন্দ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, বিশেষত গ্যালাপাগোস দ্বীপে এদের মূল আস্তানা। এরা জলজ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করে।

ত. চ.

ইঞ্জিন, অন্তর্দহন
(internal combustion engine)

যে ইঞ্জিনের ভেতরে কোনো জ্বালানি ব্যবহার করে জ্বালানি থেকে উৎপন্ন গ্যাসের চাপকে যান্ত্রিক কৌশলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এ ধরনের ইঞ্জিনে সাধারণত পেট্রোল, ডিজেল, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্তদর্হন ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন নিকোলাউস ওটো (Nikolaus August Otto ১৮৩২-১৮৯১) নামে একজন জার্মান যন্ত্রবিজ্ঞানী।

সু. ব.

ইঞ্জিন, বাষ্পীয় (steam engine)

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। আবদ্ধ সুদৃঢ় আধারে জলীয় বাষ্প তৈরি করে সেই জলীয় বাষ্পের অত্যধিক চাপ ব্যবহারের সাহায্যে এ ইঞ্জিন চালানো হয়। আধারটির নাম বয়লার। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে আরো কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থা যোগ করে এতে গতি সঞ্চারিত করা হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ যন্ত্রবিজ্ঞানী জেমস ওয়াট্ (দ্র), ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে। পরে জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson ১৭৮১-

প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

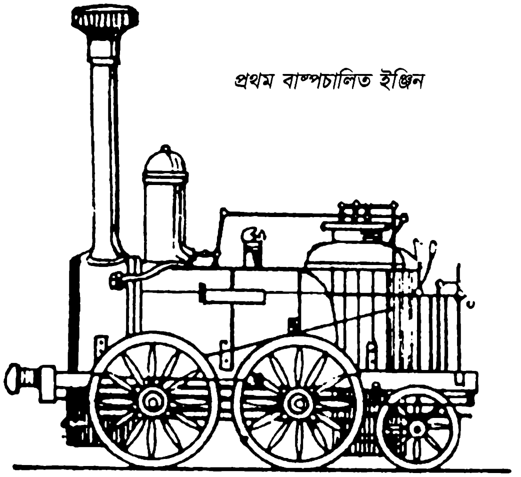

১৮৪৮) নামে আরেক জন ইংরেজ যন্ত্রবিজ্ঞানী বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে চলমান ইঞ্জিনের রূপ দিতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের বদলে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালিত রেল-ওয়াগন চালু করেন।

সু. ব.

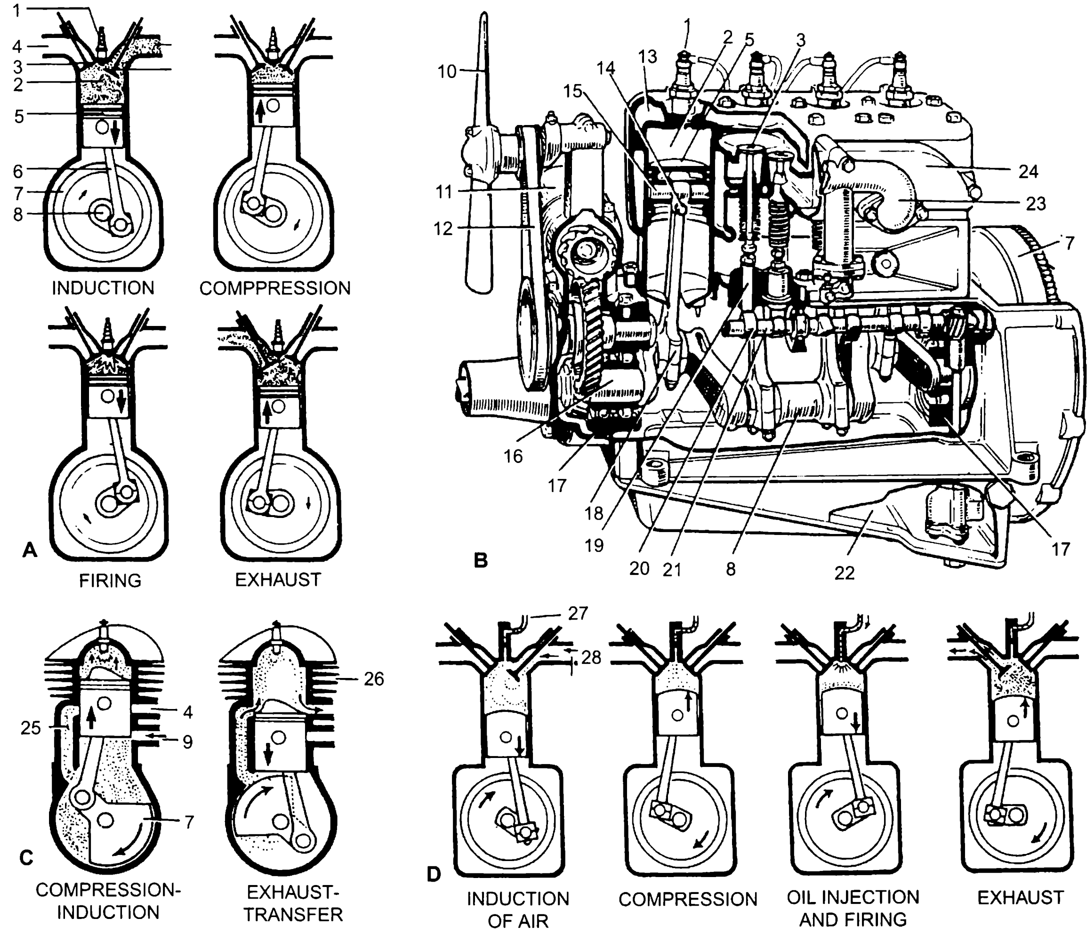

INTERNAL COMBUSTION ENGINES

A. STROKES OF FOUR-STROKE ENGINE, B. FOUR-CYLINDER FOUR-STROKE ENGINE, C. TWO-STROKE ENGINE, D. DIESEL ENGINE

A. 1. Sparking plug, 2. Cylinder, 3. Poppet-valve, 4. Exhaust port, 5. Piston, 6. Connecting rod, 7 Fly-wheel, 8. Crank-shaft, 9. Inlet port, B. 10. Fan, 11. Dynamo, 12. Fan belt, 13. Water jacket, 14. Little end of connecting rod, 15. Gudgeon pin, 16. Journal, 17 Main bearings, 18. Big end of connecting rod, 19. Tappet, 20. Cam, 21 Camshaft, 22. Sump, 23. Inlet manifold, 24. Exhaust manifold, C. 25. Transfer port, 26. Cooling fins, D. 27 Oil injector, 28. Air inlet port

অন্তর্দহন ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ

অংশগুলোর নাম, বিবরণ যেহেতু ইংরেজিতেই পরিচিত, তাই ইংরেজি ভাষায় দেওয়া হল

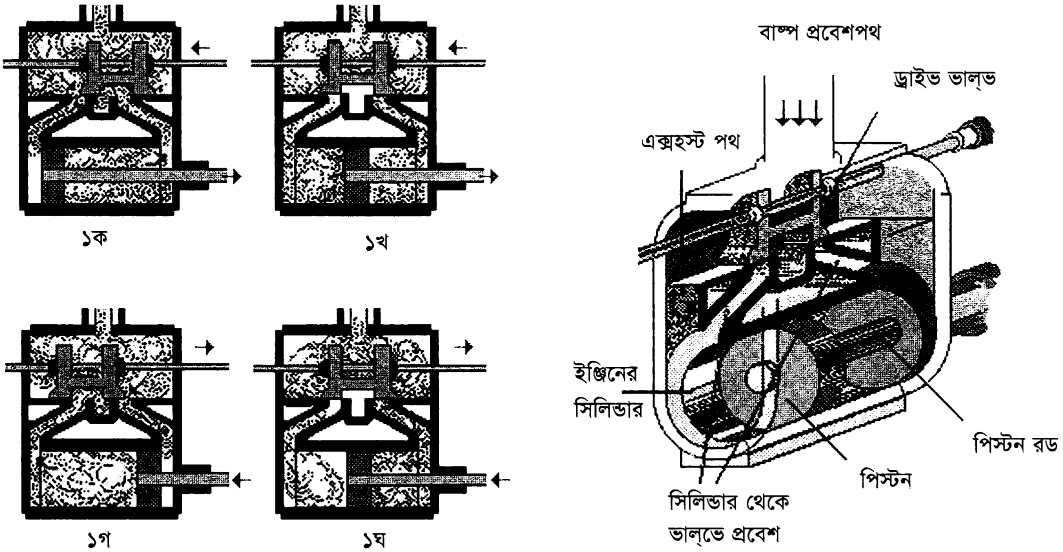

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ

ইন্টারনেট (internet)

International Network শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হল অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি। একে বলা যেতে পারে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। একই স্যাটেলাইট ও টেলিফোন সিস্টেম কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে তৈরি হয়েছে ইন্টারনেট। একই স্ট্যান্ডার্ডের যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে এরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। যেসব কম্পিউটার এই নেটওয়ার্ক তৈরি করে তারা সব এক রকম কম্পিউটার নয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশে প্রায় ২ মিলিয়ন (২০ লক্ষ) কম্পিউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ব্যবহারকারী এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা প্রতিমাসেই শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিমাসে প্রায় ২ লক্ষ ব্যবহারকারী নেটওয়ার্কের আওতায় আসছে। ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে তার ধারণা অর্জন করা বেশ কঠিন। ইন্টারনেটের গঠন নিচের চিত্র থেকে বোঝা যেতে পারে।

১৯৯৪ সাল থেকে ইন্টারনেট শব্দটির ব্যবহার

www.boighar.com

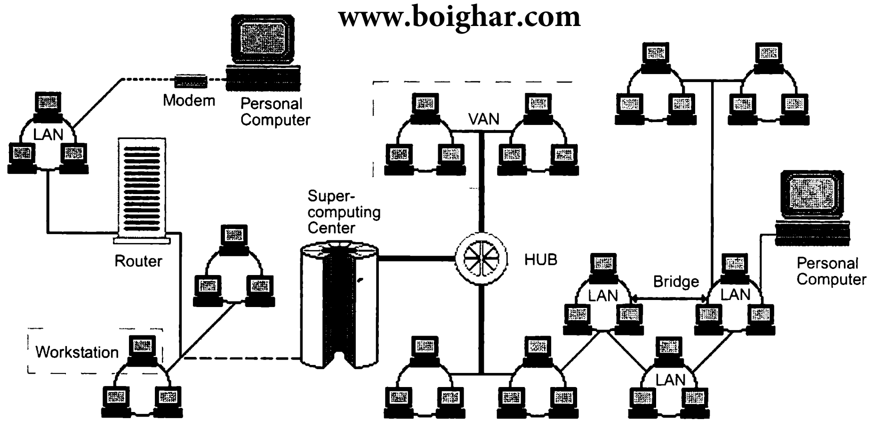

শুরু হলেও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির গবেষণা চাহিদা মেটানোর জন্য। এটি এখন বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রায় সকলেই ইন্টারনেটে এখন সার্ভিস দিচ্ছে। ইন্টারনেটের কোনো কেন্দ্রীয় দপ্তর নেই। এটি ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে; যাতে শত্রুর আক্রমণে একসাথে সব ধ্বংস না হয়ে যায়। ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি হয় ই-মেইল করতে। যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাঁদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ইন্টারনেটকে ই-মেইলের জন্য ব্যবহার করেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ২০০ দেশে ই-মেইল পাঠানো যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান কাজে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

ইন্টারফেরোমিটার (interferometer)

একগুচ্ছ আলোক-রশ্মিকে দুই বা তার বেশি কয়েকগুচ্ছ রশ্মিতে বিভক্ত করে পুনরায় গুচ্ছসমূহকে সংবদ্ধ বা একত্রিত করে পর্দা বা কোনো বস্তুর উপর ফেললে কতকগুলো উজ্জ্বল এবং অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি হয়। এই রশ্মিসমূহকে বলা হয় ব্যতিচার ডোরা (interference fringes), আলোক-রশ্মির একত্রীকরণের এই প্রক্রিয়া হল ব্যতিচার (interference)।

ইন্টারফেরোমিটার আলো, শব্দ বা বেতার-তরঙ্গের ব্যতিচার উৎপাদন এবং ব্যতিচার বৈশিষ্ট্য থেকে বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম পরিমাপ গ্রহণের যন্ত্র। আলোক-তরঙ্গের নীতিতেই বেতার-তরঙ্গ পরিমাপের জন্য মাইক্রোওয়েভ ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহৃত হয়। বেশির ভাগ ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহৃত হয় আলোক বা বেতার-তরঙ্গ গবেষণায়। সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়, বর্ণালি রেখার অতি সূক্ষ্ম গঠন পরীক্ষণে, নক্ষত্রের ব্যাস পরিমাপে, বিভিন্ন আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নিরূপণে ইন্টারফেরোমিটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৮০১ সালে ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী টমাস ইয়ং প্রথম আলোক ইন্টারফেরোমিটার ডিজাইন করেন। ১৯২০ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ এলবার্ট এ মাইকেলসন প্রথম নক্ষত্র ইন্টারফেরোমিটার উদ্ভাবন করেন।

স. রা.

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit)

সাধারণভাবে মাইক্রো সার্কিট হল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের ক্ষুদ্রতর সমাবেশ। এ রকম একটি বর্তনী হল সমন্বিত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আই সি)। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এমন একটি বর্তনী যে বর্তনীতে অনেক রকম যন্ত্রাংশ, যেমন– রোধক, ধারক, ডায়োড ও ট্রানজিস্টর ইত্যাদি একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী চিপ বা ফালীতে আঁকা থাকে এবং এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী চিপের অংশ। অন্য কথায় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হল সে বর্তনী যাতে বর্তনীর উপাংশ বা যন্ত্রাংশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী চিপের অংশ। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ, যেমন– রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি এবং এদের অন্তঃসংযোগ একটি ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসাবে থাকে, যাতে এরা এককস্বরূপ পূর্ণ ইলেকট্রনিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারে।

একটি ক্ষুদ্র অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে এসব যন্ত্রাংশ গঠন ও সংযুক্ত করা হয়।

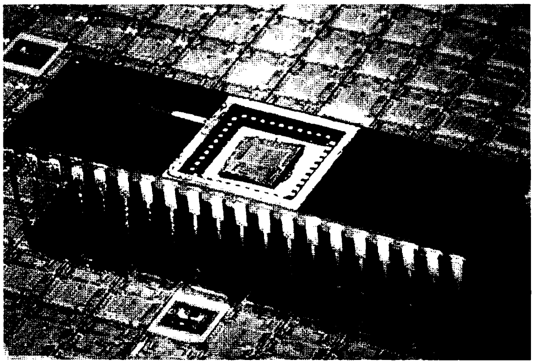

বৈশিষ্ট্য ১. এই সার্কিটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী চিপের অংশ এবং কখনই স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশকে পৃথক করা যায় না বা পুনঃস্থাপন করা যায় না।

২. IC-এর আকার থাকে খুবই ক্ষুদ্র। IC এত ছোট হয় যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সংযোগ দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে হয়।

৩. IC-এর কোনো অংশকেই অর্ধপরিবাহী চিপের পৃষ্ঠের উপর দেখা যায় না।

সুবিধা সংযোগ সংখ্যা কম হওয়ায় নির্ভরযোগ্যতা বেশি। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। ক্ষুদ্রাকার থাকার কারণে ওজনও কম। এতে কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও অধিক যোগ্যতায় কাজ করতে পারে। এর দাম স্বল্প।

অসুবিধা কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে সমগ্র চিপটি পরিবর্তন করতে হয়, অংশবিশেষ মেরামত করা যায় না।

শা. ত.

ইথার (ethers)

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। একটি অক্সিজেন পরমাণুর দুই পাশে দু'টি অ্যালকাইল মূলক সংযুক্ত হওয়ার ফলে যেসব যৌগ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে শ্রেণিগতভাবে ইথার বলা হয়। যেমন- ডাইমিথাইল ইথার (CH_3-O-CH_3), ডাইইথাইল ইথার (C_2H_5-O-C_2H_5)। এসব যৌগের সাধারণ সঙ্কেত $(C_nH_{2n+1})_2O$; এখানে n = 1, 2, 3 ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা। ইথার বর্ণহীন, নিরপেক্ষ, উদ্বায়ী তরল পদার্থ। পানিতে সামান্য দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে, যেমন- অ্যালকোহল ও বেনজিনে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। জৈব যৌগের দ্রাবক হিসাবে, অস্ত্রোপচারের সময় চেতনানাশক হিসাবে, হিমায়ক হিসাবে, পেট্রোলিয়ামের সাথে মিশিয়ে ন্যাটেলাইট নামক জ্বালানিরূপেও এর ব্যবহার আছে।

সৈ. তা. আ.

ইথিলিন (ethylene)

একটি সরল, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। এটি একটি বর্ণহীন গ্যাস। ফর্মুলা $H_2C=CH_2$। স্ফুটনাঙ্ক −১০৩.৮° সে. (−২৭২.৯° ফা.) এবং গলনাঙ্ক −১৬৯.৪° সে. (−১৫৪.৮° ফা.)। ইথিলিন একটি মূলবান জৈব যৌগ। পলিমার (দ্র) বিক্রিয়ার সাহায্যে ইথিলিন থেকে পলিথিলিন বা পলিথিন (দ্র) তৈরি করা হয়, যার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া এ থেকে তৈরি অন্যান্য যৌগের মধ্যে ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিন, ইথিলিন ডাই-ক্লোরাইড, ভিনাইল ক্লোরাইড, ইথানল, ভিনাইল অ্যাসিটেট এবং অ্যাসিটালডিহাইড-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সা. এ.

ইনকিউবেটর (incubator)

হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য পাখির ডিম কৃত্রিম উপায়ে ফুটিয়ে উপযুক্ত তাপে রক্ষা করে শাবককে বড় করে তোলার যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে একসঙ্গে অনেক হাঁস-মুরগির বাচ্চা পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোলট্রি ফার্ম করার জন্য এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল নির্দিষ্ট সময়ের আগে মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে উপযুক্ত আলো-তাপ আর্দ্রতায় লালন-পালন করার জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অনেক অকাল-প্রসূত শিশুর প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

সা. এ.

ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza)

এক ধরনের ভাইরাসের (দ্র) আক্রমণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সৃষ্টি হয়। তবে বিশেষ ধরনের জীবাণুও (হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি) এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

রোগের সূচনা হঠাৎ করে ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর গায়ে জ্বর জ্বর ভাব এবং মাথাব্যথা দেখা দেয়। সর্বাঙ্গে কষ্টদায়ক ব্যথা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ ছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমি ভাব ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসার অভাবে এ রোগ থেকে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ, যেমন– নিউমোনিয়া, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসপ্রদাহ, ফুসফুসে পুঁজ, সাইনাসপ্রদাহ (sinusitis), হৃদ্‌পেশিতে প্রদাহ, প্রান্তীয় স্নায়ুর প্রদাহ, মাত্রিকাপ্রদাহ (meningitis) ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

রোগীর শ্লেষ্মা, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু অন্যের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত শীত এবং বসন্ত কালেই এ রোগ বেশি দেখা দেয়। রোগের প্রকোপ বিক্ষিপ্ত হলেও কখনো কখনো তা মহামারীরূপেও দেখা দিতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ সেবনে এ রোগের উপসর্গ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। টিকা (দ্র) গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিরোধ সম্ভব।

সি. না. হ.

ইনসুলিন (insulin)

ইনসুলিন ল্যাটিন শব্দ insula (দ্বীপ) থেকে নেওয়া হয়েছে। অগ্ন্যাশয়ের বিটাকোষ থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন নামক এই হরমোন প্রথম আবিষ্কার (১৯২২) করেন ব্যানটিং (Sir Frederick G. Banting) ও বেস্ট (Charles Best)। ইনসুলিনের নিঃসরণ নির্ভর করে রক্তে শর্করার মাত্রার উপর। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে ইনসুলিনের নিঃসরণ হ্রাস পায় এবং শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে ইনসুলিনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।

ইনসুলিন শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাকপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিনের প্রধান কাজ রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ দেখা দেয়। ইনসুলিনের উৎস বিটাকোষ নষ্ট হবার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। বংশগত বৈশিষ্ট্য, ভাইরাস (দ্র) সংক্রমণ এবং অন্যান্য অজানা কারণে বিটাকোষ বিনষ্ট হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাকস্থলীর জারক-রসের কার্যকারিতা নষ্ট হবার কারণে ইনসুলিন মুখে খাবার পরিবর্তে ইনজেকশন হিসাবে নেওয়া হয়। কার্যকাল ভিত্তিতে একাধিক প্রকার ইনসুলিন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আ. আ. হ.

ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭)

ইবনে সিনা ছিলেন বিখ্যাত ইরানি চিকিৎসক, সেই সঙ্গে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ ও গণিতবিদ। ভাষাবিদ, বিশ্বকোষপ্রণেতা, এমনকি কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি স্বীকৃত। ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলী আল্ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বুখারার নিকটবর্তী আফসানায় জন্মগ্রহণ করেন।

'কানুন ফিৎ-তিব্ব্' (অর্থাৎ Canon of Medicine) নামে চিকিৎসা বিষয়ক বিশাল বিশ্বকোষ ইব্‌নে সিনার অমর কীর্তি। প্রায় দশ লক্ষ শব্দবিশিষ্ট এ বিশ্বকোষ মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও রচনার গুণে বইটি রচনার পর ছয় শ' বছরেরও অধিক সময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং এখনো প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনে সিনা রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এক শ'রও বেশি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আরবি ভাষায় এবং কিছু ফার্সি ভাষায় রচিত। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক ১৬টি বই, দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক ৬৮টি বই এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ১১টি বই ছাড়াও ৪টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে সিনার দার্শনিক মতবাদে আরিস্টোটল (দ্র) ও নব্য প্লেটোবাদের প্রভাব রয়েছে। তিনি 'কিতাবুশ্ শিফা' নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত দার্শনিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইবনে সিনার দর্শন 'আভিসেনা মেটাফিজিসেস কমপেন্ডিউম' (Avicennae Metaphysices Compendium) নামক আধুনিক লাতিন অনুবাদগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইবনে সিনা গতি (দ্র), স্পর্শ, বল (দ্র), শূন্য, অসীম, আলোক (দ্র), তাপ (দ্র) প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়েও তিনি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন।

ইবনে সিনা একটি আত্মজীবনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। তাঁর শিষ্য আল-জুযজানী গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। ইবনে সিনা ১০৩৭ সালে পরলোকগমন করেন।

সি. না. হ.

ইব্রাহিম, ডা. মোহাম্মদ (১৯১১-১৯৮৯)

চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও সংগঠক। তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খাড়েরা গ্রামে ১৯১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে এম.বি. ডিগ্রি লাভ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান (১৯৪৫-৪৭) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রামে সিভিল সার্জন ও জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে বহাল হন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। লন্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস থেকে এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি নিয়ে ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এডিশনাল ফিজিশিয়ান পদে যোগ দেন, এবং পরে ঐ কলেজেই প্রফেসর অব মেডিসিন পদে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিনের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত করাচির জিন্নাহ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারের মেডিসিনের প্রফেসর ও পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও জনশক্তি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

বারডেম ভবনের একাংশ

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের কর্মময় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান দুরারোগ্য ডায়াবেটিস (দ্র) রোগের চিকিৎসার জন্য ডায়াবেটিস সমিতি স্থাপন। ১৯৫৬ সালের ২৮শে এপ্রিল তিনিই প্রথম এ দেশে 'পাকিস্তান ডায়াবেটিস সমিতি' নামের প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। এর প্রথম সভাপতি মেজর ডা. দবিরুদ্দিন আহমদ। ১৯৫৭ সালে এই সমিতির উদ্যোগে সেগুনবাগিচায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এমার্জেন্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছোট্ট হাসপাতাল ডা. ইব্রাহিমের নিরলস শ্রম ও সাধনার ফলে ১৯৮০ সালে শাহবাগে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গফুট স্থান জুড়ে বিশাল ডায়াবেটিস হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। এর নাম বারডেম (BIRDEM = Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders)। সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২২৫। এখানে ডায়াবেটিস ছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বারডেমের ২২টি শাখা রয়েছে। চিকিৎসার পাশাপাশি এখানে গবেষণার কাজও চলে।

পেশাগত জীবনে সফল চিকিৎসক ডা. ইব্রাহিম নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন– যেমন, ব্রিটেনের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স থেকে সম্মানসূচক এফ.আর.সি.পি., আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিশিয়ান্স থেকে অনুরূপ এফ.সি.সি.পি., পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স থেকে অনুরূপ এফ.সি.পি.এস. ডিগ্রি। এ ছাড়াও তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন স্বর্ণপদক, নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা একাডেমীর ফেলো, জর্দানের ইসলামিক একাডেমী অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ফেলো। পাকিস্তান সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন সিতারা-ই-খিদমত উপাধি। বাংলাদেশ সরকারও তাঁকে দিয়েছিলেন জাতীয় অধ্যাপক পদের মর্যাদা। তার মৃত্যু ১৯৮৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর, ঢাকায় নিজ বাসভবনে।

আ. র.

ইমালশন (emulsion)

একটি তরল পদার্থের মধ্যে অমিশ্রণীয় অপর একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত থাকলে সে মিশ্রণকে ইমালশন বা অবদ্রবণ বলা হয়। এ কণিকাগুলির ব্যাস ০.১–১ মাইক্রন (১ মাইক্রন = $১০^{-৬}$ মিটার)। ইমালশন দুই প্রকার ১) পানিতে তেল

ইমালশন– যেমন দুধ। এখানে পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে তরল চর্বি বিস্তৃত থাকে। ২) তেলে পানির ইমালশন– যেমন কডলিভার অয়েলে কড মাছের লিভারের তেলে পানি; মাখনে চর্বির মধ্যে পানি; আইসক্রিমে ক্রিমের মধ্যে বরফের কণিকা ছড়ানো থাকে।

স্থায়ী ইমালশন তৈরির জন্য তৃতীয় কোনো পদার্থ ইমালশনের সাথে যোগ করতে হয়। এই তৃতীয় পদার্থকে বলা হয় ইমালশনকারক বা অবদ্রবণকারক। পানিতে তেল ইমালশনের ক্ষেত্রে ক্ষার ধাতুর সাবান, গাম-অ্যাকাসিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইমালশনকারক; ভারী ধাতুঘটিত সাবান তেলে পানির ইমালশনের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। দুধের ইমালশনকারক হল ক্যাজিন। জীবাণুনাশক ফিনাইল ও লাইসল পানিতে ঢাললে ইমালশন তৈরি হয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও সেই সাথে শিল্প, কৃষি, ঔষধ এবং জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমালশনের ব্যবহার আছে। ডিটারজেন্ট, পেইন্ট, বার্নিশ, রেজিন গাম, গ্লু ইত্যাদি আঠালো পদার্থ, ট্যানিং, ডাইয়িং লুব্রিকেশন শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি ইমালশন।

সৈ. তা. আ.

ইরি (IRRI)

ইরি বাংলাদেশে বহুল পরিচিত ধানের নাম। এই ধান যে প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবন করেছিল সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই ধানটি পরিচিতি লাভ করে। তবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত কিছু উন্নত জাতের ধানের নামে ইরি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই আমাদের দেশে ইরি কথাটিকে সমস্ত উচ্চ ফলনশীল ধানের সাধারণ নাম হিসাবেও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। ইরি প্রতিষ্ঠানের পুরো নাম ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (International Rice Research Institute)। এটি ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত।

ইরির বিজ্ঞানীরা ইন্দোনেশিয়ার 'লতা' ও চীনের 'ডিজি উজেন' নামক দুই জাতের ধানের মধ্যে পরাগায়ণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করেন এই জাতের ধান।

অন্যান্য প্রচলিত ধানের তুলনায় এর ফলন হয় তিন গুণ, ফলন-কালও কম। তবে ধানগাছ খর্বাকৃতির। প্রতিষ্ঠানের নামে এবং পরীক্ষার ক্রমানুসারে এর নাম রাখা হয় ইরি-৮। আউশ বা বোরো মৌসুমে আমাদের দেশে এই ধানের চাষ করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে 'সবুজ বিপ্লব' সংগঠনে ইরি-৮-এর অবদান অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠানটি এর পর অনেক সফল ধান উদ্ভাবন করে। যেমন ইরি-২০ আমাদের দেশে জনপ্রিয় ইরিশাইল নামে সমাদৃত।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইরি সারা পৃথিবীর ধান নিয়ে গবেষণা করছে। বেশি ফলনক্ষম জাত ছাড়াও ফলন-সময়হ্রাস এবং খরা, বন্যা, অধিক সময় ধরে জমে থাকা পানি, লবণাক্ততা, রোগ ইত্যাদি নানান প্রতিকূলতা রোধী ধানবীজ সংরক্ষণের দায়িত্বও এই প্রতিষ্ঠানের। হাজার হাজার বছর ধরে ধানে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে আসছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস ধরে রাখা একটি বড় মাপের কাজ। এই কাজটি এখন বিভিন্ন দেশে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (Bangladesh Rice Research Institute), সংক্ষেপে 'ব্রি' (BRRI)।

ত. চ.

ইলিশ (hilsa / ilisa)

এ সকল ইলিশ জাতীয় মাছের বৈশিষ্ট্য হল এদের পুরো জীবন কাটে সমুদ্রে, কিন্তু যৌবনের একটা পর্যায়ে নদীতে আসে ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে। ডিমধারী স্ত্রী মাছটির সাথে

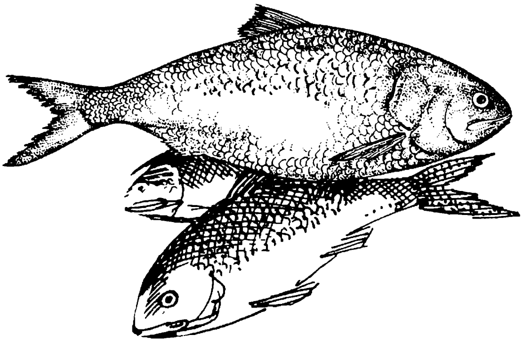

পাহারাদার পুরুষ মাছটিও থাকে বৈকি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু শুরু হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ সমুদ্রের মোহনা অঞ্চল ছেড়ে নদী বেয়ে উৎসমুখে পরিযায়ী হয়। বাংলাদেশের মেঘনা, পদ্মা ও যমুনা ইলিশের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র। নদীর স্রোত যেখানে কম সেখানে স্ত্রী ইলিশ বছরে ২,৮০,০০০ থেকে ১৮,০০,০০০ ডিম ছাড়ে। ডিম আকারে ১.৮ থেকে ২ মিলিমিটার। পুরুষ ইলিশ ডিম নিষিক্ত করে। ডিমের ভিতর কিছু তেল জাতীয় পদার্থ থাকার দরুন তা জলের তলায় ভাসমান থাকে এবং এই ডিমগুচ্ছ সূর্যতাপে মাত্র একদিনেই ফোটে। ইলিশের সদ্য ফোটা পোনা আকারে ২.৬ মিলিমিটার। এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা সাঁতার কাটায় দক্ষ হয়ে ওঠে এবং চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ নদীতে থেকে সমুদ্রে চলে যায়। ইলিশের বড় পোনাকে জাটকা বলা হয়। দু' বছরে ইলিশ ডিম পাড়ে। এ জন্য

নদীর ঘাটে ইলিশের পাইকারি বাজার

জাটকা মাছ ধরা নিষেধ। ডিম ছাড়ার মৌসুমেও বয়স্ক ইলিশ ধরলে বংশবৃদ্ধিতে সঙ্কট দেখা দেয়। এতদিন বিশ্বাস করা হত ডিম নিষিক্ত হবার পর মা-বাবা আবার সাগরে ফিরে যায়। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এরা কখনো কখনো নদীতেই থেকে যায়। কখনো মোহনায় বিচরণ করে।

ইলিশ মাছ দেখতে বড়ই সুন্দর, চকচকে রুপালি আঁশে ঝলমলে, লম্বায় ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। ওজনে আড়াই কেজি। এরা মূলত শাকাশী প্লাঙ্কটন ভোজী, অর্থাৎ সমুদ্র শৈবাল প্রধান আহার্য। পানির উপরতলায় আলো থাকায় সেখানে শৈবাল জন্মায়। কাজেই ইলিশ ঝাঁক বেঁধে ওখানেই থাকে। তখন বড় জাল বা টানা জাল, ভাসা জাল, ডোবা ও বুজা জালে ধরা পড়ে।

ইলিশ খুব সুস্বাদু। এ জন্য কদরও বেশি। জনপ্রিয় এই মাছটি আমাদের জাতীয় মাছ।

ইলিশের মতো দেখতে অন্য একটি ইলিশের নাম চন্দনা ইলিশ। এর আঁশ ইলিশের আঁশের চেয়ে বড়। গুচ্ছপাখনাও ছোট। শরীর হলুদের বদলে নীলচে।

এরাও সামুদ্রিক, তবে এরা ডিম পাড়তে নদীতে যায় না। মোহনাতেই ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফোটায়। এটি ইলিশের মতো সুস্বাদু নয়।

ত. চ.

ইলেকট্রন (electron)

একক নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আধান (দ্র) বা চার্জ বিশিষ্ট একটি মৌলিক বিদ্যুৎকণিকা। এটি সকল পদার্থে বর্তমান। আমরা জানি, সকল পদার্থ পরমাণু (দ্র) দিয়ে তৈরি। পরমাণুতে প্রধানত তিন ধরনের কণিকা থাকে। এগুলো হল ইলেকট্রন, প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রন (দ্র)। ইলেকট্রন থাকে পরমাণুর খোলকে। গ্রহগুলো যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, ঠিক তেমনি ইলেকট্রন পরমাণুর পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তিত হয়। ইলেকট্রন পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয়ে সহায়তা করে। পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা হল হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণু। ইলেকট্রন এতই হালকা যে ১৮৪০টি ইলেকট্রনের ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। ইলেকট্রনের ভর 9.107×10^{-13}

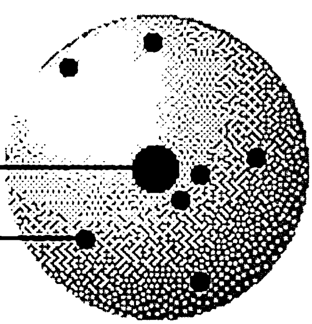

কিলোগ্রাম এবং এর চার্জ বা আধান হল 1.6×10^{-19} কুলম্। ইলেকট্রন স্পিন $^1/_2$ এবং এরা লেপ্টন শ্রেণিভুক্ত। ইলেকট্রন যখন কোনো পরিবাহক দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ বা ইলেকট্রিক কারেন্ট। ধাতু থেকে ইলেকট্রন বের করে নেওয়া বা নিঃসরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তাপীয় আয়ন নিঃসরণ, বিটাক্ষয়, তড়িৎক্ষয় ও আলোকতাড়িত নিঃসরণ থেকে ইলেকট্রন বের করা ও তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাপের সাহায্যে ধাতু থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় তাপীয় আয়ন নিঃসরণ। আর ইলেকট্রনকে বলা হয় তাপীয় আয়ন। ইলেকট্রনিক্সের বিকাশে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকার নাম পজিট্রন। পজিট্রনের ভর ইলেকট্রনের সমান। কিন্তু আধান বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ বা ধনাত্মক।

শা. ত.

ইলেকট্রন গান (electron gun)

যে কৌশল ইলেকট্রনের স্রোত উৎপাদন করে। টেলিভিশন সেট-এর পর্দার উপর ইলেকট্রন গান থেকে নির্গত ইলেকট্রন স্রোত চলমান আলোকবিন্দু উৎপাদন করে। এই আলোক-রশ্মির সমন্বয়ে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় ছবি দেখতে পারি। সাধারণত ভ্যাকুয়াম টিউবের ভিতর উত্তপ্ত ক্যাথোড দিয়ে ইলেকট্রন গান তৈরি।

তাপীয় আয়ন নিঃসরণ দ্বারা ইলেকট্রন নিঃসৃত হয় এবং উচ্চ বিভব দ্বারা ধনাত্মক তাড়িত দ্বার বা পজিটিভ ইলেকট্রোড-এর (অ্যানোড) দিকে তাড়িত

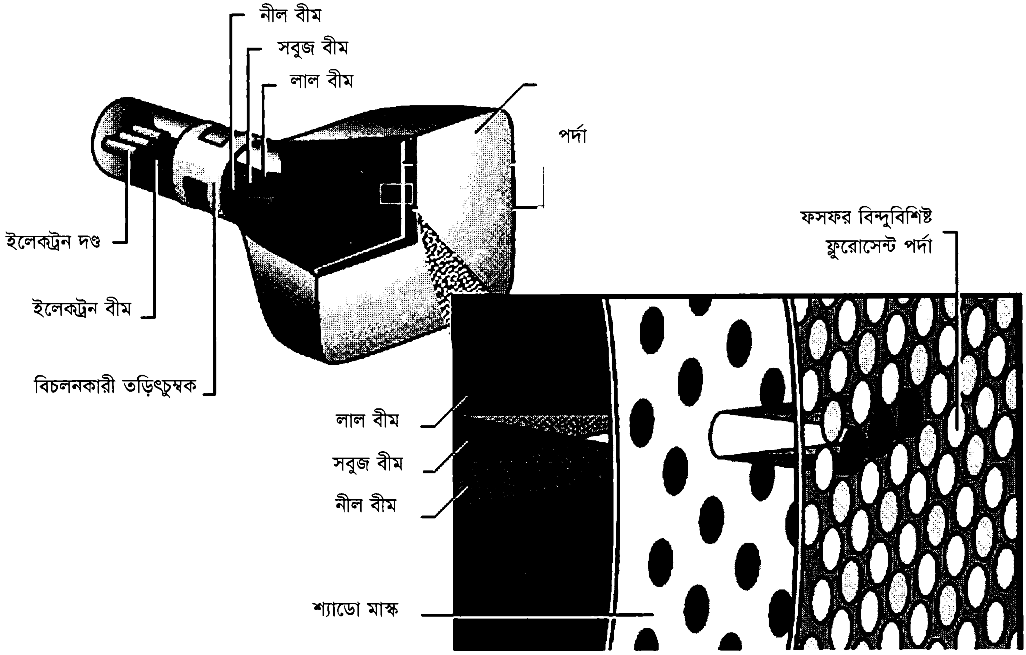

ইলেকট্রন গান

হয়। এসব ইলেকট্রন অ্যানোডের ছিদ্র দিয়ে সঙ্কীর্ণ বীমের আকারে বেরিয়ে যায়; এই বীমকে ইলেকট্রন লেন্স দ্বারা ফোকাস করা যেতে পারে।

শা. ত.

ইলেকট্রনিক্স (electronics)

ইলেকট্রন ও ইলেকট্রনিক্স কথা দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইলেকট্রন হল পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা। ইলেকট্রনিক্সের মূলে রয়েছে এই ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের প্রবাহকে বলা হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট। ইলেকট্রনের প্রবাহ যেমন কোনো কঠিন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলতে পারে, তেমনি চলতে পারে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যম, গ্যাস মাধ্যম এবং অর্ধপরিবাহী দিয়ে। অর্ধপরিবাহী হল এমন ধরনের পদার্থ, যার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না, কিন্তু কোনো কোনো শর্ত পূরণ করলে বিশেষ অবস্থায় এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে শাখা ভ্যাকুয়াম, গ্যাস মাধ্যম বা অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রনের প্রবাহ ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে, তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে। অন্য কথায় ইলেকট্রনের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেসব যন্ত্র তৈরি হয়, তাদের আবিষ্কার ও ব্যবহারিক চর্চা তড়িৎবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে। ইলেকট্রনের এরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রবাহের জন্য বিশেষ ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এদের বলা হয় ইলেকট্রনিক সার্কিট।

১৮৮৩ সালে ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেন টমাস আলভা এডিসন (দ্র)। ফ্লেমিংয়ের (দ্র) ডায়োড ভাল্‌ভ, লি ডি ফরেস্টের (Lee de Forest) ট্রায়োড ভাল্‌ভ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনিক্সের সূচনা। ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সভ্যতার অগ্রগতিতে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। ট্রায়োড ভাল্‌ভের বিকল্প হিসাবে ট্রানজিস্টর (দ্র) আবিষ্কার এবং ট্রানজিস্টরের উন্নত রূপ আই.সি:-র আবিষ্কার এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে। ইলেকট্রনিক্সের কল্যাণে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বহু রকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এগুলির মধ্যে রেডিও (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), রেডার (দ্র), রোবট (দ্র), ক্যালকুলেটর (দ্র), টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার (দ্র)

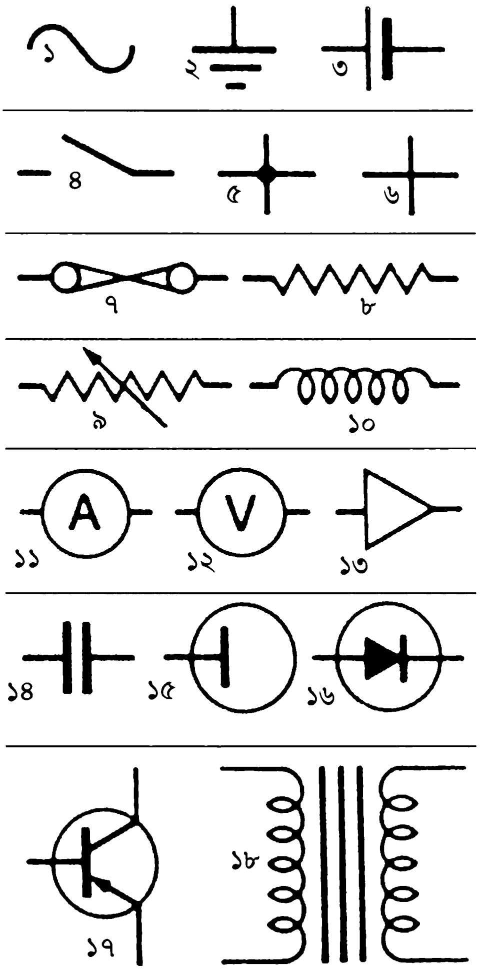

ইলেকট্রনিক প্রতীক নির্বাচন

১. পরিবর্তী প্রবাহ, ২. ভূমি, ৩. বিদ্যুৎকোষ, ৪. সুইচ, ৫. তারের সংযোগ, ৬. তার সংযুক্ত না হয়ে পেরিয়ে যাবে, ৭. ফিউজ, ৮. রোধ (রেজিস্টর), ৯. পরিবর্তনশীল রোধ, ১০. তারকুণ্ডলী, ১১. অ্যামিটার, ১২. ভোল্টমিটার, ১৩. অ্যামপ্লিফায়ার, ১৪. ধারক (ক্যাপাসিটর), ১৫. অ্যানোড, ১৬. ডায়োড, ১৭. ট্রানজিস্টর, ১৮. ট্রান্সফর্মার

ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রেই ইলেকট্রনিক্সের প্রয়োগ আছে।

শা. ত.

ইলেকট্রোপ্লেটিং / তড়িৎপ্রলেপন
(electroplating)

ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎপ্রলেপন হল তড়িৎবিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতব জিনিসের উপর অন্য ধাতুর সূক্ষ্ম আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়ার রাসায়নিক পদ্ধতি। সাধারণ কথায় একে গিল্‌টি করা বলে। সাধারণত কোনো নিকৃষ্ট বা সস্তা ধাতু (যেমন তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ুর প্রকোপ থেকে রক্ষা করা, চকচকে করা অথবা সুন্দর দেখানোর জন্য এদের উপর উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান ধাতুর (যেমন সোনা, রুপা, নিকেল ইত্যাদি) প্রলেপ দেওয়া যায়। একে গোল্ড প্লেটিং বা সিলভার প্লেটিং বা নিকেল প্লেটিং করা বলে। যে বস্তুতে প্রলেপ দিতে হবে তাকে ভোল্টামিটারে (দ্র) ক্যাথোড (দ্র) বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে ব্যবহার করা হয় অ্যানোড (দ্র) বা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার হিসাবে। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে সে ধাতুর লবণের দ্রবণকে ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎদ্রব হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লোহার পাত্রে রুপার প্রলেপ দিতে হলে লোহার পাত্রকে ক্যাথোড এবং বিশুদ্ধ রুপার পাত্রটিকে অ্যানোড এবং সিলভার নাইট্রেটকে তড়িৎদ্রব হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়ায় লোহার উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজ করা বলে। থালা-বাসন, পাতিল, চামচ ইত্যাদিকে চকচকে, উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখানোর জন্য ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়।

শা. ত.

ইস্পাত (steel)

লোহার সঙ্কর ধাতু। এতে আয়রন কার্বাইড অথবা সিমেন্টাইট রূপে প্রায় ২% কার্বন থাকে। কার্বন (দ্র) এবং অন্যান্য ধাতুর পরিমাণের উপর ইস্পাতের গুণাগুণের তারতম্য ঘটে। ধাতুর মধ্যে ইস্পাতের ব্যবহার খুবই বেশি। পেটা লোহা গলিয়ে তাতে কার্বন মিশিয়ে বেঞ্জামিন হান্টসম্যান (Benjamin Huntsman ১৭০৪-১৭৭৬) প্রথম ১৭৪০ সালে ইস্পাত তৈরি করেন। এর পর স্যার হেনরি ব্যাসেমার (Sir Henry Bessemer ১৮১৩-১৮৯৮) ১৮৫৬ সালে ইস্পাত তৈরির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতিতে ব্যাসেমার কনভার্টারে ঢালাই লোহা গলানো অবস্থায় রেখে তাতে বাতাস চালিয়ে খুব কম খরচে ইস্পাত তৈরি করা যায়। হেনরি ব্যাসেমার এ পদ্ধতি ব্যবহার করে এক সাথে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হন।

সু. ব.

ঈ

ঈগল (eagle)

ঈগল Falconiforence বর্গের পাখি। বাংলাদেশে প্রায় ১৩ প্রজাতির ঈগল দেখতে পাওয়া যায়। সাদা চোখ বা হোয়াইট-আইড ঈগলের বৈজ্ঞানিক নাম *Batastur teesa,* বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিটি প্রায় ১৪ সেন্টিমিটার লম্বা, গায়ের পালক ধূসর বাদামি। চোখ গলা সাদা। তলদেশ সাদা ও বাদামি। ঠোঁটের গোড়ার চামড়া কমলা হলুদ। পুরুষ ও স্ত্রী ঈগল দেখতে একই রকম। এরা বড় পোকা-মাকড়, ইঁদুর, ব্যাঙ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী খেয়ে থাকে। তিনটি সবুজাভ ও সাদা ডিম দেয়। স্ত্রী-ঈগল ডিমে তা দেয় এবং উভয় ঈগলই বাচ্চার পরিচর্যা করে।

বাংলাদেশে শিখরযুক্ত ঈগল বা ক্রেস্টেড ও হক ঈগল (Spizaetas cirrtates) সব থেকে বেশি দেখা যায়। দেখতে কালচে, ওড়ার সময় ডানার নিচে হালকা বাদামি ডোরা দেখা যায়। গলা, বুক ও পেট সাদা পালক দ্বারা আবৃত। এই প্রজাতির ঈগল একাকী থাকতে পছন্দ করে। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ইঁদুর, সাপ, সজারু ইত্যাদি প্রাণী। উঁচু ডালে এরা

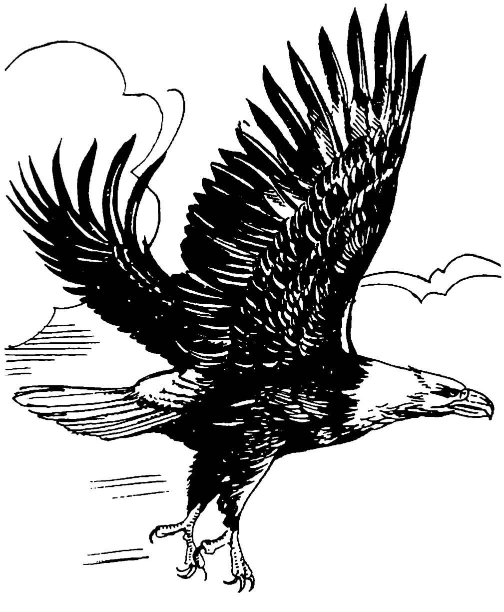

বাসা বানায় এবং একটি ডিম পাড়ে। সাদা ঈগল বা হোয়াইটব্রেড সী ঈগল (Haliaetus uncogastes) বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রজাতির ঈগল বেশ বড়– লম্বায় প্রায় ২৮ ইঞ্চি। এ ঈগলের মাথা, ঘাড়, গলা থেকে লেজের ডগা ও পা সাদা। ডানা, পিঠ ও লেজ বাদামি পালক দ্বারা আবৃত। উপকূলের কোনো গাছের উঁচু ডালে বসে থাকে শিকারের আশায়। কোনো মাছ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতি দ্রুততায়। এরা একই গাছে কয়েক বছর বাসা বানায়। ৩-৪টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ লালচে বাদামি ফোঁটাসহ হলুদ সাদা। বড় গাছ ধ্বংসের ফলে এ সকল ঈগলের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে।

রা. জা.

ঈল (eel)

ঈল এক বিশেষ আকৃতির মাছ। দেখতে সাপের মতো। দেখলে সাপ বলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। মাছের মতো ঈল মাছের দেহে নানা ধরনের পাখনা থাকে, কিন্তু এসব পাখনা খুবই ছোট। ফলে এগুলো তেমন একটা কাজে আসে না। ঈল মাছ সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলাচল করে। এ ধরনের চলাকে সর্পগতি বা সর্প-চলা (serpentine movement) বলা হয়।

ঈল মাছ কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন– কাঁটাযুক্ত ঈল, মোরে ঈল, কাদা ঈল, বৈদ্যুতিক ঈল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর ঈল মাছ প্রধানত

গুহাবাসী। জলের গভীরে যেসব পাহাড় বা টিলা রয়েছে, তার ভেতরের গুহায় এরা বাস করে। ঈল মাছের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ জাতের ঈল হল কাদা ঈল। এরা স্বভাবের দিক দিয়ে খুব শান্ত প্রকৃতির। ঈল মাছের শিকার ধরার পদ্ধতি অনেকটা সাপের মতোই। হঠাৎ

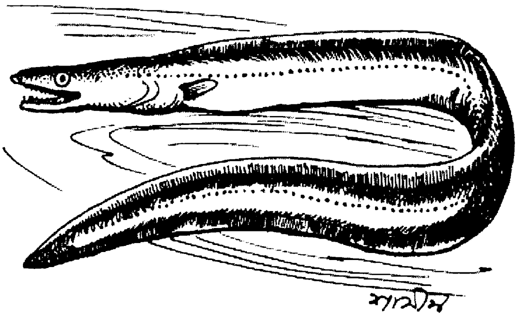

ঈল মাছ

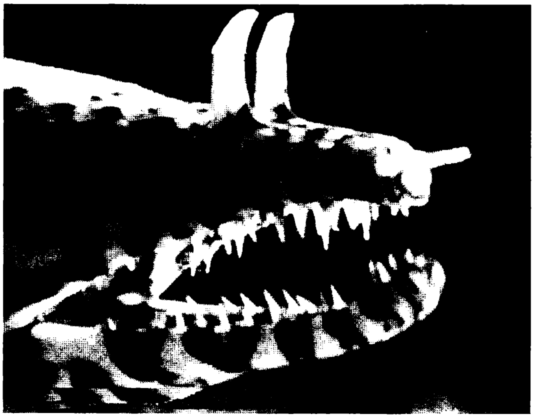

এক ধরনের ঈল মাছের মুখ ও মাথা

করে ছোবল মেরে এরা শিকার ধরে। তবে ঈল মাছের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হল বৈদ্যুতিক ঈল মাছ। এদের দেহে এক ধরনের বিশেষ বিদ্যুৎউৎপাদী অঙ্গ রয়েছে। বিদ্যুৎঅঙ্গ প্রায় ৬৬০ ভোল্টের মতো বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। অবশ্য এদের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা এক সঙ্গে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এরা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশেও তিন প্রজাতির ঈল মাছ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এরা বাইন মাছ বা বান মাছ নামে পরিচিত। এরা মাংসাশী।

ত. চ.

উ

উইপোকা (white ant)

উইপোকা Arthropoda বর্গের পতঙ্গ। উইপোকার দেহ মাথা, বুক ও উদরে বিভক্ত। প্রধানত ভেজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে উইপোকার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। উইপোকার অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে। তবে সবচেয়ে পরিচিত উইপোকাটির বৈজ্ঞানিক নাম *Megalotermes* প্রজাতি।

উইপোকা সামাজিক জীব। মাটি দিয়ে বিশাল উইঢিপি তৈরি করে সেখানে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। ঢিপি বেশ শক্ত হয়। এমনকি ঢিপির উপর মোষও দাঁড়াতে পারে।

উইপোকার ঢিপিকে কলোনি (colony) বলা হয়। কলোনিতে একটি স্ত্রী বা রানী, একাধিক রাজা এবং অসংখ্য শ্রমিক ও সৈন্য থাকে। রাজা ও শ্রমিক দেখতে প্রায় একই রকম। সৈন্য উই দেখতে অন্য রকম, স্ত্রী বা রানীর দেহ সুস্পষ্টভাবেই পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। রানী

উইপোকার ঢিপি

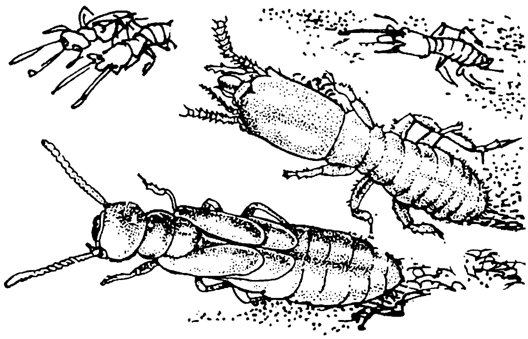

লম্বায় প্রায় চার সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রস্থে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান মোটা হয়। অথচ রাজা, শ্রমিক বা সৈন্য আকারে রানীর তুলনায় অনেক ছোট। রানী কলোনির যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। রানীর কাজ ডিম পাড়া। ঢিপি তৈরি করা, ডিমে তা দেয়া, বাচ্চা ফোটানো, বাচ্চাদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য যোগানো ইত্যাদি সব কাজই করে শ্রমিক। সৈন্য ঢিপি পাহারা দেয়। উইপোকার প্রধান শত্রু পিঁপড়া। পিঁপড়া উইয়ের বাচ্চা খাওয়ার লোভে দল বেঁধে উইঢিপি আক্রমণ করে। সৈন্য প্রায়ই পিঁপড়াদের সাথে যুদ্ধ করে। শ্রমিকের একটি দল খাবারের জন্য উইঢিপির ভেতর এক ধরনের ছত্রাক চাষ করে। স্বজাতির কেউ মারা গেলে ফেলে দেয় না। ভাঁড়ার ঘরে জমিয়ে রাখে। খাদ্যের অভাব হলে মৃত পোকা খায়।

উইপোকা মাঝে মাঝে দল বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এই সময় উইপোকাদের দেহে পাখা গজায়। দল বেঁধে উইপোকার এই ধরনের গৃহত্যাগকে সোয়ারমিং (swarming) বলে। কলোনিতে গাছের সংখ্যা বেড়ে গেলে বা দ্বিতীয় রানী জন্মালে উইপোকা এভাবে সোয়ারমিং করে।

অ. ব.

উট (camel)

Camelidae গোত্রভুক্ত পিঠে কুঁজবিশিষ্ট বৃহদাকার চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী (দ্র) জন্তু। এর উচ্চতা ২ মিটার বা ৭ ফুটের মতো এবং ওজন ৭২৫ কেজির ওপর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

উট সচরাচর দু' ধরনের হয়ে থাকে। এক কুঁজবিশিষ্ট আরবি উট (Arabian camel) এবং দু' কুঁজবিশিষ্ট বাক্ট্রিয় উট (Bactrian camel)। এক কুঁজবিশিষ্ট উট উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এবং দু' কুঁজবিশিষ্ট উট মধ্য-এশিয়ার শীতল মরুঅঞ্চলে পাওয়া যায়। এক কুঁজবিশিষ্ট উট লম্বা ও হালকা-পাতলা গড়নের হয় বলে দু' কুঁজবিশিষ্ট উটের চেয়ে দ্রুত হাঁটাচলা করতে পারে।

মরুভূমিতে যাতায়াত এবং মালামাল বহনের জন্য মানুষ প্রাচীন কাল থেকে উট ব্যবহার করে আসছে। এ কারণে উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। চার থেকে মোটামুটি ত্রিশ বছর পর্যন্ত উট মাল বহনে সক্ষম থাকে। স্বল্প দূরত্বে এরা ১,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ওজনের মাল বহন করতে পারে।

উটের শারীরিক গঠন ও জীবনপ্রণালী মরু-পরিবেশের খুব উপযোগী। পিঠের কুঁজের মধ্যে এরা প্রচুর পরিমাণে চর্বি জমা করে রাখে। মরুঅঞ্চলের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার সময় যখন নিয়মিত খেতে পায় না, তখন কুঁজের জমানো চর্বিই খাবার ও পানির অভাব পূরণ করে। পানি পান না করে উট তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচতে পারে। উটের পায়ের খুর দু' ভাগে বিভক্ত। পায়ের তলা গদির মতো নরম, যা প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়। এতে উট খুব সহজে শুকনো বালুপথে হাঁটতে এবং দৌড়াতে পারে। চোখের

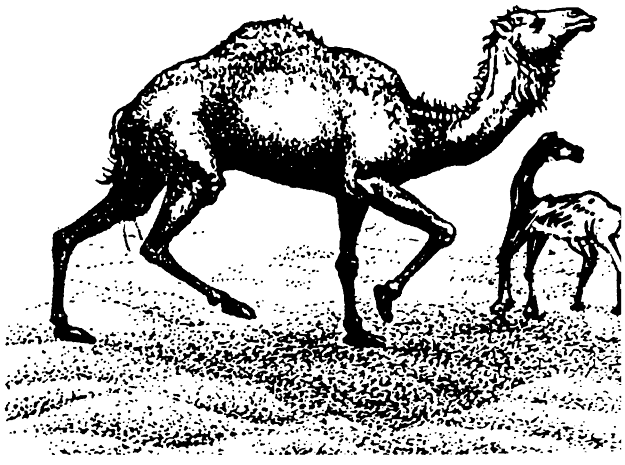

পাতাগুলো বেশ চওড়া বলে এর সাহায্যে উট মরুঝড় এবং প্রখর রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। নাকের ছিদ্র দু'টিও ইচ্ছেমতো খুলতে আর বন্ধ করতে পারে। কানে

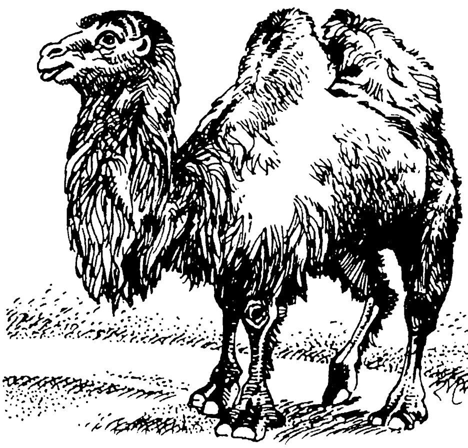

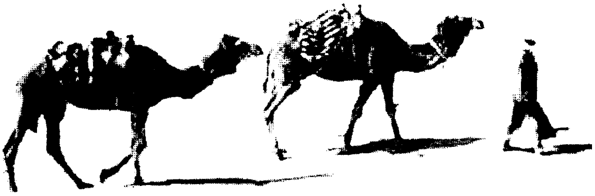

বড় বড় রোম থাকায় এদের কানের ভিতরেও বালি ঢুকতে পারে না। উট মরুভূমির ক্যাকটাসজাতীয় গাছ, লতাপাতা, তৃণ খেয়ে জীবনধারণ করে।

প্রত্যেক বসন্তে উটের পুরনো পশম ঝরে গিয়ে আবার নতুন পশম গজায়। কাপড় বা কম্বল তৈরির কাজে এই পশম ব্যবহৃত হয়।

সুজ. ব.

উটপাখি (ostrich)

পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে বড় আকারের পাখি। Struthiouiformes বর্গের এই পাখির শারীরিক গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বৈজ্ঞানিক নাম *Struthio camelus*। কোনো কোনো উটপাখি ৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। তখন এর ওজন দাঁড়ায় ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড।

ডানা আছে, নামেও পাখি, তবু উটপাখি কিন্তু উড়তে পারে না। কারণ শরীরের তুলনায় এদের পাখা দুটো বেশ ছোট। তবে পা-জোড়া খুব শক্ত গড়নের। আর তাই এরা দৃঢ় ভঙ্গিতে ও দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারে। দৌড়ানোর সময় দু' পাশের ছোট পাখা দুটো মেলে দিয়ে এরা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। ঘণ্টায় ৫৬ কিলোমিটার দৌড়াতে পারে।

উটপাখির মাথা, গলা এবং ঊরুতে পালক কম। তবে পাখার শেষ ভাগে সুদৃশ্য বড় বড় প্যালক গজায়। পুরুষ উটপাখি মসৃণ ও চকচকে কালো রঙের হয়। স্ত্রী উটপাখির রঙ হয় হালকা ধূসরাভ ও পিঙ্গল। সাধারণত একটি পুরুষ-পাখির সঙ্গে দু' থেকে ছ'টি স্ত্রী-পাখি দল বেঁধে বাস করে। পুরুষ-পাখি ডিম রাখার গর্ত তৈরি করে দেয় আর স্ত্রী-পাখি ডিম পাড়ে। এককেটি ডিমের ওজন প্রায় সোয়া কেজি। দিনের বেলা স্ত্রী-পাখি ডিমে তা দেয় আর রাতে তা দেয় পুরুষ-পাখি।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় উটপাখি পাওয়া যায়।

সুজ. ব.

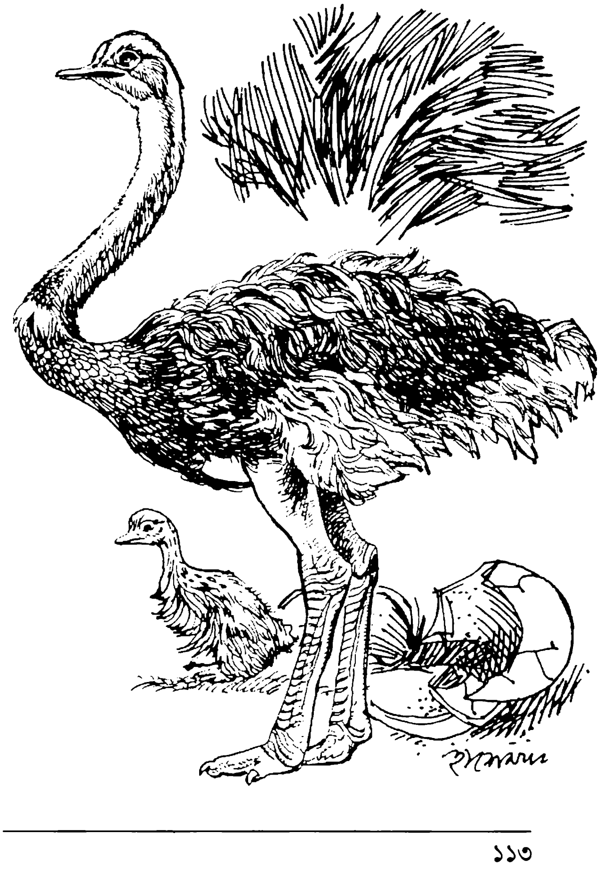

উদ্‌বিড়াল (the otter)

আমাদের দেশে তিন প্রজাতির উদ্‌বিড়াল পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে– কমন অটার (Lutra lutra), মসৃণ উদ্‌বিড়াল (Lutra perspicillata) ও ক্ললেস অটার (Aonyx cinerea)। মানুষের ঘরবাড়ির কাছাকাছিই বাস করে উদ্‌বিড়াল অর্থাৎ কমন অটার। নখরহীন উদ্‌বিড়াল আকারে ছোট, লম্বায় ১৬-২০ সেমি। ১০-১১ সেমি লম্বা লেজ ও ওজনে ৩-৬ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদের রঙ বৈচিত্র্যময় হালকা ও গাঢ় বাদামি। বুক ও গলা সাদাটে। এদের গা লোমশ, তেলতেলে ও ঘন। লেজ দাঁড়ের মতো। পাগুলো চ্যাপটা হাঁসের মতো।

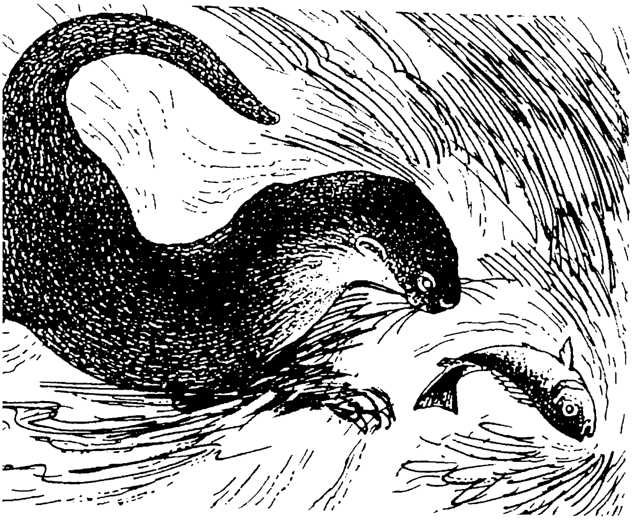

পায়ের পাতা ও শরীরের অন্যান্য অংশ পানিতে ঘুরে বেড়াবার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। উদ্‌বিড়ালের প্রধান খাদ্য মাছ। মাছ ধরতে এরা খুবই পটু। নানা কায়দায় এরা মাছের পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলে। জেলে ও মৎস্য শিকারিরা উদ্‌বিড়াল ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের গলায় দড়ি বেঁধে পানিতে নামিয়ে দেয় মাছ ধরার জন্য। বড় মাছ ধরা মাত্র রশি নিয়ে আসা হয় এবং উদ্‌বিড়ালের মুখ থেকে বড় মাছ সরিয়ে ছোট মাছ খেতে দেয়া হয়। বেঁচে থাকার মতো পরিবেশের অভাবে এবং বিদেশে চামড়া রফতানির কারণে আমাদের দেশে উদ্‌বিড়ালের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

রা. জা.

উদ্ভিদ (plant)

কঠিন খাদ্য গ্রহণে অক্ষম ও জড় কোষপ্রাচীরসম্পন্ন জীবের নাম উদ্ভিদ। প্রায় ৪ লক্ষ প্রজাতি নিয়ে উদ্ভিদজগৎ গঠিত। উদ্ভিদজগৎ বিশাল ও বিচিত্র। এদের কোনোটি সবুজ, কোনোটি অসবুজ। কোনোটির ডালপালা আছে, আবার কোনোটির নেই। কোনো উদ্ভিদের চলার ক্ষমতা আছে, আবার কোনোটির নেই। কোনো উদ্ভিদ এতই ছোট যে খালিচোখে দেখা যায় না। আবার কোনোটি বিশালাকার এবং তার উচ্চতা ৮৮ মিটার পর্যন্তও হয়ে থাকে। উদ্ভিদের কোনো স্নায়ুতন্ত্র (দ্র), রেচনতন্ত্র (দ্র) ও শ্বসনতন্ত্র (দ্র) নেই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। সাধারণত শাখা-প্রশাখায় এর বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্ভিদজগতের শ্রেণিবিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি–

ক. *স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ* দেহে ক্লোরোফিল (দ্র) থাকায় কোনো কোনো উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। তাই এগুলোকে স্বভোজী উদ্ভিদ বলা হয়। (যেমন আমগাছ, কাঁঠালগাছ)। যেসব উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে না তারা পরভোজী উদ্ভিদ। পরভোজী উদ্ভিদেরা পরজীবী (স্বর্ণলতা), মৃতজীবী (ব্যাঙের ছাতা) ও পতঙ্গভোজী (কলস উদ্ভিদ)– এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

খ. *বীরুৎ, উপগুল্ম, গুল্ম ও বৃক্ষ* : কাণ্ডের আকৃতি, গঠন ও উচ্চতার দিক থেকে উদ্ভিদজগৎ উক্ত চার শ্রেণিতে বিভক্ত। ছোট ও নরম কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদকে বীরুৎ বা ওষধি বলা হয়। যেমন ধানগাছ। আয়ুর দিক থেকে উদ্ভিদজগৎ বর্ষজীবী, দ্বি-বর্ষজীবী ও বহু-বর্ষজীবী– এ তিন ভাগে বিভক্ত।

গ. *অপুষ্পক উদ্ভিদ ও সপুষ্পক উদ্ভিদ* যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় না সেগুলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। অপুষ্পক উদ্ভিদ সমাঙ্গবর্গ, মসবর্গ ও ফার্নবর্গ– এ তিন ভাগে বিভক্ত। সমাঙ্গবর্গের যেসব উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল (এক ধরনের সবুজ কণিকা) থাকে সেগুলোকে শৈবাল বা শেওলা (দ্র) বলা হয়। অপর দিকে এ বর্গের যেসব উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল নেই সেগুলোকে ছত্রাক (দ্র) বলা হয়।

যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় সেগুলো সপুষ্পক উদ্ভিদ।

ঘ. *আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী*– এ দুই ভাগে বিভক্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী উদ্ভিদ দু' ভাগে বিভক্ত। এর একটি একবীজপত্রী ও অপরটি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ।

ঙ. *জলজ উদ্ভিদ, স্থলজ উদ্ভিদ, মরু-উদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদ* পরিবেশভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদকে মোটামুটিভাবে উক্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়।

মানুষের জীবনে উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন (দ্র) সরবরাহ করে। মানুষ উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করে খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অবসর বিনোদনের অজস্র সামগ্রী। তাই উদ্ভিদের প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য।

মু. আ.

উদ্ভিদ, পতঙ্গভুক (insectivorous plant)

কিছু কিছু উদ্ভিদের (দ্র) পত্রফলক পরিবর্তিত হয়ে বিশেষ ধরনের ফাঁদে রূপান্তরিত হয়। এ ফাঁদের সাহায্যে উদ্ভিদগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির পতঙ্গ ধরে তাদেরকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এ কারণে এসব উদ্ভিদকে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বা ইনসেক্টিভোরাস উদ্ভিদ (Insectivorous plant) বলা হয়। পতঙ্গ ধরার ফাঁদগুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

ক. *কলস উদ্ভিদ* নেপেন্থিস (Nepenthes) নামক এক প্রকার উদ্ভিদের পত্রফলক পরিবর্তিত হয়ে কলসের আকৃতি ধারণ করে এবং পতঙ্গ ধরার ফাঁদে রূপান্তরিত হয়। এ উদ্ভিদের পত্রফলকের শীর্ষভাগ কলসের ঢাকনা হিসাবে কাজ করে। অপর দিকে এর পত্রবৃন্তটি চ্যাপটা ও সবুজ হয়ে ফলকের মতো কাজ করে। ক্ষুদ্রাকৃতির কোনো পতঙ্গ সেই কলসের মধ্যে কোনোভাবে ঢুকে পড়লে ঢাকনাটি আস্তে করে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পতঙ্গ সেখানে আটকা পড়ে মরে যায়। বিবিধ প্রকার এনজাইমের (দ্র) প্রভাবে উদ্ভিদ ক্রমে তা হজম করে ফেলে এবং পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন (দ্র) সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

খ. *থলি* ঝাঁঝি নামক উদ্ভিদের পানিতে নিমজ্জিত পত্রফলক থলিতে রূপান্তরিত হয়। থলির এক প্রান্তে এমন একটি কপাটিকা (valve) থাকে যা কেবল ভেতরের দিকে খোলে। অতি ক্ষুদ্র জলজ কীটপতঙ্গ থলিটির কপাটিকা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে ঠিকই কিন্তু বাইরে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। অতপর থলির গা থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়ে পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে এবং পরে ঐ প্রোটিন-ঘটিত পদার্থ শোষণ করে। ঝাঁঝি বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সব অঞ্চলেই জন্মে।

গ. *সূর্যশিশির* ড্রসেরা (Drosera) নামক উদ্ভিদের গোলাকৃতির পত্রফলকের প্রান্তে কতকগুলো লাল বর্ণের কর্ষিকা আছে। প্রত্যেক কর্ষিকার অগ্রভাগ গোলাকার ও স্ফীত। কর্ষিকার অগ্রভাগ থেকে এক প্রকার চকচকে আঠালো পদার্থ নিঃসৃত হয়। ভোরবেলা তাতে

সূর্যরশ্মি পতিত হয়ে তা চকচকে দেখায়। ফলে কীটপতঙ্গ (দ্র) আকৃষ্ট হয়ে সেই পাতার উপরে বসলে আঠালো পদার্থে আটকে যায়। তখন কর্ষিকাগুলো বাঁকা হয়ে পতঙ্গের উপর আসে এবং তাকে ধরে ফেলে। পরে কর্ষিকা থেকে এনজাইম নির্গত হয়ে পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে এবং আমিষ-ঘটিত তরল পদার্থ ক্রমেই শোষণ করে থাকে।

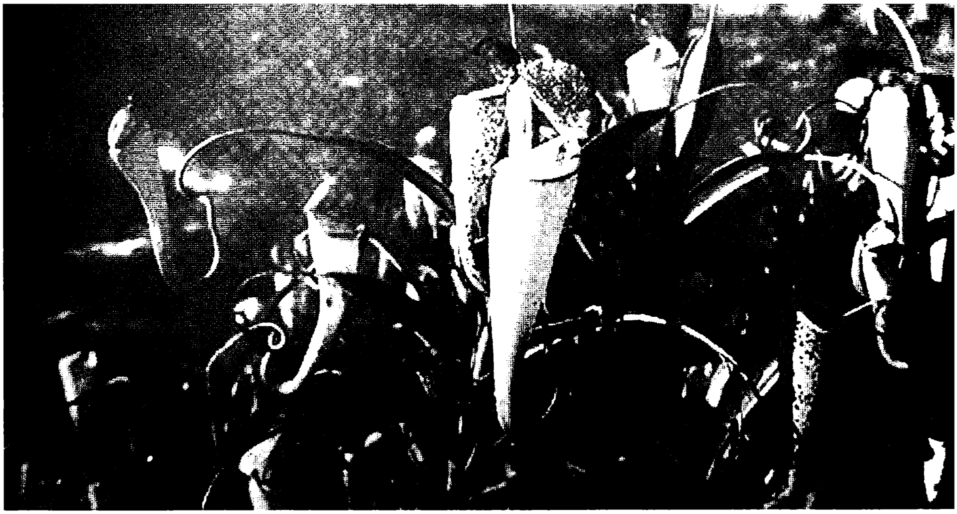

পতঙ্গভুক উদ্ভিদ

ঘ. *ডাইওনিয়া* ডাইওনিয়া উদ্ভিদের পত্রফলকের প্রান্তভাগ দাঁতের মতো। কোনো পতঙ্গ যখন ফলকের গাত্র স্পর্শ করে তখন অতি দ্রুত এর প্রান্ত দু'টি বেঁকে এসে মধ্যশিরা বরাবর সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে ডিম্বকের মতো একটি ফাঁদের সৃষ্টি হয় এবং তাতে পতঙ্গ আটকে যায়। শেষ পর্যন্ত পতঙ্গটি ডাইওনিয়া উদ্ভিদ কর্তৃক হজম হয়ে যায়।

মু. আ.

উপগ্রহ, কৃত্রিম (satellite)

মানুষের মহাশূন্য অভিযানের যুগ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে। কৃত্রিম উপগ্রহ হল মানুষনির্মিত ব্যবস্থা যা শক্তিশালী রকেটের (দ্র) মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কক্ষে স্থাপিত হয় এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যায় চাঁদের মতো। স্পুৎনিক-১-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। এ রকম অনেক উপগ্রহ আজ নিত্য আমাদেরকে বহু রকম কাজে সহায়তা করছে। এদের আকার, আয়তন, কাজ বিচিত্র রকমের। এদের কার্যকাল শেষে এক পর্যায়ে নিজেদের যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে যায়। মহাশূন্যে নানা রকম কণিকার সঙ্গে সংঘাতে গতি মন্থর হয়ে এক সময় এদেরকে ক্রমে পৃথিবীর কাছে চলে আসতে হয়। কক্ষপথে থাকার ন্যূনতম গতি বজায় না রাখতে পেরে এরা তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে এবং তার ঘর্ষণে জ্বলে উঠে ধ্বংস হয়ে যায়।

নিজ নিজ কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কৃত্রিম উপগ্রহে থাকে। সবগুলোকেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থান ঘোষণার

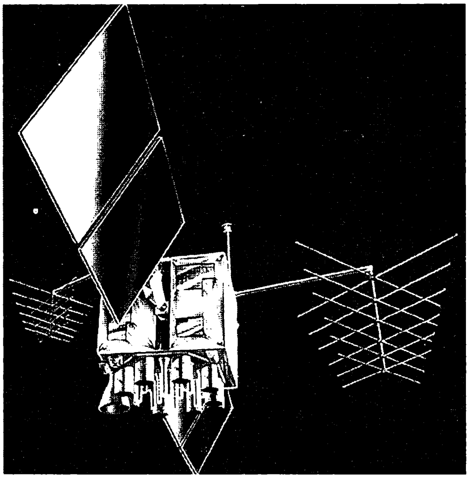

জন্য বেতারব্যবস্থা বহন করতে হয়। কাজ অনুসারে বর্তমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যায়।

যোগাযোগ উপগ্রহগুলো পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেলিফোন আলাপ, অন্যান্য টেলিসঙ্কেত, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি পৌঁছে

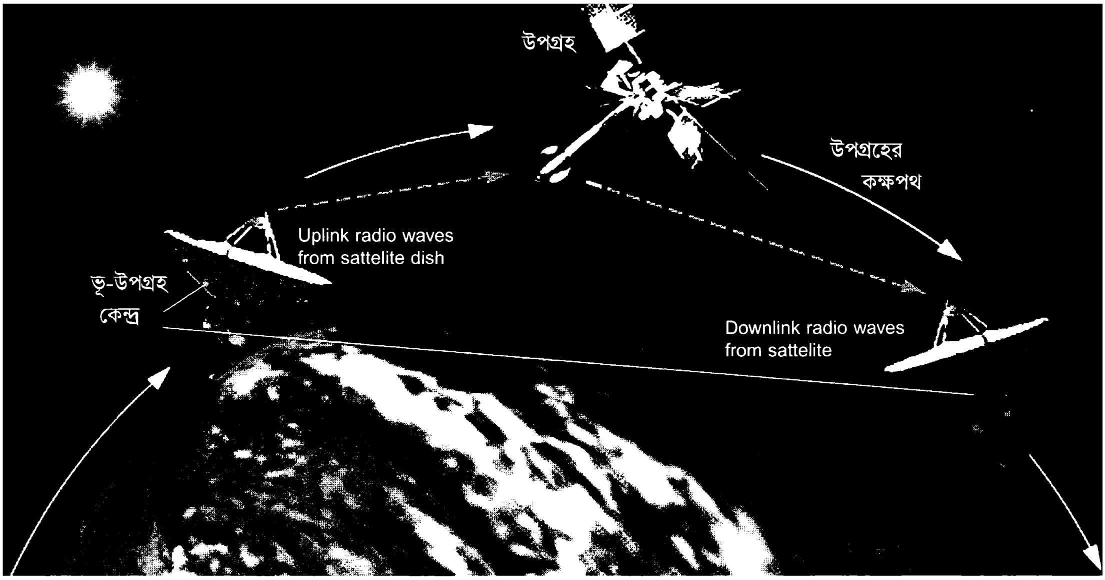

দিতে সাহায্য করে। ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে, এমনকি বাড়ির ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা দিয়ে আমরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সমলয়ে চলার ব্যবস্থা করলে এদের অনেকগুলোকে পৃথিবী থেকে স্থির দেখায়। এরা ভূ-স্থির উপগ্রহ।

আবহাওয়া উপগ্রহগুলো পরিক্রমাপথে বায়ুমণ্ডলে মেঘ, ঘূর্ণি ইত্যাদির ছবি তুলে প্রেরণ করে। অন্যান্য আবহাওয়া-তথ্যও দেয়, যার ফলে বিশাল জায়গার আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়।

দূর-অনুধাবন উপগ্রহগুলো ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবর্তন, কৃষি, বন, মৎস্য ইত্যাদির তথ্য নিয়মিত পাঠায় যা টেলিভিশনের মতো পর্দায় বিস্তারিত মানচিত্রে ফুটে ওঠে।

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও এ রকম উপগ্রহ বহু ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও চালিয়ে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সহজ হয় বলে জ্যোতির্বিদ্যার কাজেও কোনো কোনো উপগ্রহ ব্যস্ত রয়েছে। বিমান চালনা ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার সুবিধার্থে কিছু দিগ্‌দর্শক উপগ্রহ রয়েছে। আর কিছু উপগ্রহ রয়েছে যেগুলো যথেষ্ট গোপনে কাজ করে, সেগুলো সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

মু. ই.

উপত্যকা (valley)

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত সমতল বা অসমতল ঢাল ক্ষেত্রকে উপত্যকা বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল পর্বতশ্রেণিতে উপত্যকা দেখা যায়।

পর্বতের জলস্রোত থেকেই উপত্যকার সৃষ্টি হয়। পর্বত শিখরে বৃষ্টির জল জমে তা পর্বতের গা বেয়ে নিচে নামে। পর্বতের ঢাল খাড়া হওয়ায় জলস্রোতের গতি হয় প্রখর। জলের বেগে পাহাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এভাবে উপত্যকা সৃষ্টি হতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে।

হিমবাহ থেকেও কখনো কখনো উপত্যকা সৃষ্টি হয়। হিমবাহ হল বরফের নদী। হিমবাহ চলার পথে সমস্ত শিলাপাথরকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং উঁচু-নিচু জায়গা ভেঙে-চুরে নিয়ে মাটির উপর আস্তরণের সৃষ্টি করে উপত্যকার জন্ম দেয়।

কখনো কখনো নদীর গতিপথ বদলের ফলেও উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের উপত্যকাকে শুষ্ক উপত্যকা বলে।

প্রাচীন কাল থেকেই উপত্যকা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উপত্যকাতেই প্রাচীন সব সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে।

সুজ. ব

উপবৃত্ত (ellipse)

একটি সমতল দ্বারা কোনো কোণকে তির্যকভাবে ছেদ করলে যে তল পাওয়া যায় তার সীমা নির্দেশক রেখা হল উপবৃত্ত। অন্যভাবে বলা যায় একটি বিন্দু যদি এমনভাবে পরিভ্রমণ করে যেন দু'টি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ বিন্দুটির দূরত্বের যোগফল সর্বদা ধ্রুব হয় তা হলে পরিভ্রমণশীল বিন্দুটির সঞ্চারপথকে উপবৃত্ত বলে।

অথবা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যেসব বিন্দুর দূরত্ব এবং একটি নির্দিষ্ট রেখা থেকে একই বিন্দুসমূহের দূরত্বের অনুপাত একটি ধ্রুবক যা ১ থেকে ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা, সেই সব বিন্দুর সেটকে একটি উপবৃত্ত বলে। নির্দিষ্ট বিন্দুকে ফোকাস বা উপকেন্দ্র, নির্দিষ্ট রেখাকে দিগাক্ষ এবং ধ্রুবক অনুপাতকে উৎকেন্দ্রিকতা বলে। উপকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাকে প্রধান অক্ষ, প্রধান অক্ষের লম্বদ্বিখণ্ডককে উপাক্ষ বলে।

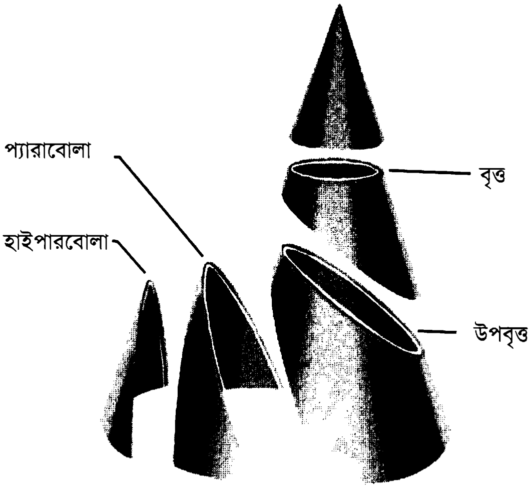

বিশেষ ধরনের কম্পাস দিয়ে উপবৃত্ত আঁকা হয়, যার নাম ইলিপসোগ্রাফ। কিন্তু সহজ উপায় হল, ফোকাস বিন্দুতে দুটো পিন পুঁতে পিন দু'টির সঙ্গে এমন একটি সুতার দুই প্রান্ত বেঁধে দেয়া যার দৈর্ঘ্য বিন্দু দ্বয়ের দূরত্ব থেকে বেশি হয়। সুতার মাঝামাঝি পেন্সিলটি চেপে কাগজের উপর উপবৃত্তের এক অর্ধাংশ আঁকা হবে। সুতোটি পিন থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে, একইভাবে আঁকলে উপবৃত্তের অন্য অর্ধাংশ আঁকা হবে।

স. রা.

উপসাগর (bay)

যে জলরাশির তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও কেবল এক দিকে সাগর সেই জলরাশিকে উপসাগর বলা হয়। যেমন– বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। সব বড় বড় সাগর যেমন মহাসাগরের অংশ তেমনি উপসাগরও সাগরের অংশ। আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, বঙ্গোপসাগর হচ্ছে ভারত মহাসাগরেরই প্রান্তিক সাগর।

সুজ. ব.

উপহ্রদ (lagoon)

সমুদ্রের উপকূলে সৃষ্ট ছোট হ্রদ। অনেক সময় জলরাশি সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রোপকূলে উপহ্রদের সৃষ্টি হয়।

উপকূল থেকে দূরে গোল বা চক্রাকারে যেসব প্রবাল-দ্বীপ গঠিত হয় তাকে প্রবাল-বলয় বলে। সাধারণত প্রবাল-বলয় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। এই প্রবাল-বলয়ের মধ্যভাগের অগভীর অংশে হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই হ্রদকেও উপহ্রদ বলে। উপহ্রদ অনেক স্থানে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অধিকাংশ উপহ্রদের তলদেশ প্রায় সমতল।

নদীর মোহনার কাছে বালিয়াড়িতে পানি আটকা পড়েও কখনো কখনো হ্রদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ ধরনের হ্রদকেও উপহ্রদ বলে। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের চিলকা হ্রদ এভাবে সৃষ্ট।

সুজ. ব.

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার [১৮৭৫-১৯৪৬]

বাঙালি চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' নামক ইনজেকশন আবিষ্কার করেন। এটি 'ব্রহ্মচারী ইনজেকশন' নামে অধিক পরিচিত। সে সময় কালাজ্বরের কোনো কার্যকরী ঔষধ ছিল না। তিনি ১৯২১ সালে এই ইনজেকশন আবিষ্কার করেন। তবে এর স্বীকৃতি পান আরো পরে।

উপেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের ৭ই জুন তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে

প্রথম হয়ে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এর পর একই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.বি. এবং এম.এ. পাশ করেন। এম.বি. পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি 'গুডিভ' ও 'ম্যাকলাইড' পদক পান। ১৯০২ সালে তিনি এম.ডি. এবং ১৯০৪ সালে শারীরতত্ত্বে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে উপেন্দ্রনাথ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার (materia medica) শিক্ষক এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। কারমাইকেল কলেজেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। এর পর ম্যালেরিয়া (দ্র), ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার এবং রসায়নশাস্ত্র (দ্র) বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ সালে উপেন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন বিলাতের 'রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনের' সদস্য। দেশীয় ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে লেখা তাঁর 'ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' বইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

উফশী ফসল (HYV crop)

উফশী কথাটি 'উচ্চ ফলনশীল' কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। ষাটের দশকের শুরু থেকে আমাদের দেশসহ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট উন্নতি সাধিত হয়। তারও কয়েক বছর আগে গমের ক্ষেত্রেও এ রকম পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এগুলো সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারায় উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবনের মাধ্যমে। এগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের গম ও ধানের ফলন অবিশ্বাস্য রকম বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছে। এ রকম বেশ কিছু দেশ থেকে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া সরে গিয়ে তারা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ শস্য রপ্তানিকারক দেশেও পরিণত হয়েছে। এ সাফল্যে অবদানের জন্য মার্কিন কৃষিবিদ নর্ম্যান বর্লাউগ (Norman E. Borlaug)-কে ১৯৭০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মেক্সিকো (Mexico)-তে উফশী গমের উদ্ভাবনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধানের ক্ষেত্রে গবেষণার নেতৃত্ব এসেছে ফিলিপাইনের ম্যানিলার কাছে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইরি' (দ্র)-র বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে।

উফশী ফসলের সাফল্যের মূলে কাজ করেছে বর্তমান জাতগুলো থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে যথাযথ জাতের মধ্যে কৃত্রিম সঙ্করায়ণ ঘটিয়ে নতুন গুণসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন। এসব জাত অধিক হারে সার (দ্র) গ্রহণ করে তাকে অধিক ফসলে পরিণত করতে সক্ষম। সাধারণত এরা বেঁটে জাত হয়ে থাকে যা ফসল বহনে অধিক সক্ষম এবং ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে নুয়ে পড়ে না। উৎপাদনশক্তি অধিকাংশ ব্যয়িত হয় ফসলের জন্য, খড়ের জন্য নয়। তা ছাড়া ফলনকাল কম বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই জমিতে বছরে তিনটি ফসলও সম্ভব হয়েছে।

উফশী ফসল সবুজ বিপ্লব এনেছে বটে, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে এর কিছু কুফলও স্পষ্ট হয়ে উঠছে– যা কালক্রমে আরো গুরুতর পরিণতি আনতে পারে। উচ্চ ফলন আসে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে। রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা আরো বাড়ছে কম খড় উৎপাদন, জমির বিশ্রাম না পাওয়া, শস্য আবর্তন না ঘটা ইত্যাদি কারণে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় না থাকায়। উফশী ফসল সাধারণত কীটপতঙ্গ, রোগ-বালাইয়ের দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। তাই এতে প্রচুর পরিমাণে কীট ও রোগ-নাশক প্রয়োগ করতে হয়। রাসায়নিক সার ও কীট-বালাই-নাশক দ্রব্যাদি গুরুতর পরিবেশদূষণের কারণ ঘটাচ্ছে। উফশী প্রবর্তনের ফলে লাভজনক একই ফসল এবং সে ফসলের মাত্র কয়েকটি জাত সর্বত্র ফলানোর প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কৃষিতে তাই ভারসাম্য থাকছে না, হাজার বছরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক জাত-বৈচিত্র্যও চিরতরে হারিয়ে আমরা এক সময় অসহায় হয়ে পড়তে পারি। উফশীর গবেষণাকে তাই এসব দিকে মনোযোগী হতে হবে।

মু. ই.

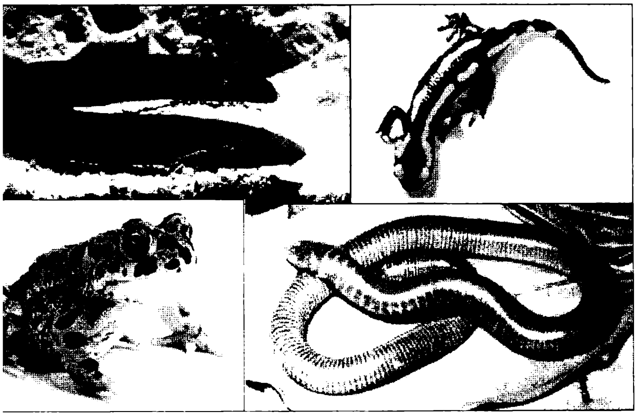

উভচর / লাঙ-ফিশ / সিলাকাঁথ (amphibian)

জলচর প্রাণীর প্রথম স্থল বিজয়ের অদ্বিতীয় ইতিহাস উভচর প্রাণীদের প্রতি আমাদের বিস্ময়কর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরেজিতে এই প্রাণীদের Amphibions animal বলা হয়। Amphi অর্থাৎ both বা উভয়। প্রায় চৌত্রিশ কোটি বছর আগে মৎস্য শ্রেণির একটি শাখায় লোব ফিন বা মাংসল পাখনা গজানোর প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। পরে দেহ আরো বিবর্তিত হয়ে তা লাঙ-ফিশ ও সিলাকাণ্ড বা ল্যাটিম্যারিয়ার রূপ পরিগ্রহ করে। তবে এ কাণ্ডটি কেন ঘটেছিল তার কারণ বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করেছেন।

সিলুরিয়ান যুগে ১০-২০ কোটি বছর আগে অনন্য লোনা জলের মধ্যে জেগে ওঠে চর, ডাঙ্গা। উদ্ভিদ সেই ডাঙ্গায় দখল নিতে শুরু করে। সেই স্থলভাগে বিশাল বিশাল জলাশয়ে বন্দি হয়ে পড়ে অসংখ্য মাছ। সূর্যের তাপে জলাশয় শুকানো শুরু হলে মাছেরা কী করবে? সাগরে ফিরে যাবার চেষ্টায় অনেকেই ডাঙ্গায় মারা পড়ে। ডাঙ্গায় বাঁচার জন্য অক্সিজেন সংগ্রহ করা চাই। ফুলকা দিয়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ সম্ভব নয়। তাই লাঙ-ফিশ ও সিলাফাসে ফুলকা ছাড়ার বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সেটি ছিল ফুসফুস জাতীয় বিকল্প প্রত্যঙ্গ। তাই দেখা গেল ডিভোনিয়ান যুগে ইফথিওস্টেওপ জল ছেড়ে ডাঙ্গায় রোদ পোহাচ্ছে।

স্থলভাগে দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল ত্বক শুকিয়ে যাওয়া বা denication। পরে চর্মের বিবর্তন দেখা দেয়। উভচরে ত্বকে মিউকাল গ্ল্যান্ড বা আর্দ্রগ্রন্থি, সরীসৃপে বর্মাবৃত কঠিন চর্ম। পাখিতে পালক, স্তন্যপায়ীতে লোম বা পুরুত্বক।

তৃতীয় সমস্যা হল মাধ্যাকর্ষণকে মোকাবিলা করা। প্রাণীকে কোটি কোটি বছর এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় নি। কারণ তারা সবাই ছিল জলচর। জল বাতাসের চেয়ে ঘনতর মাধ্যম। জলের প্লবতা (buoyancy) (দ্র) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের বিরুদ্ধে প্রাণীকে সহায়তা দান করেছে। বাতাস এ ক্ষেত্রে সহায়ক হল না। কাজেই মেরুদণ্ডকে হতে হল আরো মজবুত। বক্ষ পাখনা ও শ্রোণি পাখনায় শক্ত হাড়ের মেখলা বা গাউল তৈরি করতে হল। সেই মেখলা বা বক্ষও শ্রোণিচক্রের সাথে মেরুদণ্ডের বাঁধন আরো দৃঢ় করতে হল। ঐ দুই চক্র থেকে নিবর্তিত হল চার পা। চার পা ও শক্ত মেরুদণ্ড প্রাণীকে মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। সে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল।

চতুর্থ সমস্যা– খাবার সংগ্রহ ও অন্য প্রাণী থেকে আত্মরক্ষা। অর্থাৎ দেহকে গতিসম্পন্ন করা চাই। হাত-পা বা চার পায়ের হাড়ে বিবর্তনের ফলে এই সমস্যারও সমাধান পাওয়া গেল। এগুলোর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল উভচরের জীবন পরিক্রমায়।সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান ওরা আজো খুঁজে পায় নি। সমস্যা নিরাপদ প্রজননের। আজও ওরা ডাঙ্গায় ডিম ফোটানোর কৌশল রপ্ত করতে পারে নি যা সরীসৃপেরা পেরেছিল। কাজেই উভচরেরা সন্তান উৎপাদনের জন্যে সম্পূর্ণভাবে জলের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটে মাটির আশ্রয়ে, ডাঙ্গায়। কাজেই ব্যাঙ (দ্র), সিসিলিয়ান, স্যালামান্ডার কোটি কোটি বছর ধরেই উভচর জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে।

ত. চ.

উর্সটিড, হান্স ক্রিস্টিয়ান [১৭৭৭-১৮৫১]

দিনেমার বিজ্ঞানী। উর্সটিডের (Hans Christian Oersted) জন্ম ১৭৭৭ সালে ডেনমার্কে, মৃত্যু ১৮৫১ সালে। তড়িৎ-চুম্বকের আবিষ্কারক। ১৮২০ সালে উর্সটিড লক্ষ করেন, একটি বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে একটি চুম্বক-কম্পাস স্থাপন করলে কম্পাস (দ্র) কাঁটাটি নড়ে ওঠে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে

তিনি মন্তব্য করেন তড়িৎপ্রবাহ চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম তড়িৎ এবং চুম্বকের (দ্র) মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে মাইকেল ফ্যারাডে (দ্র), জোসেফ হেনরি, অঁদ্রে মারি অঁপ্যার এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

হান্স ক্রিস্টিয়ান কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭৯৯ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। হান্স ক্রিস্টিয়ান উর্সটিড পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া রসায়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি গ্যাস (দ্র) এবং তরল পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) মৌল (দ্র) নিষ্কাশন করেন, যদিও তা বিশুদ্ধ ছিল না। পরিবাহীর (দ্র) মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপের (দ্র) একক-এর 'উর্সটিড' নাম তাঁরই নামানুসারে দেওয়া হয়েছে।

স. রা.

উল্কা (meteoroid)

রাতের আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায় কোনো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যেন মহাশূন্যে ছুটে চলেছে, কিংবা

নিচের দিকে নেমে আসছে। মহাকাশে নিত্য পরিভ্রমণরত ছোট পাথর বা ধাতবখণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে ও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে উল্কাপাত (meteor) বলে। যেসব বস্তু এই উল্কাপাতের জন্য দায়ী, সেগুলোকে বলা হয় উল্কা (meteoroid)। অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার পরও কিছু সংখ্যক উল্কা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এগুলোকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড (meteorite)।

www.boighar.com

উল্কা মহাকাশে পরিভ্রমণ করতে করতে পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রচণ্ড গতিতে উল্কা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হয়। তাপমাত্রা এতই বৃদ্ধি পায় যে, উল্কার উপাদানগুলোকে গলিয়ে একেবারে গ্যাসে পরিণত করে। প্রচণ্ড উত্তাপে গ্যাস ও বায়ুকণা আয়নিত হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলের ঐ এলাকাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সচরাচর ভূপৃষ্ঠের ৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর আগেই উল্কা বাষ্পে পরিণত হয়।

পৃথিবী প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার উল্কার সংস্পর্শে এলেও এর মধ্যে গুটি কয়েক মাত্র ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়। উল্কাপিণ্ডের আকার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ গ্রহাণুর সমান হতে পারে।

মু. হা.

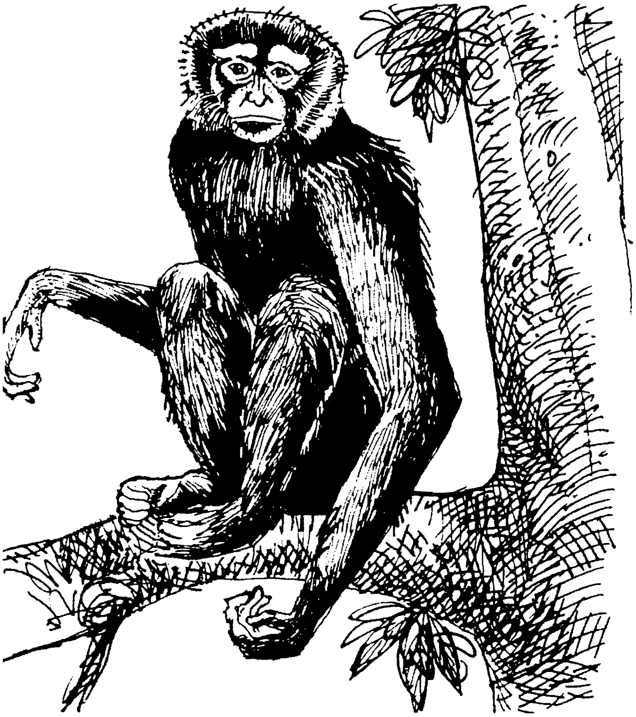

উল্লুক (gibbon)

উল্লুক, উলু বাঁদর (Hoolock gibbon)-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Hylobates hoolock*। এরা এক সময় ময়মনসিংহের শাওস ও পাতাঝরা বনে ছিল। এখন নেই বললেই চলে। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশের একমাত্র লেজবিহীন উল্লুক বান্দির। দেখতে কালো ও বাদামি রঙের, লম্বা হাত। সোজা হয়ে দাঁড়ালে এরা প্রায় ১ মিটার লম্বা হবে। ওজন প্রায় ৬-৭ কেজি। পুরুষ ও যুবতি উল্লুক কালো এবং প্রাপ্তবয়স্ক উল্লুক বাদামি রঙের হয়ে থাকে। উল্লুক লম্বা লম্বা হাতের সাহায্যে সহজেই গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঘুরে বেড়াতে পারে। এরা গভীর অরণ্যে খুবই দ্রুত চলতে পারে। একসাথে সকল উল্লুক হুঁ-হা করে ডাক দিয়ে এমনভাবে প্রতিশব্দ করে মনে হবে সারা বন জুড়েই উল্লুক ডাকছে। জোড়া বেঁধে বাচ্চাকাচ্চাসহ সর্বাধিক চারটি উল্লুক একসাথে থাকে। এরা পাখির ডিম ও ছানা খেয়ে থাকে। উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফল এদের খাদ্য। শীতের দিকে স্ত্রী-উল্লুক একটি বাচ্চা প্রসব করে।

রা. জা.

ঋ

ঋতু (season)

ভূপৃষ্ঠের জলবায়ুর (দ্র) বিশেষ বিশেষ তারতম্য অনুসারে বছরের বিভাগকে ঋতু বলা হয়। তাপের (দ্র) আধিক্য বা স্বল্পতার কারণে পর্যায়ক্রমে জলবায়ুর যে অবস্থান্তর ঘটে তাকে 'ঋতু-পরিবর্তন' বলে। পৃথিবীর (দ্র) কক্ষপথ কিছুটা ডিম্বাকার হওয়ায় পৃথিবীতে ঋতুর বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। আর সূর্যরশ্মি সারা পৃথিবীতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে না বলে সব জায়গায় ঋতুও এক হয় না। ঋতু প্রধানত চার প্রকার– বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত।

পৃথিবী নিজ অক্ষে সূর্যের (দ্র) চারদিকে ঘুরবার সময় কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ৬৬.৫° কোণ করে নিয়মিত স্থান পরিবর্তন করে। এভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণের ফলে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ কখনো সূর্যের দিকে হেলে পড়ে, আবার কখনো-বা দূরে সরে যায়। এতে সূর্য এক বার আলো ছড়ায় উত্তর গোলার্ধে, আরেক বার দক্ষিণ গোলার্ধে। উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন সেই অঞ্চলের দেশগুলোতে গ্রীষ্মকাল; আর দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলোতে শীত। আবার খাড়া সূর্যরশ্মির ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলোতে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন উত্তর অঞ্চলে শীত। প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর এই পরবর্তন ঘটে। এর মধ্যে সূর্যকে দু' বার বিষুবরেখা (equator) (দ্র) পার হতে হয়। ২১শে মার্চ এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য সরাসরি বিষুবরেখার ওপর অবস্থান করে। এই দুই বিশেষ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত সমান। এর ফলে ২২শে মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে সব সময় দিন এবং দক্ষিণ মেরুতে সব সময় রাত হয়। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত রাত এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত দিন থাকে।

উত্তর গোলার্ধে ২১শে মার্চ পর্যন্ত বসন্তকালের মাঝামাঝি অবস্থা থাকে। এ জন্য ২১শে মার্চকে বাসন্তবিষুব বা মহাবিষুব (spring or vernal equinox) বলে। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে

শরৎকালের মাঝামাঝি অবস্থা থাকে। এ জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বরকে শারদবিষুব বা জলবিষুব (autumnal equinox) বলে।

২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত সূর্যের উত্তর অয়নান্ত চলে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে সূর্যকিরণ লম্বা বা খাড়াভাবে পড়ে এবং দিনের দৈর্ঘ্যও সবচেয়ে বেশি হয়। এই কারণে উত্তর গোলার্ধে এ সময় গ্রীষ্মকাল থাকে। ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় ও গরম এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অর্থাৎ দিন সবচেয়ে ছোট হয় এবং সেখানে তখন খুব শীত পড়ে। ২১শে জুন মধ্যাহ্নে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই অক্ষাংশ সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ সীমা বলে ২১শে জুনকে উত্তর অয়নান্ত দিন বা উত্তরায়ণ দিন (summer solstice) বলা হয়।

২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্ত। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। আবার উত্তর গোলার্ধে এর ঠিক উল্টোটি ঘটে। ২২শে ডিসেম্বর ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে মধ্যাহ্ন-সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। দক্ষিণায়নে এটাই সূর্যের শেষ অবস্থান। তাই ২২শে ডিসেম্বরকে দক্ষিণায়ন দিন বা দক্ষিণ অয়নান্ত দিন (winter solstice) বলে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

পৃথিবীর জলবায়ু ও তাপ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বৎসরকে ৪টি ঋতুতে ভাগ করা হলেও বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে ৬টি ঋতুর নিয়ম প্রচলন আছে। এখানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠকে গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণকে বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিনকে শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণকে হেমন্ত, পৌষ-মাঘকে শীত এবং ফাল্গুন-চৈত্রকে বসন্ত বলা হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশও আছে, যেখানে বৎসরে দু'টি বা তিনটি ঋতু আছে।

সুজ. ব.

এ

এ.সি. (alternating current)

এ.সি. এর বাংলা হল পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহ। পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহ (এ.সি.) বলতে সেই তড়িৎপ্রবাহ বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট হারে দিক পরিবর্তন করে। পর্যাবৃত্ত তড়িৎপ্রবাহে তড়িৎ সংযোগের একটি প্রান্ত কিছুক্ষণ ধনাত্মক, পরমুহূর্তে আবার কিছুক্ষণ ঋণাত্মক– এভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এভাবে যখন সংযোগপ্রাপ্ত বা টার্মিনালের পোলারিটির পরিবর্তন হতে থাকে, টার্মিনালের সঙ্গে সংযুক্ত বর্তনীর মধ্যেও তখন তড়িৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন হতে থাকে। এ ধরনের বিদ্যুৎপ্রবাহকেই এ.সি. (A.C.) বা পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে। এর বিভবকে বলা হয় এ.সি. ভোল্টেজ। এ.সি. প্রবাহে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তড়িৎপ্রবাহের দিক এবং মান দুইই পরিবর্তিত হয়। প্রবাহ শূন্য থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ বেড়ে সর্বোচ্চ হয়, আবার ক্রমশ কমে শূন্য হয়। অতঃপর দিক পরিবর্তন করে উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে শূন্য থেকে ক্রমশ এর মান বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ মান থেকে আবার কমতে কমতে শূন্য হয়।

এভাবে একদিকে বাড়া-কমা এবং বিপরীত দিকে বাড়া-কমা নিয়ে একটি চক্র বা সাইকেল সৃষ্টি হয়। প্রতি সেকেন্ডে এ ধরনের সাইকেলের সংখ্যাকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি বলে। আমাদের দেশে পর্যাবৃত্ত প্রবাহের মূল কম্পাঙ্ক 50Hz (হার্জ)। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই কম্পাঙ্ক 50Hz।

তড়িৎ-চৌম্বক আলো দ্বারা জেনারেটরের সাহায্যে এ.সি. প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এ.সি. প্রবাহ যেমন উচ্চ ভোল্টেজ সম্পন্ন এবং দূর দূরান্তে প্রেরণ সম্ভব তেমনি এর ব্যবহারও ব্যাপক। শহর, নগর, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা সর্বত্রই এ.সি. প্রবাহ ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

এইড্‌স (AIDS)

এইড্‌স একটি ভয়াবহ ঘাতক ব্যাধি। এর পুরো নাম 'একোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম' (Acquired

Immune Deficiency Syndrome)। হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immunodeficiency Virus), সংক্ষেপে এইচআইভি (HIV) সংক্রমণের কারণে এইড্‌স দেখা দেয়। নানাভাবে এই সংক্রমণ ঘটতে পারে, যেমন- এইড্‌স ভাইরাস দ্বারা দূষিত সুচ দিয়ে ইনজেকশন নেওয়া, ঐ ভাইরাসদুষ্ট রক্ত পরিভরণ কিংবা ভাইরাসবাহক নর-নারীর দৈহিক মিলন।

এ রোগের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। তবে জ্বর, দ্রুত ওজন হ্রাস, অত্যধিক দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণের মাধ্যমে রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। এতে দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় বলে রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। এইড্‌স বিরোধী কার্যকর ঔষধ বা টিকা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তাই এর কারণ থেকে দূরে থাকাই এই ভয়াবহ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়।

আ. র.

এটিপি (atp)

উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফসফেটযুক্ত যৌগ। জীবদেহে শক্তি যোগানোর সরাসরি প্রধান উৎস। কোষের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, মাংসপেশির সঙ্কোচন এবং আরো অনেক

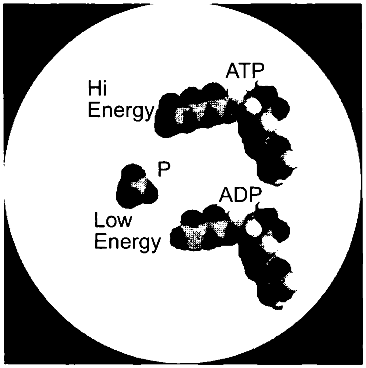

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটিপি এবং এর সমগোত্রীয় উপাদানসমূহ শক্তি যোগায়। এমনকি জোনাকি পোকার মতো অনেক প্রাণীর আলোকপ্রভা তৈরি করায় এর ভূমিকা রয়েছে। অ্যাডেনিন (একটি নাইট্রোজেন যৌগ) এবং রাইবোজ (একটি চিনি জাতীয় যৌগ) যুক্ত হয়ে অ্যাডেনোসিন তৈরি হয়। অ্যাডেনোসিনের সঙ্গে শিকলের মতো পর পর তিনটি ফসফেট মূলক যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয়। এই ফসফেট মূলক একের পর এক বিযুক্ত হয়ে এডিপি (adenosine diphosphate- এতে দুটো ফসফেট মূলক আছে) এবং এএমপি (adenosine monophosphate- এতে একটি ফসফেট মূলক আছে) তৈরি হয়। প্রতিটি ফসফেট মূলক বিযুক্ত হওয়ার সময় প্রচুর শক্তি বিমুক্ত হয় এবং তা কোষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সা. এ.

এডিসন, টমাস আলভা [১৮৪৭-১৯৩২]

বিদ্যুৎ-শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। এডিসনের (Thomas Alva Edison) জন্ম আমেরিকায়, ১৮৪৭ সালে। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ

করতে উৎসাহ বোধ করতেন। ১৮৬৮ সালে আবিষ্কার করেন ভোট রেকর্ড করার যন্ত্র। এর নয় বছর পর ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন ফোনোগ্রাফ। এই ফোনোগ্রাফই পরে 'গ্রামোফোন' (দ্র) নামে পরিচিত হয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাল্ব। দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে তিনি এতে সাফল্যলাভ করেন। কার্বন টেলিফোন ট্রান্সমিটার আবিষ্কার করে

তিনি টেলিফোন (দ্র) আবিষ্কারের সূচনা করেন। চলন্ত ছবি অর্থাৎ আজকের সিনেমার ক্যামেরা (দ্র) আবিষ্কারও তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৯৩২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সু. ব.

এন্ডোস্কপি (endoscopy)

গ্রিক ভাষায় endon মানে ভেতরে আর skopein মানে পরীক্ষা করে দেখা– endoscopy'র অর্থ তাই দেহের ভেতরে পরীক্ষা করা। শরীরের ভেতরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে যেগুলো ফাঁপা (hollow) সেগুলো পরীক্ষা করার জন্য এক রকম যন্ত্র রয়েছে। এই যন্ত্রে একটি নল থাকে, যা সাধারণত নরম। এই নলের সঙ্গে থাকে লেন্স, অপটিক ফাইবার ও আলোর উৎস। এই যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের ভেতরের কোনো ফাঁপা অঙ্গ চোখে দেখে পরীক্ষা করাকে বলা হয় এন্ডোস্কপি।

এন্ডোস্কপির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে অন্ত্রনালি পরীক্ষা করার কাজে। মুখ দিয়ে নলটি প্রবেশ করিয়ে অন্ত্রে, অন্ননালিতে ঘা, টিউমার, বা অন্য কোনো ব্যাধি সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। অস্থিসন্ধিতেও এই যন্ত্রটি প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব। শুধু রোগ শনাক্ত করতেই নয়, অপারেশন বা শল্যচিকিৎসায়ও এই যন্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। পেট পুরো না কেটে ছোট ছিদ্র করে, এই যন্ত্রের সাহায্যে চোখে দেখে শল্যচিকিৎসা করাকেই বলা হয় ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি।

আ. নূ. তু.

এনজাইম (enzyme)

জীবদেহে এমন কিছু প্রোটিন অণু (দ্র) সৃষ্টি হয় যার কাজ হল দেহের জরুরি কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুততর করা। এই অণুগুলোকে বলা হয় এনজাইম। এনজাইম রাসায়নিক অণুঘটক হিসাবে কাজ করে এই সব বিক্রিয়াকে হাজার গুণ এমনকি লক্ষগুণ দ্রুততর করে, অথচ শেষ অবধি নিজে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। বরং একই এনজাইম অণু এভাবে বার বার হাজার বার পর্যন্ত একই কাজ পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এর অভাবে বহু বিক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুততায় সম্পন্ন হত না বা একেবারেই সংঘটিত হত না। ফলে জীবনপ্রক্রিয়াই সম্ভব হত না।

১৯২৬ সালে জীবকোষ থেকে প্রথম বিশুদ্ধ এনজাইম নিষ্কাশন সম্ভব হয়। ১৯৬৯ সালে প্রথম কৃত্রিমভাবে এনজাইম তৈরি করা হয়। এনজাইমের অভাব নানা রকম উপসর্গ সৃষ্টি করে বলে ঔষধে এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। তা ছাড়া রোগ নির্ণয়ে এবং কিছু ব্যতিক্রমী চিকিৎসার কাজেও এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষত পরিষ্কার, রক্তনালিতে জমাট রক্ত সরানো ইত্যাদি। শিল্পক্ষেত্রেও এনজাইমের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে; যেমন– অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র), রুটি, পনির (দ্র), ভিনিগার, ভিটামিন (দ্র) ইত্যাদি তৈরিতে, মাংস নরম করতে, ঘাম প্রভৃতি জৈব দাগ পরিষ্কার করতে ডিটারজেন্টে।

মু. ই.

এপ্ (ape)

মানবজাতির খুব কাছাকাছি এক ধরনের প্রাণী। এ রকম প্রধান প্রাণী আছে চারটি : শিম্পাঞ্জি, গিবন, গরিলা এবং ওরাংওটাং। এদের দেহ লোমে ভরা। লেজ নেই। পায়ের চেয়ে হাত দীর্ঘ। হাত ও পায়ের আঙুল লম্বা লম্বা। মস্তিষ্ক বেশ বড়। বুদ্ধিতে মানুষের কাছাকাছি। বানর ও বেবুন কিন্তু এপ্-শ্রেণিভুক্ত নয়।

শারীরিক দিক দিয়ে এরা অনেকটা মানুষের মতো। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা এদের এবং মানবজাতির পূর্বপুরুষ ছিল একই কোনো জীব, কিন্তু এরা মানুষের মতো সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। মানুষের পা হাতের চেয়ে দীর্ঘ। দেহে লোম অনেক কম।

বানরের সঙ্গেও এদের বেশ মিল রয়েছে, কিন্তু এপ্-এর মতো বুদ্ধি বানরের নেই। বানর চার হাত-পা এপ্-এর চেয়ে আরো স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে গাছে গাছে ঝাঁপাঝাঁপি, ঝোলাঝুলি এবং মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। উপরন্তু, বানরের লেজ আছে।

আকারে গরিলা সবচেয়ে বড়, তার পর ওরাংওটাং এবং তার পর শিম্পাঞ্জি। সবচেয়ে ছোট হল গিবন। খাদ্য হিসাবে গরিলা লতাগুল্ম ও চারাগাছ এবং অন্যেরা গাছের ফল খেয়ে থাকে।

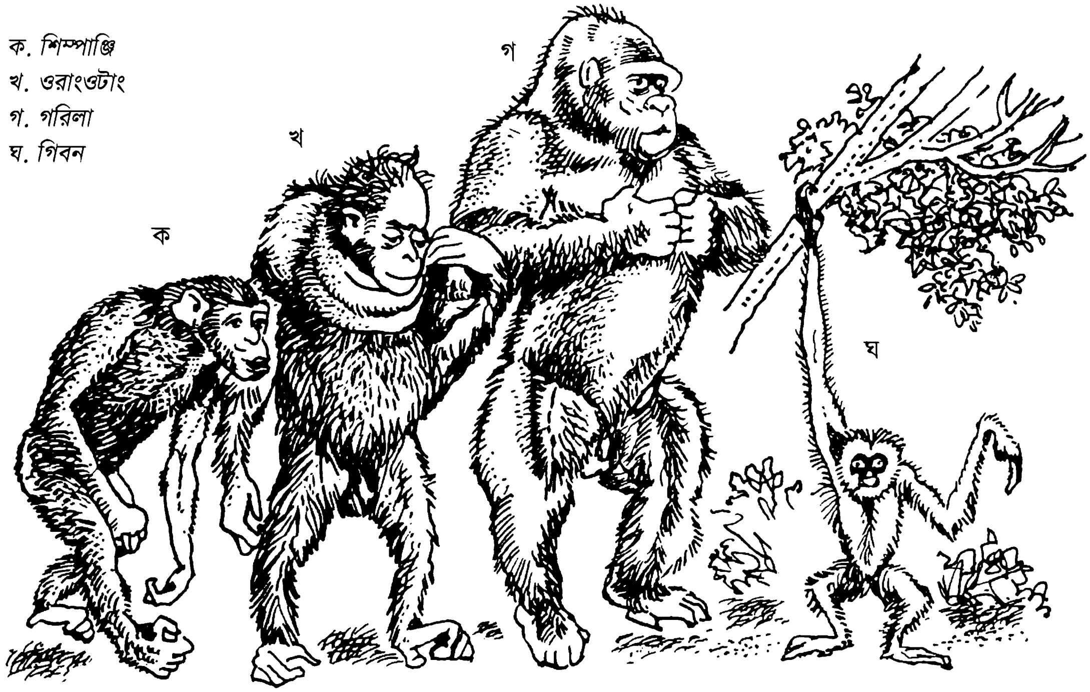

গিবন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনে-জঙ্গলে পাওয়া যায়। শিম্পাঞ্জি দেখা যায় পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকায়। গরিলা পাওয়া যায় পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এবং পূর্ব আফ্রিকার পার্বত্য বনাঞ্চলে। ওরাংওটাং এশিয়া মহাদেশের বোর্নিও এবং সুমাত্রার জঙ্গলে বাস করে।

গিবন পুরুষ ও মেয়েরা বাচ্চাসহ পরিবারের মতো বসবাস করে। শিম্পাঞ্জি বিশ থেকে চল্লিশটি পর্যন্ত একত্রে থাকে। ওরাংওটাং সাধারণত একা থাকে, তবে মেয়েরা সন্তানাদি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বয়স্ক পুরুষ গরিলাদের পিঠে সাদা লোম গজায় এবং এদেরই একজনকে দলনেতা হিসাবে নিয়ে বিশটি পর্যন্ত এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

সৈ. আ. ই.

এপিকিউরাস [খ্রি.পূ. ৩৪১-২৭০]

প্রাচীন গ্রিক বস্তুবাদী দার্শনিক ও নীতিশাস্ত্রবিদ। তাঁর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দে এবং মৃত্যু ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এপিকিউরাস (Epicurus) সুখবাদের প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত এবং তাঁর এই মতবাদ 'এপিকিউরানিজম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এথিক্স বা নীতিজ্ঞানই তাঁর দর্শনের প্রধান বিষয়। তাঁর মতে, জ্ঞান অন্বেষণ ও অর্জনের মূল উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার নীতিবোধে পৌঁছানো। দর্শনের দায়িত্বই তাই। কর্মের উদ্দেশ্য দুঃখকে পরিহার করে সুখ অর্জনের চেষ্টা। তবে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাহায্যে যথার্থ সুখের অন্বেষণই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। সব সুখের উৎস

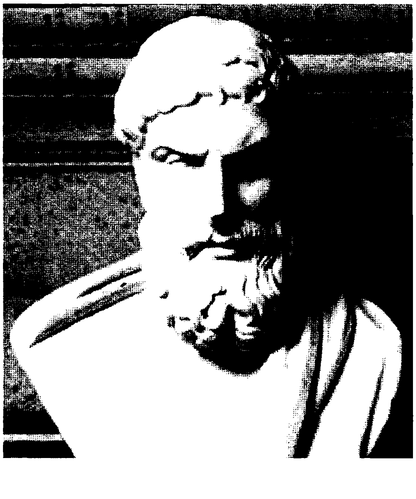

দেহ, দৈহিক সুখেই মনের সুখ, যেমন– ক্ষুধার নিবৃত্তি মনে শান্তি এনে দেয়। তবে, সুখভোগে পরিমিতি রক্ষা করা দরকার। আবার সুখের প্রকৃতিও বিচার্য বিষয়। তাই অপরিহার্য ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতেই যথার্থ সুখ মেলে। এপিকিউরাসের প্রচারিত সুখবাদ নির্বিচার ইন্দ্রিয়সুখের তত্ত্ব নয়, অথচ ভুল করে এমনটাই মনে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বস্তুবাদী দর্শন ও যুক্তিবাদের সাহায্যেই দর্শন তৈরি করেছেন।

সত্য, বস্তুসত্তা, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কেও এপিকিউরাসের মতামত সেই প্রাচীন যুগেও যথেষ্ট মৌলিক ও আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হবার কারণে তা জ্ঞানের যথার্থতা বা সত্যের পরিমাপক। মানুষের মন হল ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভবের সঞ্চয়গৃহ। ডেমোক্রিটাসের (দ্র) মতো এপিকিউরাসও মনে করতেন, বস্তুর মূলে রয়েছে সংখ্যাতীত অণুর (দ্র) উপস্থিতি। অণুর সংযোজন ও বিয়োজনে বস্তুর সৃষ্টি ও বিনাশ। তিনি ছিলেন নাস্তিক্যবাদী। তাঁর মতে– ভূত, ভগবান ও পরকালের ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারলে মানুষের পক্ষে শান্তিলাভ সম্ভব। তিনি আরো মনে করতেন, যুক্তি এবং অযুক্তির সমন্বয়ে মানুষ। মৃত্যুর পর দেহের অন্যান্য অংশের মতো আত্মারও আণবিক বিয়োজনের মাধ্যমে বিলোপ ঘটে।

আ. র.

এফ. আর. খান, ডক্টর [১৯২৯-১৯৮২]

বিশ্বখ্যাত বাঙালি স্থপতি। পুরো নাম ফজলুর রহমান খান। তিনি ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার ভাণ্ডারিকান্দি গ্রামে। পিতা শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর রহমান খান। তিনি ১৯৪৪ সালে আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার কারণে বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকার তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা BUET) পরীক্ষা দিয়ে পুরকৌশলে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

দু' বছর পর ১৯৫৩ সালে এফ. আর. খান ফুলব্রাইট স্কলার রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (Illinois Institute of Technology)-তে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং (structural engineering) বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর ১৯৫৫ সালে তিনি Theoretical and Applied Mechanics বিষয়ে এম.এস. করেন।

অধ্যয়ন শেষে ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রকৌশলী সংস্থা Skidmore Owinge and Merill (সংক্ষেপে SOM)-এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। এই পদে দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রাকপীড়নকৃত (pre-stressed) কংক্রিটের রেলসেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দেশে ফিরে Karachi Development Authority-তে কিছুদিন চাকুরি করে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান এবং পূর্বতন SOM প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এর পর ক্রমান্বয়ে তাঁর পদোন্নতি হতে হতে ১৯৭০ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে অংশীদার পদে অধিষ্ঠিত হন। এখানে কর্মরত অবস্থায় ১৯৬০ সালে তিনি Illinois Institute of

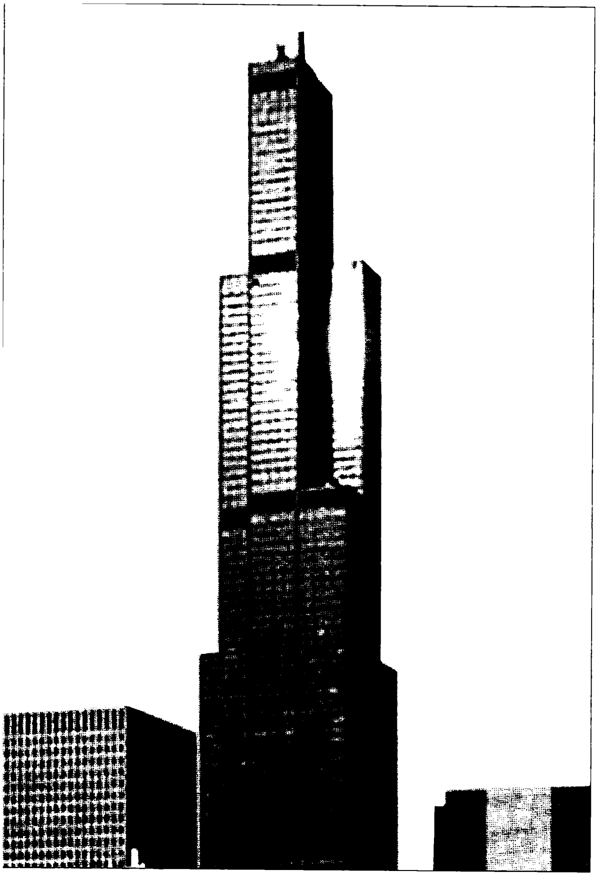

সিয়ার্স টাওয়ার (উইলিস টাওয়ার), শিকাগো

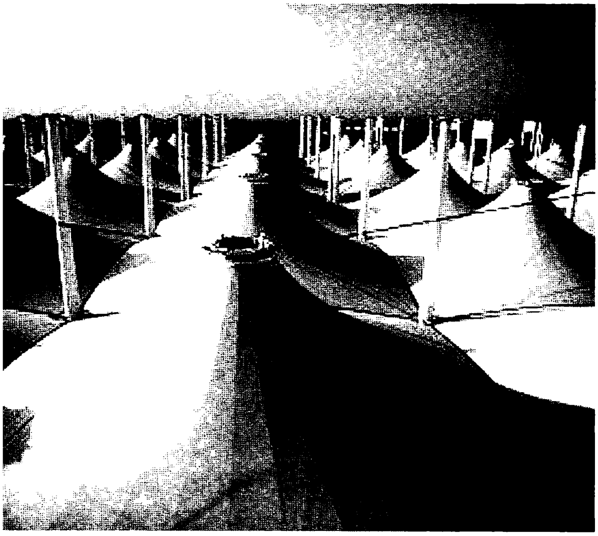

হজ্ব টার্মিনাল, জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

Technology-তে Adjunct Professor of Architecture পদে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

এফ. আর. খান বিশ্বের উচ্চতম ভবনের ডিজাইনার হিসাবে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত নির্মাণ-পদ্ধতি Tubular System বা নলাকৃতি বিন্যাস নামে খ্যাত।

এফ. আর. খান বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং আমেরিকার সর্বোচ্চ ভবন শিকাগো শহরে অবস্থিত সিয়ার্স টাওয়ার (Sears Tower) এর নকশা প্রণেতা। সম্প্রতি এ টাওয়ারের নতুন নামকরণ হয়েছে উইলিস টাওয়ার। ১৯৯৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ৪৫০ মিটার উঁচু পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার উদ্বোধন হওয়ার আগ পর্যন্ত সিয়ার্স টাওয়ারই ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। এর মোট উচ্চতা ৪৪৩ মিটার বা ১৪৫৪ ফুট। তাঁর অন্যান্য স্থাপত্য অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– জন হ্যানকক সেন্টার (১০০ তলা), জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হজ্ব টার্মিনালের পঞ্চাশ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বৃহত্তম ছাদ কাঠামো এবং মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য মডেল প্রণয়ন। জেদ্দা বিমানবন্দরের ডিজাইনের জন্য তিনি আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার লাভ করেন।

এফ. আর. খান ১৯৭২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড-এ কনস্ট্রাকশান ম্যান অব দ্য ইয়ার বলে আখ্যায়িত। মোট ৪ বার তিনি এই গৌরব লাভ করেন। নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি ১৯৭৩ সালে ও ১৯৮০ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক গগনচুম্বী ভবন ও নগরায়ণ পরিষদের চেয়ারম্যান এবং Studies in Islamic Architecture-এর উপদেষ্টা ছিলেন। মুসলিম স্থাপত্য নিয়ে তিনি নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। উঁচু ভবনের ডিজাইন সম্পর্কে International Council of Tall Building and Urban Habitat পাঁচ খণ্ডে যে Monograph প্রকাশ করেছে তার অন্যতম প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি।

এফ. আর. খান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২ সালের ২৬শে মার্চ তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

এয়ার-কন্ডিশনিং (air-conditioning)

বাতাসের (দ্র) উত্তাপ, আর্দ্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং দালানের ভেতরে এর সঞ্চারণকে এয়ার-কন্ডিশনিং বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সাধারণত শরীরের জন্য আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর বাতাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অথবা গবেষণাগার, সূক্ষ্ম কাজের শিল্প-কারখানা ইত্যাদিতে এ রকম নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে এয়ার-কন্ডিশনিং-এর কাজ হল বাতাসকে পরিষ্কার করা, ঠাণ্ডা করা এবং এর থেকে কিছু আর্দ্রতা দূরীভূত করা। শীতল ও শুষ্ক অবস্থায় পরিষ্কার করা ছাড়া বাকি কাজগুলো করতে হয় উল্টো-উত্তপ্ত করা আর আর্দ্রতা যোগ করা। এই সঙ্গে সব অবস্থায় বাতাস সঞ্চালনের কিছু ব্যবস্থা থাকে।

বাতাসের ময়লা ধুলাবালি ইত্যাদি দূর করা হয় একরকম ফিল্টার বা ছাঁকনির মধ্য দিয়ে বাতাসকে নিয়ে গিয়ে। সাধারণত কাচতন্তু বা ধাতবতন্তুতে গড়া উলের মতো জিনিসকে চটচটে তরলে ডুবিয়ে এ ছাঁকনি তৈরি করা হয়। কোনো কোনো ব্যবস্থায় পানির ফোয়ারা অথবা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণকেও বাতাসের ধুলাবালি সরাতে ব্যবহার করা হয়। বাতাসকে ঠাণ্ডা করা হয় শীতলীকৃত পানি বা অন্য তরলের উপর দিয়ে তা নিয়ে গিয়ে। তরলকে ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়া যে কোনো হিমায়কের মতোই। সাধারণত বৈদ্যুতিক মোটরের (দ্র) সাহায্যে বিশেষ গ্যাস (দ্র)-কে সঙ্কুচিত করে এবং পরে একে প্রসারিত হতে দিয়েই শীতলতা সৃষ্টি করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় বাতাসের আর্দ্রতাও কমে যায়। কারণ শীতল বাতাস অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্রতা ধারণ করতে পারে। বাতাসকে উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হলে তাকে উত্তপ্ত পানি অথবা স্টিম ভরা নলের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় পানির ফোয়ারার মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত বাতাসকে নিয়ে গিয়ে কিছু আর্দ্রতা যোগ করা হয়। সরাসরি কক্ষের মধ্যে অথবা ঘরে ঘরে হাওয়া বিশেষ বায়ু-চ্যানেলের ভেতর দিয়ে পাখার সাহায্যে সঞ্চালিত করাও এয়ার-কন্ডিশনিং-এর একটি কাজ। কারণ, গতিহীন বাতাস আরামপ্রদতার সহায়ক নয়। এয়ার-কন্ডিশনিং ছোট একটি যন্ত্র, জানালার সঙ্গে লাগিয়ে একটি কামরার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার পুরো একটি বাড়ি বা বিশাল দালানের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবেও এর আয়োজন করা যেতে পারে বৃহত্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে।

মু. ই.

এল. ই. ডি. আলোক নিঃস্বারক ডায়োড দ্র

এলপিজি (LPG)

LPG-র পুরো নাম liquified petroleum gas বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস।

অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (crude petroleum) হল হাইড্রোকার্বন (দ্র) (হাইড্রোজেন ও কার্বনের জৈব যৌগ)-এর এক জটিল মিশ্রণ। এই পেট্রোলিয়ামের উপাদান হাইড্রোকার্বনসমূহের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। এ কারণে পেট্রোলিয়াম বিশোধনের একটি প্রধান উপায় হল আংশিক পাতন। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের গ্যাসীয় ও তরল– উভয় অংশ রয়েছে। পাতনের শুরুতে গ্যাসীয় অংশ গ্যাস আকারে বের হয়ে আসে। এসব গ্যাসের মধ্যে রয়েছে মিথেন (দ্র), ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন হাইড্রোকার্বন এবং কিছুটা খাদ হিসাবে নাইট্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র) ও সালফার (দ্র)। গ্যাস ছাড়া অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (দ্র) থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য পদার্থ হল– পেট্রোল, কেরোসিন (দ্র), ডিজেল (দ্র), ফার্নেস তেল এবং টার বা আলকাতরা (দ্র)।

গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে মিথেন ও ইথেন বাদে প্রোপেন ও বিউটেনকে তরলীকরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এভাবে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি পাওয়া যায়। কিছুটা ইথেন ও মিথেনসহ এলপিজি-তে ৭০-৪০ শতাংশ প্রোপেন ও ৩০-৬০ শতাংশ বিউটেন থাকে।

এলপিজি-র জ্বালানি ক্ষমতা প্রাকৃতিক গ্যাসের কাছাকাছি, তাই গৃহকর্ম ও হালকা শিল্প-কারখানায় জ্বালানি হিসাবে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এলপিজি-র সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একে ধাতব বোতলে ভরে বিভিন্ন স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।

বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগারে বর্তমানে গড়ে প্রতিবছর ৬০০০ টন এলপিজি উৎপাদিত হয়।

মু. হা.

এলার্জি (allergy)

বিশেষ কোনো উপাদানের প্রতি শারীরিক সংবেদনশীলতার কারণে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার নাম এলার্জি। এলার্জি-সৃষ্টিকারী কোনো উপাদান একজনের শরীরে এলার্জি সৃষ্টি করলেও অন্যের শরীরে তা এলার্জি (দ্র) নাও ঘটাতে পারে।

দেহে এলার্জি দেখা দিলে তা বিভিন্ন রকম শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন– হাঁপানি, সর্দি, চুলকানি, ত্বক (দ্র) লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা, হজমের ব্যাঘাত ইত্যাদি। যে সকল উপাদানের প্রভাবে এলার্জি দেখা দিতে পারে সেগুলো হল– ধুলাবালি, ফুলের রেণু, গৃহপালিত প্রাণীর পশম, বিভিন্ন রকম খাবার, যেমন– ডিম (দ্র), চিংড়ি (দ্র) মাছ, ইলিশ (দ্র) মাছ, গরুর (দ্র) মাংস, পাকা কলা (দ্র), কচু (দ্র), বেগুন (দ্র), ফুলকপি (দ্র) এবং অনুরূপ শাক-সবজি ইত্যাদি। মানসিক উত্তেজনা এবং বংশগত কারণেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

এলার্জি সম্পূর্ণ নিরাময় সব সময় নাও ঘটতে পারে। তবে এর তীব্রতা ও উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তীব্র এলার্জির ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসাগ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তা গুরুতর শারীরিক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। এলার্জির লক্ষণ নিরাময়ের জন্য প্রধানত 'অ্যান্টিহিস্টামিন' (antihistamine) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। গুরুতর অবস্থায় 'কর্টিসোন' (cortisone) জাতীয় ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে।

সি. না. হ.

এস্কিমো ইগলু দ্র

ও

ওজোন (ozone)

অক্সিজেনের একটি বহুরূপ। অক্সিজেন (দ্র) গ্যাসের প্রতিটি অণু (দ্র) দু'টি পরমাণু (দ্র) সমবায়ে গঠিত (O_2)। তিনটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় ওজোন গ্যাস (O_3)। প্রকৃতিতে উপস্থিত অক্সিজেনের (দ্র) উপর অতিবেগুনি রশ্মির (দ্র) ক্রিয়ায় গঠিত হয় ওজোন গ্যাস। ওজোন গ্যাসের গলনাঙ্ক ১৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক ১১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ওজোন গ্যাস সামান্য নীলাভ আঁশটে গন্ধযুক্ত অস্থায়ী গ্যাস। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যাপারে এটি খুবই সক্রিয়। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ অতি সামান্য। সমুদ্রতীরের বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ বেশি। তাই সমুদ্রের বায়ু স্বাস্থ্যকর। পানির জীবাণু বিনাশ এবং পানি (দ্র) বিশুদ্ধ করার জন্য ওজোন গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভূপৃষ্ঠের ১৫-২৫ কিলোমিটার উঁচুতে অপেক্ষাকৃত ঘন ওজোন গ্যাসের স্তর রয়েছে। এই স্তর সূর্যের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

সু. ব.

ওয়াট, জেম্‌স্ [১৭৩৬-১৮১৯]

বিখ্যাত ব্রিটিশ যন্ত্রবিদ। জন্ম ১৭৩৬ সালে, স্কটল্যান্ডে। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী। ১৭৫৮

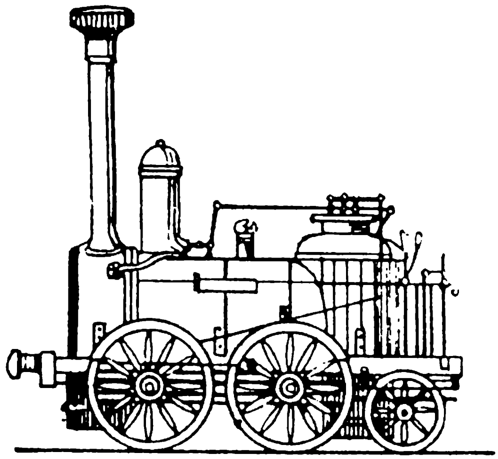

প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন (দ্র)। এর পর এই ইঞ্জিন আরো উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি কাজ করতেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক হিসাবে। তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণায় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অনেক উন্নয়ন সাধন করতে তিনি সক্ষম হন। ১৮১৯ সালে জেম্স্ ওয়াট পরলোক গমন করেন।

সু. ব.

ওয়েল্ডিং (welding)

ধাতুর দু'টি খণ্ডকে এদের সংযোগস্থলে গলিয়ে স্থায়ীভাবে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার নাম ওয়েল্ডিং। এভাবে ধাতুখণ্ড দু'টি কার্যত একটি খণ্ডে পরিণত হয় এবং জোড়ের জায়গাটুকু ধাতুর অন্য অংশের মতোই সমান শক্ত থাকে। ওয়েল্ডিংয়ের চারটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে

(১) আর্ক ওয়েল্ডিং এতে বিদ্যুৎবর্তনীর ছোট্ট ব্যবধানে উচ্চ বিদ্যুৎবিভবের ফলে যে আর্ক বা জোরালো স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তার উত্তাপে ধাতু গলানো হয়। জুড়বার একটি ধাতুখণ্ড বিদ্যুৎবর্তনীর অংশ হয়, আর হাতে অপরিবাহী হাতলের সাহায্যে ধরে রাখা একটি ইলেকট্রোড ঐ খণ্ডের খুব কাছে নিয়ে আর্ক সৃষ্টি করা হয়।

(২) গ্যাস ওয়েল্ডিং এতে অ্যাসিটিলিনের মতো একটি দাহ্য গ্যাসকে অক্সিজেন সহযোগে জ্বালিয়ে যে অত্যন্ত উত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি হয় তার উত্তাপেই ধাতু গলানো হয়। হাতে ধরে কাজ করা যায় এমন একটি ওয়েল্ডিং টর্চে গ্যাস দু'টির মিশ্রণ ঘটিয়ে ছোট-বড়, সরু-মোটা, কম-বেশি উত্তপ্ত নানা রকম শিখার সৃষ্টি করা যায়।

(৩) রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং বিদ্যুৎবর্তনীর কোথাও রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সেখানটায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে উত্তাপ দেবার দু'টি ধাতুখণ্ডই একটি বিদ্যুৎবর্তনীর অংশ হয় এবং তাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরলে সংযোগস্থলে অতিরিক্ত রেজিস্ট্যান্স সৃষ্টি হয়ে তা উত্তপ্ত হয় ও গলে যায়।

(৪) ব্রেজিং অধিক উত্তাপ ব্যবহার করা অনুচিত হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এতে তৃতীয় একটি ফিলার বা পূরণকারী সরু ধাতুদণ্ড গলিয়ে জুড়বার ধাতুদ্বয়ের ফাঁকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফিলার ধাতু উভয়ের পৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্কর ধাতু তৈরি করে উভয়কে জোড়া দিয়ে দেয়।

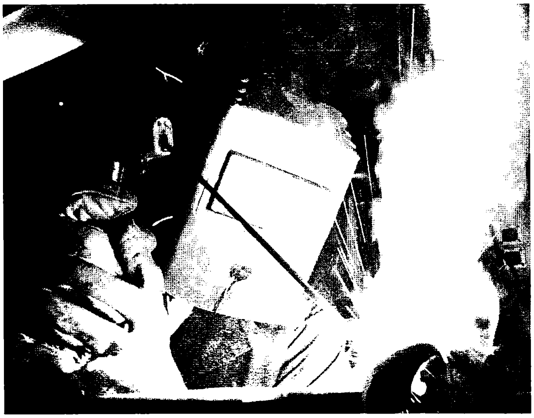

আসলে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ছাড়া অন্য সব ক'টিতেই ফিলার ধাতুদণ্ড ব্যবহার করা হয় ওয়েল্ডিং-এর সহায়ক হিসাবে। আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে হাতে ধরা ইলেকট্রোডটিই ফিলার দণ্ড হয় এবং তা আর্কের ফলে একটু একটু গলে গিয়ে জোড়ায় লাগে। গ্যাস ওয়েল্ডিংয়েও একটি 'ওয়েল্ডিং রড' ফিলার হিসাবে গলিয়ে জোড়ায় লাগানো হয়। রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ছাড়া অন্যগুলোতে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ধাতুর সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে শোষিত হয়ে যেন জোড়াকে দুর্বল ও ভঙ্গুর না করতে পারে, সে

জন্য ফিলার রঙের সঙ্গে উপযুক্ত অধাতব 'ফ্ল্যাঙ্ক' বস্তু দিয়ে রাখা হয়। এটি গলে গিয়ে সংযোগস্থলের পৃষ্ঠদেশকে বাতাসের বিরুদ্ধে আচ্ছাদিত রাখে।

মু. ই.

ওরাংওটাং (orang utang)

ওরাংওটাং-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Pango pygmaeus*। ওরাংওটাং-এর দেহ লাল বাদামি চুলে আবৃত। শক্ত সমর্থ শরীর। দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাইমেট। হাত দুটো লম্বা ও যথেষ্ট শক্তিশালী। এদের পা তুলনামূলকভাবে ছোট এবং দুর্বল। পুরুষ ওরাংওটাং স্ত্রী ওরাংওটাংদের থেকে আকারে বড় ও ভারী। উচ্চতা সাধারণত ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের লেজ নেই। ওরাংওটাং-এর মুখমণ্ডলের সাথে মানুষের মুখের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্ত্রী ওরাংওটাং-এর ওজন ৩৫-৪০ কিলোগ্রাম এবং পুরুষদের ওজন ৮০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। সুমাত্রা ও বোর্নিওর রেইন ফরেস্টেই শুধু ওরাংওটাং পাওয়া যায়। অন্য কোথাও এদের দেখতে পাওয়া যায় না। ওরাংওটাং ইচ্ছে করলে দু'পায়ে হাঁটতে পারে, তবে সাধারণত চলার সময় চার হাত পা-ই বেশি ব্যবহার করে। এরা ফল, পাতাবীজ, এমনকি পাখি ও ডিম খেয়ে থাকে। গাছের ডালে বিশ্রাম নেয় ও ঘুমিয়ে থাকে। একা, জোড়ায় ও ছোট পরিবারে বসবাস করে থাকে ওরাংওটাং। পুরুষেরা পরিবারের প্রতি মনযোগী নয়। দশ বছর বয়সে এরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী ওরাংওটাং বছরে একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে। জন্মাবার সময় বাচ্চার ওজন থাকে সাধারণত এক কিলোগ্রাম। শিশু ওরাংওটাং ১.৫ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়ে থাকে। বর্তমানে ওরাংওটাং-এর সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

রা. জা.

ওল (ol)

কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ (দ্র)। এশিয়া আফ্রিকায় এই গণের ২৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭টি প্রজাতি পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নাম *আমর্ফোফাল্লাস ক্যাম্পানুলাটাস (Amorphophallus campanulatus)*, গোত্র আরাসি (Araceae)। বুনো ও কৃষিজাত, দু' রকম ওল দেখা যায়। বুনো ওল অখাদ্য, বর্ষার শেষে এই ওল বনজঙ্গলে আপনাআপনি জন্মে। কৃষিজাত ওলের মধ্যে চিত এবং বাঘা প্রধান। এর কন্দ, কচি ডাঁটা ও পাতা খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাতিশুঁড় ওল স্বাদু ও ওজনে ভারী। এই ওল দশ-পনেরো কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় উৎকৃষ্ট ওল জন্মে। ওলের ফুল দেখতে বড় ঘণ্টার মতো। ক্যালসিয়াম অক্সালেট

নামক রাসায়নিক পদার্থের সুচগুচ্ছ থাকায় ওল খেলে গলা কুটকুট করে। এ সময় লেবু বা তেঁতুল খেলে ঐ সুচগুলো গলে যায়। বোম্বাই অঞ্চলে ঐ বুনো ওল চাকা চাকা করে কেটে শুকিয়ে 'মদন-মস্ত' হিসাবে বিক্রি হয়। রাসায়নিক ঔষধ হিসাবে সেটি ব্যবহৃত হয়।

কবিরাজেরা ওলকে কোষ্ঠবদ্ধতা, গেঁটে বাত, কষবাত, ছুলি, দাদ, মুখের ঘা, হাজা, মৌমাছি-বোলতা-ভীমরুল ও বিছার কামড়ে ঔষধ (দ্র) হিসাবে কাজে লাগায়। ওলে প্রচুর আয়রন (দ্র) আছে। তরকারি হিসাবে ওল উত্তম।

বি. ব.

ঐ

ঐষধ / ভেষজ (medicines, drugs)

সাধারণ সংজ্ঞায় রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার্য উপাদানের নাম ঐষধ। ঐষধ দেহতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, যেমন- পেশির (দ্র) সঙ্কোচন, স্নায়বিক উদ্দীপনা, হরমোন (দ্র) নিঃসরণ প্রভৃতি।

ঐষধের উৎস বিচিত্র ও ব্যাপক। উদ্ভিদ (দ্র) বা প্রাণীর কোষকলা (দ্র) অথবা অজৈব রাসায়নিক উপাদান ঐষধের উৎস হতে পারে। আয়োডিন (দ্র), লোহা (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র) বা পটাসিয়াম (দ্র) যেমন ঐষধ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি প্রোটিন, শর্করা বা তেলজাতীয় কোনো কোনো উপাদানেও রয়েছে ঐষধের গুণাগুণ। ক্যাস্টর অয়েল বা মাছের যকৃতের (দ্র) তেল বহুকাল থেকে ঐষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানবদেহের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণু (দ্র) যেমন ভিটামিন (দ্র) জাতীয় ঐষধ তৈরি করে, তেমনি ছত্রাক (দ্র) থেকে পাওয়া যায় নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র) ঐষধ।

প্রতিটি ঐষধ বা ভেষজের যেমন সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া রয়েছে, তেমনি রয়েছে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া, দেহযন্ত্রের উপর বিরূপ ক্রিয়া, কখনো-বা বিষক্রিয়া। তাই ঐষধ ব্যবহারে দরকার সতর্কতা, দরকার সঠিক মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ। ঐষধ মানবদেহে বিভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন- মুখপথে, পেশিতে বা শিরায়, ত্বকের নিচে ইনজেকশন হিসাবে, নাসাপথে বা পায়ুপথে (সাপোজিটরি হিসাবে)। ঐষধের বিপাক প্রধানত যকৃতের মাধ্যমে এবং দেহ থেকে নির্গমন মলমূত্র, ঘাম বা শ্বাসপথে।

প্রাচীন কালে ঐষধের প্রধান উৎস ছিল উদ্ভিদ- উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, মূল, বাকল ইত্যাদি, সেই সঙ্গে লতা ও গুল্ম। ছিল গুটি কয়েক রাসায়নিক উপাদান। অশোধিত অবস্থায় ছিল এগুলোর ব্যবহার। উদ্ভিদ থেকে বিশুদ্ধ ঐষধ পৃথক ও সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয় উনিশ

শতকে এসে। এই শতকেই রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ঐষধের আবিষ্কার হয়। বিশ শতকে উদ্ভিদ ও রাসায়নিক উপাদান এই উভয় উৎস থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঐষধের বিস্ময়কর আবিষ্কার, যেমন- সালফোনেমাইড (দ্র), অ্যান্টিবায়োটিক। এ ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে টিকা (দ্র)। এই সব আবিষ্কার মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে এনেছে।

ইংরেজি 'ড্রাগ' (drug) শব্দটির প্রতিরূপ ঐষধ বা ভেষজ। মেডিসিন (medicine) শব্দটিও তাই। অর্থাৎ বাংলায় ড্রাগ ও মেডিসিন একই অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় শব্দ দুটোর ব্যবহারিক পার্থক্য যথেষ্ট। মেডিসিন বলতে প্রক্রিয়াজাত ব্যবহারযোগ্য ঐষধ বোঝায়। যেমন- প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বা সিরাপ, এম্পিসিলিন ক্যাপসুল বা ইনসুলিন (দ্র) ইনজেকশন। কিন্তু ড্রাগ বলতে অশোধিত (ক্রুড) উদ্ভিদনির্যাস থেকে প্রক্রিয়াজাত মেডিসিন, অপ্রক্রিয়াজাত ঐষধ-উপাদান কিংবা ঐষধ তৈরিতে ব্যবহার্য সহায়ক উপাদান, যেমন- স্টার্চ বা ল্যাকটোজ সবই বোঝায়। সে হিসাবে বাংলায় মেডিসিন অর্থে 'ঐষধ' এবং ড্রাগ অর্থে 'ভেষজ' ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

আ. র.

ঔষধাসক্তি (drug addiction)

ঔষধের (দ্র) ব্যবহার থেকে ঔষধের প্রতি বাধ্যতামূলক নির্ভরতার নাম ঔষধাসক্তি (drug addiction বা drug dependence)। এই নির্ভরতা নিয়মিত বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হতে পারে। সাধারণত মানসিক প্রফুল্লতা, সুখানুভূতি, ঘুম বা ঘুমের আমেজ ইত্যাদি কারণে এবং ঔষধ গ্রহণের অভাবে অস্বস্তি ও যন্ত্রণা নিবারণের তাগিদে ঔষধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই ঔষধ ব্যবহারের কুফল জানা সত্ত্বেও ঔষধ বর্জন সহজ হয় না। ঔষধের প্রতি নির্ভরতা যত বাড়ে, ঔষধ ব্যবহারের প্রতি আর্কষণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে।

ঔষধ গ্রহণের সূচনা হয় কোনো রোগে ব্যবহার, কোনো মানসিক কারণ, অসৎ সংসর্গের প্রভাব, বন্ধুদের পীড়াপীড়ি থেকে অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের আশায়। কিন্তু ঔষধের বিষক্রিয়ায় এর পরিণতি ঘটে আসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যনাশে ও সর্বনাশে। এর শেষ পরিণাম মৃত্যু।

আসক্তিকর ঔষধ নানা ধরনের। যেমন– সেডেটিভ বা সম্মোহক, বার্বিচুরেটস, ডায়াজেপাম গ্রুপ, অ্যালকোহল (দ্র), আফিম (দ্র), মরফিন, পেথিডিন, কোডিন, হেরোইন (দ্র) ইত্যাদি। এগুলো আবার বেদনানাশক বলে তীব্র বেদনার উপশম ঘটাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া রয়েছে উদ্দীপক গ্রুপের ঔষধ, যেমন– কোকেন, এম্ফেটেমাইন এবং অনুরূপ ঔষধ। আরো রয়েছে অমূলপ্রত্যয় (hallucination) সৃষ্টিকারী ঔষধ, যেমন– এলএসডি, গাঁজা, ভাং, হাসিস, মেস্কালিন ইত্যাদি। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধও নেশার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঔষধে আসক্তির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় বাধ্যতামূলকভাবে নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন এক জগতে পৌঁছাতে হয়।

ঔষধাসক্তির চিকিৎসা সহজ নয়। হাসপাতালে সার্বক্ষণিক সতর্কদৃষ্টি ও অনুশাসনের মধ্যে কঠোরভাবে চিকিৎসা চালানোর প্রয়োজন হয়। চিকিৎসায় সুফল অর্জন নির্ভর করে রোগীর সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর।

আ. র.

ক

কই (anabas testudineus)

কই *(aimting perpea)* দৈর্ঘ্যে ২০.৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মাথা বড়, দু' দিকের চোয়ালে ছোট ছোট দাঁত, সামনের পৃষ্ঠপাখনায় ফুলকার পেছনে বিকল্প শ্বাসযন্ত্র থাকায় ডাঙায় অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে। ১৭-১৮টি কাঁটা, পায়ুপাখনায় প্রায় ১০টি।

পাখনায় ভর করে ওরা ডাঙায় চলে। গায়ে শক্ত আঁশ। ডোবা, পুকুর, খাল-বিলে ওরা বাস করে। ছোট ছোট জলজ সন্ধিপদী প্রাণী, পতঙ্গের শূককীট, শেওলা, পচা পাতা ইত্যাদি আহার্য।

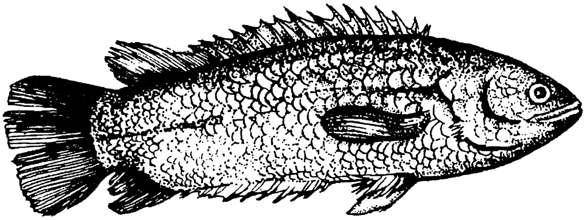

যে জলাশয়ে ওরা বাস করে সাধারণত সেখানে ডিম ছাড়ে না। কাছাকাছি অন্য কোনো জলা জায়গায় যেতে চায়। তাই বৃষ্টির পানির ধারায় ওরা উজানে ওঠার চেষ্টা করে ও অন্য জলায় গিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে নেয়। এ সময় পুরুষ-কইয়ের শ্রোণি ও বক্ষপাখনায় লালচে আভা দেখা যায়। স্ত্রী-কইয়ের রঙ বদলায়। ডিমের সংখ্যা গড়ে ৬০০০। ডিম থেকে পোনা হতে মাসখানেক লাগে।

কই সুস্বাদু। ঘরে বেশি দিন জিইয়ে রাখা যায়।

ত. চ.

কংক্রিট (concrete)

সিমেন্ট, বালি, খোয়া (ইটের টুকরো), পাথরের টুকরো পানির সঙ্গে মিশিয়ে যে নির্মাণসামগ্রী বা মসলা তৈরি হয়, তাকে ঢেলে চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। একেই বলে কংক্রিট।

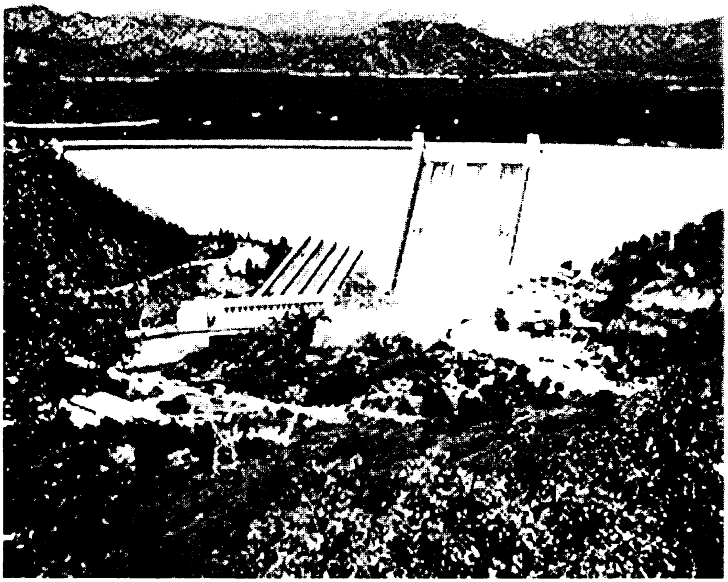

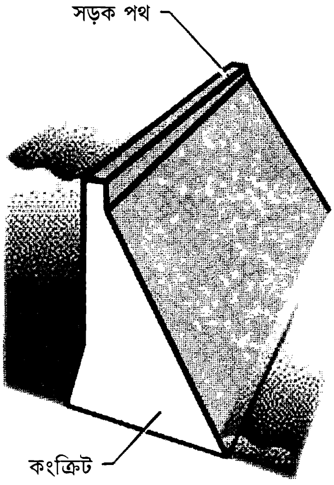

কংক্রিটের বাঁধ

সাধারণ কংক্রিটের চাপ ও আঘাত সহ্যের ক্ষমতা কম। তাই মধ্যখানে লোহা বা ইস্পাতের রড রেখে তার চারদিকে কংক্রিট জমালে তা অত্যন্ত শক্ত এবং চাপ ও ঘাতসহ হয়। এ ধরনের কংক্রিটকে বলে রি-ইনফোর্সড কংক্রিট। কংক্রিটের মধ্যে বাতাসের পরিমাণ যত কম এবং পানি ও সিমেন্টের অনুপাত যত বেশি হয় কংক্রিট তত বেশি শক্ত হয়।

কংক্রিট নির্মাণকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাকা বাড়ি, দালানকোঠা, অট্টালিকা, পুল-কালভার্ট নির্মাণে কংক্রিট অপরিহার্য। সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণেও কংক্রিট ব্যবহৃত হচ্ছে।

স. রা.

কক, রবার্ট [১৮৪৩-১৯১০]

জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক (Robert Koch) জীবাণুবিদ্যার (দ্র) প্রবর্তকদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। রবার্ট ককের জন্ম ১৮৪৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন জার্মানির গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৬৬ সালে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন।

রবার্ট কক জীবাণুর বংশবিস্তার এবং রঞ্জনকরণ (staining)-এর নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি এনথ্রাক্স রোগের জীবাণুর গঠন ও বংশবিস্তার সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ১৮৭৬ সালে এই জীবাণুর নতুন একটি উপপ্রজাতি আবিষ্কার করেন।

১৮৭৮ সালে রবার্ট কক ক্ষতস্থানে সংক্রমণের সঙ্গে রোগজীবাণুর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর অসামান্য কীর্তি হল যক্ষ্মা (দ্র) ও কলেরা (দ্র) রোগের জীবাণু আবিষ্কার। এর পর তিনি শরীরে যক্ষ্মা রোগের উপস্থিতি নির্ণয়কারী উপাদান 'টিউবারকুলিন' (tuberculin) আবিষ্কার করেন। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু থেকেই তৈরি এই টিউবারকুলিন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের কারণে যক্ষ্মাজীবাণু কক্স ব্যাসিলাস (Koch's bacillus) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের পাশাপাশি পানীয় জল, খাবার ও কাপড়চোপড়ের মাধ্যমে কলেরা রোগের বিস্তার সম্পর্কেও গবেষণার জন্য তিনি ১৮৯১ সালে বার্লিনে সংক্রামক ব্যাধি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব

গবেষণাগারে রবার্ট কক

পালন করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১০ সালের ২৭শে মে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সি. না. হ.

কচু / মানকচু / পানিকচু / দুধকচু / মৌলভী কচু (arum)

Araceae গোত্রের কন্দপ্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে সাধারণভাবে কচু বলা হয়। তবে বিশেষ প্রজাতি শনাক্ত করার জন্য কচু শব্দের পূর্বে বিশেষ শব্দসমূহ প্রয়োগ করা হয়। কচুর কয়েকটি প্রজাতির আলোচনার মাধ্যমে কচু সম্পর্কে জানা যাবে।

মানকচু এর বৈজ্ঞানিক নাম *Allocasia macrophylla*। এর পাতা খুব বড়, ১-১.৫ মিটার লম্বা হতে পারে। বহুবর্ষী এ কচুর পাতা, ডাঁটা, কন্দ সবই তরকারি হিসাবে সুস্বাদু; পুষ্টিকর। গাছ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্দটাই ১.৫-২ মিটার হয়ে যায়। যশোরের দিকে এ কচু ভালো হয়।

পঞ্চমুখী কচু ময়মনসিংহ জেলায় অধিক আবাদ করা হয়। এ কচু খেতে সুস্বাদু, মূলকাণ্ডে ৪-৫টির বেশি 'চোখ' হয়। মুখগুলো পৃথক করে ছাড়ালে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চোখের জন্য এরূপ নামকরণ।

পানিকচু বৈজ্ঞানিক নাম *Colocasia esculenta*। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এর চাষ হয়। পানিসহিষ্ণু বলেই এ নামকরণ। এর পাতা, কাণ্ড, ডাঁটা, লতা সবজি হিসাবে জনপ্রিয়।

দুধকচু বৈজ্ঞানিক নাম *Xanthosoma violacemu*। প্রধানত পারিবারিকভাবে এর আবাদ করা হয়। পাতা ও ডাঁটা (পত্রবৃন্ত) সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পাতা বেগুনি রঙের। গুড়িকন্দ, মুখী, গুড়িচারা দিয়ে বংশ বিস্তার করা হয়।

মৌলভীকচু : পাতা সবুজ, মুখী লতানো। পাতা ও ডাঁটা খাওয়া হয়।

শা. আ.

কণাত্বরক অ্যাকসেলারেটর দ্র

কদবেল বেল দ্র

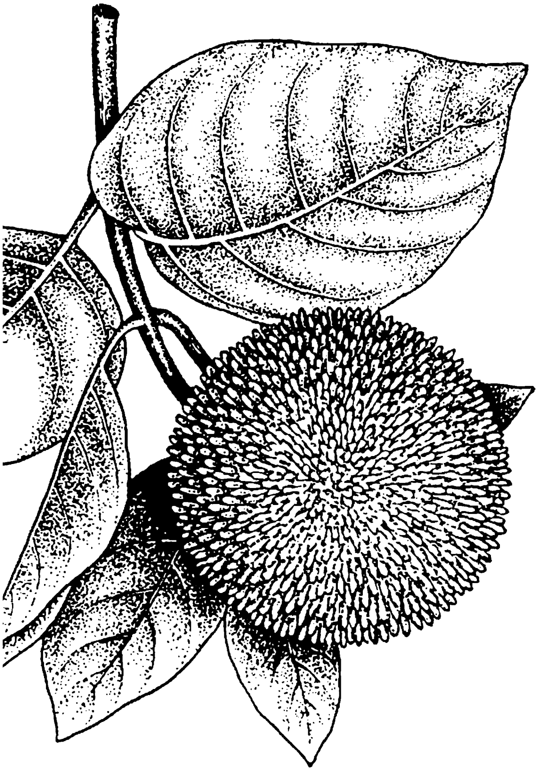

কদম ফুল ও পাতা

কদম (kadamba)

কদমকে বর্ষার দূত বলা হয়। বর্ষা ঋতুতে প্রকাণ্ড কদম গাছের ডালে ডালে প্রচুর ফুল ফোটে। ফুলগুলো দেখতে ছোট বলের মতো হয়। এর মিষ্টি গন্ধ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ায়।

এ গাছ বেশ উঁচু হয় এবং এর বহু শাখা-প্রশাখা থাকে। কাণ্ড সরল। বাকলের রঙ ধূসর থেকে প্রায় কালো। পাতা বেশ বড় ও ডিম্বাকৃতির। পাতার রঙ উজ্জ্বল সবুজ। ফুলের রঙ সাদা-হলুদ মেশানো। আমরা যাকে 'একটি কদম ফুল' বলি তা আসলে বহু ফুলের সমষ্টি। মাঝখানে থাকে গোলাকার পুষ্পাধার এবং এর গায়ে ফুলগুলো লেগে থাকে। ফল মাংসল ও টক। কদম ফল বাদুড় ও কাঠবিড়ালির প্রিয় খাদ্য। এরাই কদমের বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।

কদম গাছের কাঠ অতি নিম্নমানের। তাই এর কাঠ সাধারণ জ্বালানি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। কদম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *অ্যানথোসেফেলাস ইন্ডিকাস (Anthocephalus indicus)*।

ফ. মা.

কনীনিকা আইরিস দ্র

কপিকল (pulley)

কপিকল হল এক বা একাধিক চাকার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি দড়ি বা বেল্ট, যা শক্তি প্রয়োগের কোনো কাজকে সুবিধাজনক করে তোলে। এটি একটি সরল যন্ত্র, অনেক জটিল যন্ত্রের মধ্যেও যাকে পাওয়া যায়। যন্ত্র মাত্রেরই উদ্দেশ্য হল যান্ত্রিক সুবিধা লাভ অর্থাৎ কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ করতে পারা, অথবা কাজ করতে গিয়ে অন্য কোনো ধরনের সুবিধা লাভ।

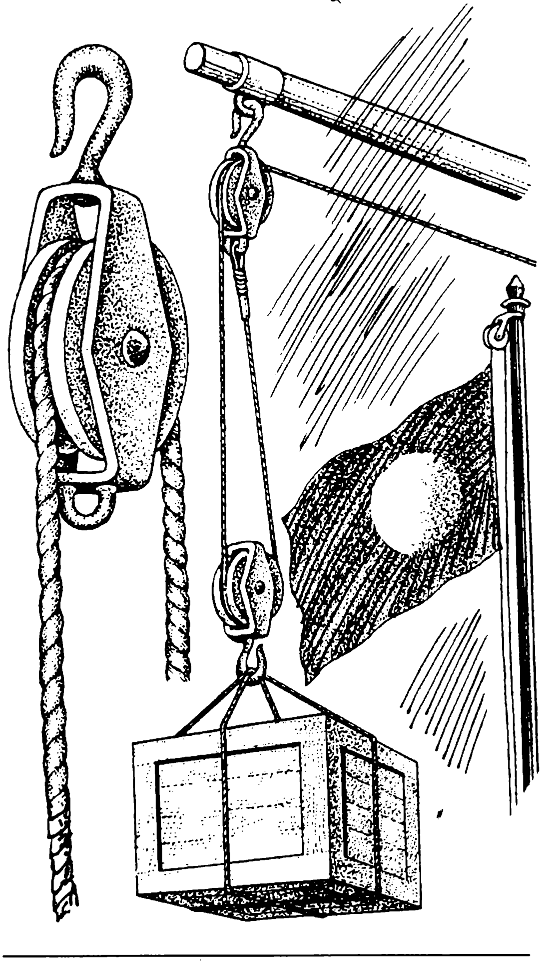

সরলতম কপিকল হল একটি খাঁজকাটা অনড় চাকার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি দড়ি। এর এক প্রান্তে থাকে যার উপর কাজ হবে সেই 'ভার' আর অন্য প্রান্তে করা হয় বলপ্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ, দড়ি টেনে পতাকা উত্তোলনের সময় আমরা এটিই ব্যবহার করি। এতে যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ ১, যার মানে বলপ্রয়োগ কমে না, ভারের ওজনের সমান বলই প্রয়োগ করতে হয়। তবে টানটিকে সুবিধাজনক স্থানে ও দিকে প্রয়োগ করার সুযোগ ঘটে। যেমন নদীর কিনারা থেকে দূরে বসে নৌকায় মাল ওঠানো-নামানোর জন্য এটি ব্যবহার করা যায়।

কপিকলের চাকাটি এক স্থানে অনড় না থেকে যদি চলনশীল হয়, তাহলে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের কপিকল পাই। এতে দড়ির এক প্রান্ত উঁচুতে স্থায়ীভাবে আটকানো থাকে। ভারটি থাকে চাকার সঙ্গে ঝোলানো। দড়ির অন্য প্রান্তে টান প্রয়োগ করলে ভারসহ চাকাটিই উঠে আসে। এতে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয় ভারের ওজনের অর্ধেক, যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ তাই ২। এ রকম আরো কপিকলের সমন্বয় করে যান্ত্রিক সুবিধা আরো বাড়িয়ে নেওয়া যায়। ফলে সামান্য বলপ্রয়োগেও অনেক বেশি ভার স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

কপিকলের অন্য রকম ব্যবহার হল দু'টি চাকার মধ্যে চলমান প্রান্তহীন দড়ি বা বেল্টরূপে। এতে একটি চাকাকে ঘোরালে সেই ঘূর্ণন অন্য চাকাতে সঞ্চারিত হয়। চাকা দু'টি সমান আকারের হলে যান্ত্রিক সুবিধা ১ থেকে যায়। কিন্তু একটি চাকা অন্যটির চেয়ে বড়-ছোট করে কম বলপ্রয়োগে কাজ সারা যায়, অথবা ঘূর্ণনগতি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। দড়ি বা বেল্ট লাগাবার সময় মাঝখানে ক্রস করে নিলে এক চাকাকে অন্য চাকার বিপরীত দিকেও ঘোরানো চলে।

মু. ই.

কফি (coffee)

কফি চায়ের মতো এক ধরনের পানীয়। কফিগাছের ফলবীজের গুঁড়ো ফুটন্ত পানিতে গুলে এই পানীয় তৈরি করা হয়। অনেকে তার সঙ্গে দুধ-চিনি মিশিয়ে, অনেকে আবার দুধ-চিনি ছাড়াই তা পান

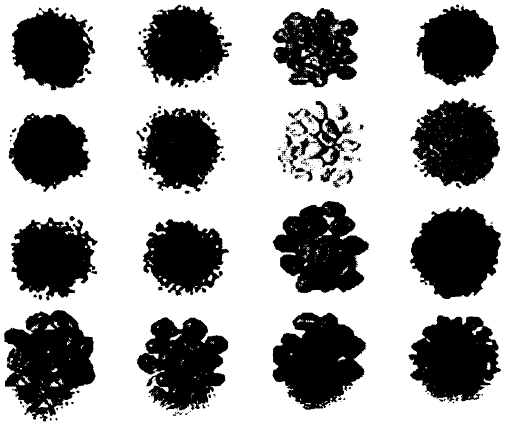

করেন। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক কফি পান করেন। কথিত আছে ইথিওপিয়ার ছাগলপালকগণ লক্ষ করেন, ছাগল যেদিন কফিগাছের পাতা বা ফল খায় সেদিন সারা রাত জেগে থাকে। এ থেকেই মানুষ কফি পানে আগ্রহী হয়। ইথিওপিয়া থেকেই কফি পানের প্রচলন হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে কফি আরবদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরব থেকে তুরস্ক হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালি ও ইউরোপে, ১৬৬০ সালের মধ্যে আমেরিকা এবং ১৭০০ সালের মধ্যে ব্রাজিলে কফির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রত্যন্ত এলাকায় কফি হাউস গড়ে ওঠে এবং তা প্রতিদিন মানুষের গল্পগুজবের আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

কফিগাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Coffea arabica*। বর্তমানে কৃষিভিত্তিক কফি উৎপাদনের মাধ্যমে অনেক দেশ প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। সুমাত্রা, জাভা, ভারত, আরব, আফ্রিকা, মেক্সিকো, হাওয়াই, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকায় কফি চাষ হয়। ব্রাজিল কফি উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। কফিগাছ ঝোপ ঝোপ সবুজ উজ্জ্বল পাতায় ঢাকা থাকে। এর উচ্চতা ১০ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। জামের মতো ফল হয়, তা প্রথমে সবুজ, পরে হলুদ এবং পাকলে লাল হয়। খোসা ছাড়ালে যে বীজ পাওয়া যায় তাকে উত্তপ্ত করে ঝলসে গুঁড়ো করা হয়। এই গুঁড়োই পানীয় তৈরির মূল উপাদান।

স. রা.

কবুতর (pigeon)

আমাদের দেশে সচরাচর দু' ধরনের কবুতর বা পায়রা দেখা যায়। একটি নানা বর্ণের গৃহপালিত কবুতর, অপরটি জালালী কবুতর। সকল জালালী কবুতরের দেহের রঙ এক ধরনেরই। পৃথিবীতে প্রায় ২০০ জাতের কবুতর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে স্ফীতবক্ষ পারাবত বা নোটন পায়রা, পাখনা-পুচ্ছ পায়রা বা শিরাজু পায়রা ও আকাশে ডিগবাজি খাওয়া গেরোবাজ পায়রা সকলের কাছে আকর্ষণীয়।

কবুতর মাঝারি আকারের পাখি। এদের চক্ষু ছোট। চোখ দূর থেকে দেখলে লাল মনে হয়। মোটামুটি চঞ্চল প্রকৃতির এই পাখি দ্রুত উড়তে সক্ষম। উড়ে ১০০ মাইলও পাড়ি দিতে পারে। বীজ, দানাদার শস্য ইত্যাদি কবুতরের প্রধান খাদ্য। এরা পাথরের টুকরোও খায়। দৈনিক গড়ে দেড় থেকে দুই আউন্স খাবার গ্রহণ করে। বছরের যে কোনো সময়

এরা বাচ্চা দিতে পারে, তবে পুরুষ ও স্ত্রী কবুতরের মিলন ঘটে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে। এটি প্রলম্বিত হয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে পারে। কবুতর প্রথম চালানের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর আগেও

দ্বিতীয় চালানের ডিম পাড়তে পারে। ১৭-১৮ দিন ডিমে তা দেয়। বাচ্চা ফোটার পর এক সপ্তাহ ধরে মা-বাবা ওদের পরিচর্যা করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশু কবুতর উড়াল দেয়।

কবুতর পোষ মানে। ওরা মনিবের ঘর চিনে ফিরে আসতে পারে। এ দেশে অনেকে শখ করে কবুতর পালে এবং কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামায়। যুদ্ধকালীন সময়ে বা কোনো জরুরি দরকার পড়লে ওদের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। আগের দিনে রাজা-বাদশাহরা প্রতিযোগিতায় নামানোর জন্য হাজার হাজার কবুতর পুষতেন। রাজপুত্র-রাজকন্যারাও গোপন সংবাদ আনা-নেওয়ার জন্য কবুতরকে কাজে লাগাতেন। বাচ্চা কবুতরের মাংস সুস্বাদু। তবে খাওয়ার চেয়ে ওদের দেখে সুখ। ওদের মিষ্টিমধুর আওয়াজ আরো সুখকর।

ত. চ.

কমলা (orange)

কমলা একটি লেবু জাতীয় ফল। সারা পৃথিবীতেই কমলার যথেষ্ট কদর রয়েছে। মনে করা হয়, কমলালেবুর আদি জন্মস্থান ভারতীয় উপমহাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাস্কো দা গামা এই ফলটি ভারত থেকে ইউরোপে নিয়ে যান।

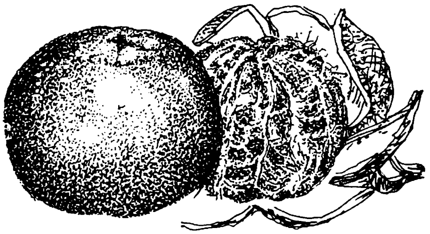

কমলালেবুকে সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন– টক কমলালেবু, মিষ্টি কমলালেবু এবং ঢিলা-খোসা বা ম্যান্ডারিন কমলালেবু। এর মধ্যে মিষ্টি কমলাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কমলালেবু গোলাকার থেকে ডিমের আকৃতি পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। রঙের পার্থক্যও প্রচুর। যেমন, গোলাপি-কমলা থেকে গাঢ় লাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গরম বেশি এবং শীতকালে শীত বেশি অথচ বরফ পড়ে না এ রকম অঞ্চলে কমলা ভালো জন্মে।

কমলাগাছের পাতা সবুজ এবং ফুলগুলো দেখতে বেশ সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত। ফুল ফোটা থেকে কমলা পাকা পর্যন্ত কোনো কোনো প্রজাতির আট মাস এবং কোনো কোনো প্রজাতির প্রায় বিশ মাস সময় লাগে। এক একটি কমলার মধ্যে ১০ থেকে ১৫টি পর্যন্ত কোয়া থাকে। কোয়াগুলো রসে পূর্ণ এবং একটি কোয়ায় কয়েকটি বিচি থাকে। তবে কিছু প্রজাতির কোয়া বিচিশূন্যও হয়। কমলা যত পাকবে তত তার মধ্যে চিনি ও রসের পরিমাণ বাড়বে এবং অ্যাসিডের পরিমাণ কমবে। এ জন্য অনেক দেশে কমলা আহরণের জন্য পরিপক্বতার একটি সীমা নির্দেশ করা থাকে।

পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি টন কমলা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ব্রাজিল রয়েছে শীর্ষস্থানে এবং এর পর পরই যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর অবস্থান। পৃথিবীতে যত কমলা উৎপন্ন হয় তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রস ও জ্যাম-জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্র এক-পঞ্চমাংশ কমলা তাজা ফল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কমলালেবু রুটেসী (Rutaceae) পরিবারের সদস্য। মিষ্টি কমলা Citrus sinensis, টক কমলা Citrus aurantium এবং সাধারণ ম্যান্ডারিন Citrus reticulata প্রজাতির। এ ছাড়াও ম্যান্ডারিনের বেশ কিছু প্রজাতি এবং সঙ্কর প্রজাতি রয়েছে।

ফ. মা.

কম্পন (vibration)

কোনো বস্তু বা বস্তুকণার অগ্র-পশ্চাৎ গতি বা দোলনকে কম্পন বলে। কম্পন প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে। স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মের কম্পনের উদাহরণ ভূমিকম্প। কৃত্রিম কম্পনের উদাহরণ শব্দ উৎপাদন। আমরা বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে শব্দ উৎপাদন করি, কথা বলি। আমরা যখন কথা বলি, আমাদের স্বরযন্ত্রের কম্পন হয়। মাইক বা লাউড স্পিকারের পর্দাটির কম্পন থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়। প্রকৌশলীরা কম্পন সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন 'ভাইব্রেটর' নামের যন্ত্র। এর কাজ দোলানো বা ঝাঁকানো।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন– কথা বলা, শব্দ উৎপাদন, ঔষধ তৈরি, রোগীর পরিচর্যা (মাংসপেশির মালিশ), বেতার-তরঙ্গ আদান-প্রদান ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম্পন অনভিপ্রেত, তা বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন– কলকারখানার শব্দ, যানবাহনের হর্ন, বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন ইত্যাদি। বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন প্রচণ্ড ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

প্রতি সেকেন্ডে বস্তু বা বস্তুকণার পূর্ণসংখ্যক কম্পনকে কম্পাঙ্ক বলে। কম্পাঙ্কের একক হার্টজ্ (hertz)। প্রতি সেকেন্ডে একটি পূর্ণ কম্পন হলে বলা হয় এক হার্টজ্।

স. রা.

কম্পাঙ্ক কম্পন দ্র

কম্পাস (compass)

(১) দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। একটি দণ্ডচুম্বককে স্বাধীনভাবে ঝুলিয়ে রাখলে সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর এসে স্থির হয়ে থাকে। অর্থাৎ চুম্বকদণ্ডের প্রান্ত দু'টি উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে কম্পাস বা দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্রের উদ্ভব হয়। একটি সূচ্যগ্র শলাকার উপর সরু অগ্রভাগবিশিষ্ট চুম্বকপাত বসিয়ে কম্পাস তৈরি হয়।

খ্রিস্টপূর্ব চার শ' বছরেরও আগে চীন দেশে এ ধরনের কম্পাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১০০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীন এবং ভূমধ্যসাগরীয়

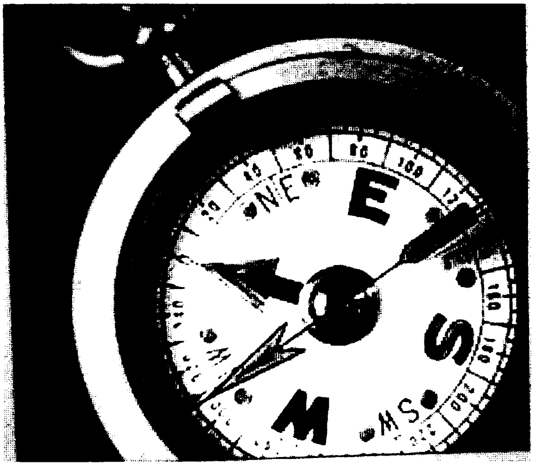

নাবিকেরা চুম্বক খণ্ডকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে কম্পাস তৈরি করত। একে বলা হত 'লিডিং স্টোন'। তখন জাহাজ ছিল কাঠের। এর পরে জাহাজে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার বেড়ে গেলে এই সব কম্পাস ব্যবহার অসম্ভব হয়ে উঠল। কারণ চুম্বক লোহা দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ফলে দিক নির্ণয়ে ভুল হয়। এ কারণে নাবিক এবং বিজ্ঞানীরা কম্পাসের উন্নয়নে সচেষ্ট হলেন। এভাবে উদ্ভব হল 'নৌ-কম্পাস', 'জাইরোকম্পাস', 'পকেট কম্পাস' ইত্যাদির। নৌ-কম্পাস নৌ-নাবিকেরা ব্যবহার করেন। জাইরোকম্পাস ব্যবহার করেন বৈমানিকেরা। ব্যবহারের সুবিধা এবং ত্রুটিমুক্ত দিঙ্‌নির্দেশনার জন্য ডায়ালযুক্ত বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে এসব কম্পাস তৈরি হয়।

(২) জোড়া কম্পাস গণিতচর্চায় ব্যবহৃত অন্যতম যন্ত্র। সুচালো পা বা অগ্রভাগ বিশিষ্ট দু'টি দণ্ডের অন্য প্রান্ত দু'টিকে স্ক্রু দ্বারা সংযুক্ত করে জোড়া কম্পাস তৈরি করা হয়। সুচালো পা দু'টিকে প্রয়োজনে পরস্পর সংলগ্ন বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। একটি পায়ের সঙ্গে প্রয়োজনে পেন্সিল যুক্ত করে এর সাহায্যে বৃত্ত, চাপ ও বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করা যায়। পেন্সিল ছাড়া দুই পিনযুক্ত কম্পাসকে বলে বিভাজক (divider), জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কনে এর গুরুত্ব বেশি। গণিত ছাড়াও ভূগোল, স্থাপত্যবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যার চর্চায় এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় কম্পাস ও রুলারের সাহায্যে অনেক সূত্র উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল।

স. রা.

কম্পিউটার (computer)

কম্পিউটার ইংরেজি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল হিসাব বা গণনাকারী যন্ত্র। আসলে আধুনিক কম্পিউটারকে শুধু গণনাকারী বললে ভুল হবে। কম্পিউটার এক দিকে যেমন অত্যন্ত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সহজ থেকে জটিল গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধান করে, তেমনি যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনও করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

কম্পিউটার ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের চাঁদে পদাচারণা, মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়েছে কেবল কম্পিউটারের নির্ভুল ও দ্রুত হিসাব করার ক্ষমতার ফলে। অসংখ্য গণিতবিদ সারা জীবন বসে যে গণনা সম্পন্ন করতে পারতেন না, কম্পিউটার তা করে দিচ্ছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। কলকারখানা নিয়ন্ত্রণে, ব্যাংক ব্যবসায়, বিমান কাউন্টারে, মুদ্রণে, খেলাধুলার রেকর্ড রাখতে, এমনকি খেলতে, পড়তে, গবেষণায়ও। নিখুঁত এবং দ্রুত কাজ করতে পারলেও কম্পিউটারের কিন্তু নিজস্ব কোনো মেধা বা বুদ্ধি নেই। একে দিয়ে কাজ করানোর জন্য প্রয়োজন হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দিতে হয় কম্পিউটারকে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করে।

কম্পিউটার একটি বিস্তৃত পদ্ধতি। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার, মনিটর, কি-বোর্ড ইত্যাদি নিয়ে কম্পিউটার গঠিত। কম্পিউটারের এসব যান্ত্রিক অংশকে বলে হার্ডওয়্যার। সমস্যা সমাধানে ও কম্পিউটারের নিজস্ব স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাদের বলে সফ্‌টওয়্যার। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সফ্‌টওয়্যার তৈরি করতে পারে। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কতকগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, যেমন ওয়ার্ড, ওয়ার্ডস্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস-১-২-৩, ডিবেস ইত্যাদি।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের চারটি অংশ ইনপুট, আউটপুট, স্মৃতি এবং কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (central processing unit) সংক্ষেপে CPU। CPU-এর দু'টি অংশ গাণিতিক/যুক্তি অংশ এবং নিয়ন্ত্রণ অংশ।

কম্পিউটারে CPU-এর মূল যন্ত্র হল মাইক্রোপ্রসেসর, সিলিকন চিপসের উপর সমন্বিত বর্তনী বা IC। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ অত্যন্ত দ্রুত– সেকেন্ডের লক্ষ লক্ষ ভাগ সময়ে– যে কোনো কাজ বা নির্দেশ পালন করতে পারে। অবশ্য কোন ধরনের সঙ্কেত নিয়ে কাজ করতে হবে তার উপর কম্পিউটারের গতি নির্ভরশীল।

এবার আসা যাক কম্পিউটার আবিষ্কারের কথায়। এর আবিষ্কারের জন্য এককভাবে কাউকে কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যান্ত্রিক গণনাপদ্ধতি বা ক্যালকুলেটর থেকে ধাপে ধাপে আজকের কম্পিউটারের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের সূত্রপাত হয় ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন থেকে। এর পর ইলেকট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের ঘটেছে প্রভূত উন্নতি। প্রথম দিকে নির্মিত পেনসেলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ENIAC নামের কম্পিউটারটির ওজন ছিল ত্রিশ টন, আয়তনও ছিল তেমনি বিশাল। ৪০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া একটি কক্ষের সকল দেয়াল জুড়ে ছিল এর যন্ত্রপাতি। এখন এই কম্পিউটারই হয়েছে একটি হাতব্যাগের সাইজের। ব্যাবেজের পর কম্পিউটার প্রস্তুতে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁরা হলেন প্যাসকেল, লাইবনিৎস্, লেডি অ্যাডা, বলডুইন, ফেল্ট, কনরাড জুসি, হলিরিথ, জর্জ স্টিবিজ এইকিন, এ্যাটানাফস ও ব্যারি, একার্ট, মর্ডসলি, ডন নিউম্যান, উইলকিস প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য ক্যালকুলেটর, মাইক্রোপ্রসেসর)

স. রা.

www.boighar.com

কয়লা (coal)

কার্বন মৌলের অবিশুদ্ধ রূপ কয়লা। অপর্যাপ্ত বাতাসে কাঠ পোড়ালে কয়লা হয়। এর নাম কাঠকয়লা। ভূগর্ভে খনিতে পাওয়া যায় পাথরের মতো শক্ত এক ধরনের শিলাখণ্ড, এর নাম খনিজ কয়লা। এ ছাড়াও আছে প্রাণিজ কয়লা, ভুসা কয়লা, সক্রিয় কয়লা, শর্করা কয়লা প্রভৃতি। প্রাণিদেহের চর্বিমুক্ত হাড়ের বিধ্বংসী পাতনের ফলে উৎপন্ন হয় প্রাণিজ বা অস্থিজ কয়লা। একে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে তৈরি হয় আইভরি ব্ল্যাক। রঙ তৈরি এবং চিনির বর্ণ শোধনে এটি ব্যবহৃত হয়। নারকেলমালার অন্তর্ধূম পাতনে যে কয়লা পাওয়া যায় তা সক্রিয় কয়লা, চিনি থেকে পাওয়া যায় শর্করা কয়লা। বিভিন্ন প্রকার কুপি বা প্রদীপশিখা থেকে কালো ঝুল তৈরি হয়, তাকে বলে ভুসা কয়লা।

পাথুরে বা খনিজ কয়লা সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভিদ থেকে। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর যেসব বিশাল অরণ্য নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায়, বায়ুর অনুপস্থিতি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপ ও ভূস্তরের চাপের ফলে তার জৈব বিধ্বংসী পাতন হয়। মাটির তলে চাপা-পড়া উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটে ধাপে ধাপে এভাবে সৃষ্টি হয় খনিজ কয়লা। এভাবে কয়লা সৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়লায় কার্বনের অনুপাত বাড়তে থাকে এবং কয়লার গুণগত মানও বৃদ্ধি পায়। এ জন্য খনিজ কয়লার মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে

কয়লার নাম	কার্বনের অনুপাত	বিবরণ
পিট কয়লা	৬০%	নিম্নশ্রেণির কয়লা, দহনে প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। জ্বালানিক্ষমতা কম বলে এর ব্যবহার হয় না।
লিগনাইট	৬০-৭৫%	ঐ

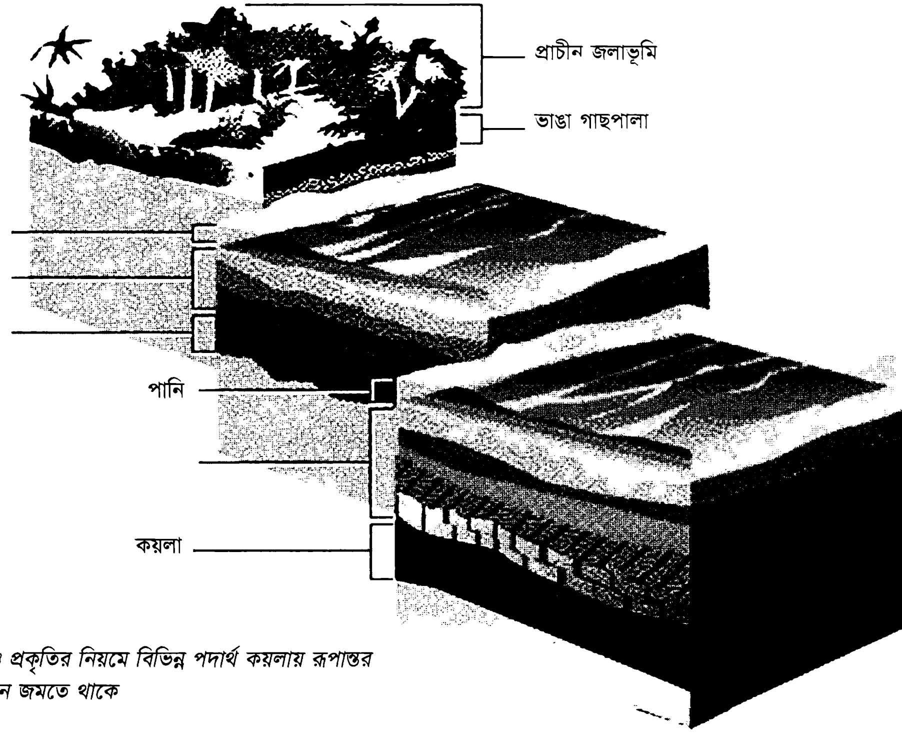

প্রাকৃতিক কারণে ও প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন পদার্থ কয়লায় রূপান্তর হয়ে নির্দিষ্ট অবস্থানে জমতে থাকে

বিটুমিনাস	৭৫-৯২%	উচ্চশ্রেণির নরম কয়লা। গৃহস্থালির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দহনে কম ধোঁয়া এবং উত্তম তাপ সৃষ্টি হয়।
অ্যানথ্রাসাইট	৯২-৯৮%	উচ্চশ্রেণির কয়লা। দহনে ধোঁয়া হয় না বললেই চলে। সবচেয়ে বেশি তাপ সৃষ্টি করে। ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ কয়লার বিধ্বংসী পাতন করে কোলগ্যাস, কোক, গ্যাস কার্বন, কেরোসিন, আলকাতরা, বিটুমিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে কোলগ্যাস দিয়ে শহরে গ্যাসের আলো জ্বালানো হত। ১৭৯২ সালে স্কটল্যান্ডে উইলিয়াম মার্ডক প্রথম কোলগ্যাস দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ি আলোকিত করেন।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ কয়লার ব্যবহার জানত (খ্রি.পূ. ২০০০)। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে খনি থেকে কয়লা তোলা আরম্ভ হয়। ১৩ শতকে শিল্পক্ষেত্রে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কাঠকয়লা জ্বালানি হিসাবে, ধাতু নিষ্কাশনে, বারুদ প্রস্তুতিতে, ফিল্টার তৈরিতে এবং ভুসা কয়লা ছাপার কালি, জুতোর কালি, রঞ্জক ইত্যাদি প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সক্রিয়কয়লা দূষিত গ্যাস পরিশোধন করে বলে গ্যাস-মুখোশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। খনিজ কয়লার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসাবে। এ ছাড়া কয়লা থেকে কোলগ্যাস, ঔষধ, রঙ, কীটনাশক, স্যাকারিন, বেনজিন, টলুইন, ন্যাপথলিন, আলকাতরা ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আবিস্কৃত হওয়ার পর জ্বালানি হিসাবে কয়লার ব্যবহার কমে যায়। কিন্তু তেল বা গ্যাসের মজুদ যে হারে খরচ হচ্ছে তাতে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে আবার কয়লার ব্যবহার শুরু হবে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কয়লার মজুদও সীমিত। তাই বিজ্ঞানীরা বিকল্প জ্বালানির সন্ধানে তৎপর।

পৃথিবীর অনেক দেশেই কয়লার খনি আছে। চীন, জাপান, ভারত, কোরিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক,

আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে উন্নত মানের কয়লা রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশেও উন্নত মানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে জামালগঞ্জে। এর পরিমাণ ১০০ কোটি মেট্রিক টন। কিন্তু এর অবস্থান ১০০০ মিটার মাটির নিচে। তাই বর্তমান প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এর উত্তোলন লাভজনক নয়। বড়পুকুরিয়া এবং পীরগঞ্জে প্রাপ্ত কয়লার মান ভালো। মাত্র ১৬০ মিটার গভীরে প্রায় ৬০-৭০ কোটি মেট্রিক টন কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে এই দুই স্থানে। এই কয়লা উত্তোলনের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ পিট কয়লার সন্ধানও পাওয়া গেছে।

স. রা.

করবী (oleander)

করবীর বৈজ্ঞানিক নাম *Nerium indicum* এবং করবী Apocyuaceae গোত্রভুক্ত। চিরসবুজ এ গাছের পাতা তিনটি একত্রে গোছা হিসাবে থাকে এবং আকৃতি খুব সুন্দর বর্ষাপালকের মতো ও চামড়ার মতো। লক্ষণীয়, এ গাছে শ্বেতকষ রয়েছে। করবীর ফুল খুব আকর্ষণীয়। ফুল সাদা, গোলাপি বা গাঢ় লাল রঙের হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের ফুল দেখা যায়। এ গাছ বিষাক্ত, কলম করে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। পুষ্প সুগন্ধি, ফল ফলিকল, কৌণিক। অসংখ্য ছোট বীজ হয়। প্রধানত বৈশাখ-আষাঢ় মাসে ফুল ফুটলেও সারা বছর কিছু না কিছু ফুল দেখা যায়। পাতা, শিকড়, বাকল এবং বীজ হৃৎপিণ্ডকে সক্রিয় রাখায় সহায়তা করে। রক্তপাত বন্ধে, ক্ষত সারাতে শিকড়ের পেস্ট ব্যবহার করা হয়। মানুষের গাত্রচর্মে যে শল্ক জাতীয় ছাল ওঠে তা বন্ধ করার জন্য করবীর শিকড় এবং বাকলের তৈল ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

শা. আ.

করোনা / করোনা ক্ষরণ (corona discharge)

উচ্চ ভোল্টেজের দ্বারা পারিপার্শ্বিক বায়ু আয়নিত হওয়ার দরুন ভোল্টেজ গ্রেডিয়েন্ট (নতি) একটি সঙ্কট বা ক্রান্তিমান অতিক্রমের জন্য কোনো পরিবাহক পৃষ্ঠে বা এত নিকটে নীলাভ-গোলাপি (purple) আভা হিসাবে আবির্ভূত তাড়িত ক্ষরণকে বলা হয় করোনা বা করোনা ক্ষরণ।

শা. ত.

করোনারি হৃদ্‌রোগ (coronary heart disease)

করোনারি ধমনি হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে যন্ত্রটিকে সজীব ও সচল রাখে। কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে করোনারি ধমনির রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া বা বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থার ফলে করোনারি হৃদ্‌রোগের উৎপত্তি হয়। রক্ত সরবরাহের স্বল্পতা অর্থাৎ ইস্কিমিয়া (ischaemia) রোগের কারণ বলে একে ইস্কিজিম হৃদ্‌রোগও বলা হয়। এ রোগের প্রকাশ ঘটে প্রধানত 'অ্যান্‌জাইনা পেকটোরিস' (angina pectoris) বা বক্ষশূল এবং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infarction) অর্থাৎ হৃদ্‌পেশির বিনষ্টিরূপে, যা আবার 'হার্ট অ্যাটাক' এই সাধারণ নামেও পরিচিত।

রোগের মূল কারণ করোনারি ধমনির স্থূলতা– যে

কারণে ধমনির নালিপথ সরু হয়ে রক্তপ্রবাহ কমে যায়। তা ছাড়া সরু ধমনিতে কখনো জমাট রক্তপিণ্ড ও রক্তপ্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও করোনারি ধমনির সঙ্কোচন সাময়িক রক্ত সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে অ্যানজাইনার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটাতে পারে। এ রোগের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কারণ অতিরিক্ত ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে চর্বি-কোলেস্টেরলের আধিক্য, শরীরচর্চার অভাব, দেহের মেদস্থূলতা ও অতিরিক্ত ওজন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, টেনশন এবং বংশগত বৈশিষ্ট্য (জীন বৈশিষ্ট্য)। করোনারি রোগ চল্লিশোর্ধ বয়সে সচরাচর দেখা দেয়, তবে আজকাল আরো কম বয়সেও দেখা দিতে শুরু করেছে। এর কারণ জীবনযাপনের চাপ।

করোনারি হৃদ্‌রোগের প্রধান লক্ষণ বুকে ব্যথা। অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যথার মাত্রা বা তীব্রতা প্রকাশ পায়। ব্যথা সাধারণত বুকের বাম দিকে দেখা দেয়, কখনো ঠিক বুকের মাঝখানে বা পেটের ঠিক উপরে, চোয়ালে এবং পিঠের বাঁ দিকের হাড়ের (অংশফলকের) পাশে বা নিচে দেখা দেয়। ব্যথা কখনো বাঁ হাতে ছড়িয়ে যায়। ব্যথার সঙ্গে গুরুতর ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম, বমির ভাব বা বমি দেখা দিতে পারে। তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত রোগী কখনো-বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

অ্যানজাইনার ক্ষেত্রে ব্যথা সাধারণত শ্রমে বাড়ে, বিশ্রামে কমে, জিভের নিচে ঔষধ ব্যবহারে চলে যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু হৃদ্‌পেশির বিনষ্টিতে ব্যথার তীব্রতা বেশি থাকে, শরীর ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বিশ্রামে ব্যথা কমে না, অনেক ক্ষেত্রে জিভের নিচে ঔষধ ব্যবহারেও কমতে চায় না। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও অস্থিরতা দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ রোগীকে নিকটস্থ হৃদ্‌রোগ হাসপাতাল বা হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া জরুরি। হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের মাধ্যমেই হওয়া দরকার। হৃদ্‌রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ব্যায়াম করা, দৈহিক স্থূলতা কমানো, অতিমাত্রায় চর্বি-কোলেস্টেরল না খাওয়া, ধূমপান মদ্যপান বাদ দেওয়া, ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং যথাক্রমে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া। টাটকা শাক-সবজি, ফলমূল যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শ্রমের পাশাপাশি বিশ্রামও এ রোগের প্রতিরোধে উপকারী।

গৌ. র.

কর্কটক্রান্তি (summer solstice)

পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করে একটি পূর্ণবৃত্ত কল্পনা করা যায়। একে নিরক্ষরেখা (দ্র) বা নিরক্ষবৃত্ত বা ভূ-বিষুবরেখা বলে। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশে ০° ডিগ্রি ধরে উত্তর গোলার্ধের ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি বলে।

সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণকালে পৃথিবী ২১শে জুন তারিখে এমনভাবে অবস্থান করে যে সূর্যরশ্মি ২৩.৫° উত্তর সমাক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। এই অক্ষরেখা সূর্যের আপাতগতির সর্ব-উত্তর সীমা বলে এর নাম

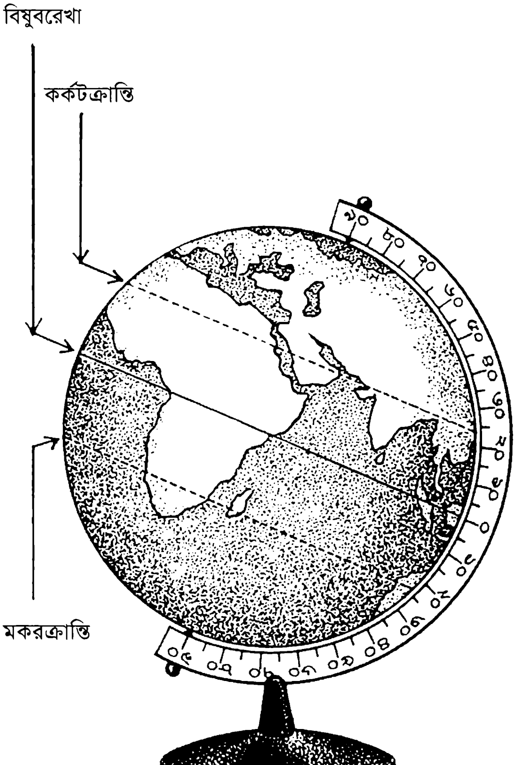

দেওয়া হয়েছে কর্কটক্রান্তি (Summer Solstice Sol = Sun, stice = standstill)। উত্তরায়ণে এটি সূর্যের শেষ অবস্থান। এই সময় ছায়াবৃত্ত (৬৬.৫° অক্ষাংশ) নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলোকে এমনভাবে ভাগ করে যে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত্রি ছোট এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে সর্বত্রই দিন এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে সর্বত্রই রাত্রি থাকে।

২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং রাত্রির পরিমাণ সবচেয়ে কম। ঐ দিনটিকে কর্কটসংক্রান্তি বলে।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপবলয় থেকে বায়ু উপরে উঠে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে পৌঁছুলে এ বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে নিচে নেমে আসে। এভাবে ২৫° থেকে ৩৫° উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দু'টি উচ্চচাপবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই দু'টি চাপবলয়কে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপবলয় বলে। এই উচ্চচাপবলয় থেকে বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলে কখনো দুইটি বায়ু মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে এখানে কোনো বৃষ্টিও হয় না। পৃথিবীর প্রায় সকল মরুভূমিই (দ্র) কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপবলয়ে অবস্থিত।

মু. এ.

কর্কট রোগ ক্যান্সার দ্র

কর্টিসোন (cortisone)

বৃক্কের (কিডনি) শীর্ষে অবস্থিত 'অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি'র বাইরের অংশ বা কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক উপাদানের (হরমোন) নাম কর্টিসোন। অন্ত্র থেকে শর্করা পরিশোষণে কর্টিসোন সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রকার রোগ সারাতেও কর্টিসোন কাজে আসে। অস্থিসন্ধির প্রদাহ, বিশেষ কারণে মাংসপেশির দুর্বলতা, এলার্জি, এডিসন্‌স রোগ (Addison's disease) ও হাঁপানিসহ চোখ, ত্বক, পরিপাকনালি এবং বৃক্কের বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কর্টিসোন কার্যকর।

ফিলিপ হ্যাঞ্চ (Philip Showalter Hench)

ফিলিপ এস হ্যাঞ্চ

এডওয়ার্ড কেন্ডাল

এবং এডওয়ার্ড কেন্ডাল (Edward Kendall) নামক দু'জন চিকিৎসক বাতজ্বর সারানোর জন্য রচেস্টার-এর মেয়ো হাসপাতালে একজন রোগীর ওপর সর্বপ্রথম কর্টিসোন প্রয়োগ করেন। কর্টিসোনের ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে বলা হয়। এ জন্য ১৯৫০ সালে এদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানীরা গরুর পিত্তে উপস্থিত এক ধরনের যৌগ থেকে কর্টিসোন তৈরি করতে সক্ষম হন।

সি. না. হ.

কর্ণ (ear)

শ্রবণ এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ। কর্ণ বা কানের তিনটি অংশ– বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের দু'টি অংশ– অনেকটা চোঙের মতো পিনা এবং কানের বহিঃছিদ্র। পিনা নরম তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি। কানের বহিঃছিদ্র লম্বা নলের মতো। বহিঃকর্ণের শেষে রয়েছে পাতলা চামড়ার কানের পর্দা। গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ কানের পর্দাকে নরম ও আর্দ্র রাখে বলে কান কর্মক্ষম থাকে।

মধ্যকর্ণের ছোট কুঠুরিতে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপেস নামের পরস্পরসংলগ্ন তিনটি ছোট অস্থি থাকে। মধ্যকর্ণ শ্রুতিনালির মাধ্যমে ফ্যারিংস বা গলবিলের সাথে যুক্ত। ফলে কানের পর্দার দুই দিকের বায়ুর চাপ সমান থাকে।

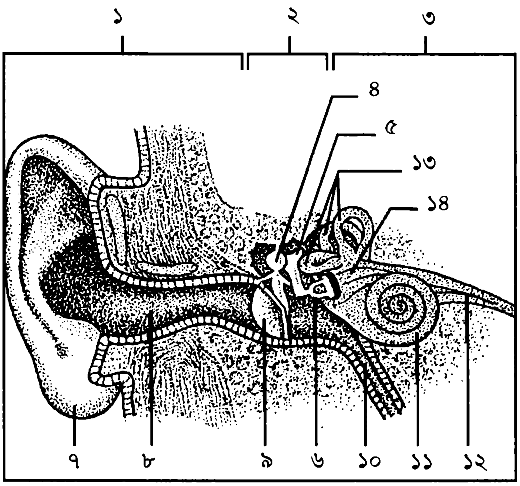

কর্ণ

১. বহিঃকর্ণ, ২. মধ্যকর্ণ, ৩. অন্তঃকর্ণ, ৪. ম্যালিয়াস, ৫. ইনকাস, ৬. স্টেপেস, ৭. পিনা, ৮. বহিঃছিদ্র (কর্ণকুহর), ৯. কানের পর্দা, ১০. ইউস্টেশিয়ান নালি, ১১. কক্লিয়া, ১২. শ্রবণস্নায়ু, ১৩. অর্ধবৃত্তাকার নালি, ১৪. ইউট্রিকিউলাস

অন্তঃকর্ণ মাথার অস্থির ভিতরে সুরক্ষিত। গোটা অন্তঃকর্ণ আকৃতিতে আঁকাবাঁকা পথের মতো। এ জন্য এর নাম 'লেবেরিন্থ'। শব্দশ্রুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এর ভেতরকার অংশের নাম কক্লিয়া (cochlea)। এর তিনটি অংশই তরল পদার্থে পূর্ণ। এই তরল পদার্থে প্রচুর শ্রবণস্নায়ু থাকে, যা মূল শ্রবণস্নায়ু (অডিটরি নার্ভ) নামে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়া অন্তঃকর্ণের বহিরাংশে দেহের অবস্থান নির্ধারণ ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য রয়েছে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি এবং ইউট্রিকিউলাস নামক অঙ্গ।

বহিঃকর্ণ শব্দধ্বনি গ্রহণ করার পর সেই শব্দতরঙ্গ কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পন মধ্যকর্ণের অস্থি তিনটির মধ্য দিয়ে কক্লিয়াতে পৌঁছায়। কক্লিয়ার তরল পদার্থ থেকে শ্রুতিস্নায়ুর মাধ্যমে কম্পন মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তখনই শব্দ শোনা হয়।

কান নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হয়। কানের ভেতরে পানি ও শক্ত ধারালো কোনো জিনিস ঢোকানো উচিত নয়। জন্মগতভাবে যারা বধির তাদের জন্য শোনার বিশেষ যন্ত্র রয়েছে।

আ. আ. হা.

কর্নিয়া (cornea)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর অক্ষিগোলকের বাইরে তন্তুময় স্তরের সামনের স্বচ্ছ অংশ কর্নিয়া (cornea) নামে পরিচিত। মানুষের অক্ষিগোলকের এক-ষষ্ঠাংশ কর্নিয়া। এর

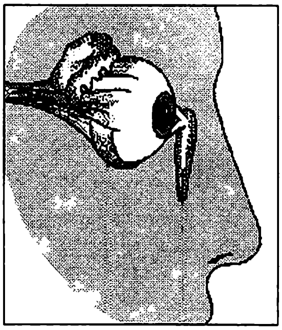

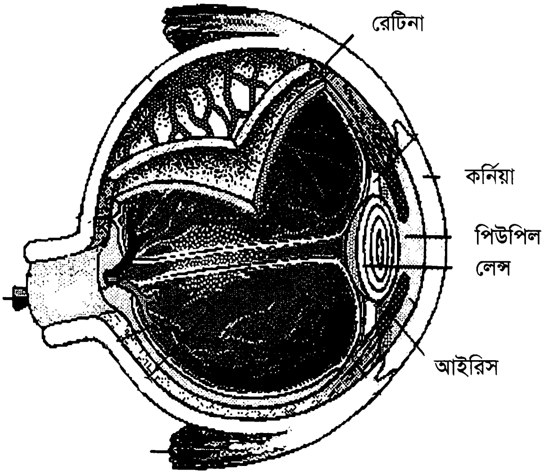

গঠনের প্রধান উপাদান যোজককলা যা সামনে ও পিছনে আবরণী কলা দ্বারা আবৃত। সামনের আবরণী কলা নেত্রাবর্ত কলা বা কনজাংটিভার আবরণী কলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কর্নিয়ার যোজককলার তন্তুসমূহের বিশেষ বিন্যাস এবং রাসায়নিক গঠনের কারণে কর্নিয়া স্বচ্ছ কাচের মতো দেখায়। বাইরে থেকে আগত আলোকরশ্মি প্রথম কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখে প্রবেশ করে। কর্নিয়ার পুষ্টির জন্য নিজস্ব কোনো রক্তনালি নেই। আশেপাশের রক্তনালি, অ্যাকুয়াস হিউমার নামক তরল এবং সরাসরি বায়ু থেকে কর্নিয়া প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি পায়।

সা. এ.

কর্পূর ফুল ও পাতা

কর্পূর (camphor)

উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কর্পূর বা ক্যাম্ফার একটি অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় জৈব উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ। পূর্ব-এশিয়ার জাপান, বোর্নিও, ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের এক জাতীয় গাছের প্রধানত পাতা থেকে কর্পূর তৈরি করা হয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এই গাছকে বলা হয় *লরাস ক্যাম্ফোরা*। আবদ্ধ পাত্রে এর পাতা ও ডালপালা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে উদ্বায়ী কর্পূর পাতিত হয়ে বেরিয়ে আসে। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে কর্পূর মিশে ঊর্ধ্বপাতিত হয়ে বেরিয়ে ঠাণ্ডা পাত্রের মধ্যে এসে জমে। কর্পূরের কিছু কিছু রোগনাশক, বীজাণুবারক, সুগন্ধদায়ী ও অন্যান্য গুণের জন্য এটি বহুকাল আগে থেকেই নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এর ব্যবহার বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সেলুলয়েড তৈরির জন্য কর্পূর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সিনেমার ফিল্ম, ফটোগ্রাফির নেগেটিভ প্লেট ও কোনো কোনো প্লাস্টিকের উৎপাদনশিল্পে সেলুলয়েডের ব্যবহার বেশ বেড়ে যাওয়ার ফলে কর্পূরের চাহিদাও বাড়তে থাকে। যেসব অঞ্চলে কর্পূরের গাছ জন্মায়, তার বেশির ভাগই ছিল জাপানের অধিকারে, আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে এর চাষ বাড়িয়ে জাপান পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অতি উচ্চমূল্যে কর্পূর সরবরাহ করে খুবই লাভবান হচ্ছিল। এই পরনির্ভরতা দূর করার জন্য পাশ্চাত্যের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু করেন।

কর্পূর বা ক্যাম্ফার একটি হাইড্রোকার্বন জাতীয় জৈব রাসায়নিক যৌগ; দেখতে সাদা, একটা বিশেষ গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী ও দাহ্য পদার্থ। এর রাসায়নিক গঠন অতি জটিল হওয়ায় এর আণবিক গঠনবিন্যাস নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, বহু গবেষণার শেষে উদ্ভিদ জাতের কর্পূরের আণবিক গঠন-বিন্যাস নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং ১৯০৩ সালে কৃত্রিম কর্পূর রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয়। অল্প কালের মধ্যেই কৃত্রিম কর্পূরের শিল্পউৎপাদন সফল হয়ে এটি বাজারে বিক্রি হতে শুরু করে। এই সংশ্লেষিত কর্পূর বিভিন্ন গুণ ও ধর্মে পুরোপুরি প্রাকৃতিক কর্পূরের মতো হয়ে শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংশ্লেষিত কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদিত হলেও কিন্তু প্রাকৃতিক কর্পূরের বাজার তেমন মন্দা হয় নি। জাপানি কর্পূরের চাহিদা আজও যথেষ্ট রয়েছে। কৃত্রিম নীল সংশ্লেষিত হওয়ার পরে উদ্ভিজ্জ নীলের চাষ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, পূর্ব-এশিয়ায় কর্পূর গাছের চাষের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিপর্যয় ঘটে নি। চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের ফিল্ম প্রভৃতির জন্য সেলুলয়েড শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং তার ফলে কর্পূরের চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। তার কারণ হল, কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তার্পিন বা টার্পেন্টাইন তেলের দাম যথেষ্ট বেশি, পাওয়াও যায় কম। কাজেই কৃত্রিম কর্পূর চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা সম্ভব হয় না এবং তা দিয়ে সেলুলয়েডের উৎপাদনশিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও চলে না। পাইন জাতীয় গাছ থেকে নিষ্কাশিত তার্পিন তেলের বিকল্প কোনো কাঁচামাল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লেষিত কর্পূর প্রাকৃতিক কর্পূরের স্থান দখল করতে পারবে না। তবে কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষিত হওয়ায় প্রাকৃতিক কর্পূরের অত্যধিক দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আ. হ. খ.

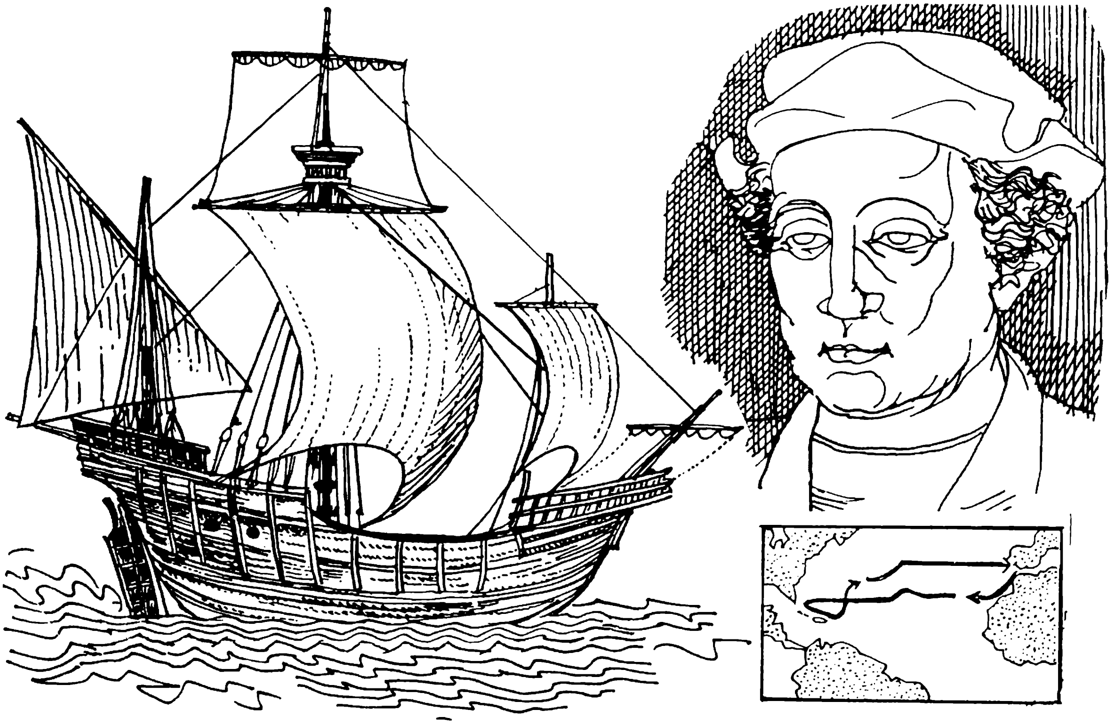

কলম্বাস ও তাঁর প্রধান জাহাজ সান্তামারিয়া। নিচে ডান কোনে– তাঁর প্রথম সমুদ্রযাত্রার মানচিত্র

কলম্বাস, ক্রিস্টোফার [১৪৫১-১৫০৬]

ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে (Christopher Columbus) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁকে আমেরিকার আবিষ্কারকও বলা হয়, যদিও ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছানোর বহু হাজার বছর আগে থেকেই সেখানে জনবসতি ছিল। কলম্বাস আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৫১ সালে ইতালির জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম কলম্বো (Colombo) পরবর্তী কালে ইংরেজিতে কলম্বাস হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। জেনোয়া সে সময় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর। তাঁতি পরিবারে জন্ম নিয়েও ক্রিস্টোফারের মনে শৈশব থেকেই সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন কাজ করত। তাই ফাঁক পেলেই কিশোর কলম্বাস বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজে চলে যেত এবং ঘুরে বেড়াত। এভাবে সে নৌবিদ্যার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই আয়ত্ত করে।

কলম্বাসের জীবনে প্রথম সমুদ্রযাত্রার সুযোগ আসে তাঁর উনিশ বছর বয়সে। একজন নাবিক হিসাবে ১৪৭৬ সালে এক দুর্ঘটনায় পড়ার পর একটি পর্তুগিজ জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে লিসবনে নিয়ে যায়। এর পরের কয়েক বছর তিনি পর্তুগিজ জাহাজেই কাজ করেন এবং ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। এ সময় তিনি একজন পর্তুগিজ মহিলাকে বিয়ে করেন।

লিসবনে অবস্থানকালে কলম্বাস লক্ষ করেন, পর্তুগালের নাবিকেরা আফ্রিকার উপকূল হয়ে চীন, ভারত ও সংলগ্ন এলাকাসমূহে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হচ্ছে। কলম্বাসও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা, আফ্রিকার উপকূল বরাবর না গিয়ে সরাসরি পশ্চিমে সমুদ্রযাত্রা করলেই সহজে সেখানে পৌঁছানো যাবে। আর সেখানে পৌঁছাতে পারলে যে কত বড় বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন।

অবশেষে কলম্বাস ভারত যাত্রার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেন এবং সফল হলে তিনি কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তারও

একটি শর্তমালা তৈরি করেন। পর্তুগালের রাজার কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ও শর্তাদি পেশ করেন। কিন্তু ১৪৮২ সলে এসব শর্তসাপেক্ষে রাজা তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

এরপর ১৪৮৫ সালে কলম্বাস স্পেনে যান এবং স্পেনের রাজার কাছে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। স্পেনের রাজাও এসব শর্তসাপেক্ষে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু একজন পরামর্শদাতা রানী ইসাবেলাকে এই সফরের ফলাফল বোঝালে রানী সকল শর্তসাপেক্ষে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪৯২ সালের ৩রা আগস্ট কলম্বাস তাঁর সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে ছিল কাঠের তৈরি ও ইঞ্জিনবিহীন তিনটি সাধারণ জাহাজ এবং ৯০ জন নাবিক। অকূল সমুদ্রে অজানা পথে এটাই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা। প্রায় তিন সপ্তাহ পর নাবিকেরা সবাই অস্থির হয়ে উঠল। তাদের ভয় হল আর বুঝি কখনো তীরে ফেরা সম্ভব হবে না। পরিস্থিতি ক্রমে এমন হল যে শেষ পর্যন্ত ১০ই অক্টোবর কলম্বাস তাদের কাছ থেকে মাত্র তিন দিনের সময় নেন। এর মধ্যে পৌঁছানো না গেলে তাঁরা ফিরতি যাত্রা করবেন।

অবশেষে ১২ই অক্টোবর মাঝরাতে বাহামার একটি দ্বীপে তাঁরা জাহাজ থেকে নামলেন। কলম্বাস এর নাম রাখলেন সান সালভাদর। অবশ্য কলম্বাস তখন একে ভারতীয় কোনো দ্বীপ বলেই মনে করেছিলেন।

কয়েক দিন পর আবার যাত্রা করলেন তাঁরা। ২৮শে অক্টোবর কিউবায় পৌঁছে কলম্বাস ভাবলেন, তিনি চীনে পৌঁছে গেছেন। এর পর হাইতির উপকূল দিয়ে যাওয়ার সময় এক জায়গায় তাদের একটি জাহাজ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানকার আদিবাসী-প্রধান তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন এবং জাহাজ মেরামতে সহায়তা করেন। পরিস্থিতি অনুকূল মনে করে কলম্বাস ৪০ জন লোককে সেখানে রেখে যান। তাঁদের তিনি দুর্গ তৈরি ও স্বর্ণ সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে যান। বাকি নাবিকদের নিয়ে ১৪৯৩ সালের ১৫ই মার্চ তিনি স্পেনে ফিরে আসেন। এর পর তিনি আরো তিন বার আমেরিকায় যান। শেষ সমুদ্রযাত্রা করেন ১৫০২ সালে।

ফ. মা.

কলা (banana)

কলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের একটি অবৃক্ষজাতীয় ফল। পৃথিবীর সর্বত্রই এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। পুষ্টি-উপাদানের দিক থেকেও কলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সারা বছরই কম-বেশি কলার ফলন হয়। শুধু ফল নয়, সবজি হিসাবেও কলার যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া কলাগাছ ও গাছের পাতা গবাদি পশুর, বিশেষ করে হাতির অতি প্রিয় খাদ্য। কয়েক জাতের কলাগাছ ও গাছের পাতা বিশেষ ধরনের সুতা, থলে, মাদুর, এমনকি ঘরের বেড়া-ছাউনি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

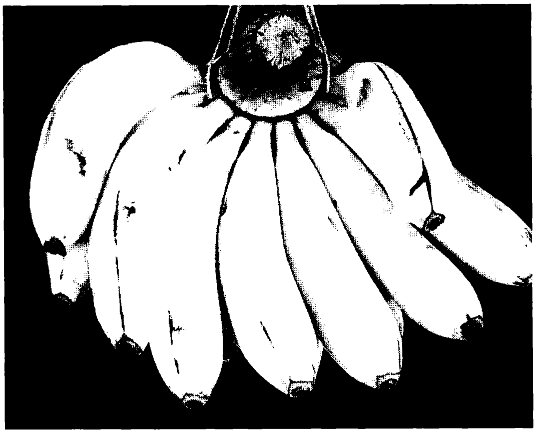

অমৃতসাগর কলা

কলার আদি জন্মস্থান এশিয়া মহাদেশে। বর্তমানে এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সকল দেশেই জন্মে। ব্রাজিল কলা উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এর পর পরই উগান্ডা, ভারত ও ফিলিপাইনের অবস্থান। বাংলাদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে কলা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বৃহত্তর বরিশাল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রচুর কলা উৎপাদিত হয়। এর পরেই রয়েছে বৃহত্তর সিলেট, খুলনা, রংপুর, ঢাকা ও ফরিদপুরের অবস্থান।

পৃথিবীতে কলার বহু জাত রয়েছে। তিনটি প্রজাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হচ্ছে Musa sapientum,, Musa cavendishic ও Musa paradisiaca। বাংলাদেশে উৎপাদিত কলার জাতগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে– ১. সম্পূর্ণ বীজহীন কলা (যেমন অমৃতসাগর, সবরি, বসরাই, সিঙ্গাপুরি, অগ্নিস্বর, দুধসর

ও মাদ্রাজি), ২. দু'-একটি বীজযুক্ত কলা (যেমন চাঁপা, চিনিচাঁপা, কবরি ও চন্দনী কবরি), ৩. এঁটে কলা (যেমন চতুর আইটা, গোমা, নিখাইল্যা ও সাংগি আইট্যা)।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং উঁচু বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য সর্বোত্তম। কলাগাছের গুঁড়ি থেকে যেসব নতুন চারা গজায়, সেগুলো থেকেই নতুন গাছ তৈরি হয়। জাতভেদে এক একটি কলাগাছ ৮ থেকে ৩০ ফুট (২.৪ থেকে ৯ মিটার) পর্যন্ত উঁচু হয়।

কলাগাছের বয়স ১০ মাসের কাছাকাছি হলেই গাছে থোড় বা ফুলের গুচ্ছ বের হয়। থোড়ে অনেকগুলো পাতলা আবরণী পরতে পরতে সাজানো থাকে। আবরণীগুলোর ভেতরে থাকে ফুল। এক একটি আবরণী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলসহ কচি কলার ছড়া বেরিয়ে আসে। এক একটি ছড়ায় ১০ থেকে ২০টি কলা থাকে। আবার এক একটি কলার কাঁদিতে অনেক ক'টি ছড়া থাকে। কলাগাছে মাত্র এক বারই ফল হয়।

ফ. মা.

কলেরা (cholera)

ভিব্রিও কলেরী (Vibrio cholerae) এবং এল্ টোর ভিব্রিও (El Tor vibrio) নামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট পরিপাকনালির সংক্রমণের ফলে কলেরা রোগ দেখা দেয়। কলেরার জীবাণুযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তারলাভ করে। বাংলায় এ অসুখকে ওলাউঠা বলে।

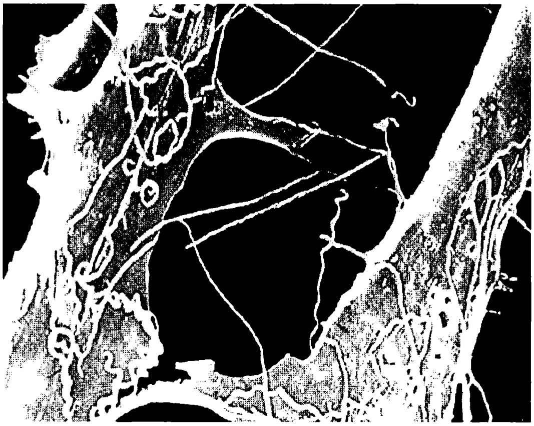

কলেরার জীবাণু

কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ বার বার পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া এবং এর সঙ্গে বমি। ফলে রোগীর শরীর থেকে দরকারি পানি ও খনিজ লবণ বেরিয়ে যায়। কলেরার ক্ষেত্রে গুরুতর ডায়রিয়ার সব উপসর্গ যথেষ্ট তীব্রতা নিয়ে প্রকাশ পায়। চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

কলেরা রোগের চিকিৎসার প্রধান দিক রোগীর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে পানি ও খনিজ লবণ সরবরাহ করা। এ ক্ষেত্রে খাওয়ার স্যালাইন কার্যকর নাও হতে পারে। তখন শিরাপথে রোগীকে কলেরা স্যালাইন দেওয়া প্রয়োজন। জীবাণুসংক্রমণ দূর করার জন্য রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ সেবন করানো উচিত।

সি. না. হ.

কসমিক রশ্মি / নভোরশ্মি (cosmic ray)

সৌরজতের বাইরের নভোমণ্ডল থেকে ধনাত্মক আধান (চার্জ)-যুক্ত এক প্রকার উচ্চশক্তি ও ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মি অবিরত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। এদের নাম কসমিক রশ্মি বা নভোরশ্মি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে, একটি চার্জযুক্ত বিদ্যুৎবীক্ষণ-যন্ত্র বাতাসে রেখে দিলে ধীরে ধীরে তার চার্জ কমে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যন্ত্রটি উত্তমরূপে অন্তরিত করলেও একই ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎবীক্ষণ-যন্ত্র হল বৈদ্যুতিক চার্জের উপস্থিতি ও প্রকৃতি জানার যন্ত্র। চার্জযুক্ত পদার্থের উপস্থিতি জানার জন্য আরো একটি যন্ত্র গাইগার কাউন্টার। এই যন্ত্রটি বাতাসে রেখে দিলে কোনো চার্জ ছাড়াই ক্লিক ক্লিক শব্দ করে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন, বাতাসে চার্জ বা আধানযুক্ত কণিকা রয়েছে। কিন্তু কী এই কণিকা? কোথায় এর উৎস? পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হল, এই রশ্মি আসছে বহির্জগৎ বা নভোমণ্ডল থেকে। অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাঞ্জ হেস্ সর্বপ্রথম বলেন যে, এই রশ্মি আসে নভোমণ্ডল থেকে। তিনি এর নাম দেন কসমিক রশ্মি। ১৯৩৬ সালে এই আবিষ্কারের জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

কসমিক রশ্মি বা নভোরশ্মি দুই প্রকার প্রাথমিক

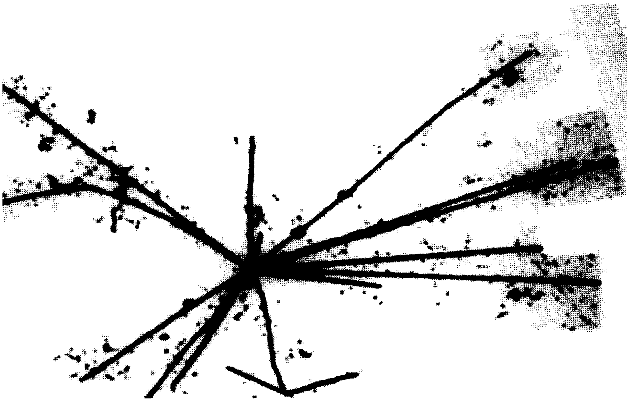

কসমিক রশ্মি

বা মুখ্য এবং জাত বা গৌণ। যে নভোরশ্মি সরাসরি নভোমণ্ডল থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তা প্রাথমিক নভোরশ্মি। এগুলো প্রধানত ধনাত্মক চার্জযুক্ত হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রোটন দ্বারা গঠিত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে থাকে ৯০% প্রোটন, ৯% আলফাকণা, বাকি ১% কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ ইত্যাদির নিউক্লিয়াস। উচ্চশক্তির প্রাথমিক নভোরশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেই অন্যান্য কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। ফলে বিভিন্ন ধরনের গৌণ কণিকার সৃষ্টি হয়। এসব কণিকা পজিট্রন, মেসন, হাইপারন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় প্রকার নভোরশ্মির সৃষ্টি করে। এই দ্বিতীয় প্রকার নভোরশ্মি হল জাত বা গৌণ নভোরশ্মি।

নভোরশ্মি অতি উচ্চ ভেদনক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন কণিকা। সমুদ্রের তলদেশে এবং খনিগর্ভেও এই রশ্মি প্রবেশ করে। তবে নিম্ন উচ্চতায় এর তীব্রতা কমে যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এর তীব্রতা বিভিন্ন। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এর তীব্রতা সবচেয়ে কম। এই রশ্মি বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয়।

স. রা.

www.boighar.com

কাঁকড়া (crab)

কাঁকড়া আর্থ্রোপোডা পর্বের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পৃথিবীর সর্বত্র আছে। লোনা ও মিঠা পানিতে এবং স্থলে বাস করে। কোনো কোনো প্রজাতি কয়েক কিলোমিটার লম্বা গর্ত করতে সক্ষম। বিশ্বে এর প্রজাতিসংখ্যা প্রায় ৪,৫০০ হলেও বাংলাদেশে আছে ১৫টি। বড় প্রজাতিগুলোর মাংস খেতে সুস্বাদু।

কাঁকড়ার দেহ শক্ত খোলসে আবৃত। এর নখরযুক্ত পাঁচ জোড়া পা আছে। প্রথম জোড়া দাঁড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর অগ্রভাগে চিমটা থাকে, যা খাদ্য বা অন্য কিছু ধরতে কাজে লাগে। পুরুষ-ফিডলার কাঁকড়ার বাম বা ডান দাঁড়া পুরো শরীর থেকেও বড়। মটর কাঁকড়া ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। স্ত্রী মটর কাঁকড়া ঝিনুকের খোলসের ভেতরে বাস করে। আলাস্কার রাজ-কাঁকড়ার ওজন ৫.৪ কেজি পর্যন্ত হয়।

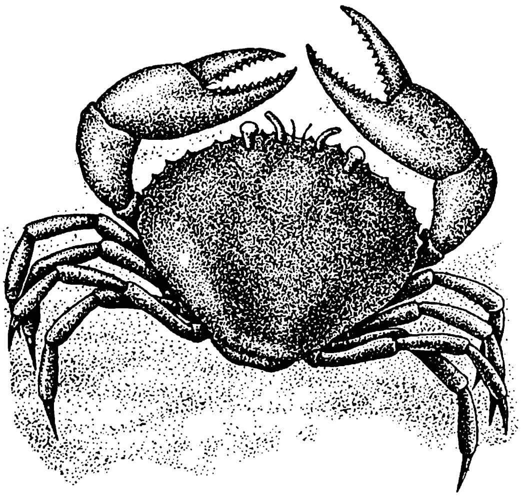

প্রজাতিভেদে এদের নখর, পা ও শরীরের গঠন, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। খোলস মসৃণ, অমসৃণ বা কণ্টকময় হতে দেখা যায়। কোনো কোনো প্রজাতি সাঁতারে দক্ষ। কোনো কোনোটি ভালো দৌড়ায়।

কাঁকড়া ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক ক্রিমি, শামুক, ঝিনুক, কীটপতঙ্গ, নদী-নালা-সমুদ্রের পচা আবর্জনা খায়। অনেকেই সর্বভুক।

স্ত্রী-কাঁকড়া ডিম পেড়ে তা উদরের পায়ের সঙ্গে আটকে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ সাঁতরাতে পারে। এটি খোলস বদলে বদলে বেশ

কয়েকটি পর্যায় পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়ায় পরিণত হয়। রাজ-কাঁকড়া ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

কাঁঠাল (jack-fruit)

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। কাঁঠালের কোয়া আমাদের প্রিয় খাদ্য। এর বিচিও একটি উপাদেয় সবজি। কাঁঠালের বাকল গরু-মহিষের প্রিয় খাদ্য।

কাঁঠাল গাছের কাঠ বেশ শক্ত, আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠাল গাছ বেশ বড় ও ঝাঁকড়া হয় এবং দীর্ঘদিন বাঁচে। কাঁঠাল গাছের পাতা বড় বড় এবং প্রায় গোলাকার। পাতা ঘন বলে কাঁঠাল গাছের ছায়াও বেশ ঘন হয়।

কাঁঠাল গাছে শীতকালে ফুল বা মুচি আসে। মুচি বেশ সুগন্ধ। একটি মুচি আসলে বহু ফুলের সমষ্টি। তেমনি একটি কাঁঠালও বহু ফলের সমষ্টি। গ্রীষ্মকালে কাঁঠাল পাকে। সাধারণত গাছের কাণ্ড ও শাখায় এ ফল ধরে। অনেক সময় গাছের মূলেও ফল ধরতে দেখা যায়।

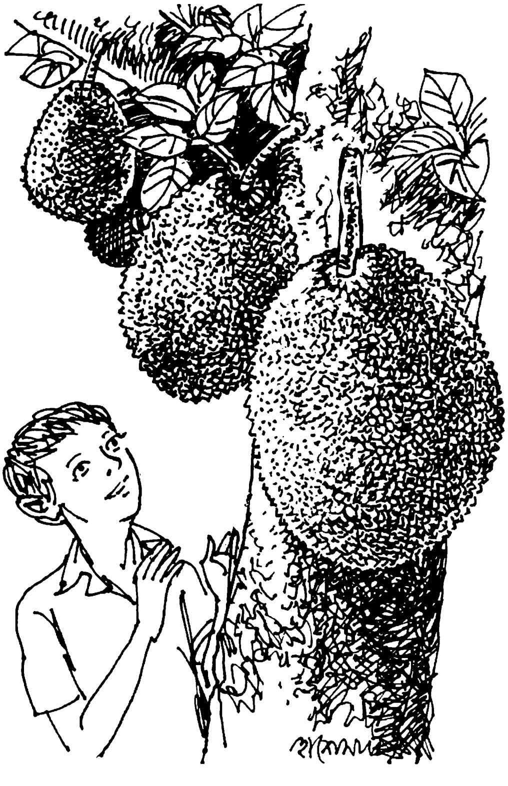

কাঁঠাল গাছ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি দেখা যায়। তবে বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর ও ঢাকা অঞ্চলে এটি একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। যেখানে পানি জমে না এমন উঁচু জায়গায় কাঁঠাল গাছ বপন করতে হয়।

কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus integra*। ইংরেজি নাম Jack tree।

ফ. মা.

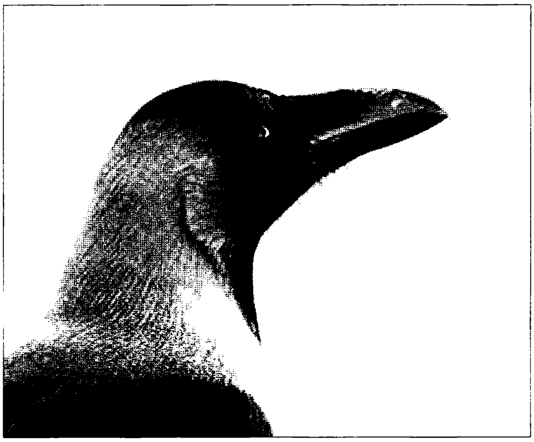

কাক (crow)

কাক প্যাসেরিফর্মেস বর্গের পাখি। বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের কাক দেখা যায়– দাঁড়কাক ও পাতিকাক। দাঁড়কাককে *(Corvus macrorhyncos)* লোকালয় ছাড়াও বনে-জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। লম্বায় ৫০-৬০ সেমি, ডানা ১.২ মিটার। রঙ কালো, ঠোঁট মজবুত, শক্ত ও লম্বা। যা পায় তা খায়। তবে অনেক সময় ছোট ছোট জীবিত প্রাণী, মুরগির বাচ্চা, এমনকি কাঁকড়া পর্যন্ত খেতে দেখা যায়। এরা বাসা বানায় গাছের অপেক্ষাকৃত ওপরে বা মগডালে।

পাতিকাকের বৈজ্ঞানিক নাম *Corvus splendensl*। এরা মূলত শহরে বা লোকালয়ে থাকে। এদের গায়ের রঙ কালো হলেও মাথার পিছন থেকে ঘাড় হয়ে বুক পর্যন্ত অংশটি ছাই রঙের। লম্বায় ৩০-৩৫ সেমি। এরা সাধারণত মানুষের ফেলে দেওয়া খাবার, মরা প্রাণী ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এ জন্য এদেরকে প্রকৃতির ধাঙ্গড়ও বলা হয়। এরা আকারে দাঁড়কাকের

চেয়ে কিছুটা ছোট। এরা বট-পাকুড়, রেণ্ডি, কড়ই বা অপেক্ষাকৃত বড় গাছে বাসা বানায়। একটি বড় গাছে এদের শতাধিক বাসাও থাকতে পারে। অনেক সময় এরা দালানের কার্নিশে বাসা বানায়। এক মৌসুমে একটি স্ত্রী-কাক ৪-৫টি ডিম দিয়ে থাকে।

ফ. মা.

কাকাতুয়া (cockatoo)

কাকাতুয়া তোতা পরিবারের বৃহত্তর পাখি। প্রত্যেকেরই মাথায় ঝুঁটি থাকে। অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও আশেপাশের দ্বীপাঞ্চলে এরা বাস করে। প্রজাতির সংখ্যা ১৭।

প্রজাতিভেদে ৩৫-৮০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এদের ঠোঁট ছোট, অত্যন্ত শক্তিশালী। ওপরের ঠোঁট

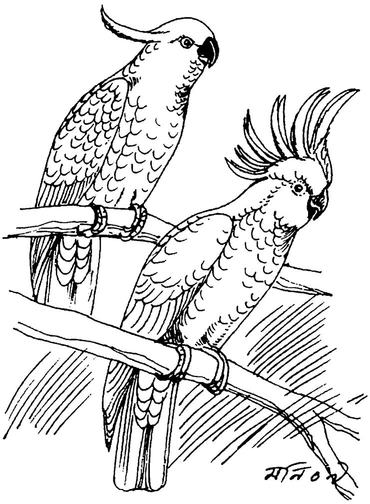

নিচের দিকে বাঁকানো, নিচেরটি সোজা। জিহ্বা পুরু। সুপারির শক্ত খোসা ছাড়াতে ও মোটা তার কাটতে এদের ঠোঁটের জুড়ি নেই। গাছের শাখা, খাঁচার তারে পা আটকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে থাকে।

বেশির ভাগ প্রজাতিই সাদা। তবে তাতে লাল, গোলাপি, হলদের ছোঁয়া থাকে। কোনো কোনোটা কালো বা নীল হয়। গোলাপিগুলো সুন্দরতম।

এরা শস্যদানা, সুপারি, ফল ইত্যাদি খায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

এরা গাছে গর্ত করে বা পরিত্যক্ত গর্তে বাস করে। অনেক সময় অন্যদের হটিয়ে গর্তের দখল নেয়। প্রজাতিভেদে স্ত্রী-কাকাতুয়া দু' থেকে পাঁচটি সাদাটে ডিম পাড়ে। তাতে ছাই ও বাদামি ছিট থাকতে পারে। গড়ে ৩০ দিন তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

এরা পোষা পাখি হিসাবে জনপ্রিয়। চড়া দামে বিক্রি হয়। কথা নকল করতে তেমন পটু নয়। কোনো কোনোটা পঞ্চাশ বছরও বেঁচে থাকে।

আ. ন. ম. আ. র.

কাগজ (paper)

লিপি ও বর্ণমালা আবিষ্কারের পরই কিসের উপর লিখবে এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল মানুষ। গাছের পাতা, বাকল, চামড়া, পাথর, মাটি ইত্যাদির উপর শুরু হল মানুষের প্রথম লেখা। মিশরের নীল নদের তীরে জন্মাত প্যাপিরাস গাছ। এটি নলখাগড়া জাতীয় গাছ। একে পাতলা ফালি করে পর পর সাজিয়ে পানিতে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলে জোড়া লেগে পাতলা চাদর বা পাতের মতো হত। লেখার জন্য ব্যবহৃত হত এসব পাতা। তার পর গুটিয়ে রাখা হত। প্যাপিরাস গাছ থেকে উৎপন্ন বলে একে বলা হয় পেপার (paper)। পেপারের চৈনিক প্রতিশব্দ 'কায়গদ' ও আরবি প্রতিশব্দ 'কাগজ'।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে চীন দেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। পুরাতন ছেঁড়া কাঁথা, কম্বল, কাপড় পচিয়ে চুন, আঠা মিশিয়ে হাতে তৈরি এসব কাগজ ছিল নরম এবং তুলোট। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতেই কাগজ তৈরি হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি বিজ্ঞানী নিকোলাস লুই রবার্ট কাগজ তৈরির মেশিন আবিষ্কার করেন। এটি ছিল খুব সাধারণ যন্ত্র। পরবর্তী কালে ধাপে ধাপে এই যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান (১) বাঁশ, নরম কাঠ, ঘাস, আখের ছোবড়া, ছেঁড়া পরিত্যক্ত কাগজ, চট, পাট ইত্যাদি; (২) কস্টিক সোডা (NaOH) এবং (৩) ব্লিচিং দ্রব্য।

যান্ত্রিক উপায়ে মূল উপাদানগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করার পর ডাইজেস্টারে সিদ্ধ ও এর পর দলিত-মথিত করে

এক ধরনের নরম মণ্ড তৈরি করা হয়। একে বলে পাল্প। পাল্পকে ব্লিচিং মিশিয়ে ধৌত করে সাদা করা হয়। পাল্পে পুনরায় পানি মিশিয়ে অর্ধতরল করে বৃহৎ রোলারযুক্ত যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিত করলে পাতলা কাগজের শিট তৈরি হয় এবং তা জড়ানো হয় একটি রিলে। পাল্পে প্রয়োজনীয় রঙ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন বর্ণের ও ধরনের কাগজ তৈরি হয়।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় কাগজের কল কর্ণফুলী নদীর তীরে চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে উৎপন্ন বাঁশ থেকে এখানে কাগজ তৈরি করা হয়। পাবনার পাকশীতে আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চিনিকল থেকে এসব ছোবড়া সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের গেওয়া প্রভৃতি নরম কাঠ থেকে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে কাগজ তৈরি হয়। এই তিনটি কাগজকল ছাড়া বাংলাদেশের সিলেটে একটি পাল্প তৈরির কারখানা আছে।

স. রা.

কাচ (glass)

কাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণসামগ্রী। এর মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে। কাচ আবহাওয়া বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এসব গুণের জন্য কাচ জানালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কাচকে বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে পাত্রাদি তৈরি করা যায়। কাচের গায়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা এবং ডিজাইন করা যায়। কাচের আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল লেন্স তৈরির কাজে এর প্রয়োজন। চশমা, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা ইত্যাদি আলোকযন্ত্র তৈরিতে লেন্স অপরিহার্য।

বিশেষ ধরনের বালি (SiO_2), চুনাপাথর ($CaCO_3$) ও সোডা অ্যাশ (Na_2CO_3) থেকে সাধারণ কাচ তৈরি হয়। একটি বিশেষ ধরনের চুল্লির মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে উপাদানগুলি মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। উচ্চ তাপে (প্রায় ১৬০০° সে.) উপাদানগুলি গলিয়ে গলিত কাচ তৈরি হয়। গলিত কাচ দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে লম্বা শিট অথবা বোতল, গ্লাস ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এই কাচ সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। মূল উপাদানের মধ্যে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে একে অত্যন্ত শক্ত,

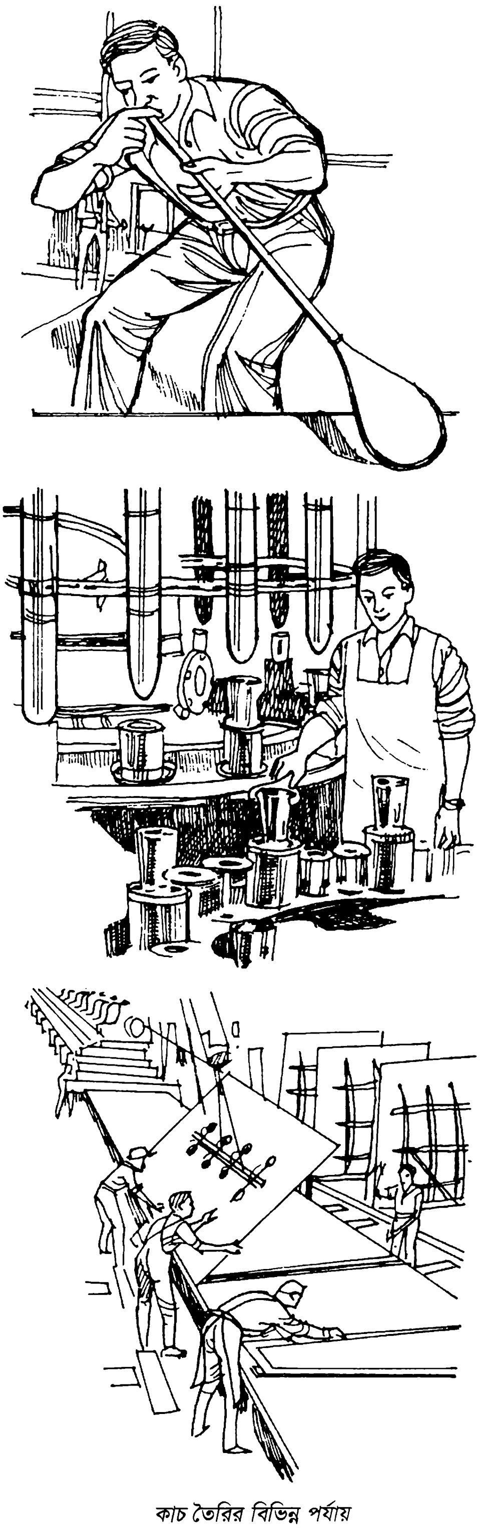

কাচ তৈরির বিভিন্ন পর্যায়

এমনকি তাপরোধী পর্যন্ত করা যায়। গলিত অবস্থায় কাচের মধ্যে রঙের উপাদান মিশিয়ে কাচকে রঙিন করা হয়। পটাসিয়াম এবং বেরিয়ামযুক্ত কাচকে বলে 'ক্রাউন গ্লাস'। ক্যালসিয়াম সিলিকেট-এর পরিবর্তে লেড সিলিকেট ব্যবহার করে তৈরি হয় 'ফ্লিন্টগ্লাস', বোরন অক্সাইড এবং অতিরিক্ত সিলিকেট দিয়ে 'পাইরেক্স গ্লাস' প্রস্তুত হয়। ক্রাউনগ্লাস বেশ শক্ত এবং তাপ সহ্য করতে পারে। এই কাচ দিয়ে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত বিকার, বোতল, ফ্লাস্ক তৈরি হয়। ফ্লিন্টগ্লাস উজ্জ্বল এবং এর প্রতিসরাঙ্ক বেশি; আলোকযন্ত্র, লেন্স প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। পাইরেক্স গ্লাস অধিকতর তাপ ও আঘাত সহ্য করতে পারে। পাইরেক্স থেকেও শক্ত কাচের নাম ভাইকার গ্লাস।

সমতল বা বক্রতল কাচের এক পিঠে অস্বচ্ছ পদার্থের প্রলেপ লাগিয়ে আয়না বা দর্পণ তৈরি হয়। কাচকে মানুষের চুলের মতো সূক্ষ্ম আঁশ বা তন্তুতে পরিণত করা যায়। এসব তন্তু দিয়ে তৈরি পদার্থকে বলে ফাইবার গ্লাস। এই তন্তু দিয়ে কাপড় বোনা যায়, এসব কাপড় অগ্নিনিরোধক হয়। প্লাস্টিকের সঙ্গে ফাইবার গ্লাস মিশিয়ে খুব শক্ত শিট তৈরি হয়। এ দিয়ে গাড়ির বডি, নৌকার খোল, সুটকেস, হাতব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাচের তন্তু দিয়ে তৈরি হয় 'গ্লাসউল'। গ্লাসউল ক্ষতিকারক তরল বিশোষণ করে এবং তাপনিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুই শিট কাচের মধ্যে স্বচ্ছ প্লাস্টিকশিট বসিয়ে তাপ ও চাপ প্রয়োগে এক ধরনের কাচশিট তৈরি হয়। একে বলে স্তরিত কাচ বা 'ল্যামিনেটেড গ্লাস'। এই কাচ বুলেটপ্রুফ হয়।

স. রা.

কাছিম (turtle)

সাপ, কুমির এবং প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরদের মতো কাছিমও এক জাতের সরীসৃপ। তবে আকার, প্রকার, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে কাছিম অন্যসব সরীসৃপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কাছিমের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ বা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তিন ধরনের প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দলটিকে বলা হয় কাছিম (turtle)। এরা সাধারণত জলচর। স্বাদু এবং লোনা উভয় ধরনের

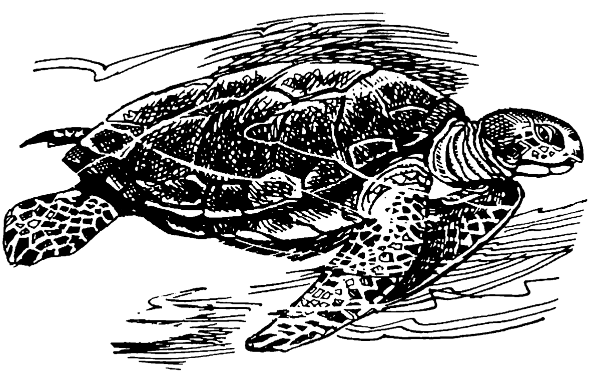

জলাঞ্চলেই কাছিম পাওয়া যায়। অন্য এক দলের নাম কচ্ছপ (tortoise)। এরা মূলত স্থলচর। তৃতীয় দলটির নাম কাইট্টা (terrapin)। এই তিনটি দলের মধ্যে আকার, স্বভাব, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগত অনেক মিল থাকলেও বৈসাদৃশ্যও খুব একটা কম নেই।

সাধারণভাবে বলা যায়, যেসব সরীসৃপের দেহের বাইরের আবরণ নরম এবং হাতে ও পায়ে তিনটি করে সুচালো নখর থাকে, তাদের সাধারণত কাছিম বলা হয়। কাছিমের মাথা অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি। মুখ অনেকটা সুচালো। কাছিমের মুখে কোনো দাঁত নেই। তবে এদের মাঢ়ি অত্যন্ত শক্ত। অনেক প্রজাতির কাছিমের পিঠ বেশ নরম, কোনো কোনো প্রজাতির পিঠ বেশ শক্ত ও দৃঢ় ধরনের। কাছিমের পিঠের এই আবরণকে প্ল্যাস্ট্রন (plastron) বলা হয়।

কাছিম প্রধানত স্বাদু জলে, বিশেষ করে খাল, বিল, নদ-নদী, নালা, পুকুর, ডোবা, দিঘি, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পুকুর, ডোবা, দিঘিতে প্রায়ই দেখা যায়। কাছিম জলে ভেসে নাক উঁচু করে বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করে। কাছিম জলচর হলেও এরা সব সময় জলে থাকে না। মাঝে-মধ্যে এরা ডাঙ্গায় উঠে আসে। বিশেষ করে ডিম পাড়ার সময়। জলাশয়ের ধারে শুকনো স্থানে কিছুটা বেলে অঞ্চলে কাছিম গর্ত করে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। এভাবে ডিম পাড়ার পর স্ত্রী-কাছিম আবার জলে ফিরে যায়। অবশ্য যাবার আগে ডিমগুলোকে বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে এরা কখনই ভোলে না। স্বাভাবিক তাপ ও আর্দ্রতায় ডিম ফুটে নির্দিষ্ট সময়ে কাছিমের বাচ্চা বের হয়ে আসে। ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসা কাছিমশিশু সরাসরি জলের দিকে রওয়ানা দেয়। সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করে কারো

সাহায্য ছাড়াই এই সদ্যোজাত কাছিমশিশু কাছের জলাশয় খুঁজে নেয়। কখনই এরা জলের বিপরীত দিকে যায় না। সদ্যোজাত কাছিমশিশুদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার রহস্য আজও অমীমাংসিত।

বাংলাদেশে বেশ কয়েক প্রজাতির কাছিম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল খালুয়া কাছিম, ধুম কাছিম, জাতা কাছিম, ছিলম কাছিম, সুন্দী কাছিম, মহম কাছিম, চামুয়া কাছিম, ইমিছ কাছিম, অ্যামবরা কাছিম, পিকটা কাছিম ইত্যাদি। আকার ও গঠনরীতিতে এসব কাছিমের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

অনেকেই কাছিমের মাংস খেয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে কাছিমভোজী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। অনেক কাছিমের মাংস বেশ বিষাক্ত।

অ. ব.

কাজ (work)

সাধারণ অর্থে কোনো কিছু করা বা কোনো দায়িত্ব সম্পাদনের প্রচেষ্টাকেই কাজ বলে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কাজের সংজ্ঞা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। তা হল বল এবং বলের দিকে বস্তুর সরণ (অতিক্রান্তদূরত্ব)-এর গুণফল। অর্থাৎ কাজ = বল x বলের দিকে বস্তুর সরণ। বস্তুর সরণ যদি প্রযুক্ত বলের দিকে না হয়ে θ কোণে বিচ্যুত হয় তা হলে–

কাজ = বল x বলের দিকে সরণের বিশিষ্টাংশ

অর্থাৎ কাজ = বল x সরণ x $\cos\theta$।

প্রায়োগিক অর্থে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বস্তু উত্তোলন করবে, টেনে বা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে, তখন 'কাজ' হবে। কিন্তু কোনো বস্তু ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা কোনোটাই কাজ নয়।

মই বেয়ে কোনো লোক উপরে উঠলে কাজ হয়। সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হবে লোকটির ওজন এবং যতটুকু উচ্চতা উঠেছে তার গুণফল। এভাবে মই বেয়ে উঠলে কাজ হয় এবং অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জিত হয়। ঐ ব্যক্তি মই থেকে লাফিয়ে পড়লে অর্জিত স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কাজের একক জুল (দ্র)। এক নিউটন বলের দ্বারা বস্তুর এক মিটার সরণ ঘটলে ঐ বলকে এক জুল বলে। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে কাজের একক ফুট-পাউন্ডাল। ১ ফুট-পাউন্ডাল = ১.৩৫৬ জুল।

স. রা.

কাঠঠোকরা (woodpecker)

কাঠঠোকরার কয়েকটি প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়। লেসার গোল্ডেন ব্যাকড উডপেকার, বৈজ্ঞানিক নাম *Dinopium benghalense*। কাঠঠোকরা পিসিফরমিস (Piciformes) বর্গের পাখি। সারা দেশে দেখতে পাওয়া যায়। পিঠ সোনালি-হলুদ। লেজ, গলা খয়েরি ও ডানার কিনারা কালো। কালো ঠোঁটের গোড়া থেকে পুরো মাথা জুড়ে লাল চূড়া আছে। কাঠঠোকরা আকারে ময়নার মতো। এরা জোড়ায় জোড়ায় ও একাকী পুরানো গাছে অথবা খুঁটিতে ঘুরে বেড়ায় এবং পোকা-মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। পুরানো কোনো গাছের ডালে গর্ত করে বাসা তৈরি করে। ২-৩টি ডিম পাড়ে। বাবা-মা দু'জনে মিলে বাচ্চার যত্ন নেয়।

রা. জা.

কাঠবিড়াল (squirrel)

কাঠবিড়ালের ৩০০ প্রজাতি-উপপ্রজাতি আছে। সাদা লেজ, অ্যান্টিলোপ, 'তের ডোরা' গ্রাউন্ড, আর্কটিক, সোনালি দাগ, উড়ন্ত ফক্স ও চিপমুঙ্ক কাঠবিড়াল উল্লেখযোগ্য। কাঠবিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম *Sciuridae*।

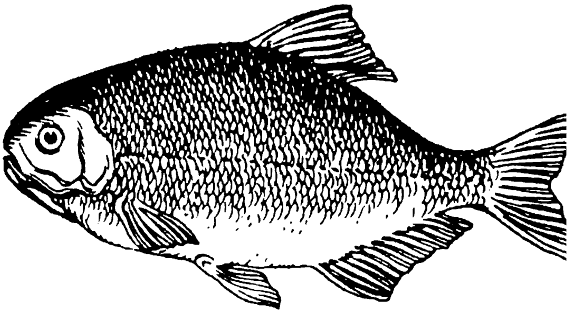

ফারের মতো লেজ ও গায়ের লোম। বাংলা '৯'-এর মতো লেজ। কালো-উজ্জ্বল চোখ। গোলাকার কান।

প্রজাতিভেদে এরা বাদামি, সোনালি, ডোরাকাটা, সাদা, কালো নানা রঙের হয়। এদের গোঁফ আছে। চঞ্চলগতি। সামনের পা দু'টি হাতের কাজ করে। লাফিয়ে গাছ থেকে গাছে যায়। উড়ন্ত কাঠবিড়াল গ্লাইডারের মতো ৪৫ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। অনেকের লেজ খাটো। অনেকে আবার গাছে চড়তে পারে না।

সবচেয়ে বড় কাঠবিড়াল হচ্ছে মারমট (লেজসহ ৭৬ সেন্টিমিটার, ওজন ৯ কিলোগ্রাম)। এর লেজ হচ্ছে ২৫ সেন্টিমিটার। ছোট হচ্ছে পিগ্‌মি কাঠবিড়াল। এটি লেজ বাদে ৮ সেন্টিমিটার, লেজ ৫ সেন্টিমিটার, ওজন ১৪ গ্রাম।

এরা কুটো, লতা, ঘাস-পাতা দিয়ে গাছে বা খোঁড়লে গোল বাসা তৈরি করে। ২-৪টি বাচ্চা হয়। অনেকের দুটো আবাসস্থল (শীতে ও গ্রীষ্মে) থাকে।

পাইন জঙ্গলের কাঠবিড়ালকে বলা হয় কাইবাব (Kaibab)। শীতে এরা কয়েকটি মিলে এক বাসায় বসবাসও করে।

লাফ দেবার সময় এদের লেজ ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা ২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

পাখির ডিম, তৃণলতা, কীটপতঙ্গ, ফল-ফলারি, গাছের ছাল ইত্যাদি খায়। উড়ুক্কু কাঠবিড়াল মূলত নিশাচর। লাল কাঠবিড়াল সবচেয়ে চঞ্চল ও মুখর। বাদামি, পাঁচডোরা, তিনডোরা, সাধারণ কাঠবিড়ালসহ উড়ুক্কুও বাংলাদেশে আছে।

শ. খা.

কাতলামাছ (katla fish)

www.boighar.com

Cypriniformes বর্গের কাতলামাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Catla catla*। এদের দেহ অনেকটা রুপালি বর্ণের। দৈর্ঘ্য অনুপাতে দেহ বেশ চওড়া। কাতলামাছের মাথা আকারে বেশ বড় এবং দেহের মোট দৈর্ঘ্যের তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। লম্বায় অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে কাতলামাছ সর্বোচ্চ ১.৫ মিটার। পিঠের পাখনা কিছুটা বড় ধরনের এবং চওড়া। দেহের আঁইশও বেশ বড়। সারা দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, পুকুর-দিঘিতে কাতলামাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাতলামাছ জলাশয়ের উপরের স্তরের মাছ। এদের মুখ কিছুটা উর্ধ্বমুখী এবং প্রসারণক্ষম, কাতলামাছ সচরাচর মুখ ভাঁজ করে রাখে। কেবল শ্বাস নেওয়া ও খাদ্য গ্রহণ করার সময় এরা মুখের ভাঁজ খুলে হাঁ করে। তবে এরা জলে ভাসমান জলজ পোকা-মাকড়, ছোট ছোট জলজ কীট, যাদের প্ল্যাঙ্কটন বলা হয়, ইত্যাদিই বেশি পছন্দ করে। কাতলামাছ দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কাতলামাছ ডিম পাড়ে। বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। পাড়ে প্রবহমান স্রোতে। কাতলামাছ বেশ মূল্যবান ও সুস্বাদু।

অ. ব.

কামরাঙা

Averhoapace গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কামরাঙার বৈজ্ঞানিক নাম *Carambola* Linn। ফলের জন্য মূলত এ গাছ বপন করা হলেও গাছ দেখতে বেশ সুন্দর। কাণ্ড খুব

লম্বা হয় না, প্রচুর শাখা এবং গাছের শীর্ষ ছাতার মতো ছড়ানো। বাকল ধূসর, মসৃণ, পাতা যৌগিক, হালকা সবুজ কিন্তু কচিপাতা তামাটে লাল। ফলে গাছ সুন্দর দেখায়। বৈশাখ-শ্রাবণ মাসে এর ফুল ফোটে। ফুলগুলো লাল রঙের, ছোট। কামরাঙার ফল ডিম্বাকৃতি, মাংসল এবং সুস্পষ্টভাবে লম্বালম্বি পাঁচশিরা বিশিষ্ট। কাঁচা ফল সবুজ, পাকা ফল ফ্যাকাসে হলুদ। কামরাঙা বর্তমানে দু' ধরনের পাওয়া যায়। টক এবং মিষ্টি। মিষ্টি কামরাঙা আকারে টক জাতের চেয়ে ছোট এবং খেতে সুস্বাদু হলেও টক কামরাঙা সুগন্ধিযুক্ত। কাঁচা খাওয়া ছাড়াও কামরাঙা ফল দিয়ে জেলি, জ্যাম, আচার এবং শরবত তৈরি হয়। কামরাঙার শিকড় বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক, পাতা পিসে জলবসন্ত, স্ক্যাবিস এবং মাথার ব্যথায় প্রলেপ দেয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের এক প্রকার রোগ দমনে পাতার ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। ফলের রস যকৃৎ ও অন্ত্রের রোগে উপকারী।

শা. আ.

কার্বন (carbon)

একটি অধাতব মৌলিক পদার্থ। এর রাসায়নিক প্রতীক C। পারমাণবিক সংখ্যা ৬, ভর ১২.০১১। প্রাচুর্যের দিক থেকে বিশ্বে কার্বনের স্থান ষষ্ঠ। নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে তাপীয় নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় (হাইড্রোজেন দহন প্রক্রিয়ায়) কার্বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূপৃষ্ঠে মৌলিক ও যৌগিক দু'ভাবেই কার্বন পাওয়া যায়। ওজনের অনুপাতে ভূ-ত্বকের প্রায় ০.২% কার্বন। পৃথিবীতে কার্বনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপ হীরক (দ্র) ও গ্রাফাইট (দ্র)। এর অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ রূপ খনিজ কয়লা (দ্র), কোক (দ্র), কাঠকয়লা, ভুসাকালি। এ ছাড়া বায়ুমণ্ডলের বাতাসে অক্সিজেন যৌগ হিসাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে, পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড, বিভিন্ন কার্বনেট, যেমন– চুনাপাথর, মার্বেলপাথর হিসাবে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে কার্বোহাইড্রেট (দ্র) রূপে এবং ভূগর্ভে হাইড্রোকার্বন (ইথেন, মিথেন, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) রূপে কার্বন যৌগিক অবস্থায় থাকে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ অ্যালকোহল (দ্র), জৈব অ্যাসিড বেনজিন, টলুইন, পলিথিন, প্লাস্টিক (দ্র), পলিয়েস্টার ইত্যাদি পলিমারসমূহের প্রধান উপাদান কার্বন।

কার্বনের পরমাণুসমূহ বিভিন্নভাবে সজ্জিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অণু গঠন করে। তাই প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে কার্বন পাওয়া যায়। পদার্থের এই ধর্মকে বলে 'বহুরূপতা' এবং মৌলটিকে বলে 'বহুরূপী'। কার্বন একটি বহুরূপী মৌল। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বহুরূপী মৌল আছে। রূপভেদ অনুযায়ী কার্বনের বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন হীরক সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, বিদ্যুৎ-অপরিবাহী, স্বচ্ছ। গ্রাফাইট নরম, বিদ্যুৎ-পরিবাহী, পিচ্ছিল এবং অস্বচ্ছ ধূসর বর্ণের। গ্রাফাইট ভিন্ন কার্বনের গলনাঙ্ক ৩৫৫০° সেলসিয়াস। স্ফুটনাঙ্ক ৪৮২৭° সেলসিয়াস। গ্রাফাইট গলে না, ৩৩৭০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হয়। হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.১ থেকে ৩.৫, গ্রাফাইটের ১.৯ থেকে ২.৩। অন্যান্য কার্বন ১.৮ থেকে ২.১ এর মধ্যে।

স. রা.

কার্বন ডাই-অক্সাইড (carbon dioxide)

বর্ণহীন গ্যাস। রাসায়নিক সঙ্কেত CO_2। এর আণবিক ভর ৪৪। বায়ুর চেয়ে ভারী। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ০.০৪% কার্বন ডাই-অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলের চেয়ে বারিমণ্ডলে (সমুদ্রের পানিতে) ৫০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। জোসেফ ব্ল্যাক নামে স্কটল্যান্ডের একজন বিজ্ঞানী ১৭৫৬ সালে এই গ্যাস আবিষ্কার করেন।

সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ নিশ্বাসের সঙ্গে CO_2 গ্যাস ত্যাগ করে যা বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়। একজন বয়স্ক মানুষের নিশ্বাসে ৫% CO_2 নির্গত হয়।

যখন কোনো জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা জ্বালানির দহন হয়, তখন কার্বন ও অক্সিজেনের সংযোগে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়।

CO_2 নিজে জ্বলে না, দহনে সাহায্য করে না। এ জন্য আগুন নেভানোর কাজে এই গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি পানিতে সহজে দ্রবণীয়। উচ্চচাপে পানিতে CO_2 গ্যাস দ্রবীভূত করে সোডাওয়াটার, লেমনেড প্রভৃতি ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তুত করা হয়। কেক, রুটি ও বিস্কুট তৈরিতে ঈস্ট ব্যবহৃত হয়। এ থেকে CO_2 উৎপন্ন হয় এবং রুটি, কেক, বিস্কুটকে ফসফসে করে। এই গ্যাস −৭৮.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সরাসরি কঠিন আকার ধারণ করে। একে ড্রাই আইস (দ্র) বা শুষ্ক বরফ বলে। ড্রাই আইসকে গরম করলে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়। আইসক্রিম বহনকারী গাড়িতে ড্রাই আইস ব্যবহৃত হয়। এটি উত্তম হিমায়ক।

উদ্ভিদ সূর্য থেকে আলো, মাটি থেকে পানি এবং বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ (শর্করা) প্রস্তুত করে। এভাবে গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী গ্রহণ করে।

বাতাসের CO_2 সূর্যতাপ শোষণ করে। এতে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। CO_2 না থাকলে পৃথিবী শীতল হয়ে যেত। ইদানীং বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডল বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে, পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে বিজ্ঞানীরা গ্রিন-হাউস প্রতিক্রিয়া (দ্র) নামে অভিহিত করেন। পৃথিবীর উত্তাপ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

স. রা.

কার্বন মনোক্সাইড (carbon monoxide)

কার্বন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত যৌগ। রাসায়নিক সঙ্কেত CO। আণবিক ভর ২৮। বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং তীব্র বিষাক্ত গ্যাস। ফরাসি রসায়নবিদ ডি. লাসন ১৭৭৬ সালে সর্বপ্রথম এই গ্যাস প্রস্তুত করেন। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুইডহানক এর উপাদান শনাক্ত করেন।

ত্রুটিপূর্ণ চুল্লি, স্টোভ, বার্নার বা যেখানে জ্বালানির দহনে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব হয়, সেখানেই কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস বায়ুদূষণ ঘটায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় খুব সামান্য পরিমাণে CO থাকে। এই সামান্য পরিমাণ গ্যাসই হৃদ্‌রোগের কারণ হয়। বিশেষ করে হৃদ্‌রোগীদের জন্য এই গ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক। CO গ্যাস রক্তে প্রবেশ করে হিমোগ্লোবিনের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়, ফলে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। অক্সিজেনের অভাবে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় CO গ্যাস কার্যকারিতা উৎপন্ন হতে না দেওয়া। আর এর জন্য দরকার পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালানির দহন, বদ্ধ ঘরে চুল্লি জ্বালানো বা বদ্ধ গ্যারেজে গাড়ির ইঞ্জিন চালানো থেকে বিরত থাকা।

কার্বন মনোক্সাইড জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোল গ্যাস এবং পানি গ্যাসে CO থাকে। ধাতু নিষ্কাশনে (লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতে) ও বিশুদ্ধকরণে CO ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

কার্বুরেটর (carburettor)

এটি পেট্রোল ইঞ্জিনের একটি অংশ, যার কাজ হল পেট্রোল আর বাতাসের একটি দাহ্য মিশ্রণ তৈরি করে দেওয়া। ভালো দহনের জন্য বাতাসের অক্সিজেন জ্বালানির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে থাকা প্রয়োজন। কার্বুরেটরে ক্ষুদ্র পেট্রোলবিন্দু আর বাতাস একত্রে কুয়াশার মতো একটি দাহ্য মিশ্রণ সৃষ্টি করে। কার্বুরেটরের মূল অংশ মোটামুটি একটি নলের মতো। এর এক প্রান্ত দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে। প্রবেশের সময় একটি ফিল্টার বা ছাঁকনির মাধ্যমে বাতাস থেকে ধুলাবালি সরিয়ে ফেলা হয়। নলটির মাঝামাঝি একটা জায়গা হঠাৎ একেবারে সরু হয়ে আবার প্রশস্ত হয়। কার্বুরেটরে সংযুক্ত একটি পেট্রোল-আধার থেকে পেট্রোল ঐ সরু অংশে ঢুকতে পারে। বার্নুলির নীতি (Bernoulli's principle) অনুসারে বাতাস যখন নলের সরু অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার গতিবেগ বাড়ে এবং চাপ কমে। ফলে পেট্রোল-আধারের অধিকতর চাপের কারণে পেট্রোল কার্বুরেটরের নলের অংশে ঢোকে

এবং ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় অনেকটা সুগন্ধ দ্রব্য স্প্রে করার মতো।

এই মিশ্রণ নলের অন্য প্রান্ত দিয়ে ইঞ্জিনের বিভিন্ন সিলিন্ডারে চলে যায় দহনের জন্য। যাওয়ার পথে এটি থ্রট্‌ল্ ভাল্‌ভ নামক একটি কপাটের মধ্য দিয়ে যায়।

ইঞ্জিনের চালক বাইরে থেকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে কম বা বেশি জ্বালানি যেতে দিতে পারেন। ঐ জ্বালানি-মিশ্রণ সিলিন্ডারে যত বেশি পরিমাণে যাবে, ইঞ্জিনের গতিবেগ তত বাড়বে। সব রকম গতিবেগে ইঞ্জিনকে মসৃণভাবে চলতে দিতে হলে পেট্রোলের ওজনের চেয়ে অন্তত ১৫ গুণ বেশি ওজনের বাতাস এর সঙ্গে মেশা চাই। কার্বুরেটরে সে রকম ব্যবস্থাই থাকে। তবে শুরুতে চালু করার সময় ইঞ্জিন যদি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকে, সে ক্ষেত্রে মিশ্রণের মধ্যে বাতাসের তুলনায় পেট্রোল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে ভালো হয়। কার্বুরেটর নলে ঢোকার পথেই চোক্ ভাল্‌ভ নামে একটি কপাট নিয়ন্ত্রণ করে বেশি বা কম বাতাস এতে ঢোকানো যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোক্ ভাল্‌ভটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মু. ই.

কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate)

জৈব যৌগের একটি বিশাল শ্রেণি হল কার্বোহাইড্রেট। কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অণু (নির্দিষ্ট অনুপাতে) রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে। এদের সাধারণ সঙ্কেত $C_x(H_2O)_y$।

কার্বোহাইড্রেট আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্বসনপ্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রাণিজগৎ যে শক্তি পায় তার উৎস কার্বোহাইড্রেট। চিনি, ভাত, রুটি, ডাল, সবজি, তরকারি আমাদের প্রধান খাদ্য। সুতি-বস্ত্র আমাদের পরিধেয়। কাগজ আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন। এগুলো সবই কার্বোহাইড্রেট বা কার্বোহাইড্রেট থেকে উৎপন্ন।

কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়– চিনি এবং অ-চিনি। চিনি দুই শ্রেণির ১. এককশর্করা জাতীয় (monosaccharides)– গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ। ২. দ্বিশর্করা জাতীয় (disaccharides)– ইক্ষুচিনি, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ইত্যাদি।

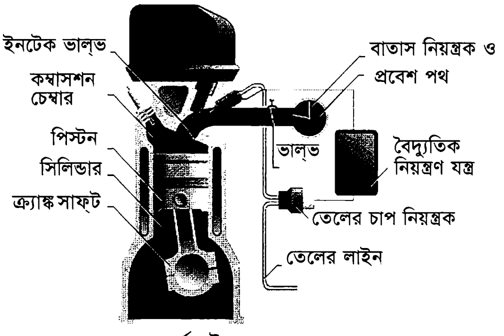

কার্বুরেটর

অ-চিনি বা বহুশর্করা (polysaccharides) কার্বোহাইড্রেট দুই ধরনের শ্বেতসার ও সেলুলোজ। এরা লম্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জটিল যৌগ। বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেটের আণবিক সঙ্কেত সদৃশ হলেও এদের গঠনসঙ্কেতের মধ্যে তারতম্য থাকে।

উদ্ভিদের পাতায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। সুক্রোজ সরল চিনি, যা আমরা সাধারণ চিনি হিসাবে খাই এবং আখ বা বীট থেকে উৎপন্ন হয়। ফ্রুকটোজ ফলের মধ্যে এবং ল্যাকটোজ দুধের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্বেতসার জাতীয় যৌগ হল গম, আলু, ভুট্টা, যব, চাউল ইত্যাদির অণু। সেলুলোজ উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের উপাদান– ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত অণু। এগুলো উদ্ভিদের আঁশযুক্ত কোষকলা তৈরি করে। উদ্ভিদের প্রধান আঙ্গিক উপাদান। তাই উদ্ভিদ শক্ত হয় এবং এ থেকে সুতা, কাগজ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। খাদ্যের মধ্যে সেলুলোজ থাকে। কিন্তু এগুলো আমরা হজম করতে পারি না। কোনো কোনো তৃণভোজী প্রাণী (যেমন গরু, ঘোড়া) ও কীটপতঙ্গ (যেমন উইপোকা) সেলুলোজ হজম করতে পারে। এদের পাকস্থলীতে বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা প্রোটোজোয়া থাকায় এটি সম্ভব হয়।

স. রা.

কার্সিনোমা ক্যান্সার দ্র

কালপুরুষ মণ্ডল (orion)

আকাশের কালপুরুষ বা অরায়ন (orion)-মণ্ডল কতিপয় তারার সমষ্টি। এই তারাগুলো দিয়ে আকাশে মহাবীর কালপুরুষের একটি চিত্র কল্পনা করা হয়েছে তার এক

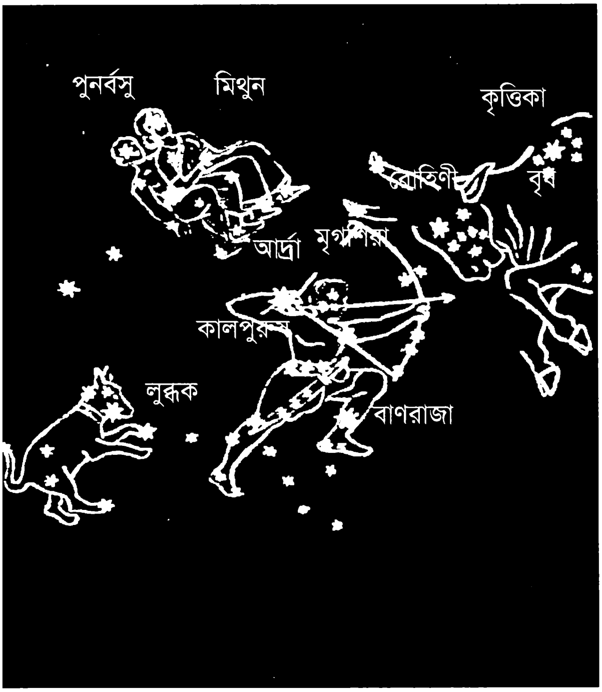

অনেক তারার মাঝে 'কালপুরুষ মণ্ডল'

হাতে রয়েছে গদা, অন্য হাতে সিংহের চামড়া, কোমরবন্ধনীতে তরবারি ঝোলানো, সঙ্গে রয়েছে একটি শিকারি কুকুর। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কালপুরুষ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই একে আদমসুরত হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পর পরই রয়েছে কালপুরুষ বা অরায়নমণ্ডলের তারাগুলো। এই মণ্ডলের তারাগুলো দিয়ে সহজেই একজন মানুষের আকৃতি কল্পনা করা যায়। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে এই মণ্ডলটিকে মানুষের আকৃতিতেই কল্পনা করা হয়েছে। কালপুরুষ মণ্ডলটিকে শীতকালের আকাশে, বিশেষ করে অক্টোবর মাস থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যার ঠিক পর পরই পুব আকাশে এই মণ্ডলটি উদয় হয়। সারা রাত ধরে ক্রমশ পশ্চিম দিকে তা এগিয়ে যায়। এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে তাকে পশ্চিম আকাশে ডুবতে দেখা যায়। এর পর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাকে আর রাতের আকাশে দেখা যায় না।

আকাশের মাঝামাঝি দিগন্ত থেকে প্রায় ৭০ ডিগ্রি উত্তরে একই রকম উজ্জ্বল তিনটি তারা একই সরলরেখায় অবস্থিত। এই সরলরেখাটি উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত। আকাশের অন্য কোথাও একই রকম উজ্জ্বল তিনটি তারাকে এ রকম একই সরলরেখায় আর দেখা যায় না। এই তিনটি তারাকে চেনা গেলে কালপুরুষ মণ্ডল চেনাও সহজ হয়ে যায়। কালপুরুষ মণ্ডলের ঠিক মধ্যখানে অবস্থিত একই সরলরেখায় পূর্বোক্ত তিনটি তারা। এগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের কোমরবন্ধনী। এর কিছুটা উত্তরে বেশ উজ্জ্বল দুটো তারা রয়েছে। এ দুটো তারা দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের কাঁধ। কাঁধের তারা দু'টির মাঝখান দিয়ে আরো খানিকটা উত্তরে খুব ছোট ছোট কয়েকটি তারা রয়েছে। ত্রিভুজাকৃতির অনুজ্জ্বল বা মিটমিট করা এই তারাগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে কালপুরুষের মাথা। কোমরবন্ধনীর তিনটি তারা থেকে অনেকটা দক্ষিণে দু'টি বেশ উজ্জ্বল তারা রয়েছে। এ দু'টি তারা কালপুরুষের পা নির্দেশ করছে। পশ্চিমের তারাটি খুব উজ্জ্বল। এটি বাম পায়ের গোড়ালিতে অবস্থিত। পূর্বদিকের অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল তারাটি ডান পায়ের উরুতে অবস্থিত। কোমরবন্ধনীর তিন তারা এবং ডান পায়ের উরুর তারার মাঝখানে খুব অস্পষ্ট আরো তিনটি তারা রয়েছে। এই তারাগুলো দিয়ে কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো তরবারি কল্পনা করা হয়েছে। মিশরীয়, অ্যাসেরীয়, গ্রিক ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্যতাতেই এই মণ্ডলটিকে নিয়ে নানা ধরনের উপাখ্যান প্রচলিত ছিল।

ফ. মা.

কালবৈশাখী (nor'-wester)

মার্চ-এপ্রিল মাস বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস। এই সময়ে বায়ুর উষ্ণতা বঙ্গোপসাগর থেকে দেশের অভ্যন্তরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে কোনো এলাকার উষ্ণতা হঠাৎ অত্যন্ত বেশি হয়ে আঞ্চলিক ঘূর্ণিবাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে চারপাশের শীতল বায়ু তীব্র বেগে ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই শীতল বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে। ফলে ঐ এলাকায় ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়। একে কালবৈশাখী বা কালবোশেখি বলে। বজ্র ও বৃষ্টিপাতসহ এই কালবৈশাখী ঝড় বাংলাদেশের এক-

পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী। প্রতি বছর কালবৈশাখী বাংলাদেশে জান ও মালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, যদিও এই ঝড় তীব্র দাবদাহের পর বর্ষা মৌসুমের আগমনী বার্তা বয়ে আনে। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল এরূপ একটি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূল এলাকার লক্ষাধিক লোক মারা যায় এবং সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

মু. হা.

কালমেঘ (kalamegh)

কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। Acauthaceae গোত্রভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম *Andrographis paniculata new*। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই এই গাছ জন্মে থাকে। বিশেষ করে পতিত জমিতেই এই গাছ বেশি দেখা যায়। এরা অযত্নেই বাড়ে। সাধারণ মানুষের কাছে এর বিশেষ কদর নেই। এর পাতা, কাণ্ড, ফল, ফুল সব কিছুরই স্বাদ তেতো। সে জন্য গরু-ছাগলও এই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে পছন্দ করে না।

কালমেঘ বর্ষজীবী উদ্ভিদ। অর্থাৎ এর আয়ু মাত্র এক বছর। এটি উচ্চতায় আধ মিটারের মতো। এর মূল, কাণ্ড ও শাখা দেখতে চারকোনা আকৃতির। মূল, কাণ্ড, পাতা সবই নরম। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। শাখায় পাতারা পরস্পরের বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। পাতার গোড়া ও মূল কাণ্ডের মিলনস্থল থেকে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল বের হয়। ফুল পরে ফলে পরিণত হয় ফলের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ জন্মায়। ফল ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। পরে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

কালমেঘের টাটকা পাতার রস মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করলে কৃমির উৎপাত, যকৃতের রোগ ও দূষিত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ মতে উদরাময়, পেট ফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও রক্তামাশয় রোগেও এই গাছের রস খাওয়ানো হয়। গাছ ও পাতার রস এক চামচ পরিমাণ সকাল-বিকাল দু' বেলা খেতে হয়। এইভাবে সাত দিন খেলে রোগীর রোগমুক্তি ঘটে। এই গাছের নির্যাস বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ত. চ.

কালাজ্বর (kalaazar)

কালাজ্বর প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার রোগ। লিশমেনিয়া ডনোভানি (Leishmania donovani) নামক পরজীবী এই রোগের কারণ। পরজীবীবাহী ফ্লেবোটোমাস (Phlebotomus) জাতের মাছির দংশনে এই রোগ বিস্তারলাভ করে। কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর মল, মূত্র এবং নাসিকায় নিঃসরণের মাধ্যমে সুস্থ শরীরে কালাজ্বরের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। কালাজ্বরে আক্রান্ত কুকুর, শেয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীর কামড়েও মানবদেহে কালাজ্বরের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়।

এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর; সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমানরক্তাল্পতা। তা ছাড়া এই রোগে রোগীর প্লীহা ও যকৃতের আকার বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা না করানো হলে রক্তাল্পতা, ওজন হ্রাস ও অন্যান্য উপসর্গে রোগীর মৃত্যু ঘটে। কালাজ্বরের চিকিৎসায় সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট (Sodium stibo-gluconate) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (দ্র) প্রথম কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেন।

সি. না. হ.

www.boighar.com

কীটনাশক (insecticide)

শস্যক্ষেত্র এবং অন্যত্র অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে মানুষ বরাবরই সচেষ্ট ছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক রসায়নবিদ্যার একটি অবদান হিসাবে উন্নত ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক এসেছে। প্রথম দিকে তামা, পারদ, সিসা, আর্সেনিক ইত্যাদির বিষময় রাসায়নিক যোগই কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হত। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক কিছু জৈব যৌগ এবং আধুনিক কালে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত জৈব যৌগই কীটনাশক হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৩৯ সালে ডিডিটির আবিষ্কার ছিল এ দিক থেকে একটি বিরাট অগ্রগতি। এর অপূর্ব সাফল্য অনুরূপ আরো কিছু জৈব যৌগ আবিষ্কারের পথ করে দেয়। এর মধ্যে মেথোক্সিক্লোর, বিএইচসি, অলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিয়েলড্রিন ইত্যাদি অর্গানো-ক্লোরিন জাতীয় কীটনাশক যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। পরে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি এদের ক্ষতিকর দিকগুলো উদঘাটিত হলে ডিডিটি এবং এ ধরনের আরো কিছু কীটনাশকের ব্যবহার অনুচিত বলে ঘোষিত হয়। আজকাল অর্গানো-ফসফেট ও কার্বোমেট জাতীয় কীটনাশক, যেমন–ফেনিট্রোথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ডাইমিথোয়েট ইত্যাদি অধিক প্রচলিত রয়েছে।

এসব কীটনাশক আধুনিক কৃষিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশকের ব্যবহারও বেড়ে গেছে খুবই বেশি। পরিবেশের উপর এর গুরুতর বিরূপ প্রভাব দেখা দিচ্ছে। দেখা গেছে, অনেকগুলো কীটনাশক শুধু অনিষ্টকারী কীটেরই ক্ষতি করছে না, পরিবেশে অনেক দিন টিকে থেকে, খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এটি অল্প অল্প করে মানুষের ও অন্য জীবের জীবকোষে জমে উঠছে এবং তাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেসব কীটপতঙ্গ, পাখি, মাছ ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে অনিষ্টকারী কীট দমন করত, তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে রাসায়নিক কীটনাশক নির্দোষ প্রাকৃতিক দমনের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। অন্য দিকে কীটনাশকের কবল থেকে যেসব অধিক প্রতিরোধী কীট বেঁচে যাচ্ছে, পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরই বংশধর হওয়াতে ঐ কীটনাশক-তাদেরকে আর কাবু করতে পারছে না। দরকার হচ্ছে আরো বেশি কড়া কীটনাশক। কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা এভাবে বেড়েই চলেছে। তাই এখন রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে কীটদমন,

পোকার ফাঁদ ইত্যাদি ব্যবহার, নিম প্রভৃতি নির্দোষ উদ্ভিজ্জ কীটনাশক এবং আধুনিক জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কীটদমন ব্যবস্থার উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মু. ই.

কীটপতঙ্গ (worms and insects)

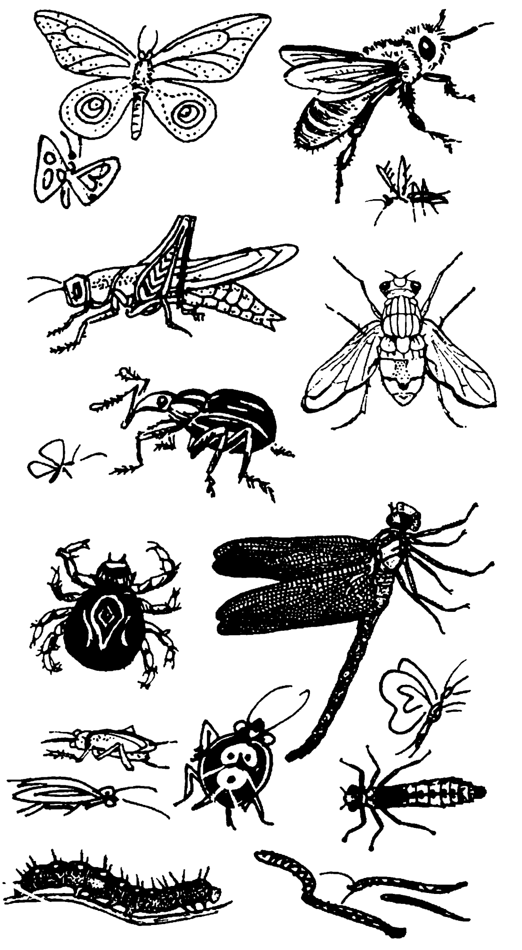

কীট অর্থ পোকা, কৃমি। যেমন– জোনাকি পোকা, কৃমিকীট। জোনাকি পোকার পাখা আছে। পাখার সাহায্যে জোনাকি উড়তে পারে। জোনাকি পোকার দেহে পা-ও আছে। কৃমির পা নেই, পাখা নেই। পতঙ্গ মানে পত বা পক্ষ দ্বারা যে কীট বা পোকা উড়তে পারে। তাহলে কীটপতঙ্গ বলতে বুঝব সেসব পা-যুক্ত কীট বা পোকা যারা পাখায় ভর করে উড়তে পারে। যেমন– প্রজাপতি, ফড়িং, জোনাকি, গুটি পোকা, গুবরে পোকা, গাঁধি পোকা ইত্যাদি। পোকা-মাকড় বলে একটা কথা আছে। মাকড় কীটপতঙ্গের প্রায় সমগোত্রের প্রাণী। কীটপতঙ্গে থাকে তিন জোড়া পা, মাকড়ে চার জোড়া। কীটপতঙ্গ প্রাণিজগতের অমেরুদণ্ডী পর্যায়ের প্রাণী। কীটপতঙ্গের দেহে মেরুদণ্ড নেই। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক'টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। কীটপতঙ্গ আর্থ্রোপোডা পর্বের অধীন। আর্থ্রো (arthro) অর্থ সন্ধি, পোডা (poda) অর্থ পা। সন্ধিযুক্ত পা যে সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে রয়েছে তারাই আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদী (joint footed), যেমন– জোনাকি, চিংড়ি, মাকড়সা। সন্ধিপদীদের মধ্যে যাদের দেহ মাথা-বক্ষ-উদরে বিভক্ত এবং বক্ষের পৃষ্ঠভাগে দু' জোড়া পাখা ও অঙ্গে তিন জোড়া পা থাকে এবং যারা পাখায় ভর করে উড়তে পারে, তাদেরই ইনসেক্ট বা পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এ পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গের হিসাব পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অনেক কীটপতঙ্গ এখনো তাঁদের অজানা। কীটপতঙ্গদের দেহের আকার, আকৃতি ও বর্ণ বিচিত্র রকমের। এত ক্ষুদ্র আকৃতির পোকা রয়েছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। কোনো কোনো পোকা আকারে ২০ সেন্টিমিটারও হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গের অধিকাংশ স্থলভাগে বাস করে। মিঠা পানিতেও অনেক কীটপতঙ্গ দেখা যায়। সামুদ্রিক কীটপতঙ্গের সংখ্যা খুব কম। কীটপতঙ্গ মানুষের বড় উপকারী বন্ধু। অধিকাংশ উদ্ভিদের ফুলে পরাগসংযোগ ঘটায় কীটপতঙ্গ। পরাগায়ণ না হলে ফসল ফলে না, ফসল না হলে মানুষের আহার জুটবে না। মধু, রেশম ইত্যাদিও কীটপতঙ্গের দান। কীটপতঙ্গ মানুষের ক্ষতিও করে। তেলাপোকা গৃহস্থালির অনেক খাবার ও জিনিস নষ্ট করে। আমাদের প্রধান ফসল ধানের ক্ষতি করে মাজরা পোকা। মশা মানুষের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। অনেক দেশের লোক পোকা, শূককীট ও মূককীট আহার হিসাবে গ্রহণ করে। কীটপতঙ্গ প্রকৃতির এক বড় সম্পদ। মানুষের জীবন ও সভ্যতা কীটপতঙ্গের অবদানের উপর বেশ নির্ভরশীল।

ত. চ.

কুইনিন পাতা

কুইনিন (quinine)

কুইনিন ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর ঔষধ। সিনকোনা গাছের বাকল থেকে সংগৃহীত এক ধরনের উপক্ষার বা অ্যালকালয়েডের নাম কুইনিন। ১৮২০ সালে পেলতিয়ে (Pierre Joseph Pelletier ১৭৮৮-১৮৪২) ও কাঁভাতু (Joseph Bienaime Caventou ১৭৯৫-১৮৭৭) নামে দু' জন ফরাসি বিজ্ঞানী সিনকোনা গাছের বাকল থেকে প্রথম কুইনিন সংগ্রহ করেন। ১৯৪৪ সালে উডওয়ার্ড (Robert Burns Woodward ১৯১৭-১৯৭৯) ও ডোয়েরিং নামে দু' জন বিজ্ঞানী গবেষণাগারে রাসায়নিক উপায়ে কুইনিন সংশ্লেষণ করেন।

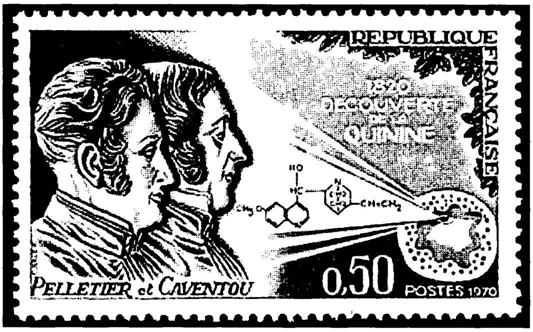

পেলতিয়ের ও কাঁভাতু

কুইনিনের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। ম্যালেরিয়ার জীবাণুনাশক হিসাবে ম্যালেরিয়ার ঔষধ তৈরিতে এবং এ রোগ প্রতিরোধে কুইনিন বহুল ব্যবহৃত। এ ছাড়া জ্বর ও বেদনানাশক ক্রিয়াও কুইনিনের রয়েছে। কুইনিন ব্যবহারের ফলে রোগীর মাথা ঘোরানো, কানে ঝি-ঝি শব্দ, বমি, কদাচিৎ প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কুইনিন-চিকিৎসার দ্বারা কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার স্থায়ী নিরাময় সম্ভব হয় না বলে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে কুইনিনজাত বিভিন্ন সংশ্লেষিত ঔষধ ব্যবহৃত হচ্ছে।

সি. না. হ.

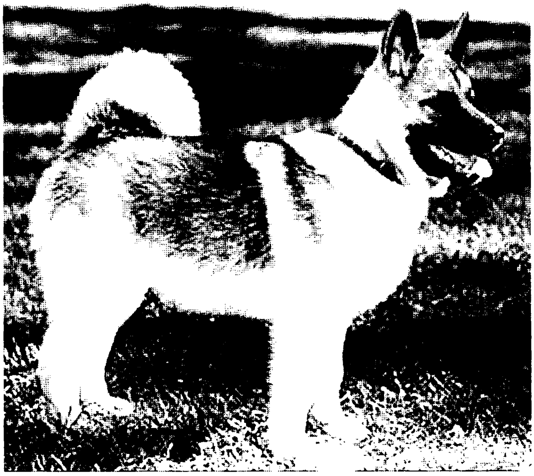

কুকুর (dog)

কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত প্রাণী। এই প্রভুভক্তির কারণেই আজ থেকে কমপক্ষে ১২ হাজার বছর আগে কুকুর গুহাবাসী মানুষের পোষ্যপ্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। সেদিক থেকে কুকুরই মানুষের প্রথম পোষমানা প্রাণী।

আকার, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন প্রজাতির কুকুরের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এদের কোনোটির সারা শরীর লম্বা লম্বা চুল দিয়ে ঢাকা, আবার কোনো কোনোটির গায়ে যেন লোমই নেই। *'চিহুয়াহুয়া'* নামের সবচেয়ে ছোট জাতের কুকুরটি দাঁড়ালে উচ্চতা হয় মাত্র ৫ ইঞ্চি এবং ওজন মাত্র ১.৮ কেজি। অপর দিকে সবচেয়ে উঁচু আইরিশ উলফ হাউন্ডের উচ্চতা হয় ৩৪ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং

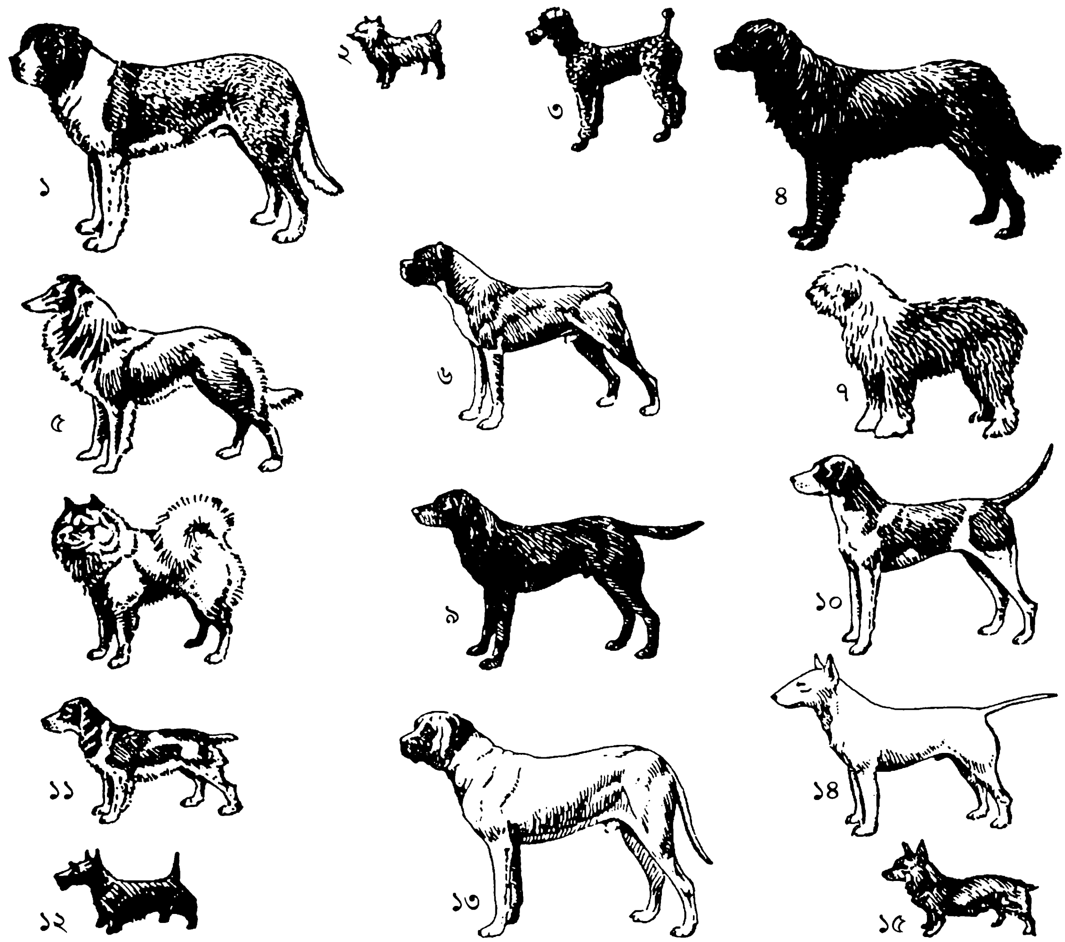

সারা পৃথিবী জুড়ে আছে নানান জাতের কুকুর

১. সেন্ট বার্নার্ড, ২. কায়র্ন টেরিয়ার, ৩. পুড্‌ল্, ৪. নিউফাউন্ডল্যান্ড. ৫. কোল্‌লী ৬. বক্সার. ৭. শিপ্‌ডগ্. ৮. চৌ চৌ. ৯. লেব্রেডর রিট্রাইডার, ১০. ফক্সহাউন্ড, ১১. ককার স্প্যানিয়াল, ১২. স্কটিশ টেরিয়ার, ১৩. মাসটিফ্. ১৪. বুল টেরিয়ার. ১৫. পেম্ব্রোক, ১৬. অ্যালসেশিয়ান

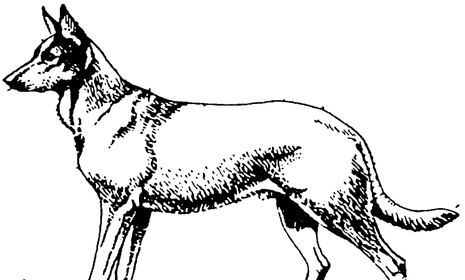

সবচেয়ে ভারী 'সেন্ট বার্নার্ড'-এর ওজন হয় ৯০ কেজি পর্যন্ত।

বলা হয়, গুহাবাসী মানুষ কুকুরকে খাবার দিত এবং বিনিময়ে রাতে ঘুমানোর সময় কুকুর তাদের অন্যান্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত অথবা সতর্ক করে দিত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কুকুর মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা বা পাহারাদারের কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও কুকুরের নানা রকম ব্যবহার রয়েছে। বরফে ঢাকা অঞ্চলসমূহে কুকুরকে দিয়ে 'স্লেজ' নামক এক

ধরনের গাড়ি টানানো হয়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাই বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি থেকে শুরু করে অপরাধীদের খুঁজে বের করা পর্যন্ত নানা রকম অনুসন্ধানের কাজ করানো হয়।

কুকুরের প্রভুভক্তি নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। পালনকারী প্রভুর কল্যাণে কুকুর নিজের জীবন দিতেও পিছপা হয় না। কুকুরের এমনি ত্যাগস্বীকারের বহু স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। আর তাই সারা পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ কুকুরের নামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' সমাধিস্তম্ভ।

একটি মাদী কুকুর এক সঙ্গে ১২টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। জন্মের সময় এসব বাচ্চার চোখ ও কান দুটোই বন্ধ থাকে। সাধারণত ১৩ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে চোখ ও কান ফুটে যায়।

ফ. মা.

কুচিলা (kucila)

Logaviaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কুচিলার বৈজ্ঞানিক নাম *Strychnos nux vomica* L। ভেজা বনে কুচিলা চিরসবুজ, কিন্তু শুষ্ক বনে তা পর্ণমোচী বৃক্ষ। এর উচ্চতা ১৩ মিটার এবং ব্যাস ১.৮ মিটার হতে পারে। গোড়া থেকে ৬ মিটার বা তার কম অংশ সোজা। লম্বা নলাকৃতি কাণ্ড দেখে এ গাছ চেনা সহজ। কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে এ গাছ দেখা যায়। পাতা লম্বা, চওড়া চন্দ্রাকৃতি, অখণ্ড, মধ্যশিরা সুস্পষ্ট। ফুল সবুজে সাদা। ফল বেরি, গোলাকৃতির, বীজ মুদ্রার মতো সূক্ষ্মসিল্কি রোমাবৃত এবং সাদা তিতা শাঁস দ্বারা আবৃত। এ গাছের শীর্ষ পল্লব মধ্যম ঘন। ফলে বেশ ছায়া হয়। এ গাছের শিকড়ে শাফার উৎপন্ন হয়। এ গাছের পাকা শুষ্ক বীজ থেকে নাক্স-ভূমিকা পাওয়া যায় যা গন্ধহীন কিন্তু তিতা। অধিক পরিমাণ নাক্স-ভূমিকা শক্তিশালী বিষ যা ধনুষ্টঙ্কার ধরনের আক্ষেপ সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটায়। অল্প পরিমাণ গ্রহণে মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। দেশজ চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এমনকি অ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতির ঔষধে নাক্স-ভূমিকার ব্যবহারের ব্যাপকতা রয়েছে। নাক্স-ভূমিকায় রয়েছে স্ট্রিকনিন এবং ব্রুসিন নামক দুটো শক্তিশালী অধিবিষ। পাতায় এ দুটো উপক্ষার ছাড়াও রয়েছে ভমিসিন। পাকস্থলীর অসুবিধায় স্ট্রিকনিন ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

কুদরাত-এ-খুদা, মুহাম্মাদ [১৮৯০-১৯৭৭]

রসায়নবিদ, গ্রন্থকার, শিক্ষাবিদ। ১৮৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতের বীরভূমের মাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোন্দকার আব্দুল মুকিদ, মাতা ফাসিহা খাতুন। শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাড়গ্রাম এম. ই. স্কুলে, পরে

কলকাতা উডবার্ন এম. ই. স্কুল এবং কলকাতা মাদ্রাসায়। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক (১৯১৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এসসি. (১৯২৫) এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ডি.এসসি. (১৯২৯) ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে এ কলেজে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নেন। ১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৪৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

দেশবিভাগের পর ড. খুদা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং জনশিক্ষা পরিচালকের দায়িত্ব নেন (১৯৪৭-১৯৪৯)। অতঃপর তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ক

উপদেষ্টা হন। ১৯৫২-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারসমূহের পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় ড. খুদা তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়।

ড. খুদা স্টেরিও কেমেস্ট্রি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, লবণ, কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, বিজ্ঞানগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প', 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী', 'বিচিত্র বিজ্ঞান', পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা' ও 'জৈব রসায়ন' (চার খণ্ড)। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে শিক্ষায় একুশে পদক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পান।

ড. খুদা ১৯৭৭ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

স. রা.

কুমড়া (pumpkin)

Cucurbitacea গোত্রভুক্ত দ্বি-বীজপত্রী বর্ষজীবী রোহিণী জাতীয় লতানে উদ্ভিদ। এর একটি প্রজাতি চালকুমড়া (সাদা কুমড়া বা ছাঁচি কুমড়া বা চুনা কুমড়া) এবং অপর একটি মিষ্টি কুমড়া নামে পরিচিত।

চালকুমড়া : এর ইংরেজি নাম অ্যাশ গোর্ড (ash gourd), বৈজ্ঞানিক নাম *Beninocasa cerifera, cong*। এ গাছ বাংলাদেশে সহজেই উৎপাদন করা যায়। বাঁশের মাচা বা ঘরের চালায় এ গাছের লতাপাতার বৃদ্ধি ভালো হয়। কুমড়া গাছের পাতা সবুজ ও নরম এবং শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কচি কুমড়া সবজি হিসাবে

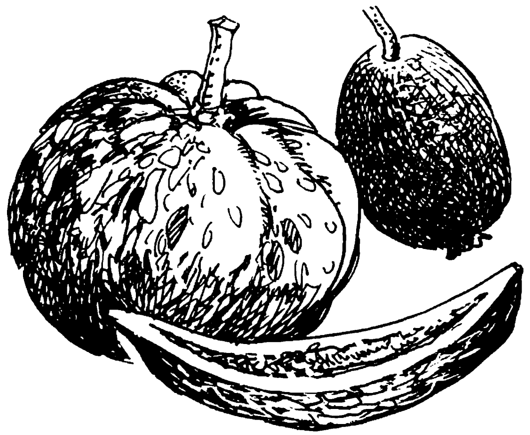

বেশ জনপ্রিয়। পাকা কুমড়া দিয়ে মোরব্বা ও হালুয়া তৈরি করা যায়। পাকা কুমড়া অনেক দিন সহজেই ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে লম্বা ও খাটো দুই ধরনের কুমড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে।

মিষ্টি কুমড়া এর ইংরেজি নাম সুইট গোর্ড (sweet gourd), বৈজ্ঞানিক নাম *Curcurbita macsima, Duchesne*। বাংলাদেশে এটি প্রিয় সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মিষ্টি কুমড়ার কচি ডগা ও পাতা এবং ফুল রান্না করে খাওয়া যায়। মিষ্টি কুমড়ায় ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং খনিজ পদার্থ থাকে। এ গাছ গ্রীষ্মকালে ভালো জন্মে। তবে শীতকালেও এর চাষ হতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। মিষ্টি কুমড়া লম্বা, ছোট, বড় ও গোলকৃতির হয়ে থাকে। বীজের সাহায্যে এর বংশবৃদ্ধি ঘটে।

মু. আ.

কুমির (crocodile)

কুমির এক ধরনের সরীসৃপ। প্রাগৈতিহাসিক কালে যেসব সরীসৃপ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, কুমির তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে দিয়ে কুমির আজও তাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর গুণাবলি নিয়ে বেঁচে আছে।

বাংলাদেশে তিন জাতের কুমির পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি লোনা জলের কুমির, যার বৈজ্ঞানিক

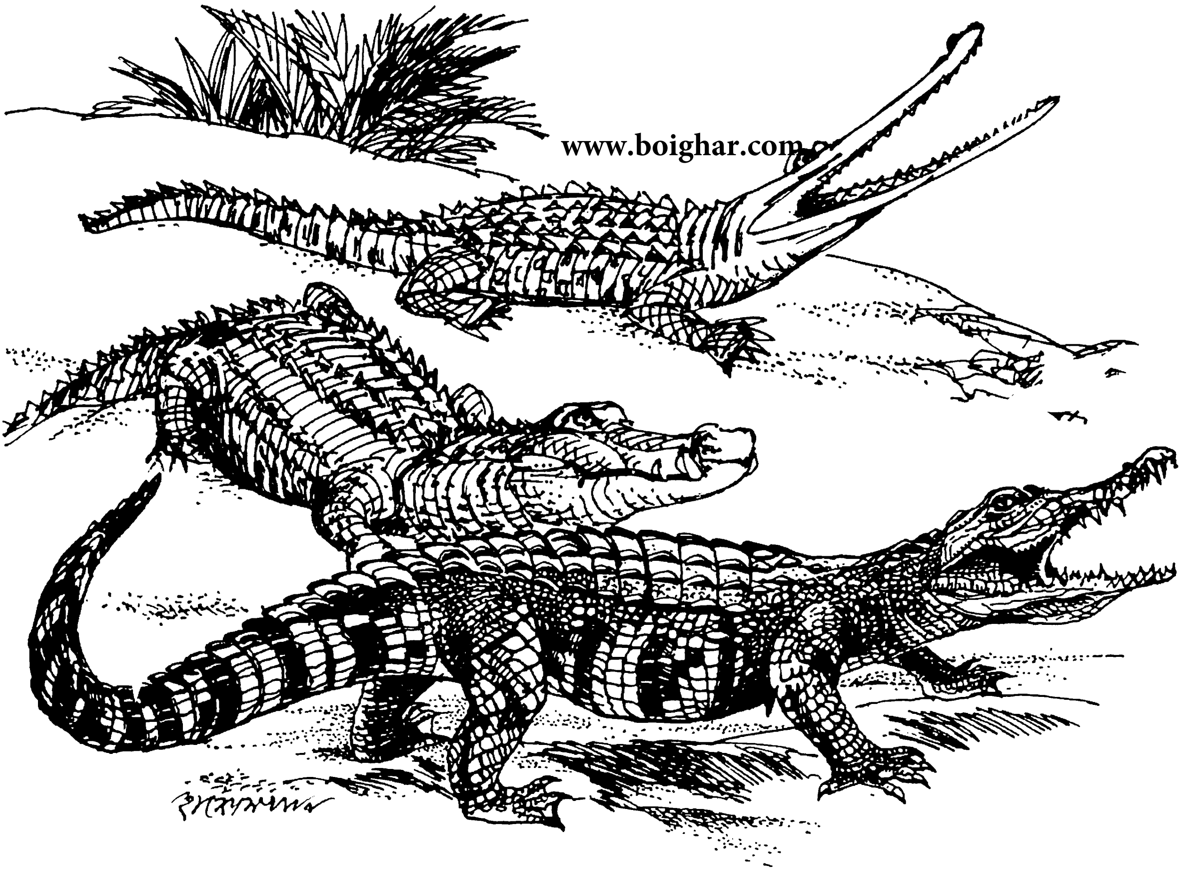
www.boighar.com

বাংলাদেশে তিন জাতের কুমির রয়েছে– লোনা পানির কুমির, মিঠা পানির কুমির ও ঘড়িয়াল

নাম *Crocodylus porosus*, একটি স্বাদু জলের কুমির, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris*, এবং তৃতীয়টি মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus*। এই ভিন্ন প্রজাতির কুমিরের মধ্যে লোনা জলের কুমির কেবল সুন্দরবন এলাকাতেই পাওয়া যায়। স্বাদু জলের কুমির বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে একটিও দেখা যায় না। কেবল খুলনার খান জাহান আলীর মাজার প্রাঙ্গণের পুকুর এবং ঢাকা চিড়িয়াখানায় এই প্রজাতির কয়েকটি কুমির কোনোমতে টিকে আছে। মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ-নদীতে মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। তবে এদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। ধারণা করা হচ্ছে, আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে কোনো মেছো কুমির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশের জলসীমায় যে তিন প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়, তার মধ্যে লোনা জলের কুমিরই আকারের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় এবং বেশ হিংস্র স্বভাবের। এই কুমির দৈর্ঘ্যে তিন মিটারেরও বেশি হতে পারে। অবশ্য দু' একটি মেছো কুমিরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মিটারের কাছাকাছি।

কুমির দেখতে অনেকটা বড় আকারের টিকটিকির মতো। পিঠের দিকের রঙ জলে ভেজা মরচে ধরা লোহার মতো। কিন্তু পেটের দিকটা হলুদ আর সাদায় মেশানো। কুমিরের দেহ বেশ মোটা ও ভারী এবং ঘাড় বেশ চওড়া হয়ে থাকে। দেখা গেছে কুমিরের পিঠের চামড়া যতটা শক্ত, পেটের দিকের চামড়া ততটা শক্ত নয়। এদের দেহের চামড়া শক্ত আঁইশের মতো ভাঁজ হয়ে থাকে। সব ধরনের কুমিরের লেজই প্রচণ্ড রকম শক্তিশালী, এদের

লেজের দু' পাশে তিনকোনা চ্যাপটা ধরনের কাঁটা থাকে। কুমিরের মাথা তিনকোনা, মাথায় একজোড়া শক্তিশালী চোয়াল আছে। চোয়ালের দু' দিকে ২৯টি করে বড় আকারের দাঁত থাকে। এই শক্তিশালী চোয়ালের সাহায্যে কুমির খুব সহজেই বেশ বড় আকারের প্রাণী অনায়াসেই শিকার করতে পারে। কুমির সাধারণত জীবিত প্রাণী শিকার করে। তবে কোনো কিছুই এরা জীবিত খায় না। খাওয়ার আগে শিকারকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। অনেকে আবার খাওয়ার আগে শিকারের মাংস পচিয়ে নেয়।

মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে কুমির নদীর ধারে বালিতে গর্ত করে বাসা বাঁধে। স্ত্রী-কুমির এই বাসায় ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী বা পুরুষ কুমির ডিমের কোনো যত্নই নেয় না। রোদ আর বালির তাপে এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

কুমিরের চামড়া বেশ মূল্যবান। এই চামড়া দিয়ে মহিলাদের শৌখিন জুতা, চামড়ার বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ কারণেই যথেচ্ছভাবে কুমির নিধন হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে।

অ. ব.

কুয়াশা (frost)

কুয়াশা হল ভূমির কাছাকাছি সৃষ্টি হওয়া এক প্রকারের মেঘ। শীতের রাতে ভূমি দ্রুত শীতল হয়ে পড়লে এর সংস্পর্শে কাছের বাতাসও শীতল হয়। এ সময় বাতাসের প্রবাহ কম থাকলে ওখানকার বাতাস শীতল অবস্থায় থেকে যায়। এই শীতলতা শিশিরাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছলে বাতাসের জলীয় বাষ্প আর বাতাসে থাকতে পারে না। এটি তখন বাতাসের মধ্যে থাকা অসংখ্য ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট জলবিন্দু গঠন করে। এভাবেই সৃষ্টি হয় কুয়াশা। মাটির ধূলিকণা, কলকারখানা ও গাড়ির ধূম্রকণা ইত্যাদির আধিক্য থাকলে কুয়াশা বেশি হতে পারে।

জোরালো বাতাস থাকলে ভূমির কাছাকাছি ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর এলোমেলো হয়ে তার সঙ্গে উপরের গরম বাতাস মিশে যায়। এতে কুয়াশা হতে পারে না। তবে মৃদুমন্দ বাতাস বইলে সেটি বরং

উপরের বাতাসকে আরো ঠাণ্ডা করে কুয়াশাকে পুরু করে তোলে। সকালে সূর্যের তেজ বাড়ার পর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে তা নাড়া খায়। তখন গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে কুয়াশার জলবিন্দু বাষ্পীভূত হয়, কুয়াশা কেটে যায়।

তাপ বিকিরণে ভূমি শীতল হয়ে সাধারণ যে কুয়াশার সৃষ্টি হয় সেটি বিকিরণ কুয়াশা। শীতল স্রোত ইত্যাদির কারণে সমুদ্রের পানি ঠাণ্ডা হয়ে সেখানে অন্য একভাবে কুয়াশা জমে। আবার বাদলা দিনে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে উষ্ণতর বৃষ্টিপাত হলে 'ভাপ কুয়াশা' নামে আর এক রকমের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। এটি অনেকটা ফুটন্ত পানির কেতলির মুখে দেখা যাওয়া ভাপের মতো বলে একে 'ভাপ কুয়াশা' বলা হয়।

কুয়াশা থাকলে দৃষ্টি ব্যাহত হয়ে চলাচলের অসুবিধা হয়। গাড়ি চলাচল, বিমান অবতরণ ইত্যাদির জন্য এটি রীতিমতো বিপজ্জনক হতে পারে। শিল্পাঞ্চলের ময়লাটে কুয়াশা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর।

মু. ই.

কুরি, মারি [১৮৬৭–১৯৩৪]

পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ার্‌স শহরে। মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই ফ্র্যান্সের প্যারিসে। পিতা ভ্লাদিচ্‌লভ স্ক্লদোভস্‌কি ছিলেন দরিদ্র স্কুলশিক্ষক। স্ক্লদোভস্‌কির দুই মেয়ে ব্রোনিয়া আর মোনিয়া।

মোনিয়ার পুরো নাম মারিয়া স্ক্লদোভস্‌কা। স্কুলপরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও আর্থিক অনটনের জন্য ব্রোনিয়া এবং মারিয়ার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। মারিয়া গৃহশিক্ষকতা করে ব্রোনিয়ার পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। ব্রোনিয়া ডাক্তারি পাশ করার পর মারিয়ার উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসে। তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম এবং ১৮৯৪ সালে গণিতে দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। এর পর পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা শুরু করেন। এই সময় তাঁর পরিচয় হয় প্যারিসের তরুণ বিজ্ঞানী পিয়ের কুরির সঙ্গে। ১৮৯৫ সালে মারিয়ার সঙ্গে পিয়ের কুরির বিয়ে হয়। মারিয়ার নাম হয় মারি কুরি।

মাদাম মারি কুরি ও স্বামী পিয়ের কুরি নিজেদের গবেষণাগারে

কঠোর অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত গবেষণা করে কুরি দম্পতি ১৮৯৮ সালে দু'টি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। মারি কুরির (Marie Curie) জন্মস্থান পোল্যান্ডের নামানুসারে তাঁরা প্রথম মৌলটির নাম দেন পলোনিয়াম, অন্যটির তেজস্ক্রিয়তা (radiation) ধর্মের জন্য নাম দেন রেডিয়াম। ১৯০৩ সালে তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা ও নতুন মৌল আবিষ্কারের জন্য হেনরি বেকরেল এবং কুরি দম্পতিকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯০৬ সালে পিয়ের কুরি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। স্বামীর মৃত্যু মারি কুরিকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি দুই মেয়ে ইরিন এবং ইভকে নিয়ে সংসার যাপনের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পিয়ের কুরি সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মারি সেই পদে যোগদান করেন। তিনিই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা অধ্যাপক। তাঁর গবেষণা ও শিক্ষকতা তাঁকে মাদাম কুরি হিসাবে খ্যাতিমান করে তোলে।

১৯১০ সালে তেজস্ক্রিয়তার উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে তিনি বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন। এসব গবেষণার জন্য ১৯১১ সালে মাদাম কুরি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। এ ছাড়াও তিনি পান রয়াল সোসাইটির ডেভিড পদক, একাডেমিক পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার।

মারি কুরি

তিনি প্যারিসের বিখ্যাত রেডিয়াম ইনস্টিটিউট এবং কুরি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদাম কুরি রঞ্জনরশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে রোগচিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং এই পদ্ধতিতে সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ দল গঠন করেন। এই দলে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন মেয়ে ইরিন কুরি। ইরিন ও তাঁর স্বামী জোলিও উভয়েই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান (১৯৩৫)। ৬৭ বছর বয়সে লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাদাম কুরির মৃত্যু হয়।

স. রা.

কুলঁ, শার্ল ওগুস্ত্যাঁ দ্য [১৭৩৬–১৮০৬]

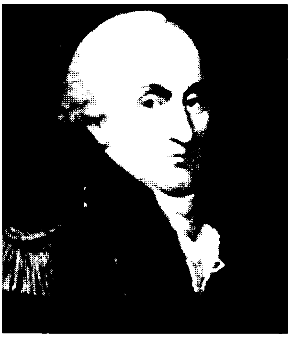

ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী কুলঁ (Charles Augustin de Coulomb)-র জন্ম ১৭৩৬ সালের ১৪ই জুন, মৃত্যু ১৮০৬ সালের ২৩শে আগস্ট। (কুলঁ নামটি বাংলায় ভুল উচ্চারণে কুলম্ব ও কুলম্ হিসাবে চালু আছে।) তিনি প্যারিস থেকে ১৭৬১ সালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রকৌশলী হিসাবে ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। তিনি ১৭৮১ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে প্যারিসে ফিরে এসে পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাপ্রবন্ধ, বিশেষ করে তড়িৎ-চুম্বকের উপর ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৭৮৫ সালে তিনি দু'টি বিপরীত চার্জের মধ্যে আকর্ষণবলের ব্যস্তানুপাতের সূত্রটি প্রদর্শন করেন। ১৭৮৭ সালে তড়িৎচার্জ এবং চুম্বকমেরু উভয় ক্ষেত্রে সমধর্মী চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ ও বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণবলের ব্যস্তানুপাত প্রদর্শন করেন। এভাবে তিনি নিম্নোক্ত দু'টি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন

(১) চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল মেরুশক্তির গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

(২) তড়িৎচার্জের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল চার্জ দু'টির গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

সূত্র দু'টি পদার্থবিজ্ঞানে Coulomb's Law বা 'কুলম্ সূত্র' নামে বিখ্যাত। তাঁরই নামানুসারে ইলেকট্রিক চার্জের একক 'কুলম্'। এ ছাড়া তিনি যন্ত্রপাতির ঘর্ষণ, বায়ুকল, ধাতু ও সিল্ক সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটান।

স. রা.

কুষ্ঠরোগ (leprosy)

মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্‌রি (Mycobacterium leprae) নামক জীবাণু সংক্রমণে কুষ্ঠরোগের সৃষ্টি হয়।

কুষ্ঠরোগের জীবাণু সাধারণত শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে বা ত্বকের ক্ষতমুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তবে এই রোগের বিস্তারপ্রক্রিয়া এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। শরীরে কুষ্ঠরোগের জীবাণু প্রবেশের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুষ্ঠরোগ অন্যের শরীরে সরাসরি সংক্রমিত হয় না। কেবল কুষ্ঠরোগের বিশেষ অবস্থাতেই তা সংক্রমিত হতে পারে।

কুষ্ঠরোগে ত্বকে ফ্যাকাসে বা লাল রঙের ফুসকুড়ি (patch) দেখা দেয়। ফুসকুড়িতে অনুভূতি থাকে না বা

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে মুখ ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকৃতি ও পচন ধরে

চুলকানিও সৃষ্টি হয় না। কুষ্ঠরোগে শরীরের প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়, মাংসপেশিতে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং রোগীর ত্বক, হাত, পা ইত্যাদি স্থানের অনুভূতি লোপ পায়।

কুষ্ঠ নিরাময়যোগ্য রোগ। যথাশীঘ্র চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করা হলে কুষ্ঠরোগজনিত অঙ্গবিকৃতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফোন (sulfones) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সি. না. হ.

কৃত্রিম উপগ্রহ উপগ্রহ, কৃত্রিম দ্র

কৃত্রিম তন্তু (artificial fibre)

সাধারণ অর্থে যে কোনো আঁশই তন্তু। কিন্তু বয়নশিল্পে যেসব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়নতন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে। তন্তু প্রকৃতি থেকে যেমন সংগ্রহ করা হয়, তেমনি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংমিশ্রণে গবেষণাগারেও উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার তন্তুই হল কৃত্রিম তন্তু।

প্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে রসায়নবিদেরা কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবন করেছেন। সাধারণত মেশিনের সাহায্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি গলিয়ে বিভিন্ন তরলে রূপান্তর করা হয়। এর পর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চাকতির মধ্য দিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঐ তরলকে প্রচণ্ড চাপে ঠেলে দেয়া হয়। ফলে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আঁশের আকারে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থ জমাট বেঁধে শক্ত হয় এবং তন্তু ও পরে তন্তু থেকে সুতা তৈরি হয়।

এ ধরনের সুতা বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন গুণের। প্রধানত দুই শ্রেণির তন্তু হল সেলুলোজিক তন্তু এবং নন-সেলুলোজিক তন্তু। সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ উদ্ভিদ-প্রাণীর অঙ্গ কোষ, সেলুলোজ থেকে প্রক্রিয়াজাত করে সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু তৈরি হয়। এদের রিজেনারেটেড তন্তুও বলে। এর মূল উপাদান বাঁশ, কাঠের গুঁড়া। এ থেকে তৈরি হয় রেয়ন, ভিসকোম, এসিটেট ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সেলুলোজ নয় এমন পদার্থ, যেমন– কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়ায়তৈরি হয় নন-সেলুলোজিক বা সিনথেটিক তন্তু। এদের পলিমারও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইলন, পলিয়েস্টার, একরাইলিক, এরামিত ইত্যাদি। নাইলন প্রথম উদ্ভাবিত কৃত্রিম তন্তু। এটি হালকা ও শক্ত। ইদানীং বস্ত্র বয়নশিল্পসহ দড়ি, টায়ার, ফিল্টার, সুটকেস ইত্যাদি তৈরিতে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বেড়েই চলছে।

স. রা.

কৃমিরোগ (helminthiasis)

কৃমি বহুকোষী পরজীবী শ্রেণির অন্তর্গত। কৃমি পুষ্টি শোষণ করে কিংবা বিষাক্ত বস্তু নিঃসরণ করে মানবদেহে

রোগ সৃষ্টি করে। মানবদেহে সচরাচর রোগ সৃষ্টিকারী কৃমির মধ্যে রয়েছে গোলকৃমি, বক্রকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি।

গোলকৃমি দেখতে কেঁচোর মতো। মানুষের অন্ত্রে বাস করে। গোলকৃমির পূর্ণাঙ্গ ডিম দূষিত খাবার, পানি, ফল ইত্যাদির মাধ্যমে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং পরিপাকতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিচরণ-শেষে পুনরায় পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে পরিণত হয়।

বক্রকৃমি বা হুকওয়ার্ম ধূসর-সাদা বর্ণের ছোট ছোট কৃমি। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বক্রকৃমির ডিম থেকে নির্গত শূককীট মানুষের পায়ের পাতার চামড়া ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে কৃমিরোগ ঘটায়।

সুতাকৃমি ছোট ছোট সুতার আকৃতিবিশিষ্ট কৃমি। সুতাকৃমির ডিম মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশের ফলে এই কৃমিরোগ দেখা দেয়। এই কৃমিরোগে মলদ্বারের চারপাশে ভীষণ চুলকানি হয়।

ফিতাকৃমি বা টেপওয়ার্ম লম্বা আকৃতির এবং এর দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত। ফিতাকৃমির শূককীট দ্বারা আক্রান্ত বিভিন্ন পশুর মাংস ও মাছ কাঁচা বা অর্ধসেদ্ধ খেলে মানুষ এই কৃমিতে আক্রান্ত হয়। এর প্রতিরোধব্যবস্থা হিসাবে মাছ-মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ করে খাওয়া যেমন উচিত, তেমনি পশুকেও পরিষ্কার খাবার খেতে দেওয়া উচিত।

কৃমিরোগে দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, কাশি, চুলকানি, রক্তাল্পতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কৃমিরোগের প্রতিরোধব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যেখানে-সেখানে মলত্যাগ না করা, মাছি বা অন্যান্য মাধ্যমে সংক্রমিত খাবার না খাওয়া, খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পর হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধোওয়া, খালি পায়ে না হাঁটা ইত্যাদি। ঔষধের সাহায্যে দেহ থেকে কৃমির পূর্ণ অপসারণই কৃমিরোগের যথাযথ চিকিৎসা হিসাবে স্বীকৃত।

আ. আ. হা.

কৃষি-প্রকৌশল (agro-engineering)

সম্প্রতি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল প্রয়োগ করে অধিক ও উন্নত মানের ফসল ফলানোর যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে, একে কৃষি-প্রকৌশল বলা হয়। মানুষের প্রাচীন কর্মকাণ্ডের মধ্যে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। কৃষি মানবসভ্যতার একটি বড় ভিত্তি। মানুষ ক্রমে ক্রমে কৃষিকাজের নানা কৌশল আয়ত্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষ যেখানে ঠেকেছে সেখানে তার উদ্ভাবনী মেধা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে। এভাবে মানুষ কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত পানিসেচ পদ্ধতি, আবহাওয়া বিজ্ঞান, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ-সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা বিষয় আবিষ্কার করেছে। আগে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম। ক্রমেই পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যা বাড়লেও জমির পরিমাণ বাড়ে নি। কিন্তু বাড়তি লোকের জন্য বাড়তি ফসল ফলানো চাই। তাই বিজ্ঞানীরা আরো উন্নত প্রযুক্তি, কৃত্রিম সার, কীটনাশক ইত্যাদি আবিষ্কারের উদ্যোগ নেন। এভাবে কৃষি-প্রকৌশলবিদ্যার সূচনা হয়।

কৃষি-প্রকৌশলকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়– যান্ত্রিক কৃষি-প্রকৌশল ও জৈবিক কৃষি-প্রকৌশল। যান্ত্রিক কৃষি-প্রকৌশল জমি চাষ, বীজবপন, নিড়ানি, ফসল সংগ্রহ, ফসল বাছাই, মাড়াই ইত্যাদির জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে থাকে। এই প্রকৌশল ফসল-

ক্ষেতে তাপমাত্রা ও আলোকদৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে এক ঋতুর ফসল অন্য ঋতুতেও ফলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। জৈবিক কৃষি-প্রকৌশল বিভিন্ন ধরনের উন্নততর জাত উদ্ভাবন, রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন এবং উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের কাজ করে। বর্তমানে জীন-প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, হরমোন প্রয়োগ ধরনের আরো উন্নত কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে এই শাখায়। ফসলের শত্রু কীটপতঙ্গ দমনে ও জৈবিক নিয়ন্ত্রণেও এই বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব করেছে কৃষি-প্রকৌশল।

ত. চ.

www.boighar.com

কৃষিবিজ্ঞান (agricultural science)

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষের জীবিকার উপায় ছিল প্রকৃতিজাত খাদ্য আহরণ ও পশুপাখি শিকার। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য সমস্যার সমাধান কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। তাই বাধ্য হয়ে মানুষ খাদ্য আহরণের বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ খাদ্য ফলানো আয়ত্ত করতে শেখে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কৃষিকার্যের প্রবর্তন একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করে। যন্ত্রপাতি ছাড়া, সেচ ছাড়া ফসল ফলানো সহজ ছিল না বলেই নদ-নদীর কোল ঘেঁষে, নদীতীরের কাদামাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অতি সহজেই ফসল লাভ করা যেত। তার পর সে চাষাবাদ কাদামাটির সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে সাধারণ মাটিতেও ছড়িয়ে পড়ে। জমির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকম ফসলের চাষ শুরু হয়। জমির উপর নির্ভর করে এসব ফসল দুই ফসল বা ফসলক্রম আবিষ্কার হতে থাকে। এভাবে ধাপে ধাপে কৃষির বিভিন্ন দিক বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা এবং গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কৃষিবিজ্ঞান বলতে তাই বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ, ফসল নির্বাচন, জমির উর্বরাশক্তি সংরক্ষণ, সাফল্যজনকভাবে নতুন ফসলের প্রবর্তন, প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল এবং ফসলক্রম উদ্ভাবন, বিভিন্ন ফসলের পারস্পরিক সম্পর্ক, ফসলের সঙ্গে অন্যান্য পশুপাখি পালনের সম্পর্ক, ফসল আবাদের সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য রক্ষা করার উপায় অধ্যয়ন উদ্ভাবন এবং প্রয়োগকে বোঝায়।

শা. আ.

কৃষ্ণচূড়া (delonix regia)

কৃষ্ণচূড়া মাঝারি আকারের বৃক্ষ। এর শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পাতা যৌগিক ও দ্বি-পক্ষল। পাতার দৈর্ঘ্য ২.৫ থেকে ৪ সেন্টিমিটার। ফুলের ব্যাস ৫ থেকে ৭.৫ সেন্টিমিটার। বৃতির বাইরের দিকটা সবুজ এবং ভেতরের দিকটা লাল। দলে পাপড়ির সংখ্যা ৫টি। ফল বেশ লম্বা হয়– ২৫ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। কচি ফলের রঙ সবুজ, পাকা ফল গাঢ় ধূসর। একটি ফলে লম্বাকৃতির অনেকগুলো বীজ থাকে।

কৃষ্ণচূড়া গাছে শীতের শেষ দিকে ফুল ফুটতে শুরু করে। চৈত্র-বৈশাখ মাসেই গাছে ফুল থাকে সবচেয়ে বেশি। তার পর ধীরে ধীরে ফুলের সমারোহ কমতে থাকে। মোটামুটি বর্ষার শেষ পর্যন্ত অনেক গাছেই ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুল গাঢ় লাল, লাল, কমলা, হলুদ, হালকা হলুদ ইত্যাদি নানা রঙের হয়ে থাকে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের কাণ্ড খুব দীর্ঘ হয় না, শাখা-প্রশাখাও খুব একটা ঊর্ধ্বগামী হয় না। ফলে ছড়িয়ে যাওয়া শাখা-প্রশাখায় গাছটিকে অনেকটা ছাতার মতো

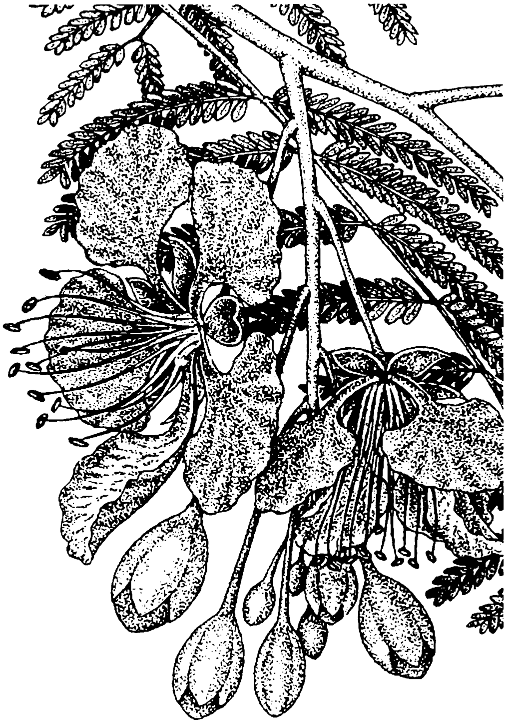

কৃষ্ণচূড়া ফুল ও পাতা

কৃষ্ণচূড়া গাছ

মনে হয়। এর কাণ্ড বা শাখা খুব মজবুত নয়। কাঠ মূলত জ্বালানি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

কৃষ্ণচূড়া আমাদের খুব চেনা হলেও এর আদি নিবাস অনেক দূরে। আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জ থেকে এটি প্রথমে যায় ইউরোপে এবং মাত্র গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশেরা এটিকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। Leguminoeac গোত্রের এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *Delonix Regia Raf.* ইংরেজি Flame tree, Peacock tree।

ফ. মা.

কৃষ্ণবিবর (black hole)

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় মনে করা হয়, মহাকাশে কোনো কোনো তারার মাধ্যাকর্ষণ এত বেশি যে এর আকর্ষণ কাটিয়ে কোনো কিছুই এর বাইরে আসতে পারে না– এমনকি আলোও নয়। ফলে এসব তারা অদৃশ্য। এদেরকে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণবিবর বলা হয়। কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত মত হল কোনো কোনো অতিকায় তারা তার নিজের ভারে নিজেই নিজের ভিতর চুপসে যায়। এ রকম সঙ্কোচনের ফলে তার বস্তুঘনত্ব বেড়ে যায় অনেকখানি, ফলে এর পৃষ্ঠদেশে নিজের মাধ্যাকর্ষণও বেড়ে যায় খুব বেশি। এটি তখন একটি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

যে আমাদের সূর্যের ব্যাস ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার কিলোমিটার; যদি কখনো চুপসে গিয়ে তা ৬ কিলোমিটারে পরিণত হতে পারে তা হলে সেটি কৃষ্ণবিবর হবার মতো মাধ্যাকর্ষণ-বল অর্জন করবে।

অদৃশ্য হবার কারণে কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব সরাসরি প্রমাণের কোনো উপায় নেই। তবে পরোক্ষভাবে এর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। যেমন– দৃশ্যমান একটি বিশাল অতিদানব ধরনের তারার চলাচলের আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, এর একটি নিকটসঙ্গী রয়েছে, যা অত্যন্ত ভারী হতে বাধ্য, অথচ সে সঙ্গী তারাটিকে দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত এক্স-রে টেলিস্কোপে একটি এক্স-রে সঙ্কেতে বোঝা গেছে যে সেই অদৃশ্য স্থানে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি উৎস রয়েছে। সব দিক থেকে প্রমাণিত হয় যে ওখানে একটি কৃষ্ণবিবরই রয়েছে। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ মনে করেন, আমাদের ছায়াপথের সমস্ত তারকাবস্তুর এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে কৃষ্ণবিবররূপে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে বস্তুমাত্রই তার মাধ্যাকর্ষণের কারণে নিজের আশপাশের 'স্থানে' একটি বিকৃতির চতুর্থ মাত্রা সৃষ্টি করে। কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি চরম রূপ লাভ করে এবং এখানে 'স্থানে'র মধ্যে যেন এক 'অতল কূপ' সৃষ্টি হয়। কেউ এই অতল কূপের মধ্যে পড়লে সে কূপের অন্য প্রান্তে স্থান-কালের অন্য এক অংশে উঠে আসবে, যেখানে শুধু স্থান নয়, কালও হবে ভিন্ন– হয়তো-বা সুদূর অতীতে বা ভবিষ্যতে। যদিও আপাতত প্রমাণের কোনো উপায় নেই, তবু কৃষ্ণবিবর এ রকম চমকপ্রদ কিছু তাত্ত্বিক চিন্তার উদ্ভব করেছে।

মু. ই.

কেঁচো (earthworms)

সাধারণত মৃত্তিকা-কৃমিকেই (earthworms) কেঁচো বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *Pharctine posthumo*। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, এমনকি ৩০০০ মিটার উঁচু পার্বত্যভূমিতেও কেঁচো দেখা যায়। কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চলে, চলার পথে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতেই মলত্যাগ করে। এভাবে কেঁচো মাটিকে নরম ও উর্বরা করে তোলে। এ কারণে কেঁচোকে 'প্রকৃতির লাঙ্গল' বলেও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া কেঁচো গৃহপালিত হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে এবং মাছ ধরার জন্যও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

www.boighar.com

কেঁচো এনেলিডা বর্গের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। সাধারণত জৈবপচন (humus)-যুক্ত নরম মাটিতে থাকে। কেঁচোর লম্বা শরীরের অগ্রভাগ বা মুখের অংশ বেশ সরু। মাটিতে ছোটখাটো কোনো ছিদ্র পেলে সেখানে অগ্রমুখটি (peristomium) ঢুকিয়ে দেয় এবং পেছনের অংশটিকে সঙ্কুচিত করে সামনের দিকে চাপ দেয়। ফলে ছিদ্র ক্রমশ বড় হয় এবং শরীরটাকে মাটির মধ্যে ঢোকাতে থাকে। এ ছাড়া মাটি খাওয়ার কারণেও কেঁচোর পক্ষে গর্ত খোঁড়া সহজ হয়। কেঁচো মুখ দিয়ে মাটি খায় এবং শরীরের অপর প্রান্ত দিয়ে বের করে দেয়। এই খাওয়া এবং বের করে দেওয়ার মধ্যেই কেঁচোর শরীর মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়।

কেঁচোর আকৃতিতে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কেঁচোর শরীরের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ মিমি থেকে শুরু করে ১ মিটার (৩ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। দেহের রঙ সাধারণত লালচে-বাদামি। এর কোনো চোখ বা কান নেই। মুখের অংশটি তাপ, আলো ও স্পর্শের প্রতি অত্যন্ত সংবেদী। কেঁচোর কোনো ফুসফুস নেই। ত্বকের সাহায্যেই এরা শ্বাসকার্য চালায়। ত্বকের উপরে 'সিটা' নামের চলন অঙ্গের সাহায্যে এরা চলাফেরা করে। একই কেঁচোতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জননাঙ্গই থাকে। তবে ডিম পাড়ার জন্য একটি কেঁচোকে অন্য একটি কেঁচোর সঙ্গে মিলিত হতে হয়।

ফ. মা.

কেতকী (screwpine)

কেতকীর অপর নাম কেয়া, কেতড়ী। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Pandanus odorathssimus* L.f. এবং এটি Pandanaeceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্র সৈকতে জলসীমার উপরে প্রচুর শাখা সংবলিত আঁকাবাঁকা কাণ্ডবিশিষ্ট কেতকী গাছ নিশ্ছিদ্র এক বেড়ার সৃষ্টি করে যা ভেদ করে যাওয়া যায় না। কাণ্ড সাধারণত তিন মিটারের মতো উঁচু হলেও ছয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কাণ্ডগুলো কিছুদূর পর পর বের হওয়া বায়বীয় মূল দ্বারা খুঁটির মতো সাহায্য পেয়ে থাকে। পাতা তরবারির আকৃতির, ০.৫-১.৫ মিটার লম্বা হতে পারে। সাদাটে পাউডার আবৃত সবুজ চামড়ার মতো পাতার কিনারা ও মধ্যশিরা কাঁটাযুক্ত। পুরুষ ফুলের স্প্যাডিক্স ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং সাদা ও সুগন্ধিযুক্ত লেজাকৃতির

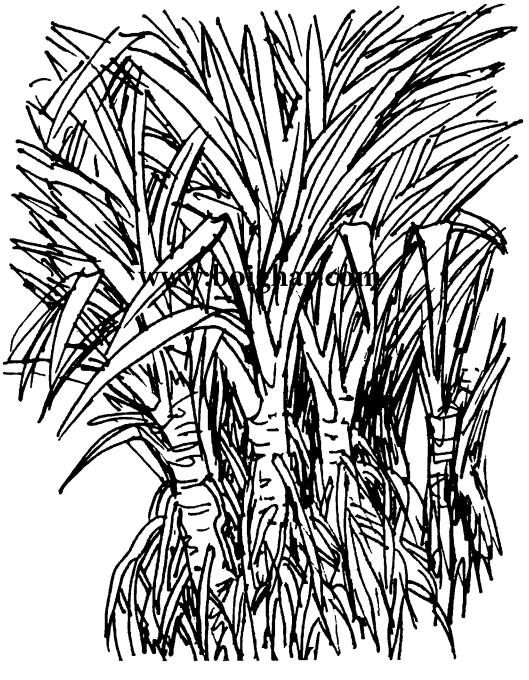

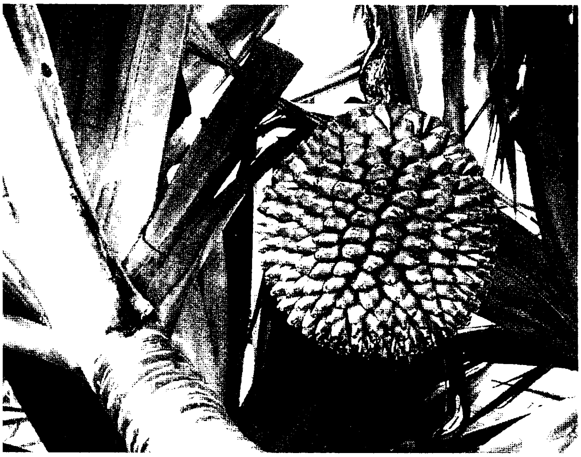

কেতকী গাছ ও ফল। সমুদ্রের ধারে বিশেষ করে সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রচুর কেতকী রয়েছে

শীর্ষবিশিষ্ট স্পেথ দ্বারা আবৃত। স্ত্রী-ফুলের স্প্যাডিক্স এককভাবে জন্মে, সমান্তরাল, হলুদ বা লাল। ফল ড্রুপ, অসংখ্য। কেতকী বহুরূপী এবং সে কারণেই কয়েকটি প্রজাতির নামে নামাঙ্কিত। এর বহু ধরন রয়েছে যা কোনো কোনো দেশে বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঁটাবিহীন লেভিস (laevis) ধরনটি এর পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধিযুক্ত উপবৃত্তির জন্য আবাদ করা হয়। কাঁটাযুক্ত সমক (samak) ধরনটি এর শক্ত পাতার জন্য আবাদ করা হয়, যা দিয়ে মাদুর তৈরি হয়। ভেরিগ্যাটাস (variegatus) ধরনটি পাতার প্রান্ত জুড়ে লম্বালম্বি হলুদ ব্যান্ডের জন্য বাগানে লাগানো হয়। কেওড়া আতর, কেওড়াজল পুরুষ পুষ্পমঞ্জরি আবৃতকারী সুগন্ধি স্পেথ থেকে নির্যাস করা হয়।

শা. আ.

কেনিয়াপিথেকাস (kenyapithecus)

১৯৬২ সালে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ লুই সাইমর বেজেট লিকি আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলে এপ্ সদৃশ প্রাণীর চোয়াল এবং কয়েকটি দাঁত উদ্ধার করেন। এগুলো আনুমানিক এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বছর আগের বলে তিনি ধারণা করেন। তিনি এই নিদর্শনগুলোর নাম দেন 'কেনিয়াপিথেকাস', পুরো নাম কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস। পরবর্তী কালে এগুলোর আরো নিদর্শন এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এরা যে তিনকোনা পাথরের সাহায্যে পশুর খুলি ও হাড় ভেঙে মগজ ও মজ্জা বের করে খেতে অভ্যস্ত ছিল তেমন প্রমাণও লিকি আবিষ্কার করেছেন। কেনিয়াপিথেকাসের সঙ্গে রামাপিথেকাসের দৈহিক মিল দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন, রামাপিথেকাস ও কেনিয়াপিথেকাস একই জাতির এশীয় এবং আফ্রিকীয় সংস্করণ।

সৈ. আ. ই.

কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force)

অপকেন্দ্র বা কেন্দ্রবিমুখী কোনো বস্তুকে বৃত্তাকার পথে ঘুরাতে হলে ঐ বস্তুর উপর যে বল প্রয়োগ করা হয়, তা হচ্ছে কেন্দ্রাভিগ বল। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে এই বলের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে বল বৃত্তের কেন্দ্রে ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের বাইরের দিকে ক্রিয়া করে তাকে কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রবিমুখী প্রতিক্রিয়া বলে।

কেন্দ্রাতিগ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কেন্দ্রাভিগ বলের সমান ও বিপরীতমুখী। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কোনো সময়ই একই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় না। তাই কেন্দ্রাভিগ

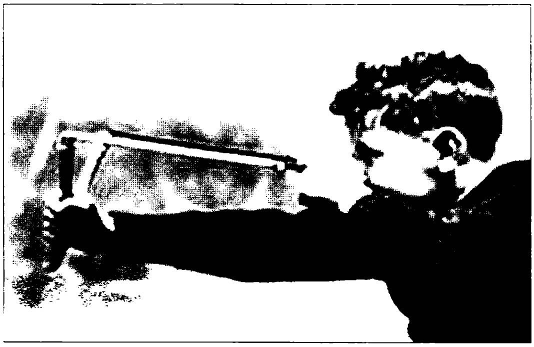

বল ও কেন্দ্রবিমুখী প্রতিক্রিয়া দু'টি ভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়। কেন্দ্রাভিগ বল প্রযুক্ত হয় ঘূর্ণায়মান বস্তুর উপর এবং এর দিক হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের দিকে। অপর পক্ষে কেন্দ্রবিমুখী প্রতিক্রিয়া প্রযুক্ত হয় বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রে ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের বাইরের দিকে।

m ভরের কোনো বস্তু r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে v সমদ্রুতিতে ঘুরলে বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রে অনুভূত কেন্দ্রবিমুখী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে $\frac{mv^2}{r}$।

সুতায় বাঁধা একটি ঢিলকে যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরানো হয় তখন সুতা ঢিলটির উপর যে বল বৃত্তের

কেন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করে অর্থাৎ সুতার টানই হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বা কেন্দ্রাভিগ বল এবং সুতার মাধ্যমে আঙুলের উপর যে বল প্রযুক্ত হয় তা হচ্ছে কেন্দ্রাভিগ প্রতিক্রিয়া।

শা. ত.

কেন্দ্রাভিগ বল (centripetal force)

কোনো বস্তুর উপর বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে এর বেগের পরিবর্তন হয় না। আমরা জানি, কোনো বস্তুর বেগের দিকের লম্ব বরাবর বল প্রয়োগ করা হলে এর বেগের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু দিকের পরিবর্তন হয়। যেহেতু কোনো বস্তু বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে ঘোরার সময় এর বেগের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু প্রতিনিয়ত দিক পরিবর্তিত হয়, কাজেই বৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় বস্তুর বেগের দিকের সাথে লম্ব বরাবর প্রতিনিয়ত বল প্রযুক্ত হয়। বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে স্পর্শক তথা বেগের দিকের সাথে লম্ব, তাই বৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় বস্তুর ওপর ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রের দিকে সব সময়ই একটি বল ক্রিয়া করে। এই বলকে অভিকেন্দ্র বল বা কেন্দ্রমুখী বল বা কেন্দ্রাভিগ বল বলা হয়।

বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত নীট বলকেই কেন্দ্রাভিগ বল নামে অভিহিত করা হয়। এ বল আলাদা কোনো বল নয়। কোনো বস্তু তার ওজন বা কোনো সুতার টান বা কোনো ঘর্ষণ বল বা কোনো অভিলম্ব বল বা একাধিক বলের সমন্বয়ের প্রভাবে বৃত্তাকার পথে ঘোরে। কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত নীট বল যদি বৃত্তাকার গতি উৎপন্ন করে তখন সেই নীট বল বা লব্ধি বলকেই কেন্দ্রাভিগ বল বলা হয়।

কেন্দ্রাভিগ বলের মানকে Fc দিয়ে প্রকাশ করলে

$$Fc = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$$

যেখানে m বস্তুর ভর, v বেগ, r বৃত্তের ব্যাসার্ধ, ω কৌণিক বেগ।

বস্তুকে বৃত্তাকার পথে ঘুরানোর জন্য নানাভাবে বল প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি সুতার এক প্রান্তে একটি ঢিল বেঁধে সুতার অন্য প্রান্ত আঙুলে ধরে যদি সমদ্রুতিতে ঘুরানো যায় তাহলে সুতার মধ্য দিয়ে আঙুলের দিকে ঢিলের উপর একটি বল প্রযুক্ত হবে।

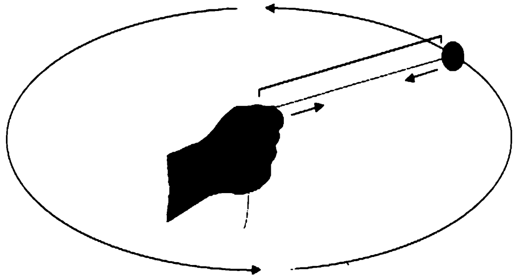

সুতার মধ্য দিয়ে বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রের দিকে ঢিলটির উপর যে বল প্রযুক্ত হচ্ছে তাই কেন্দ্রাভিগ বল। কেন্দ্রাভিগ বল উৎপন্ন হওয়ার জন্য ঘূর্ণায়মান বস্তু আর ঘূর্ণন কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি সংযোগ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যখনই কোনো বস্তু কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে গতিশীল হয় তখনই কেন্দ্রাভিগ বল উৎপন্ন হয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে বা চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার সময় কেন্দ্রাভিগ বল লাভ করে। এই কেন্দ্রাভিগ বল মাধ্যাকর্ষণজনিত। এখানে বস্তু ও কেন্দ্রের মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। আবার পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো যখন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে তখন ইলেকট্রনগুলোতে কেন্দ্রাভিগ বল উৎপন্ন হয়। এই বল তড়িৎ আধানের কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

শা. ত.

কেপ্‌লার, ইওহানেস্‌ [১৫৭১-১৬৩০]

জার্মান জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ২৭শে ডিসেম্বর, ১৫৭১ সাল। মৃত্যু ১৫ই নভেম্বর, ১৬৩০ সাল। দক্ষিণ জার্মানির এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইওহানেস্‌। স্কুলজীবনে তাঁর অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গুটেনবার্গের ডিউক তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। টুবিঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন, গণিত ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই সময় সবাই ধারণা করতেন, পৃথিবী স্থির, সূর্য ও চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এ সম্পর্কে ১৫৪৩ সালে জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তত্ত্বটি হল– সূর্য স্থির, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তখনকার দিনে এই তত্ত্বটি কেউ মেনে নেন নি। কিন্তু কেপ্‌লারের শিক্ষক মাইকেল

ম্যাস্টলিন তত্ত্বটি বিশ্বাস করতেন। কেপ্‌লারকে তিনি তত্ত্বটির প্রতি আকৃষ্ট করেন। কেপ্‌লার গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

কেপ্‌লারের ইচ্ছা ছিল ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার গ্রেজে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। ২৪ বছর বয়সে তিনি Mysterium Cosmographicum (বিশ্বতত্ত্বের রহস্য) নামে একটি বই লেখেন। এতে তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। বইটি ইউরোপের খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ট্রাইকো ব্রাহির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কেপ্‌লারকে তাঁর সঙ্গে গবেষণা করতে আমন্ত্রণ জানান। ট্রাইকো ব্রাহি ছিলেন প্রাগ মানমন্দিরের প্রধান এবং রোমের প্রধান রাজজ্যোতির্বিদ। তাঁর মৃত্যুর পর কেপ্‌লার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (১৬০১)।

দীর্ঘদিন গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে কেপ্‌লার তিনটি সূত্র উদ্ভাবন করেন, যা কেপ্‌লারের সূত্র হিসাবে খ্যাত। এগুলো হল ১. সূর্যকে উপকেন্দ্রে রেখে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে; ২. গ্রহের গতি সূর্য থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভরশীল, গ্রহ এবং সূর্যের সংযোগকারী রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে; ৩. একটি গ্রহের আবর্তনকালের বর্গকে সূর্য থেকে এর গড় দূরত্বের ঘনফল দ্বারা ভাগ করলে একটি ধ্রুব সংখ্যা পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটি ১৬০৯ সালে এবং তৃতীয় সূত্রটি ১৬১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া কেপ্‌লার আলোকতত্ত্বের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আমরা কীভাবে দেখি তিনি তার প্রথম ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, বিচ্ছুরিত রশ্মিকণা আমাদের চোখের তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ফোকাস হয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে পড়ে। রেটিনা আলোকসংবেদী, দর্শনের অনুভূতি জাগায়। আলোকরশ্মির ফোকাস রেটিনার সামনে বা পিছনে পড়লে চোখে ঝাপসা দেখা যায়। এই তত্ত্বের জন্য তাঁকে আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

স. রা.

কেপ্‌লারের সূত্র (Kepler's law)

জার্মান গণিতবিদ ইওহানেস্ কেপ্‌লার ১৬০৯ সালে এবং ১৬১৯ সালে মহাকাশের গ্রহসমূহের গতির নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে তিনটি সূত্র উপস্থাপন করেন। এগুলিই কেপ্‌লারের সূত্র নামে পরিচিত। সূত্রগুলি হল

১. প্রতিটি গ্রহই সূর্যকে একটি নাভি (Focus)-তে রেখে উপবৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান।

২. গ্রহ এবং সূর্যের সংযোজক রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

৩. সূর্যের চারিদিকে প্রতিটি গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ, সূর্য থেকে ঐ গ্রহের দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র ১৬০৯ সালে এবং তৃতীয় সূত্রটি ১৬১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

স. রা.

কেমোচিকিৎসা (chemotherapy)

লুই পাস্তুর, রবার্ট কক প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণায় সংক্রামক রোগের কারণরূপে জীবাণুর ভূমিকা প্রমাণিত হবার পর সেই সূত্রে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কারের দিকে বিজ্ঞানীদের নজর পড়ে।

বিশ শতকে পৌঁছে জার্মান চিকিৎসক পল আহ্‌লিলই প্রথম রঞ্জক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জীবাণুনাশক আর্সেনিক যৌগের সন্ধান পান। ১৯০৯ সালে তাঁর আবিস্কৃত ৬০৬ নম্বর যৌগটি পরে 'স্যালভার্সান' নামে খ্যাতি অর্জন করে।

এর পর ১৯৩৫ সালে আরেক জার্মান বিজ্ঞানী গেরহার্ড ডোমাগ্ 'প্রন্টোসিল রুব্রাম' নামে একটি জীবাণুনাশক রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এটি বহুল পরিচিত সালফোনেমাইড জাতীয় জীবাণুবিরোধী ঔষধের আদি সংস্করণ। এর পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সে এর উন্নত রূপ সংশ্লেষিত হয়ে জীবাণুবিরোধী চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। জীবাণুবিরোধী এই সব রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে চিকিৎসা পরিচিত হয়ে ওঠে কেমোথেরাপি বা কেমোচিকিৎসা নামে।

ক্রমে এই পথে উন্নততর ও নিরাপদ উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টায় আবিস্কৃত হয়েছে একাধিক রাসায়নিক ঔষধ। এগুলো জীবাণু ও পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিকের

উপস্থিতি সত্ত্বেও মেট্রোনিডাজোল, ট্রাইমেথোপ্রিম, ড্যাপসোন, আইসোনিয়াজিড নামীয় ঔষধগুলো বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এবং এর পরও চলছে পরজীবী সংক্রমণের বিরুদ্ধে নতুন নতুন কেমোচিকিৎসার উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা।

রু. হা.

কেরোসিন (kerosene)

তীব্র গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন দাহ্য তরল। এর অপর নাম প্যারাফিন তেল। পেট্রোলিয়াম পরিশোধন করে অনেকগুলো উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম উপাদান কেরোসিন। পাতন প্রণালীতে কেরোসিনকে অন্যান্য হাইড্রোকার্বন থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। ডিকেন ($C_{10}H_{12}$) এবং ডোডিকেন ($C_{12}H_{26}$)-এ দু'টি হাইড্রোকার্বন কেরোসিনে থাকে। সস্তা জ্বালানি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত পদার্থ। ১৯৫৪ সালে একজন কানাডীয় ভূতত্ত্ববিদ আব্রাহাম গেসনার পেট্রোলিয়াম (দ্র) পরিশোধনের পাতন প্রক্রিয়ার পেটেন্ট করেন এবং কেরোসিন উদ্ভাবন করেন। কেরোসিন শব্দটি গ্রিক শব্দ কোরেস থেকে নেওয়া। কোরেস অর্থ মোম। কেরোসিন আবিষ্কারের আগে কৃত্রিম আলোক-উৎস ছিল মোমবাতি এবং উদ্ভিজ্জ তেলের বাতি। কেরোসিন আবিষ্কারের পর কুপি, হারিকেন, হ্যাজাকবাতি প্রভৃতিতে কৃত্রিম আলোক-উৎস হিসাবে কেরোসিনই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি গ্যাসোলিনের চেয়ে কম উদ্বায়ী। তরল জ্বালানি হিসাবে জেট এয়ারক্র্যাফট এবং গৃহস্থালি কাজে তেলের বাতি ও চুলা ইত্যাদিতে কেরোসিন ব্যবহার হয়। বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পর এর ব্যবহার কমলেও যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎসরবরাহ নেই এখনো সেসব অঞ্চলে আলো জ্বালাতে এবং উনুনের চুলোয় কেরোসিন ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে কেরোসিনের প্রধান ব্যবহার জেট-ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে। কোনো কোনো যুদ্ধবিমানে কেরোসিন এবং গ্যাসোলিনের মিশ্রণ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ট্রাক্টর, ইলেকট্রিক জেনারেটর, কীটনাশক ও জৈব যৌগের দ্রাবক হিসাবে কেরোসিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেরোসিন মূলত হাইড্রোকার্বনের (দ্র) মিশ্রণ। নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলে হাইড্রোকার্বন যৌগ শ্রেণি গঠন করে। যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগের কার্বনসংখ্যা ৯ থেকে ১৬-এর মধ্যে, সেগুলির মিশ্রণই কেরোসিন।

কেরোসিনের স্ফুটনাঙ্ক ১৫০° থেকে ৩০০° সে.-এর মধ্যে। আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৮।

স. রা.

কেলভিন তাপমাত্রা (Kelvin's temperature)

তাপগতিবিদ্যায় তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক কেলভিন। এর প্রতীক K। স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী গণিতবিদ উইলিয়াম কেলভিন প্রথম পরমশূন্য তাপমাত্রার স্কেলের প্রস্তাব দেন। একে তাপমাত্রার পরম স্কেল বলা হয়। এই স্কেলে হিমাঙ্ক -273.15° K এবং স্ফুটনাঙ্ক 373.15° K, যা সেলসিয়াস স্কেলে যথাক্রমে 0° C এবং 100° C। ১৯৬৮ সালে তাপমাত্রার পরম স্কেলকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাপমাত্রার ব্যবহারিক স্কেল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এবং উইলিয়াম কেলভিনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় কেলভিন স্কেল। এর তাপমাত্রার একক কেলভিন মাত্রাকে 1° C-এর সমান ধরা হয়। এই স্কেল অনুসারে পানির হিমাঙ্ক -273.15° K, স্ফুটনাঙ্ক 373.15° K।

স. রা.

কেলাস (crystal)

কঠিন পদার্থের একটি রূপ হল ক্রিস্টাল বা কেলাস। কঠিন পদার্থের পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টি যখন পরস্পর থেকে সুনির্দিষ্ট দূরত্বে পুনরাবৃত্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নে অবস্থান নেয়, সে ক্ষেত্রে পদার্থটির কেলাসিত রূপ পাওয়া যায়। অধিকাংশ কঠিন জড় বস্তু কেলাসিত অবস্থাতেই থাকে। একটি বস্তুর পুরো অবয়বটাই যদি একই নিরবচ্ছিন্ন কেলাস প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে একে সিঙ্গল ক্রিস্টাল বা এক-কেলাস বলা হয়। তা না হয়ে বস্তুটি যদি অপেক্ষাকৃত

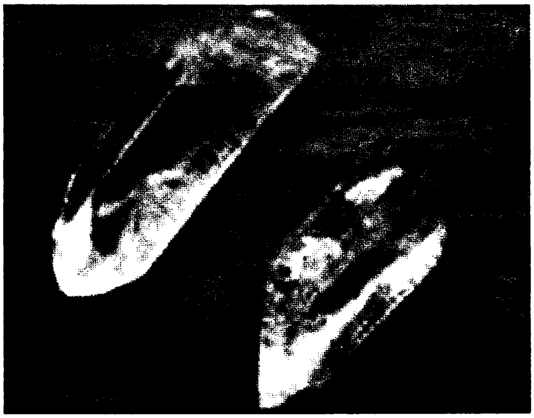

ছোট অনেকগুলো কেলাসের এলোমেলো সমাহার হয়, তা হলে একে পলি-ক্রিস্টাল বা বহু-কেলাস বলা হয়। আমাদের চারপাশের অধিকাংশ কঠিন বস্তু এই শেষোক্ত দলে পড়ে।

বাষ্প দ্রবণ বা গলিত অবস্থা থেকে কঠিন রূপ লাভ করার সময় খুব ধীরে এবং অবিচলভাবে তা করা হলে সাধারণত বড় এক-কেলাস সৃষ্টির সুযোগ ঘটে। অন্যথায় ক্ষুদ্রাকার কেলাসের সমন্বয়ে বহু-কেলাস, এমনকি একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকা পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টিতে গড়া অকেলাসিত রূপ পাওয়া যায়। কাচ এমনি একটি অকেলাসিত বস্তু। বড় এক-কেলাসের ক্ষেত্রে পরমাণু-সজ্জার প্যাটার্নটি বস্তুটির সামগ্রিক অবয়বের মধ্যেও ধরা পড়তে পারে। যেমন বড় লবণদানার কিউব বা ঘনক আকৃতির কেলাস এর অনুরূপ পরমাণু-সজ্জারই প্রতিচ্ছবি। কেলাসের গঠনে বিভিন্ন প্রতিসাম্য দ্বারাই এর শ্রেণিবিভাজন করা হয়। জ্যামিতিকভাবে এ রকম ৩২ রকম প্রতিসাম্য সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে বাইরের অবয়ব থেকে প্রতিসাম্য ধরা পড়ে। তবে কেলাসিত রূপের বিস্তারিত গঠন জানতে হলে ক্রিস্টালোগ্রাফি বা কেলাসবিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়– বিশেষ করে কেলাসের এক্স-রে ছবিভিত্তিক উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ার। জড়বস্তু ছাড়াও প্রোটিন, ডিএনএ প্রভৃতি বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল জৈব বস্তুর বিস্তারিত গঠন উদ্‌ঘাটন এভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত ভৌত গুণাগুণের অনেক কিছু তার কেলাসিত রূপের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হীরা আর গ্রাফাইট একই কার্বন-পরমাণুতে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু কেলাস গঠনের পার্থক্যের কারণে হীরা সকল বস্তুর মধ্যে কঠিনতম, অথচ গ্রাফাইট খুবই নরম। যে সকল বৈদ্যুতিক গুণের কারণে সিলিকনের মতো সেমিকন্ডাক্টর আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে বিরাট ভূমিকা রাখছে, তা অনেকাংশে এর কেলাস গঠনের উপর নির্ভরশীল। এভাবে বস্তুর যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, তাপীয় কিংবা আলোক-গুণ তার কেলাস গঠনের ওপর নির্ভর করে। আবার কেলাসের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরও এসব গুণ যথেষ্ট নির্ভর করে, যেমন অনেক বস্তুর রঙ, নমনীয়তা, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ইত্যাদি।

মু. ই.

কেসিন (casein)

কেসিন দুধের অন্যতম আমিষ অংশ। সাধারণত দুধে এটি কেসিনোজেন (caseinogen) হিসাবে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মূলত এই কেসিন নামক আমিষের কারণেই দুধ এত পুষ্টিকর। ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে কেসিন এক ধরনের অদ্রবণীয় পদার্থ তৈরি করে। এই পদার্থের নাম ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেট (calcium paracaseinate)। অদ্রবণীয় এই পদার্থটি খুব সহজেই তলানি হিসাবে জমা পড়ে। মুখ্যত এই ক্যালসিয়াম প্যারাকেসিনেটের বৈগুণ্যে দুধ থেকে দই, পনির বা অন্যান্য জমাটবদ্ধ দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব হয়। দুধ পানের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জমাট বাঁধার কারণ হল রেনিন (rennin) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ। পাকস্থলীসংলগ্ন বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে এই রেনিন নিঃসৃত হয়। এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিক কেসিন থেকে উৎপন্ন করা হয়। এর নাম কেসিন-প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিককে বোতাম, সেলাইয়ের সুচ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। আট হাজার গ্যালন দুধ থেকে এক টন কেসিন পাওয়া যায়।

ত. চ.

কোক (coke)

কার্বন মৌলের বহু রূপের একটি। শক্ত ধূসর পদার্থ। প্রাকৃতিক বা খনিজ কয়লাকে চূর্ণ করে বায়ুশূন্য চুল্লিতে উত্তপ্ত করলে কোক পাওয়া যায়। বায়ুশূন্য চুল্লিতে উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে বলে অন্তর্ধূম পাতন। এভাবে পাতনের ফলে পানি, বাষ্প, কোলটার এবং গ্যাসকার্বন উৎপন্ন হয়। আর অনুদ্বায়ী যে কঠিন পদার্থ নিচে পড়ে থাকে তাই কোক। কোক অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট বা রন্ধ্রবহুল কার্বনপিণ্ড। এর মধ্যে ৮৭% থেকে ৯০% বিশুদ্ধ কার্বন থাকে।

কোকের প্রকৃতি পাতনপ্রক্রিয়ার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। কম উষ্ণতায় পাতন করলে যে কোক পাওয়া যায় তাকে বলে নরম (soft) কোক এবং উচ্চ তাপমাত্রায় যে কোক পাওয়া যায় তাকে বলে শক্ত (hard) কোক। পাতনপাত্রের অপেক্ষাকৃত শীতল দেয়ালে যে শক্ত কালো আস্তরণ পড়ে তা গ্যাসকার্বন।

শক্ত কোক ধাতু নিষ্কাশনে বিদারকরূপে ও জ্বালানি হিসাবে এবং নরম কোক গৃহস্থালি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

কোকিল (cuckoo)

Cuculiformes বর্গের পাখি কোকিলের বৈজ্ঞানিক নাম *Eudynamys scolapacen*। মিষ্টি ডাকের জন্যই কোকিল আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। সাধারণত বট-পাকুড় গাছে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ-কোকিলের গায়ের রঙ কালচে-নীলাভ, চোখ লাল। স্ত্রী-কোকিলের গায়ের রঙ বাদামি। তার ওপর ধূসর ও সাদার আঁকিবুকি রয়েছে। ঠোঁট অনেকটা সবুজ।

কোকিল নিজে বাসা বানায় না। অন্যান্য পাখির বাসায়, বিশেষ করে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কাক যাতে বুঝতে না পারে সে জন্য অনেক সময় কোকিল ডিম পেড়ে কাকের ডিম নিচে ফেলে দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে কাক নিজের বাচ্চা মনে করে কোকিলের বাচ্চার যত্ন নেয়। বাচ্চা যথেষ্ট বড় হলেই কেবল কাক তাদের চিনতে পারে এবং বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোকিলের বাচ্চা ততদিনে উড়তে শিখে যায়।

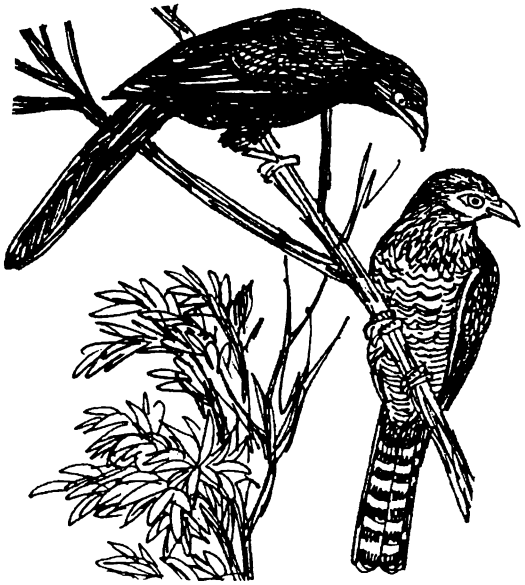

স্ত্রী-কোকিল ও পুরুষ-কোকিল

কোকিলের প্রধান খাদ্য বট-পাকুড়সহ বিভিন্ন গাছের ফল। তবে অনেক সময় এরা কীটপতঙ্গও খেয়ে থাকে। এরা একা একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা দলবদ্ধভাবেও বাস করে। রাতে পুরুষ-কোকিল প্রহরে প্রহরে কিংবা অন্যান্য পাখির সঙ্গে গলা মিলিয়ে মিহি সুরে 'কুহু কুহু' বলে ডাকে। স্ত্রী-কোকিল কোনো কারণে পালাবার সময় 'কিক কিক' শব্দ করে ডাকে, অন্য সময় সাধারণত চুপচাপ থাকে।

কোকিলকে অঞ্চলভেদে কুলি বা কালো কোকিল নামেও ডাকা হয়। এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম *Eudynamus scolopacsa*। এ ছাড়াও আরেক ধরনের কোকিল রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় সবুজ কোকিল (Rhopodytis tristis)। এক সময় বাংলাদেশে সবুজ কোকিল যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যেত, কিন্তু এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।

ফ. মা.

কোকেন (cocaine)

কোকা (ইরিথ্রোজাইলাম কোকা) গাছের কচি পাতা থেকে সংগৃহীত নির্যাস প্রক্রিয়াজাত করে কোকেন

পৃথক করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপত্যকার ইনকা আদিবাসীদের জানা ছিল যে কোকা পাতা চিবিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে কষ্ট হয় না। এটিকে তারা 'স্বর্গীয় উদ্ভিদ' মনে করত। পেরু ও বলিভিয়াতে কোকা গাছের চাষ সবচাইতে বেশি হয়। কোকা পাতা থেকে প্রথম কোকেন সংগ্রহ করা হয় ১৮৬০ সালে।

কোকেনই প্রথম 'স্থানিক অবেদনিক' (local anaesthetic) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভিয়েনাবাসী বিজ্ঞানী কার্ল কোলার ১৮৮৪ সালে প্রথম 'স্থানিক অবেদনের' কাজে কোকেন ব্যবহার করেন। প্রধানত শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে এবং চোখের অস্ত্রোপচারে অবেদনিক হিসাবে কোকেন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বিরূপ ক্রিয়া ও আসক্তির জন্য এখন কোকেনের বদলে অন্যান্য নতুন ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কোকেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতর কেন্দ্র উদ্দীপ্ত করে যে সুখানুভূতির সৃষ্টি করে তার ফলে কোকেন ব্যবহারকারী ক্রমেই ঔষধটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। হেরোইনের মতো কোকেনের মাদকাসক্তিও এখন বিশ্বে যথেষ্ট ব্যাপক। সে জন্য কোকেন ব্যবহার রোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে কোকেনের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ করার।

সি. না. হ.

কোকো (cocoa)

কাকাও (Cacao) বা থিওব্রোমা কাকাও (Theobroma cacao) গাছের ফসল। কোকো থেকে চকোলেট ও কোকো মাখন উৎপন্ন হয়। নানা রকম ঔষধ আর প্রসাধন দ্রব্য তৈরির কাজেও কোকো ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও আইসক্রিম, রুটি, পুডিং, পানীয়সহ বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবারের সুগন্ধ বাড়ানোর জন্য কোকোর প্রয়োজন অপরিহার্য। এই রকম নানাবিধ চাহিদার কারণে কোকো এখন অর্থকরী ফসল হিসাবে পরিগণিত হয়।

কোকো ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এর গাছ চিরসবুজ। এটি ঘন ডালপালা ছড়িয়ে ৭.৫ মিটার বা ২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর কাণ্ড ও শাখার বাকলে গুচ্ছ গুচ্ছ

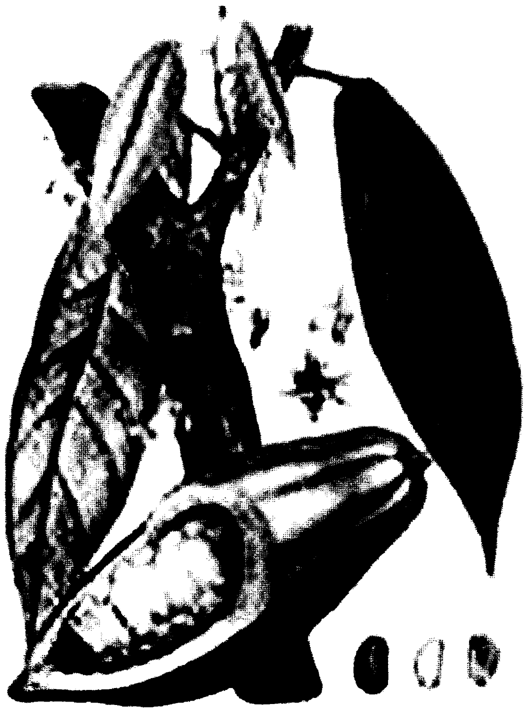

কোকো ফল, পাতা ও গাছ

গোলাপি-হলুদ রঙের ফুল ধরে। এ ফুলই ক্রমে ফলে পরিণত হয়। চার বছর বয়স থেকে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। ফল পাকতে ছয় মাস সময় লাগে। ফলের রঙ বাদামি। ফল ৩০ সেন্টিমিটার বা ১ ফুট লম্বা এবং ১০ সেন্টিমিটার বা ৪ ইঞ্চির ওপর পুরু হয়। ফলের বাইরের দিকে চামড়ার মতো শক্ত আবরণ থাকে। প্রতিটি ফলে ২০ থেকে ৩০টিরও বেশি বীজ হয়। বীজগুলো প্রথমে কলাপাতার মধ্যে দিয়ে গাঁজানো হয়। পরে প্রয়োজন মতো রোদে শুকিয়ে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ালেই পরিষ্কার একটি শাঁস পাওয়া যায়। এই শাঁসকে বলা হয় কোকোনিব। কোকোনিবের গুঁড়োই কোকো পণ্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

কোকোর খাদ্যমূল্য বেশ উঁচুমানের। এতে প্রায় ৪০% কার্বোহাইড্রেট, ৩৭% স্নেহ পদার্থ, ১৮% প্রোটিন, ৬% অজৈব লবণ, ২% থিওব্রোমিন নামক উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) ও অল্প পরিমাণে পানি, জৈব তন্তু এবং ক্যাফিন নামক উপক্ষার থাকে।

কোকো গাছের জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকা হলেও পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া, কঙ্গো

প্রভৃতি দেশ সমগ্র বিশ্বের মোট চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ কোকো সরবরাহ করে। এ ছাড়া মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি প্রভৃতি দেশেও ব্যাপকভাবে কোকোর চাষ হয়।

সুজ. ব.

কোণ (angle)

একটি ঘরে সাধারণত চারটি দেয়াল থাকে। চারটি দেয়াল এমনভাবে তোলা হয় যে দু'টি দেয়ালের দু'টি ধার বা প্রান্ত একত্রে মিলে একটি করে মোট চারটি কোণ তৈরি হয়। ফুটবল খেলার মাঠে চারটি কোণ থাকে এবং ফুটবল খেলায় কোণের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় প্রয়োজনে কোণ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। গণিতের জ্যামিতি অংশে কোণ একটি প্রাথমিক আলোচনার বিষয়।

কোণ হল দু'টি রেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হলে অথবা দু'টি তলের দু'টি ধার বা প্রান্ত সংযুক্ত করলে তাদের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান। রেখার শুধু দৈর্ঘ্য আছে বলে দু'টি রেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হয় আর তলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই আছে বলে দু'টি তলের দু'টি প্রান্ত একটি রেখায় মিলিত হয়। অর্থাৎ একটি বিন্দু থেকে দু'টি রেখা আঁকলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা-ই কোণ। যেমন AB ও AC রেখা দু'টি A বিন্দুতে মিলিত হলে বলা যায় A বিন্দুতে কোণ তৈরি হয়েছে। কোণের চিহ্ন <। চিত্রের কোণটিকে লেখা যায় <BAC বা <CAB। A বিন্দুতে <BAC বা <CAB-এর মান সব সময় এক; AB বা AC বাহুকে অনেক দূর পর্যন্ত একই সরলরেখায় বাড়ালে কোণের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

কোণকে ডিগ্রিতে অথবা রেডিয়ানে (বৃত্তীয় পরিমাপ) পরিমাণ করা হয়। একটি রেখা কোনো একটি প্রারম্ভিক অবস্থানের সাপেক্ষে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অবস্থানের পরিবর্তন করলে বিভিন্ন কোণের সৃষ্টি হয় এবং এ থেকে কোণ পরিমাপ করা যায়। নব্বই ডিগ্রি (৯০°) মানের কোণকে সমকোণ, এর চেয়ে ছোট মাপের কোণকে সূক্ষ্মকোণ আর বড় মাপের কোণকে স্থূলকোণ বলে।

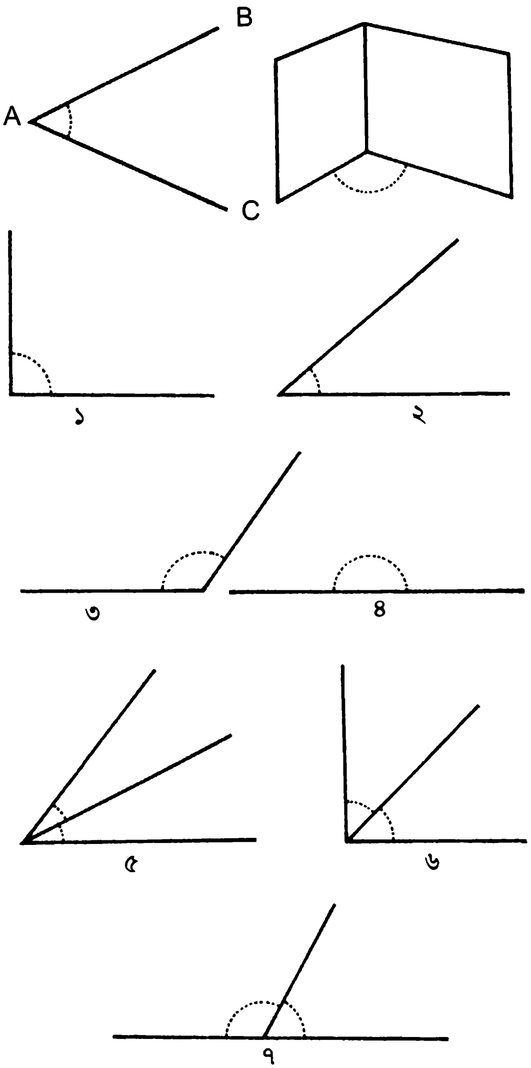

কোণ *১. সমকোণ, ২. সূক্ষ্মকোণ, ৩. স্থূলকোণ, ৪. সরলকোণ, ৫. সন্নিহিত কোণ, ৬. পূরক কোণ, ৭. সম্পূরক কোণ*

কোণের মান ১৮০° হলে তাকে সরলকোণ বলে। দু'টি কোণের একটি সাধারণ বাহু থাকলে কোণ দু'টিকে সন্নিহিত কোণ বলে। দু'টি সন্নিহিত কোণের মান ৯০° হলে একটিকে অপরটির পূরক কোণ বলে। দু'টি সন্নিহিত কোণের মান ১৮০° হলে একটিকে অপরটির সম্পূরক কোণ বলে।

হো. আ.

কোপার্নিকাস [১৪৭৩-১৫৪৩]

ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) পৃথিবীকে পরিক্রমণশীল গ্রহ হিসাবে দেখিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের আধুনিক ধারণা প্রবর্তন করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এটি ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

কোপার্নিকাস ১৪৭৩ সালে পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ক্রাকভ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর তিনি পোল্যান্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মযাজকের পদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যেই তিনি ইতালিতে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কোপার্নিকাস অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ও এ বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থটির জন্য, যার নাম 'জ্যোতিষ্ক গোলকসমূহের পরিক্রমণ সম্পর্কে'। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি সৌরজগৎ বিষয়ে তাঁর নতুন মতবাদগুলো অকাট্য যুক্তিতে সন্নিবেশিত করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৫৪৩ সালে।

প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থিরভাবে স্থাপন করেই জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রিক পণ্ডিত টলেমি বিস্তারিত জ্যামিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই ভূকেন্দ্রিক চিত্রকে নিখুঁত বলে প্রতীয়মান করে রেখেছিলেন হাজার বছর ধরে। কোপার্নিকাসই প্রথম এ চিত্রের দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেন এবং সত্যিকার গতি ও আপাতগতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি দেখান কীভাবে পৃথিবীর আবর্তন-পরিক্রমণের ভিত্তিতে অন্য জ্যোতিষ্কগুলোর আপাতগতিকে অনেক সহজ একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে পরে গ্যালিলেওর দুরবিন সহকারে পর্যবেক্ষিত সিদ্ধান্তগুলো, কেপলারের গ্রহ সম্পর্কীয় নিয়ম ও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন এ

মতবাদ মোটেই গ্রাহ্য হয় নি। বরং শক্তিশালী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষসহ সব মহল একে উদ্ভট ও ধর্মদ্রোহী মতবাদ হিসাবে নিন্দা করেছে।

মু. ই.

কোয়ান্টাম তত্ত্ব (quantum theory)

পরমাণু বা অ্যাটম ও সাব-অ্যাটমিক বা অবপারমাণবিক জগতের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ১৯০০ সালে কৃষ্ণকায় বস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করার সময় জার্মান বিজ্ঞানী মাক্স প্লাঙ্ক প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা প্রকাশ করেন। কোনো শক্তির বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয় না, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ (energy packet) হিসাবে নির্গত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছকে বলা হয় কোয়ান্টাম। যেমন আলোর কোয়ান্টাম হল ফোটন।

১৯০৫ সালে আলোকতড়িৎক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সময় আইনস্টাইন দেখালেন, বিকিরণ শুধু নির্গত হবার সময় কোয়ান্টাম আকারে নির্গত হয় না, বরং স্থানান্তর গমনের সময়ও (propagation) গুচ্ছাকারেই গমন করে। পরবর্তী কালে নীলস্ বোর পরমাণু-মডেল তৈরি করার সময় লক্ষ করলেন, বস্তুকণা মাত্রই স্থির (stable)

অবস্থায় যেখানে সেখানে থাকে না, বরং সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তর বা কোয়ান্টাম স্তরে থাকে।

এভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদানে এই শতকের প্রথম দিকে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বিশ শতকে লুই দ্য ব্রগ্‌লির কণাতরঙ্গ দ্বৈতবাদ, শ্রয়েডিংগারের তরঙ্গসমীকরণ, ডিরাকের সমীকরণ, ম্যাক্স বর্নের পরিসংখ্যান, সর্বোপরি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূচনা করে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি প্রচলিত নিউটনীয় ধ্যানধারণার বিপরীতে সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচন করে দেয় । এই অনিশ্চয়তার নীতির জন্য আইনস্টাইনের মতো অনেক বিজ্ঞানী প্রথমে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বর্তমানে সাব-অ্যাটমিক স্কেলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, বরং কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে ইলেকট্রনিক্সের বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

প্রকৃতিজগতের চারটি বলের মধ্যে অভিকর্ষ ছাড়া বাকি তিনটিরই কোয়ান্টাম তত্ত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যাতে অভিকর্ষের একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়। তা হলে প্রকৃতিজগতের চারটি বলকেই একটি মাত্র সমীকরণ দ্বারা প্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীদের আছে তার একটি বড় ধাপ পূরণ হবে।

মু. হা.

কোয়ার্জ (quartz)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ শিলা, যার কয়েকটি রূপ মূল্যবান রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পক্ষেত্রেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কেলাসিত রূপেই সাধারণত কোয়ার্জ পাওয়া যায়। রাসায়নিকভাবে এটি সিলিকন ডাই-অক্সাইড বালি বা মাটির মতোই। কেলাস গঠনই কোয়ার্জকে তার বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। কেলাসে সামান্য অপদ্রব্য হিসাবে যদি স্বল্প অনুপাতে এর সঙ্গে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পরমাণু মেশানো থাকে, তা হলে তা মূল্যবান রত্নপাথর বেগুনি রঙের এমেথিস্ট-এ পরিণত হয়।

কোয়ার্জ খুব শক্ত একটি বস্তু। এর গলনাঙ্ক অনেক বেশি। উত্তাপে এর আয়তনও বাড়ে খুব কম, দ্রুত ঠাণ্ডা করলে ফেটেও যায় না। এসব কারণে উচ্চ উত্তাপের কাজের জন্য কাচপাত্রের বদলে কোয়ার্জপাত্র ব্যবহার করা হয়। আলোকবিদ্যার মূল্যবান কিছু লেন্স ইত্যাদি কোয়ার্জ দিয়ে তৈরি হয়। কোয়ার্জের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর পিয়েজোইলেকট্রিক গুণ। এর ফলে পাতলা করে কাটা কোয়ার্জপাতের দু'পাশে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এর এক পাশে ধনাত্মক ও অন্য পাশে ঋণাত্মক বিদ্যুৎবিভবের সৃষ্টি হয়। আবার টানে রাখলে ঠিক বিপরীতটি ঘটে। ফলে যান্ত্রিকভাবে কোয়ার্জকে কাঁপানো হলে এতে পরিবর্তী বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়, যার পর্যাবৃত্তিহার কোয়ার্জের আকার আকৃতির উপর নির্ভর করে। একইভাবে পরিবর্তী বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করলে কোয়ার্জ যান্ত্রিক কম্পন লাভ করে থাকে। বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টিকারী যন্ত্রে ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দনহার নিয়ন্ত্রক অংশ হিসাবে তাই কোয়ার্জের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ঘড়ি, রেডিও ট্রান্সমিটার, রেডার ইত্যাদি অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রে কোয়ার্জের এই ব্যবহার হয়ে থাকে।

মু. ই.

কোয়ালা (quala)

কোয়ালা এক ধরনের মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী প্রাণী। দেখতে 'অনেকটা বিড়ালের মতো। কোয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মারসুপিয়ালিয়া (Marsupialia) উপ-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এরা ক্যাঙারুর সমগোত্রীয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল, এ জাতীয় প্রাণীর স্ত্রীদের পেটের চামড়া ভাঁজ হয়ে থলের মতো

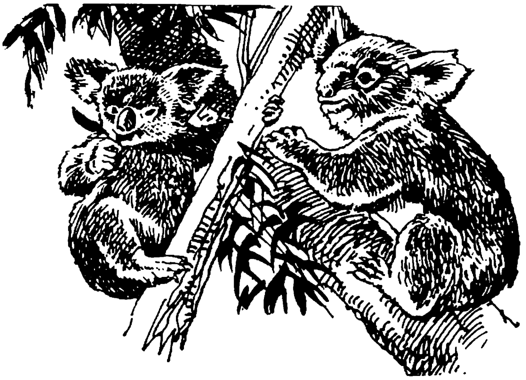

একটি অঙ্গ সৃষ্টি করে। একে ইংরেজিতে মারসুপিয়াম (marsupium) বলে। মারসুপিয়াম থাকার কারণেই এদের মারসুপিয়ালিয়া বলা হয়। এদের স্তনগ্রন্থি মারসু-পিয়ামের ভেতর অবস্থান করে। বাচ্চা জন্মানোর পর পরই মারসুপিয়ামের ভেতর চলে যায় এবং অনবরত মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে।

কোয়ালার মাথা অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি। এদের কান বেশ লম্বা এবং দীর্ঘ লোমযুক্ত। পায়ে নখরবিহীন থাবা রয়েছে, যা এদের গাছপালায় চলাফেরা করতে সাহায্য করে। কোয়ালার চোখ দুটো বড় বড়। এরা প্রধানত গাছে থাকে। তবে মাঝে মাঝে এদের মাটিতে নেমে আসতে দেখা যায়। এরা নিশাচরও বটে। রাতে এরা গাছের ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করে। এরা প্রধানত উদ্ভিদভোজী। গাছের পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য। তবে খিদে পেলে কোয়ালা বিস্কুটও খায়।

প্রতি প্রজনন মৌসুমে কোয়ালা একটি করে বাচ্চা দেয়। পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোয়ালাশিশু মায়ের পেটের থলিতেই বাস করে। মা-কোয়ালা নিজের পেটের থলিতে রেখে সন্তানকে নানা ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। কোয়ালার বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।

ত. চ.

কোয়াশিওরকর (kwashiorkor)

অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ শিশু নানা রকম অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। এ সকল অপুষ্টিজনিত সমস্যার মধ্যে প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত অপুষ্টিই (protein energy malnutrition) প্রধান রোগ। প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত অপুষ্টি মূলত দু' রকমের কোয়াশিওরকর (kwashiorkor) এবং ম্যারাসমাস (marasmas)। গ্রামবাংলায় শিশুদের ওপর ১৯৮১-৮২ সালে পরিচালিত এক পুষ্টি-জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের শতকরা ১৬ জন শিশু প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। এদের মধ্যে কোয়াশিওরকরে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

যে সকল শিশু যথেষ্ট শর্করা জাতীয় খাবার খায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন জাতীয় খাবার পায় না তারাই কোয়াশিওরকরে আক্রান্ত হয়। সাধারণত দুই বছরে পা দিলে মায়ের দুধ ছেড়ে, অন্যান্য খাবার খাওয়া শুরু করার সময় যথেষ্ট প্রোটিন খাদ্য না পেলে শিশু কোয়াশিওরকর রোগে আক্রান্ত হতে পরে।

কোয়াশিওরকর রোগে আক্রান্ত শিশুরা

তা ছাড়া শৈশবে ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের রোগ ইত্যাদি হলে পুষ্টির অভাব আরো প্রকট হয়। শিশুর পরিবারে আর্থিক দারিদ্র্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাও এ রোগের কারণ হিসাবে বিবেচ্য।

কোয়াশিওরকর রোগে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং শিশু কোনো কিছুতে সহজে মনোযোগ দেয় না। এ রোগের ফলে শিশুর ত্বক ও চুল বিবর্ণ হয়ে যায়। তা ছাড়া শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে দেহে শোথ বা পানি জমে যায়। যকৃতে চর্বি জমে এবং তা আকারে বৃদ্ধি পেতে পারে। অগ্ন্যাশয়, লালাগ্রন্থি এবং আন্ত্রিক গ্রন্থিসমূহে গোলযোগ দেখা দিতে পারে।

সা. এ.

কোয়াসার (quasar)

মহাকাশে এমন কিছু গ্যালাক্সি বা তারকাপুঞ্জ আছে, যার মাঝখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প এলাকা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। এগুলোকে বলা হয় কোয়াসার, যে নামটি কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স (quasi-stellar radio source) কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রধানত আলোক ও রেডিও-তরঙ্গ হিসাবে শক্তি কোয়াসার থেকে নির্গত হয়। এসব আমাদের কাছে পৌঁছতে এক শ' কোটি বছর লেগে যায় এমন দূরত্বে থাকা কোয়াসারকেও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো বলতে গেলে মহাবিশ্বের এক কিনারায় অবস্থিত। দূরবর্তী কোনো উৎস থেকে আসা বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘতর হবার দিকে সরে যেতে থাকলে (লাল সরণ) বোঝা যায় যে উৎসটি ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কোয়াসারের ক্ষেত্রে এটি এতই প্রকট যে এ থেকে মনে হয় কোয়াসারের দূরে সরে যাবার গতি আলোর গতির কাছাকাছি, যা আশ্চর্যজনক।

কোয়াসার প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট পালামোরে অবস্থিত বৃহৎ দূরবীক্ষণে। তখন থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। কোয়াসারের বিকীর্ণ শক্তির বিস্ময়কর প্রচণ্ডতার কারণ সম্পর্কে নানা অনুমান বিজ্ঞানীরা করে থাকেন। এর মধ্যে একটি অনুমান হল, কোয়াসারের মাঝখানের বস্তুপুঞ্জ বৃহদাকার ব্ল্যাক হোলের (কৃষ্ণবিবর) মধ্যে গিয়ে পড়ার কারণেই এই বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়।

মু. ই.

কোয়েল (quail)

কোয়েল (বাংলায় বটের) Calliforunes বর্গের পাখি। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর সবখানেই আছে। বিশ্বে কোয়েলের প্রজাতিসংখ্যা ১৩০। বাংলাদেশে আছে দুটো, তাও বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। ওদের নাম বটের (Coturnix coromoudelica) ও ধূসর বটের (C. coturunix)। কোয়েল গোলগাল, ছোটখাটো পাখি। লেজ ছোট, ঘাড় খাটো। প্রজাতিভেদে লম্বায় ১২-৩০ সেমি। স্ত্রী-পুরুষ আলাদা রঙের। পুরুষগুলোই সুন্দর। এরা সাধারণত ধূসর বা বাদামি। তাতে লালচে-বাদামি, নীল, সাদা, কালো ডোরা। স্ত্রীগুলো সাধারণত বাদামি, তামাটে বা ধূসর। আবাস-এলাকার পরিবেশের সঙ্গে এদের গায়ের রঙ মিলেমিশে যায়। চীনা রঙিন কোয়েল ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। মাত্র ১২ সেমি লম্বা। ওজন ৪৫ গ্রাম। পাহাড়ি কোয়েল বৃহত্তম। ২৭-৩০ সেমি লম্বা। ওজন ২৩০ গ্রাম।

কোয়েল ঝোপঝাড়পূর্ণ খোলা মাঠে থাকতে ভালোবাসে। শস্যদানা, গাছের পাতা, শেকড়, পোকা-মাকড় খায়। মাটিতে বা ঝোপঝাড়ে খড়কুটো বিছিয়ে বাসা বানায়। সাধারণত বসন্তে আট থেকে বারোটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো নীল, খয়েরি ও বেগুনি ফোঁটাযুক্ত। মা-বাবা মিলে প্রজাতিভেদে ১৬-২১ দিন তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। একরত্তি বাচ্চাগুলো অত্যন্ত চঞ্চল।

কোয়েলের মাংস ও ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এদের শিকার করছে। এদের বেশ ক'টি প্রজাতিকে পোষ মানানো গেছে। বর্তমানে জাপানি কোয়েল সারা বিশ্বে খামারভিত্তিতে পোষা হচ্ছে। বাংলাদেশেও এদের খামার আছে। বছরে প্রতিটি স্ত্রী-কোয়েল ১০-১২ গ্রাম ওজনের ২৯০–৩০০ ডিম পাড়ে। ওজনে পুরুষগুলো ১৩০–১৪০ গ্রাম, স্ত্রীগুলো ১৪০-১৫০ গ্রাম। সদ্য-ফোটা বাচ্চাগুলো মাত্র সাত গ্রাম হয়। জন্মের পাঁচ সপ্তাহ পরেই এদের মাংস খাওয়ার উপযোগী হয়। মাত্র ৬–৭ সপ্তাহ বয়সে স্ত্রী-কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করে। একাধারে বছর খানেক ডিম পাড়ে। ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফোটাতে হয়।

আ. ন. ম. আ. র.

কোরাল মাছ (koral fish)

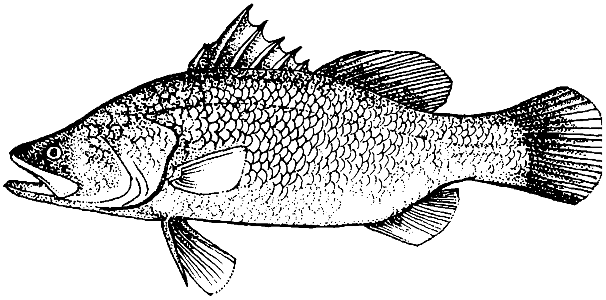

স্থানীয়ভাবে অনেকে Perciformes বর্গের এই মাছকে ভেটকি, কোরাল, কোরল, কুড়িল ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেন। এটি সামুদ্রিক মাছ। কোরাল মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Lates calcarifer*। আকার অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েও কোরাল মাছ অনেক বড়। বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে পার্চ জাতীয় যত মাছ আছে, তাদের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। লম্বায় দুই মিটার পর্যন্ত হতে পারে, তবে সাধারণত এক মিটারের চেয়ে বড় কোরাল মাছ খুব কমই পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক মাছের পিঠের দিক অনেকটা সবুজাভ-নীল (সবজেটে-নীল) বর্ণের। পেটের দিক অনেকটা রুপালি বর্ণের। কমবয়েসী মাছের দেহ অনেকটা জলপাই-বাদামি বর্ণের। এদের মাথার দৈর্ঘ্য দেহের মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। দেহের আঁইশ বেশ বড় বড় ও চিরন্যাকৃতির। পিঠে দুটো পাখনা আছে। প্রথমটি কাঁটাবহুল এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত কম কাঁটাযুক্ত। লেজ অনেকটা গোলাকৃতির, ছোট আকারের এবং কমবয়েসী কোরাল মাছ খাদ্যের সন্ধানে উপকূল এলাকায় আসে এবং প্রচুর খাদ্য খেয়ে সেখানে খুবই অল্পসময়ে বেশ বড় হয়ে ওঠে। সমুদ্র ছাড়াও স্বাদু জলেও মাঝে-মধ্যে কোরাল মাছ পাওয়া যায়। এটি অগভীর জলের মাছ। এরা সর্বভুক। বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি, শামুক এবং জলজ পোকা-মাকড় এদের প্রিয় খাদ্য। খাদ্যের অভাবে স্বজাতির মাছও খায়। প্রধানত শীতকালে উপকূলবর্তী এলাকায় ডিম পাড়ে। ডিম কিছুটা ভারী। কোরাল সুস্বাদু মাছ।

অ. ব.

কোষ-১ (cell)

প্রতিটি জীব এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ হল কোনো জীবের সংস্থানিক (স্ট্রাকচারাল) এবং বৃত্তিক (ফাংশনাল) একক শেষ আণুবীক্ষণিক। জীবদেহের এ গুরুত্বপূর্ণ এককের কাজ চালানোর জন্য রয়েছে বেশ কিছু অঙ্গাণু, যেমন– নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম, ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাজমা, মেমব্রেন, গল্গিবডিল এবং ভ্যাকুয়ল। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের কোষের কয়েকটি অঙ্গাণু এক রকম হলেও কয়েকটি অঙ্গাণু উদ্ভিদে রয়েছে কিন্তু প্রাণিদেহে নেই, যেমন– কোষপ্রাচীর এবং ক্লোরোপ্লাস্ট। কোষের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন– গোলাকৃতি, পঞ্চকোণী। উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কোষ দেখা যায়, যেমন– প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা, জাইলেম, ফ্লোয়েম। প্রাণীতে রক্তকোষ, স্নায়ুকোষ, শুক্রাণু, ডিম্বাণু ইত্যাদি। কোষ জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক। এক জীব থেকে পরবর্তী বংশধরে গুণাবলি সঞ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় ডিমসমূহ এ কোষের মধ্যে বিদ্যমান। জীববিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একখণ্ড কর্কের মধ্যে কোষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তার পর কোষ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকে। এ সকল তথ্য জানার ও বোঝার জন্য কোষবিদ্যা বিকাশ লাভ করে। কোষ কীভাবে বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে তা জানতে গিয়ে কোষকৌলিতত্ত্ব দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

শা. আ.

কোষ-২ (cell)

জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকর্মের ক্ষুদ্রতম এককের নাম কোষ, যা স্বাধীনভাবে জীবনক্রিয়া পরিচালনায় সক্ষম। দেহ অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। কোষের প্রধান দু'টি অংশ সাইটোপ্লাজম ও কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস)। সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে প্রাচীরের মতো রয়েছে কোষঝিল্লির বেষ্টনী। সাইটোপ্লাজম এক ধরনের সজীব পিচ্ছিল পদার্থ, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন– রিবোসোম (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আরএনএ), এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গল্‌গি অ্যাপারেটাস, মিটোকন্ড্রিয়া, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম ইত্যাদি।

কেন্দ্রক সাধারণত আকারে গোল, ঘনবদ্ধ উপাদান; প্রায়শ কোষের কেন্দ্রস্থলেই এর অবস্থান। এর আকার, আকৃতি ও অবস্থানে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রকের চারপাশে রয়েছে আবরক ঝিল্লি। কেন্দ্রকের প্রধান উপাদান ডিএনএ (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। কেন্দ্রকের ভেতরে এক বা একাধিক নিউক্লিয়োলাস (কেন্দ্রিক) অবস্থান করে।

কেন্দ্রকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ ধরনের আরএনএ সংশ্লেষণ, যা আবার বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রকে রয়েছে বংশগতির উপাদান ক্রোমোজোম, জীন ইত্যাদি। কেন্দ্রকটি সরিয়ে নিলে কোষের মৃত্যু ঘটে। বহুকোষী জীবের কোষ বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন কাজের হয়ে থাকে। যেমন– কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্নায়ুকোষ, আবরক কোষ, নিঃসারক কোষ ইত্যাদি।

১৬৬৫ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখান যে উদ্ভিদদেহ প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। কোষ শব্দটির ল্যাটিন অর্থও প্রকোষ্ঠ। এর পর হেনরি দুত্রোশেৎ, ইয়াকোব শ্লাইডেন (Jacob Schleiden), টেওডোর শভান্ (Theodor Schwann), রুডোল্‌ফ্ ফির্কোহ (Rudolf Virchow) প্রমুখ

উদ্ভিদকোষের আদর্শ নমুনা

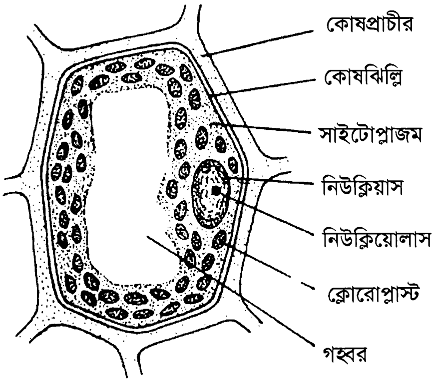

প্রাণিকোষের আদর্শ নমুনা

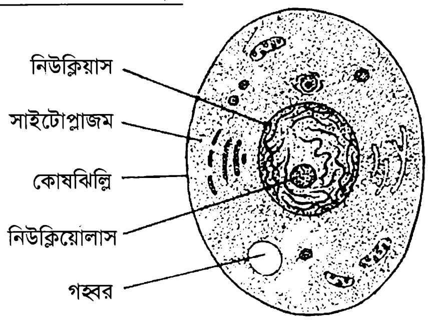

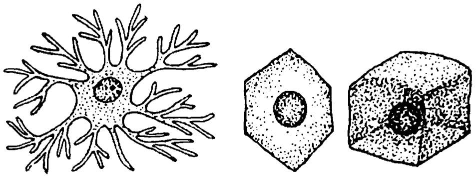

স্নায়ুকোষ আবরক কোষ নিঃসারক কোষ

বিজ্ঞানী কোষ সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। আর ১৮৩১ সালে রবার্ট ব্রাউন দেখান 'কোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রকের উপস্থিতি। এমনি করে ছোট্ট এই কোষের গবেষণার ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোষতত্ত্বের মতো বিজ্ঞানের উপশাখা।

রু. হা.

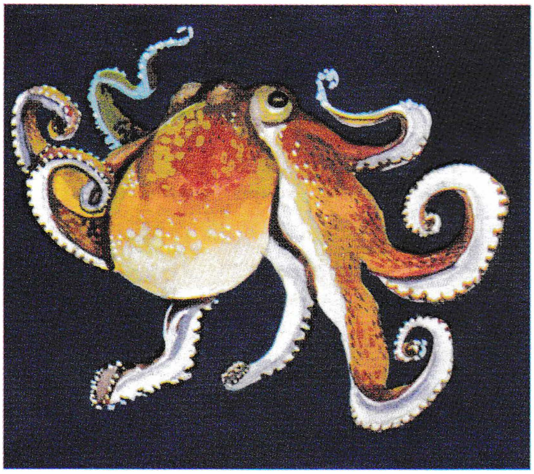

অক্টোপাস

www.boighar.com

অঙ্কুরোদ্‌গম

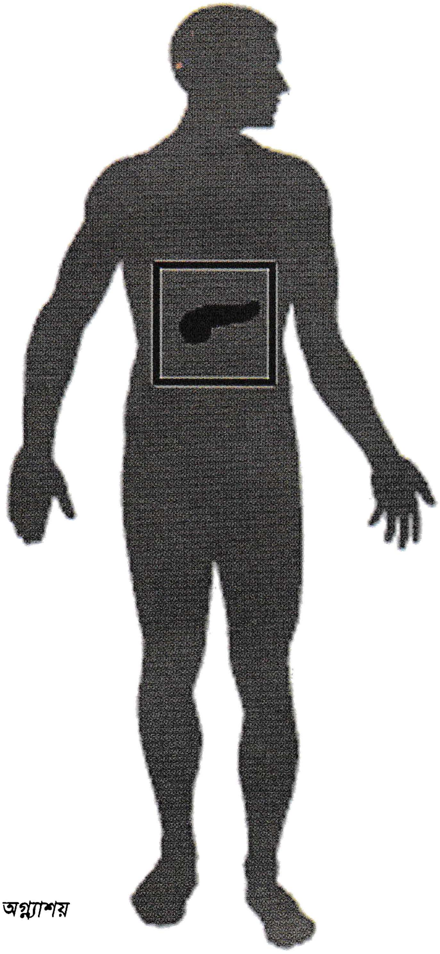

অগ্ন্যাশয়

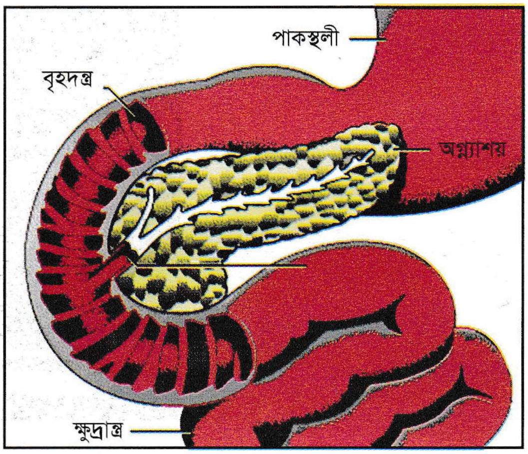

অপরাজিতা ফুল

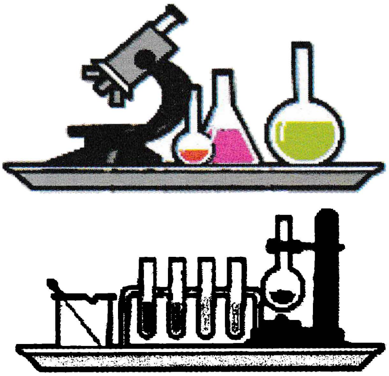

অণুবীক্ষণযন্ত্র
রক্ত পরীক্ষাসহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম
পরীক্ষা করা হয় এই যন্ত্রে

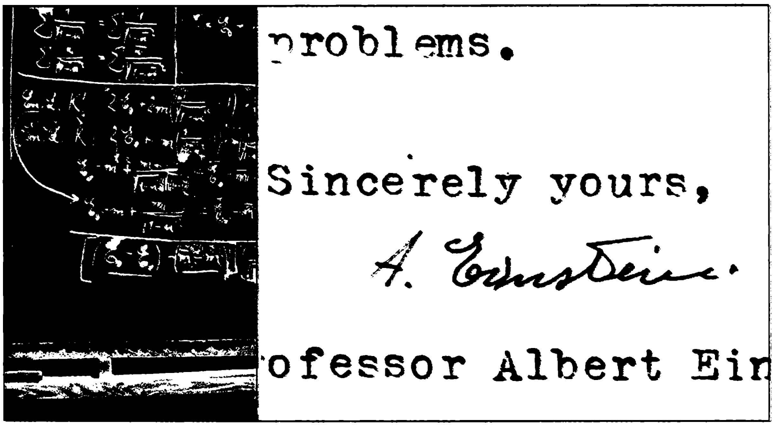

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের
অঙ্ক এবং পাশে তাঁর সই-
নিচের ছবিতে আলবার্ট আইনস্টাইন

আকাশ, মেঘ ও পাখি

আনারস

আণবিক চুল্লি

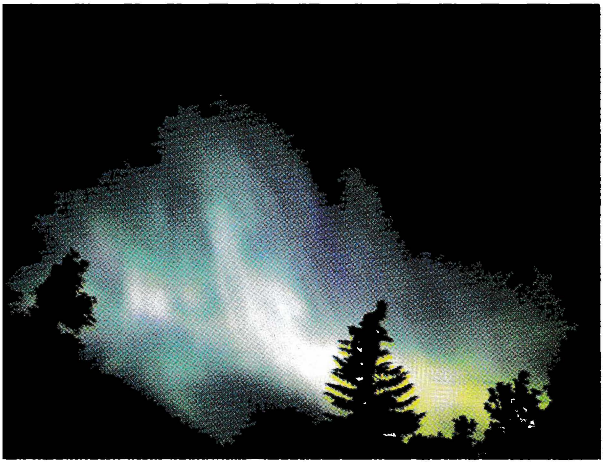

অরোরা বোরিয়ালিস

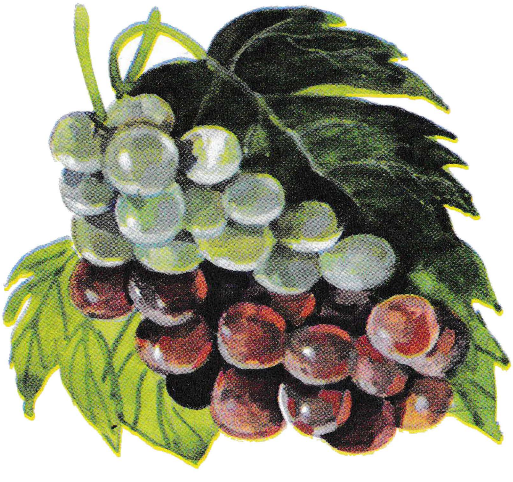

আঙুর

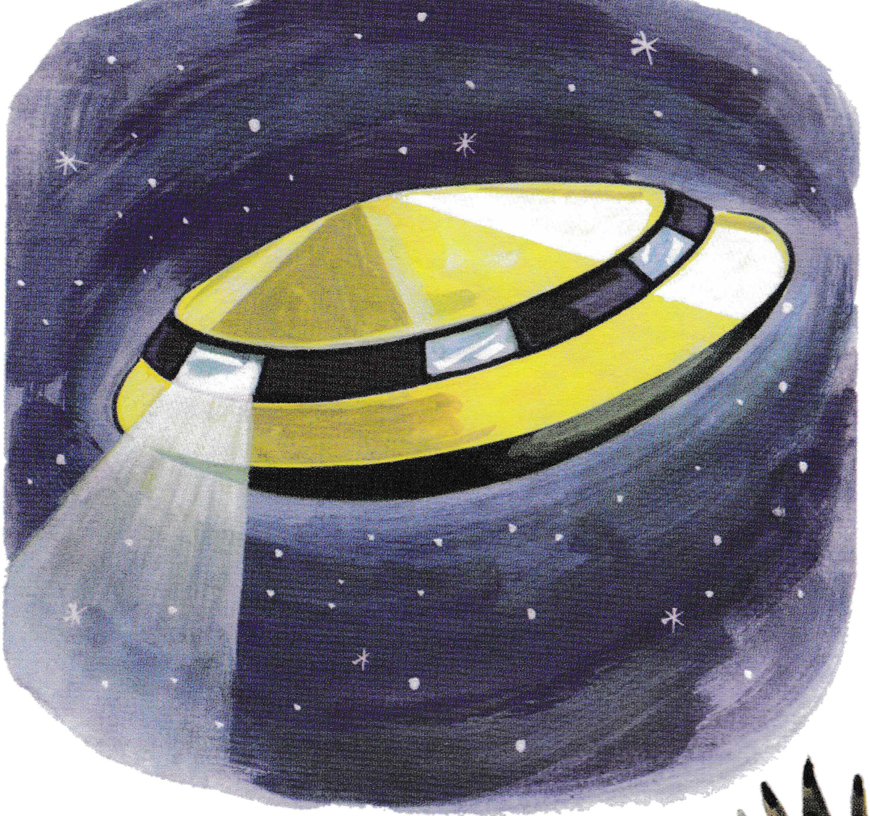

ইউএফও (অজানা উড়ন্ত বস্তু)

আদা

www.boighar.com

ঈগল

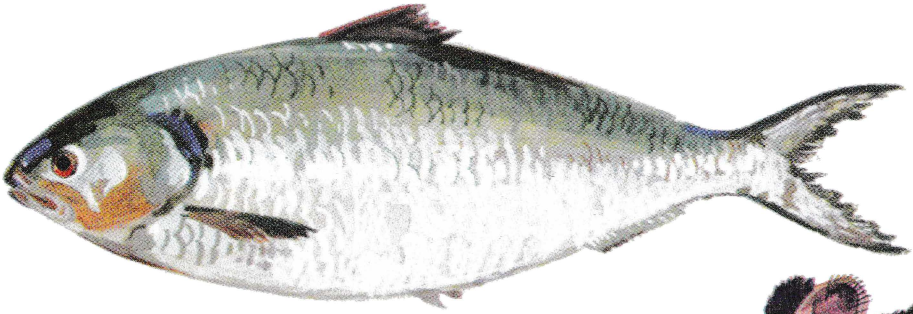

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ

ইঁদুর

ইগলু : এস্কিমোদের বরফের তৈরি ঘর

এস্কিমো : বল্লম দিয়ে শীল মাছ শিকার করছে

উইপোকার ঢিপি

উটপাখি
বর্তমান পৃথিবীতে বিরাট আকারের পাখি।
প্রচণ্ড বেগে দৌড়াতে পারে, কিন্তু উড়তে পারে না।
আফ্রিকা মহাদেশে বেশি দেখা যায়

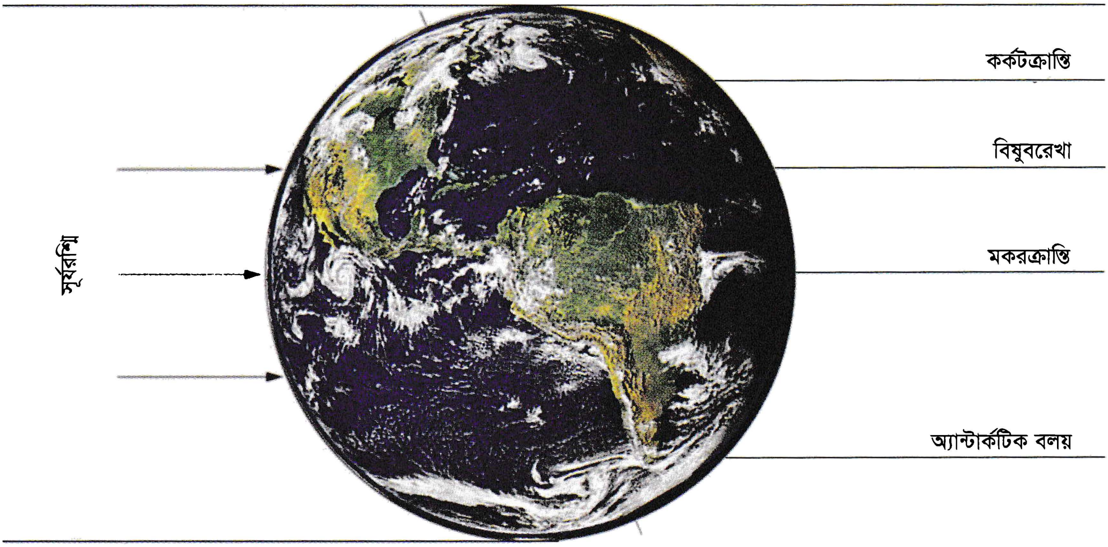

অক্ষরেখা, বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, সুমেরু বলয় ও কুমেরু বলয়

*পৃথিবী জুড়ে নানাবিধ উদ্ভিদ রয়েছে।
ছবি দু'টি পতঙ্গভুক উদ্ভিদের, ছোটখাটো
পোকা-মাকড় এরা হজম করে ফেলে*

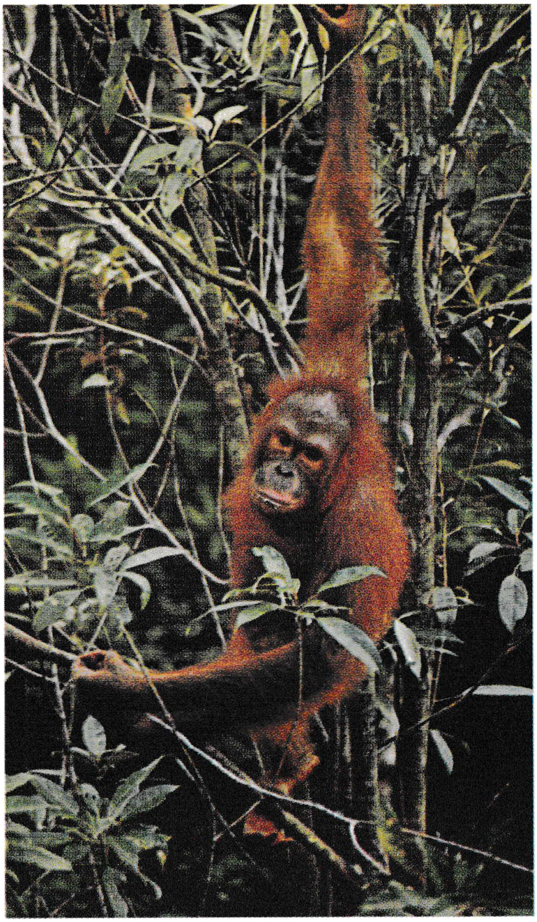

ওরাংওটাং বনমানুষ নামেও পরিচিত । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনাঞ্চল এদের বিচরণক্ষেত্র

উদ্‌বিড়াল   মাছ এদের প্রধান খাদ্য

উল্লুক বা গিবন

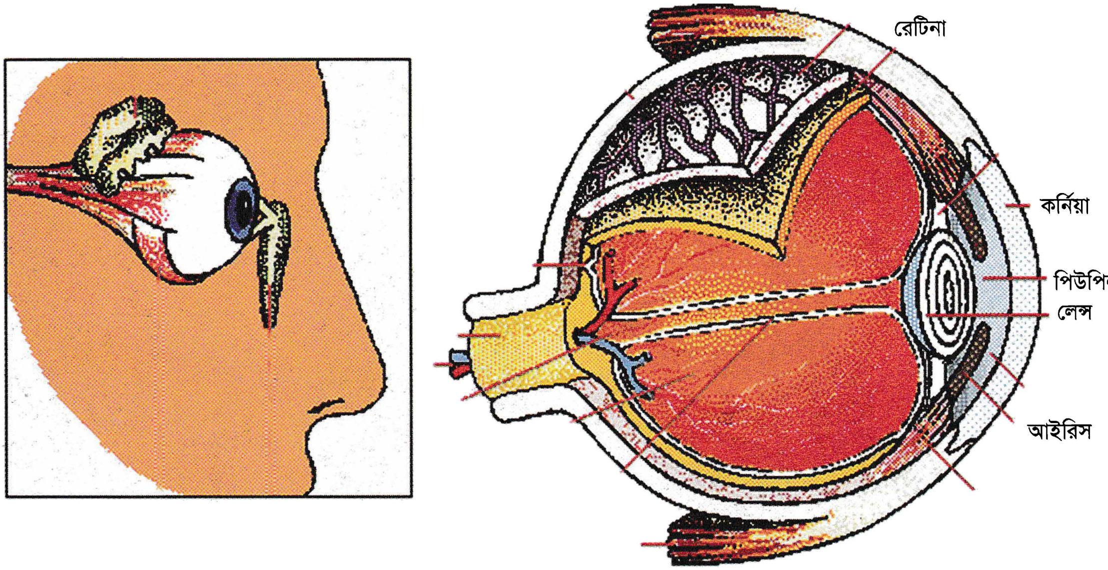

কর্নিয়া ও চোখের অন্যান্য অংশ

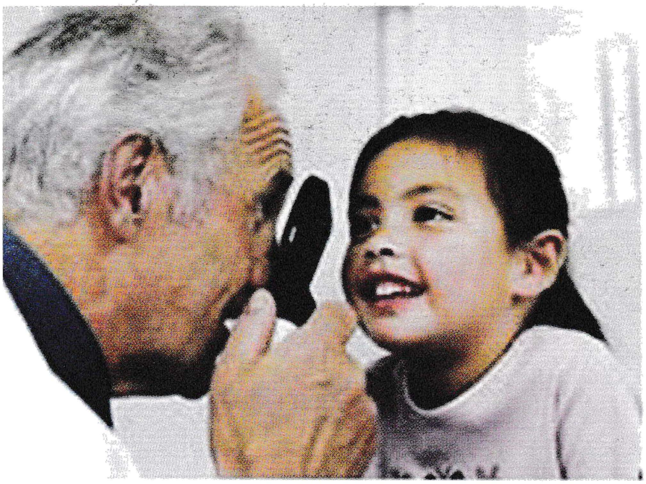

চোখ ও চক্ষুরোগ

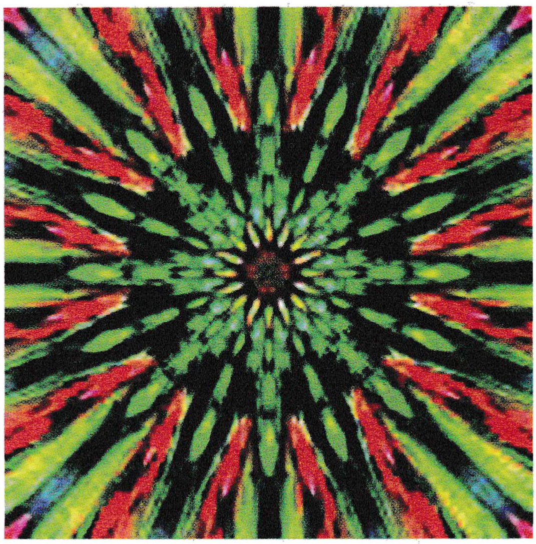

ক্যালেইডোস্কোপ

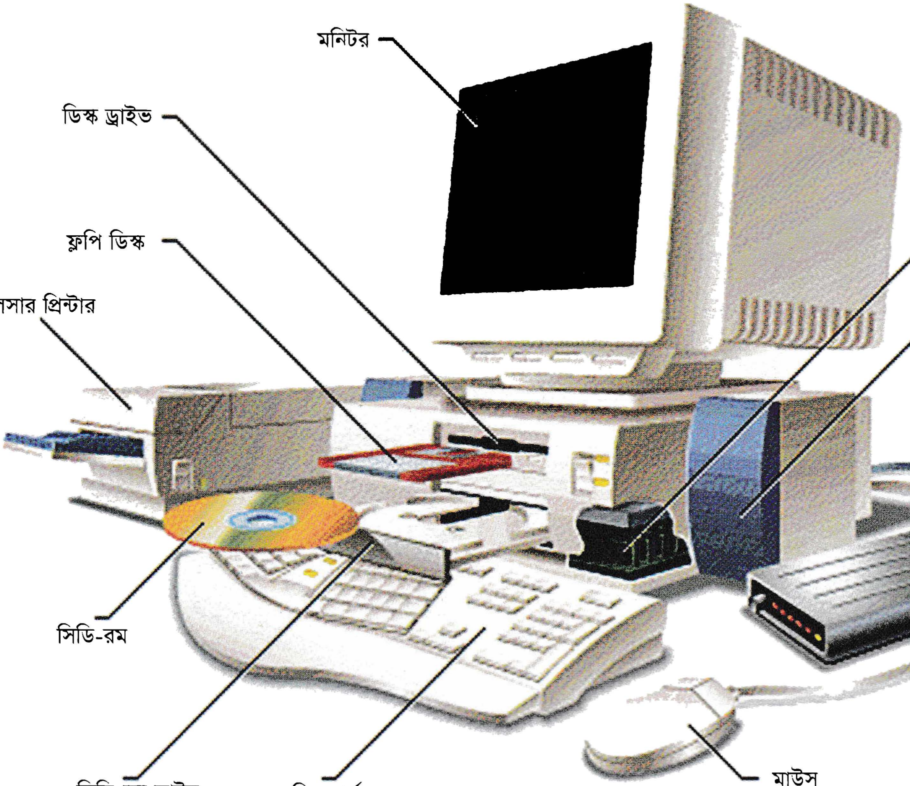

কম্পিউটারের ব্যবহার এখন সর্বত্র

কাঠবিড়ালি

কাঠঠোকরা

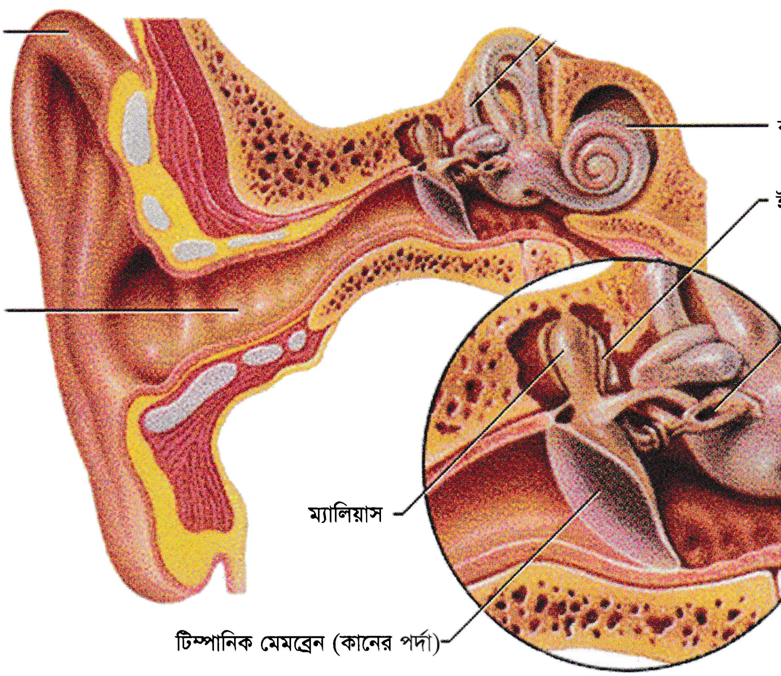

কর্ণ বা কানের বিভিন্ন অংশ

কাকাতুয়া

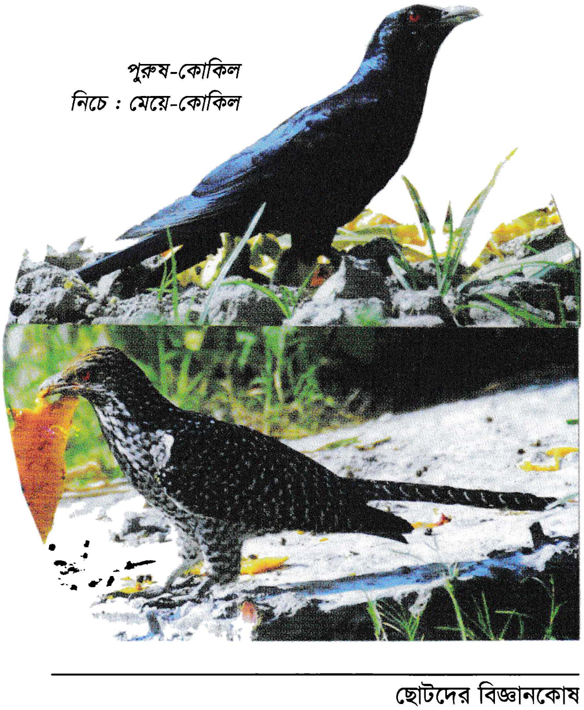

পুরুষ-কোকিল
নিচে : মেয়ে-কোকিল

কৃষ্ণচূড়া ফুল। গাছ বেশ বড় ও ছড়ানো

খেজুর গাছ থেকে মিষ্টি রস সংগ্রহের ব্যবস্থা

গরিলা

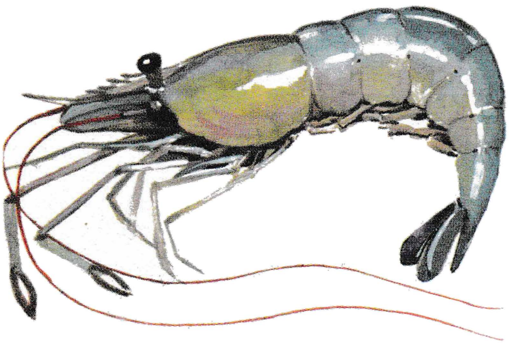

চিংড়ি

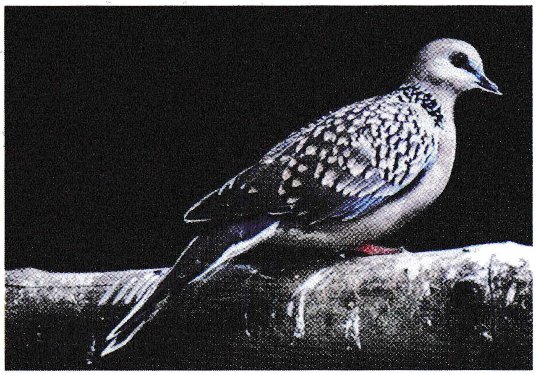

ঘুঘু– একে তিলাঘুঘু বলে

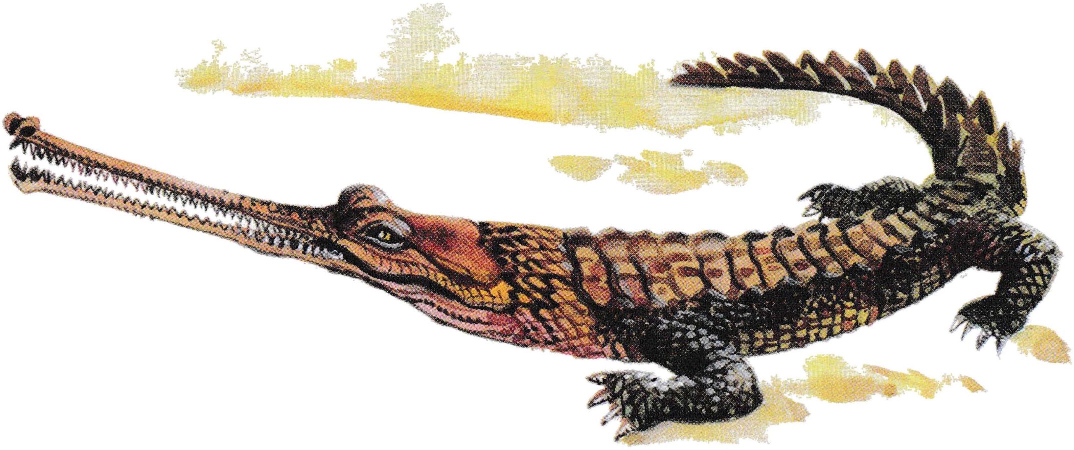

ঘড়িয়াল। সাধারণ মানুষ বলে মেছোকুমির। পদ্মা নদীতে আগে বেশ দেখা যেত।
মানুষের সচেতনতার অভাবে ঘড়িয়াল এখন অনেক কমে গিয়েছে

ছায়াপথ

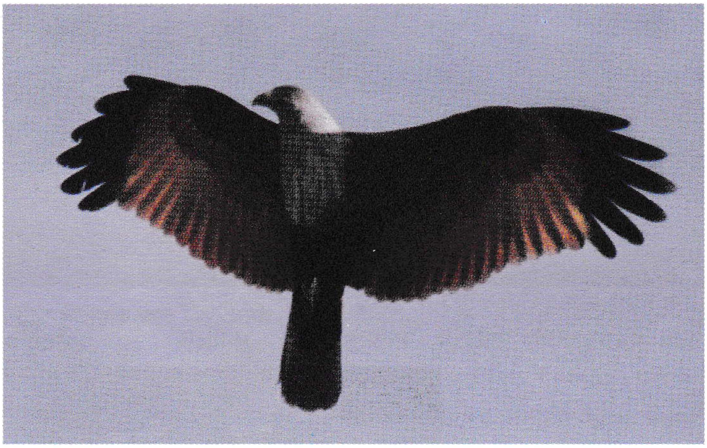

চিল

টগর ফুল ও পাতা

টুনটুনি ও তার বাসা

তাঁতে তৈরি হচ্ছে জামদানি শাড়ি

কাঁচা তাল। এর শাঁস খুবই সুস্বাদু

কোষকলা-১ (tissue)

সরল উদ্ভিদ বা প্রাণীতে একটি কোষ সমুদয় বৃত্তি পালন করলেও উন্নত উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি কোষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এমনকি বিভিন্ন ধরনের এক একটি কোষ সম্মিলিতভাবেও সমুদয় দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সে সকল ক্ষেত্রে একই উৎসের এবং বৃত্তির একাধিক কোষ মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। একই উৎসের এবং একই বৃত্তি পালন করা এ কোষসমূহকে কোষকলা (টিস্যু) বলা হয়। সক্রিয় বর্ধনশীল কোষকলাকে মেরিস্টেমেটিক কোষকলা এবং বৃদ্ধি না পাওয়া (অর্থাৎ বৃদ্ধি শেষ হয়ে পরিণত)

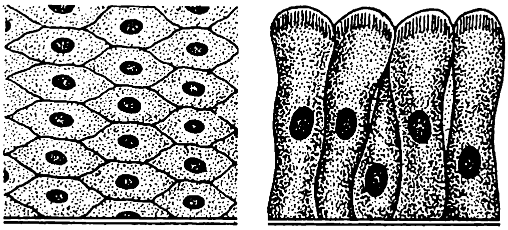

আবরক কলা আঁইশাকার ও স্তম্ভাকার

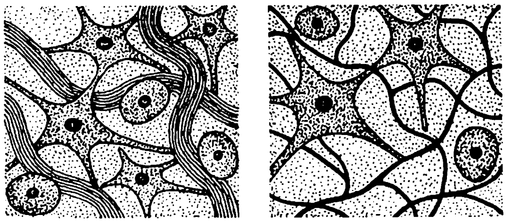

সংযোজক কলা শ্বেততন্তুময় কলা ও স্তম্ভাকার আবরক কলা

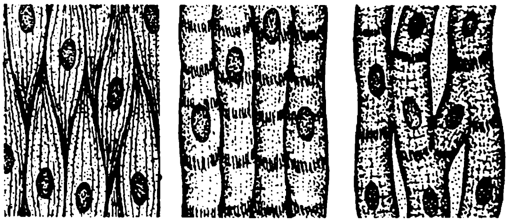

পেশিকলা মসৃণ রৈখিক ও হৃদ্‌পেশি

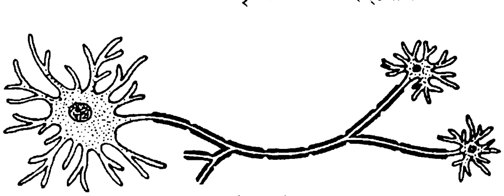

স্নায়ুকলা

কোষকলাকে স্থায়ী কোষকলা বলা হয়। কোষকলা দু' রকম হতে পারে, যথা– অকানিক্যাল কোষকলা যা জীবদেহের গঠনকাঠামো ঠিক রাখতে, আত্মরক্ষায় সাহায্য করে এবং জনন কোষকলা যা জীবের বংশবিস্তারে সাহায্য করে। উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের কয়েক প্রকারের কোষকলা সুপরিচিত, যেমন– উদ্ভিদে ক্যাম্বিয়ম কোষকলা বিভাজন হয়ে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমসহ অন্যান্য কলা গঠন করে। জাইলেম দিয়ে মাটি থেকে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ দেহের বিভিন্ন অংশে যায়। ফ্লোয়েম কোষকলা তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়। প্রাণীতে স্নায়ুকলা স্নায়বিক কাজ করে, মাংসল কোষকলা দেহকে ধারণ করে গতি সঞ্চালন করে।

শা. আ.

কোষকলা-২ (tissue)

গঠন ও কার্যক্রমের দিক থেকে সব দেহকোষ এক ধরনের নয়। বরং দেখা যায়, এক জাতীয় কোষ সমষ্টিগতভাবে নির্দিষ্ট ধরনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এ ধরনের সংঘবদ্ধ কোষ বা কোষসমষ্টির নাম কোষকলা বা টিস্যু, সংক্ষেপে কলা। সংঘবদ্ধ কোষগুলোকে ধরে রাখে বিভিন্ন পরিমাণের আন্তঃকৌষিক উপাদান। দুই বা ততোধিক কলার সমন্বয়ে বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য তৈরি হয় অঙ্গ বা দেহযন্ত্র (অর্গ্যান)। এগুলো দেহকর্মের বৃহত্তর একক হিসাবে বিবেচিত, যেমন– যকৃৎ, বৃক্ক, রক্তবাহ, ত্বক, ফুসফুস ইত্যাদি। আবার কয়েকটি অঙ্গ নির্দিষ্ট ধরনের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত হয়ে দেহতন্ত্র গঠন করে, যেমন– শ্বসনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ইত্যাদি।

মানবদেহ কয়েক প্রকার মৌলিক কোষকলার সাহায্যে গঠিত। যেমন– আবরক কলা (এপিথেলিয়াল টিস্যু), সংযোজক কলা (কানেকটিভ টিস্যু), পেশিকলা (মাসকুলার টিস্যু), স্নায়ুকলা (নার্ভাস টিস্যু)। দেহের প্রয়োজনীয় নানা কাজ এরা করে থাকে। যেমন– দেহকে রক্ষা, শোষণ, নিঃসরণ, নিষ্কাশন, চলন, দেহকাঠামো গঠন, প্রতিরক্ষা, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, প্রতিটি কাজের উপযোগী উদ্দীপনা সৃষ্টি ও তা পরিবহণ ইত্যাদি।

রু. হা.

কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation)

মল সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার না হওয়া, মল কঠিন ও স্বল্প পরিমাণে বের হওয়া বা অনিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস কোষ্ঠকাঠিন্য নামে পরিচিত। কোষ্ঠকাঠিন্য কোনো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। নানা কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিয়ে থাকে। যেমন– দৈহিক শ্রমের অভাব, খাদ্যে আঁশযুক্ত উপাদান ও শাক-সবজির অভাব, যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান না করার অভ্যাস, যকৃতের পীড়া, বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, দীর্ঘস্থায়ী রোগে অন্ত্রপেশির দুর্বলতা, কোনো ঘা শুকানোর কারণে অন্ত্রের আয়তনিক সর্বক্ষীণতা অথবা ক্রমাগত জোলাপ সেবনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য দীর্ঘদিন থাকলে অর্শ রোগের সৃষ্টি হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিয়ে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে মলদ্বারে ঘা দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে বার বার জোলাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য নিয়মিত যথেষ্ট পানি, প্রচুর আঁশযুক্ত খাদ্য ও শাক-সবজি গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন সকালে মলত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। মাঝে মাঝে ইসবগুলের ভুষি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় ভুষিযুক্ত আটার রুটি ও গরম দুধে সাময়িক উপকার মিলতে পারে।

পায়খানার বেগ হলেই পায়খানায় যাওয়া উচিত। পায়খানার বেগ কখনো চেপে রাখা উচিত নয়। তবে শরীরচর্চা ও উদরের ব্যায়াম কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে উপকারী।

গৌ. র.

কৈশিকতা (capillarity)

অতি সূক্ষ্ম ও সুষম ছিদ্রবিশিষ্ট নলকে কৈশিক নল বলে। কোনো কৈশিক কাচনলের এক প্রান্ত তরলের মধ্যে খাড়া করে ঢুকালে নলের ভিতর কিছু তরল তরলের মুক্ত তল থেকে উপরে উঠে যায় বা নিচে নেমে আসে। যেসব তরল কাচনলকে ভিজিয়ে দেয় (যেমন পানি) তাদের

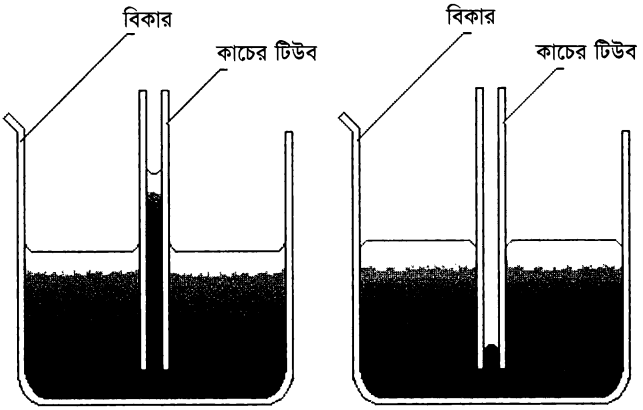

বেলায় জলের ভিতরকার তরলের তল পাত্রের তরলের মুক্ত তলের চেয়ে উপরে উঠে যায় অর্থাৎ তরলের উত্থান বা অধিক্ষেপ হয়।

যেসব তরল কাচনলকে ভিজায় না (যেমন পারদ) তাদের বেলায় নলের ভিতরকার তরল-স্তম্ভের উপরিতল পাত্রের তরলের মুক্ত তলের চেয়ে নিচে নেমে আসে অর্থাৎ তরলের অবনমন বা অবক্ষেপ হয়। কৈশিক নলে তরলের এ রকম অধিক্ষেপ বা অবক্ষেপকে কৈশিকতা বলে। তরলের পৃষ্ঠটানের জন্য এরূপ হয়ে থাকে।

অধিক্ষেপের বেলায় নলের ভিতর তরলের উপরিতল অবতল থাকে এবং অবক্ষেপের বেলায় নলের ভিতর তরলের উপরিতল উত্তল থাকে। আসঞ্জন বা সংসক্তি বলের আপেক্ষিক মানের উপর নির্ভর করে নলের ভিতরকার তরলের উপরিতলের বক্রতা কেমন হবে। আসঞ্জন বা সংসক্তি বলের মান কতটা হবে তা তরল ও কঠিন পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থকে ভিজিয়ে দেয় (যেমন পানি ও কাচ) তার আসঞ্জন বল, যে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থকে ভেজায় না (যেমন পারদ ও কাচ) তার আসঞ্জন বলের চেয়ে অনেক বেশি। আবার পানির সংসক্তি বল পারদের সংসক্তি বলের চেয়ে অনেক কম। নলের ভিতরকার তরল-স্তম্ভের উচ্চতা বা গভীরতা নলের ব্যাসার্ধ ও তরল পদার্থের প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে।

শা. ত.

ক্যাকটাস (cactus)

ক্যাকটাস শব্দটি প্রাচীন গ্রিকরা কাঁটাযুক্ত গাছকে বোঝাতে ব্যবহার করত। Cactaceae গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ। প্রধানত দৃষ্টিনন্দন গাছের জন্য একে ঘরে, বাগানে, কৃত্রিম পাহাড় বা হ্রদের ধারে বপন করা হয়। কয়েকটি প্রজাতির ফুল বেশ সুগন্ধি এবং আকর্ষণীয়। ছোট গোল লাটিমাকৃতি থেকে নলাকৃতি, স্তম্ভাকৃতি, চ্যাপটা সন্ধিযুক্ত হতে পারে। গাছের পৃষ্ঠদেশ শিরায়িত, নিপলের মতো উদগত অংশবিশিষ্ট বিভিন্নভাবে কৌণিক হতে পারে। প্রায় সকল প্রজাতিতে শক্ত, সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা কাঁটার গোছা দেখা যায় যা অন্য কোনো গোত্রের উদ্ভিদে দেখা যায় না। কাঁটা কোনোটি চুলের মতো অথবা দৃঢ়। এগুলোকে এরিয়ালস বলা হয়। কেবল পেরেসকিয়া (Pereskia sp) গণের গাছ ব্যতীত অন্য কোনো প্রজাতিতে পাতা নেই বললেই চলে, যদি-বা থাকে তাও খুব ছোট। অধিকাংশ প্রজাতির ফুল বেশ বড় এবং বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। ক্যাকটাস খুব শুষ্কতাসহিষ্ণু হলেও ভালো বৃদ্ধির জন্য পরিমিত পানির প্রয়োজন। জলাবদ্ধতা এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না, সে জন্য দ্রুত পানি নিকাশযোগ্য মাটিতে লাগাতে হয়। বহু প্রজাতি প্রত্যক্ষ সূর্যালোকে এবং গরম আবহাওয়ায় ভালো হয়। কোনোটির কিছু ছায়া দরকার। কয়েকটি ধরনের ক্যাকটাস হল ফণিমনসা (বৈজ্ঞানিক নাম *Opuntia diilenil haw*), ম্যামিলারিয়া, মেলোক্যাকটাস, পেরেসটিয়া এপিফাইলাল রিপস্যালিস, টর্চ ক্যাকটাস।

শা. আ.

ক্যাঙ্গারু (kangaroo)

বিচিত্র এক স্তন্যপায়ী প্রাণী ক্যাঙ্গারু। এদের মারসুপিলিয়া স্তন্যপায়ী বলা হয়। পেছনের পা দু'টি বেশ লম্বা আর শক্তিশালী। সেই তুলনায় সামনের পা দু'টি নিতান্তই ছোট, যেন দু'টি হাত। ক্যাঙ্গারু পেছনের পায়ের সাহায্যে বেশ দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে, এমনকি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল গতিতে দৌড়াতে পারে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০ প্রজাতির ক্যাঙ্গারু আছে। এর মধ্যে ৫টি প্রজাতি অন্যান্য ক্যাঙ্গারুর তুলনায় বেশ বড়। এগুলোকে সাধারণত বৃহৎ ক্যাঙ্গারু বলে উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ধূসর ক্যাঙ্গারু ও লাল ক্যাঙ্গারু ১.৮ মিটার বা প্রায় ৬ ফুট উঁচু হয় এবং ওজন হয় ৪৫ কেজি বা ১০০ পাউন্ডের মতো।

ক্যাঙ্গারুর মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, দেখতে অনেকটা হরিণের মতো। কান দু'টি বড় এবং ওপর দিকে খাড়া। দেহ ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে। অবশ্য একই প্রজাতির বিভিন্ন ক্যাঙ্গারুর গায়ের রঙ বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোনো কোনো প্রজাতির বা বৃহৎ ক্যাঙ্গারুর লেজ প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। দৌড়ানোর সময় ক্যাঙ্গারু লেজের সাহায্যে তার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা লাফিয়ে ৬ ফুট উঁচু দেয়াল পর্যন্ত ডিঙিয়ে চলে যেতে পারে। অধিকাংশ ক্যাঙ্গারুর আবাস অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। নিউগিনি এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতেও কিছু কিছু ক্যাঙ্গারুর আবাস রয়েছে। কিছু ক্যাঙ্গারু বনে-জঙ্গলে, কিছু ক্যাঙ্গারু সমতল ভূমিতে, আবার কিছু কিছু ক্যাঙ্গারু মরুভূমি ও সংলগ্ন তৃণভূমিতে বিচরণ করে।

www.boighar.com

ক্যাঙ্গারু খুবই ছোট অর্থাৎ মাত্র ইঞ্চি খানেক লম্বা বাচ্চা প্রসব করে। ক্যাঙ্গারুর পেটের নিচে বাচ্চা বহনের জন্য একটি থলে থাকে। থলেকে ইংরেজিতে মারসুপিয়াম (marsupium) বলা হয়।

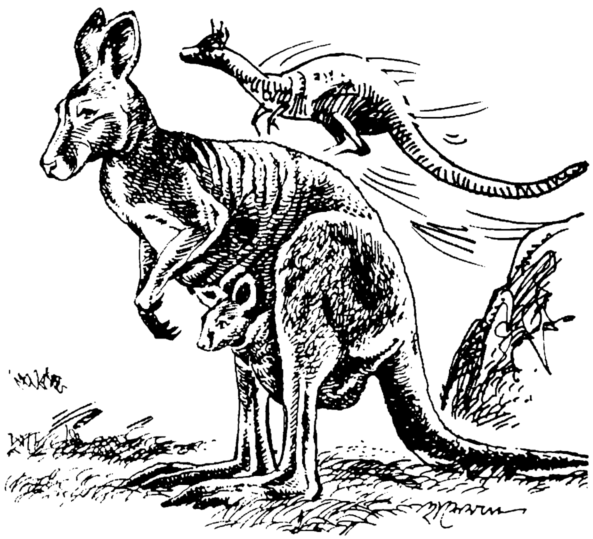

প্রসবের পর এই ছোট বাচ্চাটিকে ক্যাঙ্গারু থলের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বাচ্চা যথেষ্ট শক্তসমর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই থলেতেই থাকে। সাধারণত ৬ মাস থলেতে থাকার পর বাচ্চা থলের বাইরে আসতে শুরু করে। প্রায় ৮ মাস পর ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা স্থায়ীভাবে থলে ছেড়ে যায়।

ফ. মা.

ক্যাথোড (cathode)

কোনো তড়িৎ-উপাদানের দু'টি তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোড থাকে। একটি দিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, অন্যটি দিয়ে প্রবেশ করে। যেটি দিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে (ইলেকট্রন আধিক্যবিশিষ্ট পাত) সেই পাতটিকে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড বলে। ধনাত্মক তড়িৎদ্বারটি অ্যানোড।

তড়িৎবিশ্লেষণ বা তড়িৎপ্রলেপনের সময় ভোল্টামিটারে (দ্র) দু'টি পাত বা দণ্ড ডোবানো থাকে। যে পাতটি ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটি ক্যাথোড। তড়িৎপ্রলেপন বা ইলেকট্রোপ্লেটিং (দ্র) প্রক্রিয়ায় এক ধাতুর ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। যার ওপর প্রলেপ দেওয়া হয় তাকে ভিতধাতু বলে। ভিতধাতুটি ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়।

থার্মো-আয়োনিক ভাল্‌ভ বা ইলেকট্রনিক টিউবে (ডায়োড (দ্র), ট্রায়োড ইত্যাদি) একাধিক তড়িৎদ্বার থাকে। এদের একটি থাকে ক্যাথোড। ক্যাথোডটি এমন পদার্থের দ্বারা তৈরি হয়, যা উত্তপ্ত হলে ইলেকট্রন মুক্ত করে। বর্তনীতে এই ভাল্‌ভগুলি এমনভাবে যুক্ত হয় যে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং তড়িৎপ্রবাহকে একমুখী করে। রেক্‌টিফায়ার (দ্র), অ্যামপ্লিফায়ার (দ্র) তৈরিতে এই সব ভাল্‌ভ ব্যবহৃত হয়।

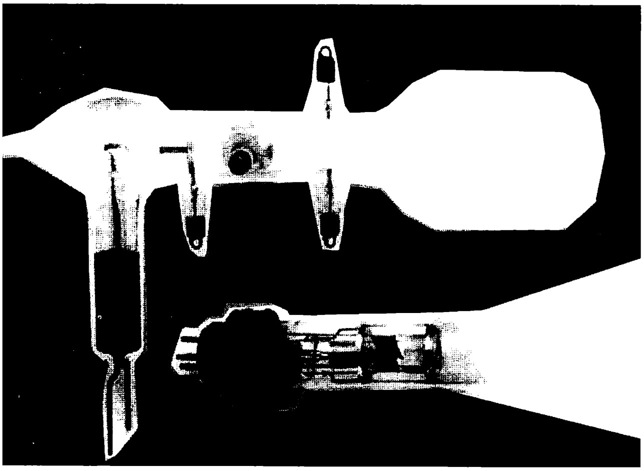

স. রা.

ক্যান্সার / কার্সিনোমা (cancer / carcinoma)

ক্যান্সার (চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'কার্সিনোমা') এপিথেলিয়াল কোষ থেকে উদ্ভূত ম্যালিগন্যান্ট (ক্ষতিকর) টিউমার। নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষের অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ক্যান্সার দেখা দেয়। এই অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে কোষের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তন এবং আচরণগত চরিত্র বদল। ক্যান্সারকোষ তাই তার নিজস্ব নিয়মে বেড়ে চলে এবং দেহের কোনো কাজে আসে না। ক্যান্সারকোষ কখনো পরিণত পর্যায়ে পৌঁছায় না বলে কোষের বংশবৃদ্ধি অব্যাহত ধারায় চলে। ক্যান্সারকোষ সন্নিহিত কোষকলাদের আক্রমণ এবং সেগুলোকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ক্যান্সারকোষ লসিকাপ্রবাহ বা রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং নতুন নতুন স্থানে ক্যান্সারকোষের বসতি স্থাপন করতে পারে। সেই সঙ্গে তা রাখে অনিয়ন্ত্রিত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা। এই দূরবিস্তারের (metastasis) কারণে ক্যান্সার রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

ক্যান্সারের কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। যদিও কিছু কিছু ভৌত কারণ, রাসায়নিক উপাদান, ডিএনএ বা আরএনএ ভাইরাসের কোনো কোনোটি এবং কখনো-বা যৌন হরমোন স্বাভাবিক কোষের চরিত্র বদল করে ক্যান্সারের সূচনা ঘটাতে পারে, তবু চিকিৎসাবিজ্ঞানের চোখে ক্যান্সার এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

ক্যান্সারের চরিত্র তাই বহুমুখী ও জটিল।

অথচ ত্বক, ফুসফুস, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, মূত্রাশয়, মলাশয় থেকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, মস্তিষ্ক ও রক্তকোষের ক্যান্সার (লিউকিমিয়া)-সহ দুই শ'রও অধিক ধরনের ক্যান্সার মানবদেহ আক্রমণ করে থাকে এবং ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা এখনো অনেক রোগের চাইতে বেশি।

সঠিক কারণ জানা না থাকার কারণে ক্যান্সারের চিকিৎসাও ফলপ্রসূ নয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আক্রান্ত অঙ্গ অপসারণ, রশ্মিচিকিৎসা এবং কোষনাশক ঔষধ ব্যবহারই বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরুতে ধরা পড়ে না বলে অস্ত্রোপচারের সাফল্য যথেষ্ট নয়, আবার শেষোক্ত দুই পদ্ধতির চিকিৎসার বিষক্রিয়াও যথেষ্ট। তাই ক্যান্সার চিকিৎসাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে এখনো অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে।

ক্যান্সারকে বাংলায় বলা হয় কর্কট রোগ।

রু. হা.

ক্যাপাসিটর (capacitor)

সাধারণ অর্থে যে তড়িৎযন্ত্র বিদ্যুৎ বা চার্জ ধারণ করে তাকে ধারক বা ক্যাপাসিটর বলে। কোনো অপরিবাহী মাধ্যম মাঝখানে রেখে দু'পাশে দু'টি পরিবাহী খণ্ডকে বিশেষ উপায়ে সাজিয়ে ক্যাপাসিটর তৈরি করা হয়। তড়িৎশক্তি বা চার্জকে ধরে রাখাই এর কাজ। ক্যাপাসিটর বা ধারকের ধারকত্ব হল চার্জ ধারণ করার ক্ষমতা।

ক্যাপাসিটরের প্রাথমিক অবস্থা হল লিডেন জার। এটি আবিষ্কৃত হয় ১৭৪৬ সালে। পরবর্তী সময়ে ক্যাপাসিটরের আকারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে বিভিন্ন আকার-আকৃতির ক্যাপাসিটরের মূলনীতি একই। দু'টি পরিবাহী পাতকে কোনো অপরিবাহী দিয়ে আলাদা করে পাশাপাশি বসানো হয়। অপরিবাহী হিসাবে বায়ু, সিরামিক, কাচ, মাইকা, প্লাস্টিক, কাগজ এবং তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। এই অপরিবাহীগুলোর বিশেষ নাম 'ডায়লেকট্রিক'। যখন বিদ্যুৎবর্তনীতে কোনো ক্যাপাসিটর যুক্ত করা হয়, এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, কিন্তু দুই প্লেটে দুই ধরনের চার্জ জমা হয়। ব্যাটারি বা তড়িৎ উৎস সরিয়ে বর্তনী পূর্ণ করলে বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যায়।

ক্যাপাসিটরের গঠন-আকৃতি এবং ব্যবহৃত ডায়লেকট্রিক-এর প্রকৃতির উপর চার্জ ধারণক্ষমতা নির্ভর করে। ধারকত্ব পরিমাপের একক ফ্যারাড (farad)। এর হাজার ভাগের এক ভাগ হল মাইক্রো-ফ্যারাড। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্যাপাসিটর। টিউবলাইটে ব্যবহৃত টিউব স্টার্টার এক ধরনের ক্যাপাসিটর। রেডিও-টেলিভিশনের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র বা প্রচারতরঙ্গ নির্বাচনের জন্য যে নব (চাবি) ঘোরানো হয়, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে বিশেষ ধরনের ক্যাপাসিটর, এদের বলে 'ভ্যারিয়েবল (পরিবর্তনশীল) ক্যাপাসিটর'।

স. রা.

ক্যাফিন (caffeine)

রাসায়নিক জৈব যৌগ। এর সঙ্কেত হল $C_8H_{10}N_4O_2.H_2O$। ক্যাফিন গন্ধহীন সামান্য তিক্ত স্বাদের কঠিন পদার্থ, কেলাসাকৃতি। চা এবং কফির মধ্যে সামান্য পরিমাণে ক্যাফিন পাওয়া যায়। ক্যাফিন উত্তেজক পদার্থ। সামান্য পরিমাণে ক্যাফিন পানে রক্তের পরিচলন বৃদ্ধি পায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে তা গ্রহণ করলে অনিদ্রা এবং স্নায়ুদুর্বলতা সৃষ্টি করে, মাথাব্যথা হয় এবং হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। ক্যাফিন পানি ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।

১৮২০ সালে প্রথম কফিবীজ থেকে ল্যাবরেটরিতে বিশুদ্ধ ক্যাফিন নিষ্কাশন সম্ভব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ রোগীর জন্য হৃৎপিণ্ড বা স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ক্যাফিন ব্যবহৃত হয়। আফিম (দ্র), অ্যালকোহল (দ্র)

এবং অন্য ড্রাগের দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া বিনষ্টের জন্য ক্যাফিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক গবেষকই প্রমাণ করেছেন যে ক্যাফিনমুক্ত চা ও কফি স্বাস্থ্যের জন্য অধিক উপযোগী।

স. রা.

ক্যামেরা (camera)

ফটো তোলার যন্ত্র। ভেতরে কালো রঙ করা একটি আলোকনিরুদ্ধ বাক্সের এক দিকে একটি ছোট্ট ছিদ্র করে তার বিপরীত দিকে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রলেপযুক্ত একটি পর্দা বসানো হয়। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পর্দার উপর পড়লে ছবি তৈরি হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই ক্যামেরা তৈরি। 'ক্যামেরা' শব্দটি লাতিন শব্দ obscura থেকে এসেছে, এবং এর অর্থ 'অন্ধকার কক্ষ'।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা পাওয়া যায়। সব ক্যামেরাই একই নীতিতে কাজ করে। এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে আলোকনিরুদ্ধ বাক্স বা ক্যামেরা বক্স, লেন্স, ডায়াফ্রাম, শাটার, ফিল্মস্থল, ভিউফাইন্ডার, পর্দা এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট রিং ইত্যাদি। ক্যামেরা বক্সের মুখেই থাকে একটি উত্তল লেন্স, কখনো একাধিক লেন্স দিয়ে তৈরি একটি যৌগিক লেন্স। অ্যাডজাস্টমেন্ট রিং ঘুরিয়ে লেন্স ও পর্দার মধ্যের দূরত্ব বাড়ানো-কমানো যায়। লেন্সের পরেই থাকে ডায়াফ্রামযুক্ত একটি ছোট্ট ছিদ্রপথ। এই ছিদ্রটিকে ছোট-বড় করার জন্য থাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট রিং। প্রয়োজন মতো আলো ফিল্মের উপর ফেলার জন্য ডায়াফ্রামের ছিদ্র ছোট-বড় করতে হয়। ডায়াফ্রামের পর শাটারের অবস্থান। একটি সুইচের সাহায্যে শাটারটি খুলে দেওয়া বা বন্ধ করা যায়।

যে বস্তুর ছবি তুলতে হবে, ক্যামেরার লেন্সটিকে সেই দিকে মুখ করে ধরে ভিউফাইন্ডারের মধ্য দিয়ে লক্ষ করতে হবে। ভিউফাইন্ডারে যা-কিছু দেখা যায়, যেভাবে দেখা যায়, পর্দায় ঠিক সেভাবেই ছবি ওঠে। তাই ভিউফাইন্ডারের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে লেন্সটি সামনে পেছনে সরিয়ে পর্দার উপর বস্তুর স্পষ্ট ছবি ফেলতে হয়। অতঃপর শাটারটি খুলে দিলে বস্তু থেকে আলো

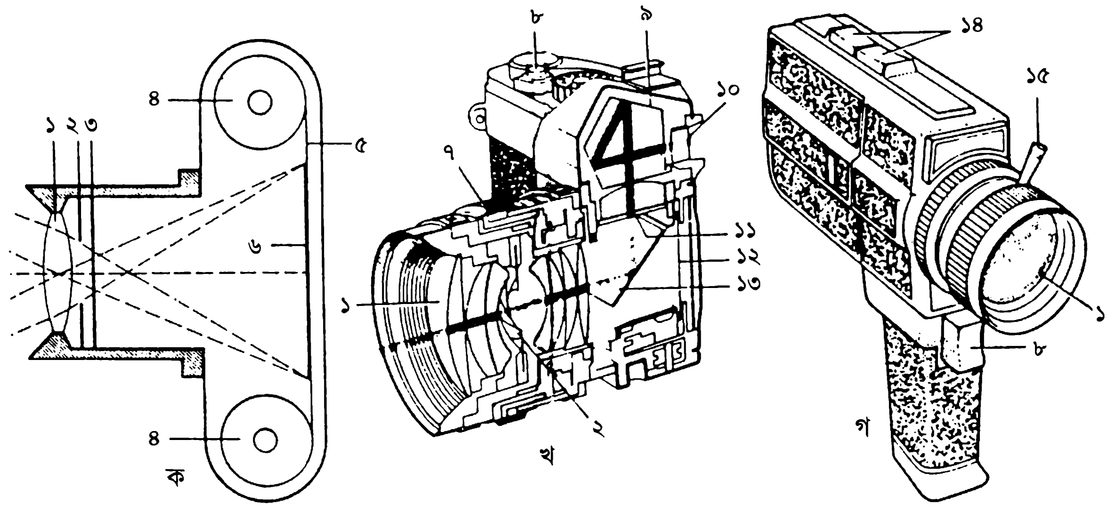

ক. ক্যামেরার নকশা, খ. ৩৫ মিমি সিঙ্গল লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা (তীর চিহ্ন আলোকের পথ নির্দেশ করছে), গ. চলচ্চিত্রের জন্য ব্যবহৃত ক্যামেরা।

১. লেন্স, ২. আইরিস পর্দা (অ্যাপারচার), ৩. শাটার, ৪. ফিল্ম স্পুল, ৫. ফিল্ম, ৬. ওল্টানো প্রতিবিম্ব, ৭. ফোকাস করার আংটা, ৮. শাটার রিলিজ, ৯. পেন্টাপ্রিজম, ১০. ভিউফাইন্ডার, ১১. ফোকাস করার পর্দা, ১২. ফোকাস-তল শাটার, ১৩. ত্বরিত-প্রত্যাবর্তন আয়না, ১৪. বিদ্যুৎচালিত জুম নিয়ন্ত্রণ, ১৫. হস্তচালিত জুম নিয়ন্ত্রণ

লেন্সের মধ্য দিয়ে পর্দার উপর পড়ে। পর্দার উপর রাসায়নিক বস্তুর তৈরি ফিল্মটি থাকায় ফিল্মের উপর ছবি তৈরি হয়।

ফিল্মের উপর গৃহীত ছবিটি আলোতে আনা যাবে না। একে অন্ধকার ঘরে বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে স্থায়ী করার পরই শুধু আলোতে আনা যাবে। এ ধরনের ছবিকে বলে ডেভলপ-করা নেগেটিভ। বিশেষ ধরনের কাগজের উপর একই উপায়ে অন্ধকার কক্ষে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ছবি মুদ্রিত করা হয়। এই ছবিকেই বলে ফটোগ্রাফ।

আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা পাওয়া যায়। যেমন– ফিক্সড ফোকাস ক্যামেরা, টুইন-লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা, ভিউ ক্যামেরা, ইন্সট্যান্ট বা পোলারয়েড ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, অটো ক্যামেরা, স্টিরিও ক্যামেরা ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে মহাকাশের ছবি তোলার, যুদ্ধের ছবি তোলার, বৈজ্ঞানিক কাজের এবং পানির তলায় ব্যবহারযোগ্য বিশেষ ক্যামেরা।

স. রা.

ক্যালকুলেটর (calculator)

ক্যালকুলেটর ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ গণকযন্ত্র। দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি গাণিতিক হিসাব সমাধানের যন্ত্রই 'ক্যালকুলেটর'।

প্রাচীন কাল থেকেই গণনার কাজে মানুষ যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে চীনসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হত অ্যাবাকাস (দ্র)। এখনো জাপান এবং চীনে অ্যাবাকাসের প্রচলন রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জটিল গণনা ও গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে উন্নততর ক্যালকুলেটর। এসব ক্যালকুলেটরকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায় ১. যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর, ২. ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর। যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি হয় গিয়ার, লিভার, দণ্ড ও পুলি দিয়ে। এসব ক্যালকুলেটরের নির্মাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ´কয়েক জন বিজ্ঞানী হলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাস্কাল, জার্মান গণিতবিদ লাইবনিৎস্ এবং মূলার ব্যাবেজ। পাস্কাল ১৬৪২ সালে, লাইবনিৎস্ ১৬৭১ সালে এবং ব্যাবেজ ১৮১২ সালে প্রথম এবং ১৮৩৩ সালে দ্বিতীয় ক্যালকুলেটরযন্ত্র তৈরি করেন। ব্যাবেজের যন্ত্র থেকেই কালক্রমে কম্পিউটারের (দ্র) উদ্ভব হয়েছে। ১৮৭২ সালে ফ্রাঙ্ক স্টিফেন বলডুইন বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। ১৮৮৭ সালে ডর ফেল্ট 'কমটোমিটার' নামে ক্যালকুলেটরের প্রথম পেটেন্ট নেন।

বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হলে ক্যালকুলেটরে গিয়ার, চাকা, লিভার ইত্যাদির পরিবর্তে তড়িৎ-যান্ত্রিক (electro-mechanical) পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ স্টিবিজ 'কমপ্লেক্স-ক্যালকুলেটর' নামের প্রথম ম্যাগনেটিক রিলে পদ্ধতির যন্ত্র তৈরি করেন।

বিংশ শতাব্দীতে ইলেকট্রনিক্সের সূত্রপাত হয়। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত উন্নত মানের রকমারি ক্যালকুলেটর তৈরি সম্ভব হয়েছে। ক্যালকুলেটর বলতে আমরা ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর বুঝি। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন নির্দেশ সম্পন্ন ক্যালকুলেটর পাওয়া যায়। সাধারণ হিসাবের জন্য, পকেটে বহনযোগ্য, ডেস্কে ব্যবহারের উপযোগী নানা ধরনের ক্যালকুলেটর আছে। এসব ক্যালকুলেটরের প্রধান অংশ চারটি– ১. ইনপুট, ২. মেমোরি, ৩. প্রসেসর, ৪. আউটপুট। 'ইনপুট' হল কতকগুলি সুইচযুক্ত কি-বোর্ড, যার সাহায্যে যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মেমোরি অংশে থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্বলিত তথ্যাদি। প্রসেসরের কাজ হল ইনপুটের তথ্যসমূহকে মেমোরির নির্দেশ অনুসারে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আউটপুটে থাকে একটি ডিসপ্লে এবং ডিসপ্লে কোডার। এটি তৈরি হয় বিশেষ ধরনের LED দিয়ে। এতে নির্ণেয় সমাধান ভেসে ওঠে। কোনো কোনো ক্যালকুলেটরে আউটপুটে ডিসপ্লে ছাড়াও কাগজে তথ্যাদি ছাপা হয়। এদের বলে ডেস্কটপ ক্যালকুলেটর।

স. রা.

ক্যালরি (calorie)

ক্যালরি হচ্ছে তাপশক্তির একটি একক। এক গ্রাম পানিকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তুলতে যে পরিমাণ তাপশক্তি প্রয়োজন, তাকে এক ক্যালরিরূপে আগে সংজ্ঞায়িত করা হত। কিন্তু এই তাপের

পরিমাণ পানির তাপমাত্রার ওপর কিছুটা নির্ভর করে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখন পানির সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫.৫ ডিগ্রিতে তুলতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে এক ক্যালরি বলা হয়। এক ক্যালরি তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তির একক জুলের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা পাই এক ক্যালরি সমান ৪.১৮৬৮ বা মোটামুটিভাবে ৪.২ জুল।

আমরা যখন খাবার থেকে পাওয়া তাপশক্তির এককরূপে ক্যালরি শব্দটি ব্যবহার করি সেই ক্যালরি আসলে বড় ক্যালরি এবং আমাদের সংজ্ঞায়িত ক্যালরির হাজার গুণ। এই বড় ক্যালরিকে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর C দ্বারা বোঝানো হয়। এই হিসাব অনুসারে একজন কায়িক পরিশ্রমকারী বড় মানুষের দৈনিক প্রয়োজন প্রায় তিন হাজার বড় ক্যালরিশক্তি।

তাপশক্তি পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় ক্যালরিমিটার।

আ. আ.

ক্যালসিয়াম (calcium)

ক্যালসিয়াম দেখতে সাদা রঙের। এটি নরম এক প্রকার মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাঙ্কেতিক চিহ্ন Ca, পারমাণবিক ওজন ৪০.০৮, পারমাণবিক সংখ্যা ২০। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রকৃতিতে নানাভাবে ও নানা আকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। এর হাইড্রক্সাইড সাধারণ চুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট হল খড়িমাটি (চক) ও বিভিন্ন পাথর। শুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অন্য পদার্থের পানি শুষে নেয়। রঞ্জক শিল্পে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ক্যালসিয়াম সালফেট তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শক্ত হয় বলে এ দিয়ে প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরি হয়। প্রাণিদেহের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান হল এই ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে কুইকলাইম (quicklime) বলে। এর মধ্যে পানি দিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড যার রাসায়নিক নাম হল স্লেকড্ লাইম, সাধারণ চুন। স্যার হামফ্রি ডেভি সর্বপ্রথম ১৮০৮ সালে এটিকে নিষ্কাশিত করেন। ধাতুটি প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে এবং নানা যৌগিকে বিরাজ করে, যেমন– ক্যালসিয়াম কার্বনেট (লাইম স্টোন, চক, মার্বেল), ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম, অ্যালাবেস্টার) এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট, যা প্রাণিদেহের হাড়সমূহের এক প্রধান উপাদান। অন্য একটি মূল্যবান খনিজ হিসাবে বিরাজ করে, যার নাম হল ফ্লুরাইট বা ফ্লুরোস্পার CaF_2। সাধারণভাবে বলা যায় যে এর রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা বেরিয়াম ধাতুটির মতো। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৬ ও গলনাঙ্ক ৮৫১° সে., স্ফুটনাঙ্ক ১৪৪০° সে.। উদ্বায়ী বস্তু শিখায় লালচে কমলা রঙ দেয়। ক্যালসিয়াম ধাতুটি পানি ও পাতলা অ্যাসিডে গলে যায় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এটি অধাতুর সঙ্গে যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে বিক্রিয়া করে অত্যধিক উত্তাপের সৃষ্টি করে। ক্যালসিয়ামের হাইড্রাইডের প্রকৃতি নেগেটিভ হাইড্রোজেন আয়নিক হিসাবে ব্যবহার করে এবং বিশেষ জোরালোভাবে পানিতে গলে যায় এবং নাইট্রোজেনের মতো সক্রিয় নয় এমন রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অনেক কম উষ্ণতায় বিক্রিয়া করে এবং অধিক উষ্ণতায় কার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কারবাইড তৈরি করে। ক্যালসিয়াম অক্সাইড সাদা রঙের এবং অধিক তাপসহ পানির সঙ্গে জোরালোভাবে বিক্রিয়া করে সাদা রঙের হাইড্রক্সাইড তৈরি করে। ক্যালসিয়াম অক্সাইড (কুইকলাইম) যা পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (slaked lime) তৈরি করে তা ব্যাপকভাবে বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

ক্যালেইডোস্কোপ (kaleidoscope)

ক্যালেইডোস্কোপ দুই বা ততোধিক আয়নার সাহায্যে তৈরি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি খেলনা। একটি ফ্রেমের মধ্যে দু'টি বা তিনটি সমতল আয়না খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে এই আয়নাগুলো পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণ উৎপন্ন করবে। এবার কয়েকটি রঙিন কাচের টুকরা একটি সমতল জায়গায় রেখে পিরামিডের মতন দাঁড় করানো ও পরস্পরের সঙ্গে আটকানো আয়নাগুলোকে যদি ঘোরানো যায়, তাহলে প্রতিবার সামান্য ঘোরালেই নতুন নকশা সৃষ্টি হবে। এর কারণ, কাচের প্রতিটি রঙিন টুকরো প্রথম আয়নাতে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবে সেই প্রতিবিম্ব অন্য আয়নাতে

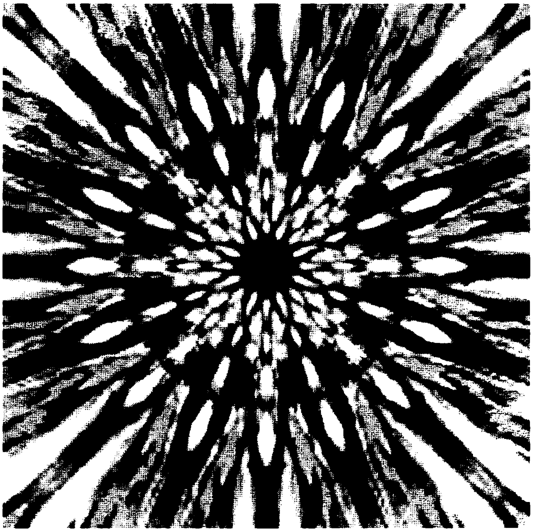

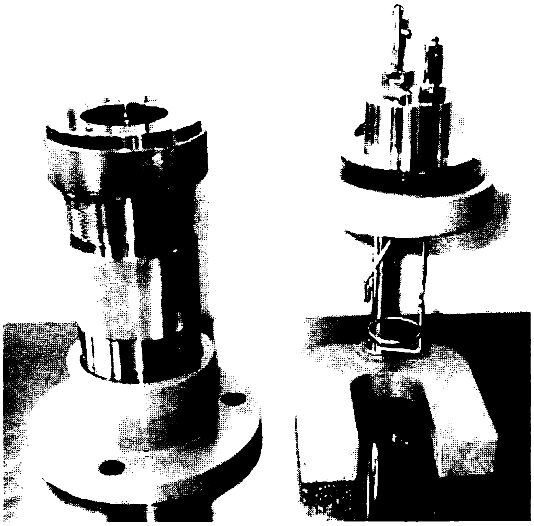

প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। উপর্যুপরি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবার ফলে অনেকগুলো কাচের টুকরো একত্রে যে প্রতিবিম্বের প্যাটার্ন তৈরি করবে তা হবে বৈচিত্র্যময়। আয়নাগুলো পরস্পরের সঙ্গে কোণ করে আছে বলে সামান্য ঘোরালেও এই প্রতিবিম্বের নকশা অনেকটা বদলে যাবে। কত বিপুল সংখ্যক প্যাটার্ন যে এভাবে তৈরি করা সম্ভব তা গুণে শেষ করা যাবে না। এই প্যাটার্ন দেখার জন্য দাঁড় করানো আয়নাগুলোর উপর থেকে তাকাতে হবে। কাচের টুকরাগুলো স্থির রেখে আয়নার ফ্রেমটি স্বাধীনভাবে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ক্যালেইডোস্কোপ ব্যবহার করে যে অসংখ্য নকশা পাওয়া সম্ভব তার ছবি তুলে নানা রকম ডিজাইনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে।

আ. আ.

ক্যালরিমিটার (calorimeter)

গবেষণাগারে ব্যবহৃত তাপ পরিমাপের যন্ত্রবিশেষ। এর সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপ শোষণ বা বর্জনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতা, আপেক্ষিক তাপ ও ভরবিশিষ্ট দু'টি বস্তু (একটি তরল অন্যটি তরল বা কঠিন) এই যন্ত্রের মধ্যে মিশিয়ে মিশ্রণের তাপমাত্রা নিরূপণ করা হয়। 'গরম বস্তুটি যে পরিমাণ তাপ বর্জন করে, ঠাণ্ডা বস্তু এবং যন্ত্রের ধারক পাত্রটি সেই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে' এই তত্ত্ব থেকে গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তাপ পরিমাপ করা যায়।

ক্যালরিমিটারের মূল অংশ বেলনাকৃতি একটি ধাতব পাত্র। এর মধ্যে থাকে একটি নাড়নকাঠি। এটিও একই ধাতুর তৈরি, নিচের অংশ কুণ্ডলী পাকানো। পাত্রটিকে দু'টি ছোট্ট ছিদ্রযুক্ত একটি ঢাকনা দিয়ে তাপ নিরোধক বাক্সের মধ্যে বসানো হয়। ঢাকনার একটি ছিদ্রপথে নাড়নকাঠির হাতল বেরিয়ে থাকে। এবং দ্বিতীয় ছিদ্রটির মধ্যে দিয়ে একটি তাপমানযন্ত্রের কুণ্ডলীটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

তাপ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যালরিমিটার ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেনোর ক্যালরিমিটার, বম্ব ক্যালরিমিটার, গ্যাস ফুয়েল ক্যালরিমিটার ইত্যাদি।

স. রা.

ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার (casette, tape recorder)

টেপ রেকর্ডার ও ক্যাসেট রেকর্ডার সঙ্গীত, কথা বা যে কোনো ধরনের শব্দ ধারণ করে রাখার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থা। যে কোনো শব্দ সৃষ্টির সময় যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করা হয় মাইক্রোফোনের সাহায্যে পরিবর্তনশীল এই বিদ্যুৎপ্রবাহ আনুপাতিক হারে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে রেকর্ডিং হেডে এই রেকর্ডিং

হেডের ফাঁকের পাশ দিয়ে চৌম্বক টেপ যখন পার হয়ে যায় তখন এই টেপের মধ্যে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌম্বক অক্সাইড কণিকা ধারণ করা আছে তা বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। প্লাস্টিক ফিতার মধ্যে নিহিত চৌম্বক কণিকাগুলো অনেকটা স্বাধীনভাবে নড়তে পারে বলে শব্দের তীব্রতা অনুপাতে ও এর কম্পনহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদেরকে সাজায়। এই রেকর্ডকৃত ফিতা তখন অন্য একটি রীলের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এই টেপ বাজাবার সময় তা অন্য একটি হেডের ফাঁকের পাশ দিয়ে টেনে নেওয়া হয়। এই বাজাবার হেডের কাজ হল চৌম্বক টেপের মধ্যে সাজানো চৌম্বক কণিকার প্রভাব অনুসারে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা। এই মৃদু তড়িৎসঙ্কেতকে প্রথমে বিবর্ধিত করা হয় এবং পরে লাউড স্পিকারের সাহায্যে শব্দে রূপান্তরিত করা হয়।

চৌম্বক রেকর্ডিং প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৮ সালে। ডেনমার্কের প্রকৌশলী ভাল্‌ডেমার্ পুল্‌সেন্ (Valdemar Poulsen) ফিতার পরিবর্তে তারের উপর চৌম্বক কণিকা স্থাপন করে এই রেকর্ডিং করেন। ১৯৪০ সালে আধুনিক রেকর্ডিং টেপের প্রবর্তন ঘটান জার্মান বিজ্ঞানীরা। ক্ষুদ্রাকার ক্যাসেট রেকর্ডারের প্রচলন ঘটে ১৯৬০ সালের দিকে, যেখানে জাপানি বিজ্ঞানীদের বিশেষ অবদান রয়েছে।

আ. আ.

ক্রোমিয়াম (chromium)

মৌলিক পদার্থ। কঠিন, ভঙ্গুর, ধূসর ধাতব পদার্থ। এর রাসায়নিক প্রতীক Cr। পারমাণবিক সংখ্যা ২৪, ভর ৫১.৯৯৬, গলনাঙ্ক ১৮৫০° সে., স্ফুটনাঙ্ক ২৬৭২° সে.। ১৭৯৭ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই নিকোলো ভোক্‌ল্যাঁ সর্বপ্রথম ক্রোমিয়াম নিষ্কাশন করেন।

ক্রোমিয়াম ক্ষয়রোধ করে। ঘষলে উজ্জ্বল চকচকে হয়। এ জন্য অন্য ধাতুর উপর ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। তাতে ধাতু দীর্ঘস্থায়ী এবং চকচকে হয়। মোটরগাড়ির বাম্পার ও দরজার হাতলে ক্রোমিয়ামের প্লেটিং করা হয়। ইস্পাতে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে ক্রোমস্টিল তৈরি করা হয়। ক্রোমস্টিল অত্যন্ত শক্ত। যুদ্ধজাহাজ, ট্যাঙ্কের বডি, বলবেয়ারিং, কাটিং মেশিনের ব্লেড ইত্যাদি তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশ্রণে তৈরি হয় স্টেইনলেস স্টিল। এতে মরচে ধরে না। রান্না ও খাবারের বাসনপত্র, হাতা, গামলা তৈরিতে স্টেইনলেস স্টিল বহুল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মৌলিকের সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে রঙ তৈরি হয়। ক্রোমিয়াম যৌগ পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট রঞ্জক হিসাবে চামড়াশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় ক্রোমিয়াম পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোহা এবং অক্সিজেনের যৌগ ক্রোমাইট (FeO, Cr_2O_3) হিসাবে পাওয়া যায়। আলবেনিয়া, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কিস্তান এবং জিম্বাবুয়েতে উল্লেখযোগ্য ক্রোমাইট খনি রয়েছে।

স. রা.

ক্রোমোজোম (chromosome)

জীবকোষের কেন্দ্রকে সুতার মতো আকৃতিবিশিষ্ট উপাদানের নাম ক্রোমোজোম। রঞ্জকের প্রতি আকর্ষণের কারণে এই নাম। ডিএনএ-র যুগ্মকুণ্ডলীর সঙ্গে প্রোটিন, যৎসামান্য আরএনএ এবং ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম আয়ন নিয়ে ক্রোমোজোম গঠিত। বংশগতির একক জীন সারিবদ্ধভাবে

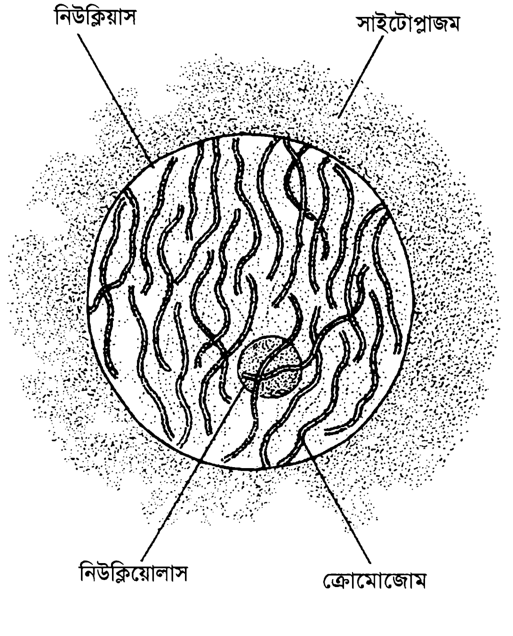

ক্রোমোজোমে বিন্যস্ত থাকে। কোষবিভাজনে ক্রোমোজমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রতিটি প্রজাতির জন্য ক্রোমোজোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। যেমন– ফলের মাছি ড্রসোফিলায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র আট (চার যুগল), কিন্তু শিম্পাঞ্জিতে ৪৮ আর মানব-দেহকোষে ৪৬। ক্রোমোজোমগুলো দু'টি করে যুক্ত থাকায় মানবদেহে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ জোড়ায় (pairs)। এর মধ্যে একজোড়া যৌন পরিচয় (পুরুষ কিংবা নারী) নির্ধারণ করে বলে নাম দেওয়া হয়েছে যৌন ক্রোমোজোম (sex chromosome)। বাকি ২২ জোড়াকে বলা হয় সোমাটিক ক্রোমোজোম বা অটোসোম (autosome), যেগুলোর মাধ্যমে বংশগতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

ক্রোমোজোম নামটি ওয়ালডেয়ার হার্ৎজ নামক এক জার্মান শারীরস্থানবিদের দেওয়া, ১৮৮৮ সালে। আর যৌন ক্রোমোজোম শনাক্ত করেন আরেক জার্মান কোষতত্ত্ববিদ ১৮৯১ সালে, নাম হেন্‌কিং (Henking)।

রু. হা.

ক্রোম্যানিয়ন মানব (cromagnon man)

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নাম। পঁয়ত্রিশ থেকে আশি হাজার বছর আগে ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় এরা বসবাস করত। ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সে ক্রোম্যানিয়ন (cromagnon) নামের একটি গুহায় এদের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। এ জন্য এরা ক্রোম্যানিয়ন মানুষ নামে পরিচিত।

হাড়গোড়ের ধরন দেখে মনে হয়, ক্রোম্যানিয়ন মানুষের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল। এদের উচ্চতা হত প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো (১৭৩ সেন্টিমিটার)। এদের দৈহিক গঠন ছিল আজকের দিনের মানুষের মতোই। শারীরিক দিক দিয়ে এদের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার মানুষের মিল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ক্রোম্যানিয়ন মানুষই হল বর্তমান কালের মানুষের প্রাথমিক রূপ।

ইউরোপের তীব্র শীতে এবং সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ শিকার করে বেড়াত। ইউরোপের বহু স্থানই তখন বরফে আবৃত। পাথর এবং হাড়ের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার এরা ব্যবহার করত। অস্ত্রের সাহায্যে চামড়া পরিষ্কার করা এবং সেলাইয়ের কায়দা এরা আবিষ্কার করেছিল। স্থানভেদে এসব অস্ত্র ছিল বিভিন্ন ধরনের। খোলা জায়গায় আবাস নির্মাণ করে এরা বসবাস করত। তবে কেউ কেউ গুহাতেও বাস করত।

খাদ্যের অন্বেষণে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ স্থান থেকে স্থানে ঘুরে বেড়াত। বিনিময়পদ্ধতি এরা আবিষ্কার করেছিল, যেমন– কোনো একটা বিশেষ ধরনের পাথরের বদলে এক দল অন্য দলের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত। ক্রোম্যানিয়নদের কেউ কেউ সুন্দর গুহাচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স এবং স্পেনে বিভিন্ন গুহায় এদের চমৎকার শিল্পকাজ আজও রয়েছে। হাড় থেকেও নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি তাদের জানা ছিল, জানা ছিল মাটি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি তৈরির কায়দা।

সৈ. আ. ই.

ক্লোরোফর্ম (chloroform)

বর্ণহীন মিষ্টি গন্ধযুক্ত অদাহ্য তরল যৌগ। এর আণবিক ওজন ১৯.৩৯, ফর্মুলা $CHCl_3$। ক্লোরোফর্মের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৪৮৯ (২০° সে. তাপমাত্রায়) এবং এর স্ফুটনাঙ্ক ৬১.২° সে. (১৪২° ফারেনহাইট)। এটা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে কিংবা অন্ধকারে ক্লোরোফর্ম ধীরে ধীরে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অত্যন্ত বিষাক্ত ফসজিন গ্যাস তৈরি করে। এ জন্য বাণিজ্যিক ক্লোরোফর্মে এই বিক্রিয়া নিরোধক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এটি একটি শক্তিশালী চেতনানাশক পদার্থ। কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যবহার করলে শরীরের বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ এবং কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্য আজকাল আরো নিরাপদ চেতনানাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার রয়েছে। রঙ এবং ঔষধশিল্পেও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

ক্লোরোফিল (chlorophyll)

প্রায় সকল গাছের পাতা সবুজ। কোনো কোনো গাছের কাণ্ড ও ডালপালা সবুজ। বাতাসে ঝুলে থাকা দু'-একটা গাছের মূলও সবুজ। ফুলের বৃতি সবুজ। এত সবুজ যে উপাদানটির জন্য তার নাম ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলের পরিভাষা করা হয়েছে পত্রহরিৎ। হরিৎ শব্দের অর্থ সবুজ। বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্লোরোফিল সৃষ্টি না হলে জীবজগৎ টিকত না। প্রাণিজগৎ প্রায় পুরোপুরি উদ্ভিদজগতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণী তৈরি খাবার খায়। উদ্ভিদ কারো ওপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়। উদ্ভিদ নিজ দেহে খাদ্য তৈরি করতে পারে। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ। ক্লোরোফিলের অণু গঠিত হয় পাইরল নামক এক জাতীয় পদার্থ দিয়ে। পাতা বা কাণ্ডের ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অঙ্গাণুতে দু' ধরনের ক্লোরোফিল থাকে। এ দু' ধরনের ক্লোরোফিল হল ক্লোরোফিল 'এ' এবং ক্লোরোফিল 'বি'। উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতা বা কাণ্ডে খাদ্য তৈরি করে, সে প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ। এ প্রক্রিয়া দিনের বেলায় সূর্যের আলোকেই সম্পন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় চারটি মূল উপাদান অংশ নেয়– কার্বন ডাই-অক্সাইড, পানি, সূর্যালোক ও ক্লোরোফিল। প্রক্রিয়া শেষে গাছে খাদ্য তৈরি হয় এবং অক্সিজেন তৈরি হয় উপজাত হিসাবে। ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের উপস্থিতি ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই পারে না। কাজেই ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে মুক্ত করে এবং অক্সিজেন উপহার দেয়। গাছের জন্য খাদ্য তো তৈরি করেই।

ত. চ.

ক্ষেত্র (field)

একজন মানুষ দড়ি বেঁধে একটি গাড়ি টেনে নিলে তা দেখা যায়। ধাক্কা দিলে দরজা খুলে যায় তা-ও দেখা যায়। এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ এবং তার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বল প্রয়োগকারীর কোনো সংযোগ ছাড়াই বলের প্রভাব লক্ষ করি। যেমন– গাছ থেকে ফল পড়ে অভিকর্ষের প্রভাবে। চুম্বকের কাছাকাছি চৌম্বক পদার্থের উপর চুম্বকের আকর্ষণ কার্যকর হয়। এসব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর বলের প্রভাব অনুভব করা যায় কিন্তু বল প্রয়োগ দেখা যায় না।

কোনো ভৌত শক্তি বা সত্তার দ্বারা প্রভাবযুক্ত অঞ্চল ও এলাকাকে ঐ সত্তার ক্ষেত্র বা ফিল্ড বলে। যেমন– তড়িৎক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র, অভিকর্ষ ক্ষেত্র, তাপীয় ক্ষেত্র। প্রথম তিনটি ভেক্টর রাশি। চতুর্থটি স্কেলার রাশি। প্রভাবযুক্ত অঞ্চলের যে কোনো বিন্দুতে সংশ্লিষ্ট সত্তার প্রভাবের গাণিতিক পরিমাণ হল ঐ বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বা সংক্ষেপে শুধু ক্ষেত্র (field)।

গণিতে ফিল্ড হল একটি গাণিতিক পরিবেশ (system) যাতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একসেট উপাদান বিদ্যমান থাকে।

স. রা.

ক্ষেত্র / ক্ষেত্রফল (area)

ক্ষেত্রফল হল কোনো বস্তুর পৃষ্ঠ বা তলের পরিমাপ। আমরা জানি, রেখার শুধু দৈর্ঘ্য থাকে অর্থাৎ একটি

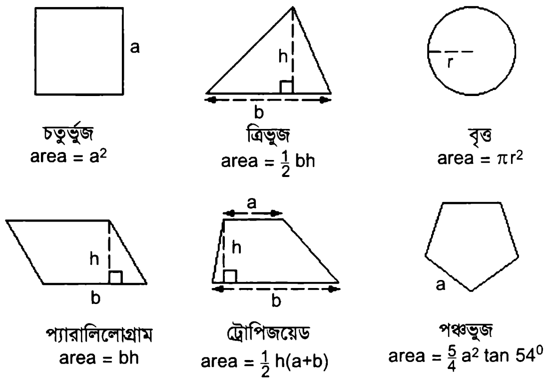

মাত্রা থাকে; তেমনি ক্ষেত্রফলের রয়েছে দু'টি মাত্রা। রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে বিভিন্ন এককের প্রয়োজন হয়। যেমন– সেন্টিমিটার, মিটার ও ফুট ইত্যাদি। ক্ষেত্রফলের দু'টি মাত্রা থাকে বলে এসব এককের বর্গ করলেই ক্ষেত্রফলের একক পাওয়া যায়। একই জাতীয় দু'টি রাশি গুণ করলে রাশিটির বর্গ পাওয়া যায়। যেমন axa = a^2; a^2 হল a-এর বর্গ। তেমনি ক্ষেত্রফলের এককগুলো হল বর্গসেন্টিমিটার, বর্গমিটার, বর্গফুট ইত্যাদি। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের বিভিন্ন একক রয়েছে। যেমন– সিজিএস পদ্ধতিতে বর্গসেন্টিমিটার, এমকেএস পদ্ধতিতে বর্গমিটার, এফপিএস পদ্ধতিতে বর্গফুট এবং এসআই একক হচ্ছে বর্গমিটার। বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠ বা তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বিভিন্ন। সুষম জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন– আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ; সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি x উচ্চতা; বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x দৈর্ঘ্য = (দৈর্ঘ্য)^{২}; ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ x (সমান্তরাল বাহুর যোগফল) x উচ্চতা; বৃত্তের ক্ষেত্রফল = π x (ব্যাসার্ধ)^{২}; গোলকের ক্ষেত্রফল = 4π x (ব্যাসার্ধ)^{২}; সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল = 2π x ব্যাসার্ধ x দৈর্ঘ্য। এখানে π একটি গ্রিক অক্ষর। এর উচ্চারণ 'পাই'। এটি একটি ধ্রুব সংখ্যা। এর মান মোটামুটি $\pi = \frac{২২}{৭}$। অসমতলের ক্ষেত্রফলও নির্ণয় করা যায়।

হো. আ.

খ

খচ্চর (mule / hinny)

গাধা (দ্র) ও ঘোড়ার (দ্র) মিলনে উৎপন্ন বংশধরদের খচ্চর বলে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী, সহজে রোগাক্রান্ত হয় না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কর্মক্ষম থাকে। তাই প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি ভারবাহী জন্তু হিসাবে অনেক দেশেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে খচ্চর নেই বললেই চলে।

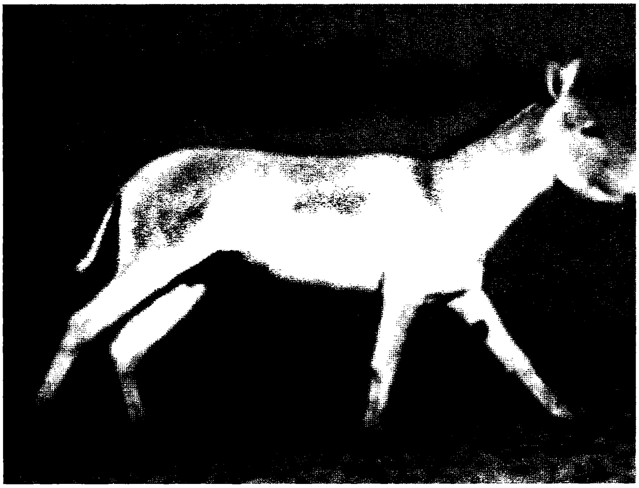

খচ্চর দু' প্রকারের হয়– পুরুষ গাধা ও স্ত্রী ঘোড়ার মিলনে মিউল (mule) এবং পুরুষ ঘোড়া ও স্ত্রী গাধার মিলনে হিন্নি (hinny)। এদের প্রজননক্ষমতা নেই। মিউল ১.৬–১.৭৫ মিটার উঁচু ও ৫৫০-৭০০ কেজি এবং হিন্নি ১.২–১.৬ মিটার উঁচু ও ২৭৫-৬০০ কেজি হয়।

মিউল সাধারণত বাদামি বা লালচে-বাদামি রঙের হয়। গাধার মতো এদের কানও লম্বা, কেশর ছোট, লেজের গোছা বড়, পা চিকন, খুর ছোট। দেহ ঘোড়ার মতো বৃহৎ ও সুগঠিত। মাংসপেশি মজবুত। গলার স্বর গাধার মতো।

খচ্চর ঘোড়া-গাধার মতোই ঘাস খায়। ২০-২৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

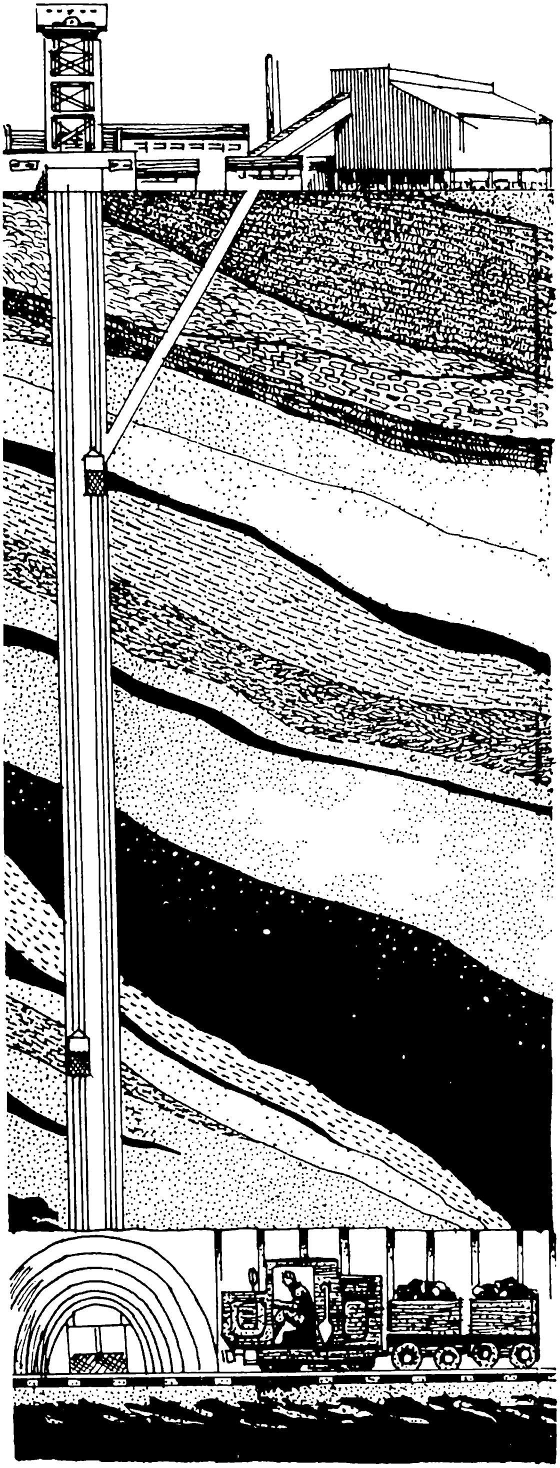

কয়লাখনি থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে

খনি (mine)

আকর, জ্বালানি (দ্র) পদার্থ, পাথর বা বিশেষ কোনো মাটি সংগ্রহের জন্য খোদিত স্থানকে খনি বলে। খনি দু' প্রকার হতে পারে– ভূপৃষ্ঠস্থিত এবং ভূগর্ভস্থ। খনিজ বস্তু যখন ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের অল্প নিচে পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় ভূপৃষ্ঠস্থিত খনি। আবার খনিজ বস্তু যখন ভূতলের অনেক নিচে অবস্থান করে, তখন তাকে ভূগর্ভস্থ খনি বলা হয়। www.boighar.com

খনিজ বস্তুর ধরন ও অবস্থানভেদে এবং তার চারপাশের শিলার কাঠিন্য অনুসারে ভূগর্ভে খনন-প্রণালীর প্রভেদ ঘটে। খনিজ বা ধারক শিলা যথেষ্ট কঠিন না হলে খোদক যন্ত্র বা শাবল-গাঁইতি দ্বারা কাটা হয়। কঠিন শিলা বা খনিজের ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট ফুটো বা ড্রিলিং করে সরু গর্ত করা হয়, তার পর সেখানে বিস্ফোরক ফাটিয়ে খনিজ বস্তু আহরণের কাজ চলে।

খনির মধ্যে যেসব জায়গায় খনিজ বস্তু ওঠানোর কাজ শেষ হয়ে যায়, সেসব জায়গা অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। কারণ সব খনিজ কেটে নেওয়ার পর প্রায়ই খনির মধ্যে ছাদ ধসে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ভূগর্ভস্থ খনিতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা এবং দূষিত বায়ু দূর করা প্রধান এবং প্রথম কাজ। এই উদ্দেশ্যে খনির একেবারে ওপর থেকে খাড়াভাবে এমন সুড়ঙ্গ কাটা হয়, যার সঙ্গে নিচের সবগুলো ধাপের সরাসরি যোগ থাকে। খনির এই সুড়ঙ্গব্যবস্থাকে শ্যাফ্‌ট (shaft) বলা হয়। প্রয়োজনবোধে শ্যাফ্‌টের সংখ্যা কখনো কখনো বাড়ানো চলে। কোনো একটি শ্যাফ্‌টের মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে তা অন্যদিক দিয়ে দূষিত ও খারাপ গ্যাসযুক্ত বাতাস সরিয়ে নিয়ে যায়। আগে খনিতে আলোর জন্য 'ডেভি সেফটি ল্যাম্প' নামে এক ধরনের ল্যাম্প ব্যবহার করা হত। বিদ্যুৎ প্রচলিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যুৎ বাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। খনি ভূমধ্যস্থ জলস্তরে পৌঁছলেই জলনিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সুজ. ব.

খমির (yeast)

রুটি, জিলাপি ইত্যাদি তৈরির সময় ফুলিয়ে ফাঁপা করার জন্য মাখানো ময়দায় লেচির সঙ্গে ছত্রাক জাতীয় এক

রকম এককোষী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মেশানো হয়। এটিই খমির বা ঈস্ট। বিশেষ করে শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে এটি নিজেকে বার বার বিভক্ত করার মাধ্যমে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। প্রায় ৬০০ বিভিন্ন প্রকার খমির রয়েছে– যদিও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এর মাত্র দু'একটি। তবে এই উদ্ভিদের রেণু বাতাসে উড়ন্ত অবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান। যে প্রক্রিয়ায় এটি রুটি বা জিলাপিকে ফুলিয়ে তোলে, একই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আঙুর বা তালের রসের মতো চিনি বা শর্করা জাতীয় জিনিসকে গাঁজিয়ে মদে পরিণত করে। এই বিক্রিয়াটিকে বলে ফার্মেন্টেশন বা খমিরায়ন। এসবকে উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিলে বাতাসের খমির যুক্ত হয়ে এবং বংশবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। ভাত থেকে পান্তা হওয়াসহ আরো বহু রকম খাদ্যপরিবর্তনে এই একই রকম বিক্রিয়া ঘটে।

খমির সবুজ উদ্ভিদ নয় বলে এটি তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। পুষ্টির জন্য এটি চিনি, শর্করা ইত্যাদি মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। মাধ্যমের এই খাদ্যকে ভেঙে ফেলার জন্য এটি এনজাইম নামক কিছু বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে। এ রকম কয়েকটি এনজাইম চিনিকে ভেঙে অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে। এটিই খমিরায়ন বিক্রিয়া। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রুটির লেচিকে ফুলিয়ে তোলে। তন্দুরে রুটি সেঁকার সময় উৎপন্ন অ্যালকোহল উঠে যায় আর খমিরও মরে যায়। মদ জাতীয় দ্রব্যের খমিরায়নে অ্যালকোহল থেকে যায় আর কার্বন ডাই-অক্সাইড এর মধ্যে বুদ্বুদ সৃষ্টি করে।

বাতাসের খমিরের ব্যবহার যদিও মানুষ হাজার বছর ধরে করছে, বাজারজাত করার মতো খমির উৎপন্ন হচ্ছে মাত্র ১৮৮০ সাল থেকে। আজকাল ব্যাপক ভিত্তিতে এটি তৈরি হয় প্রধানত চিটাগুড়ের সাহায্যে।

মু. ই.

খরগোশ (hare / rabbit)

খরগোশ ছোট আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র)। পৃথিবীর সর্বত্র বন্য খরগোশ অর্থাৎ হেয়ার ও র‍্যাবিট বাস করে। হেয়ার ও র‍্যাবিটের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। বাংলায় খরগোশ বললে দু'টিই বোঝায়। বিশ্বে প্রায়

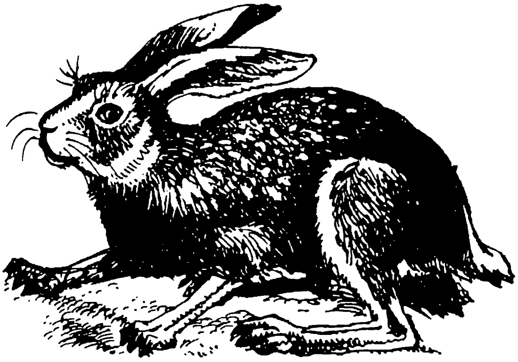

৬৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে আছে দু'টি। বন্য র‍্যাবিট থেকেই গৃহপালিত খরগোশের উৎপত্তি। ৪০-৫০ জাতের গৃহপালিত খরগোশ আছে। এদের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এর লোমযুক্ত চামড়া দামি ফার-কোট, টুপি প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মাংস ও চামড়ার জন্য খামার ভিত্তিতে এবং শখের বশে খরগোশ পোষা হয়।

এদের দেহ চিকন ও লম্বা, লেজ ছোট, কান বড় বড়। প্রজাতিভেদে কান ৭-২৫ সেমি হয়। কান ঘুরিয়ে যে কোনো দিকের শব্দ এরা শুনতে পারে। এরা হাঁটেও না, দৌড়ায়ও না। এদের পেছনের পা দু'টি অত্যন্ত লম্বা। এগুলোর ওপর ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ঘণ্টায় ২৫-৩০ কিলোমিটার বেগে লাফাতে পারে। বিপদে পড়লে এক লাফে তিন মিটার পর্যন্ত যায়।

প্রজাতিভেদে এদের আকৃতি ও রঙে পার্থক্য থাকে। ২০-৭০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ওজনে ০.৯-২.৩ কেজি হয়। গৃহপালিত সাদা ফ্লেমিশ জাত ৮ কেজি পর্যন্ত

হয়। বন্যগুলো বাদামি ও ধূসর। গৃহপালিতগুলো সাদা, কালো, ধূসর, বাদামি বা মিশ্রিত রঙের।

হেয়ার একাকী এবং র‍্যাবিট দলবদ্ধভাবে বাস করে। এদের খাদ্য ঘাস-পাতা, গাছের ছাল, শাক-সবজি, ফল-মূল।

স্ত্রী-খরগোশ বছরে বেশ ক'বার বাচ্চা দেয়। প্রজাতিভেদে ২৬-৩২ দিন গর্ভধারণের পর দু' থেকে আটটি বাচ্চা দেয়। র‍্যাবিটের বাচ্চাগুলো লোমহীন, অন্ধ ও অসহায়। দশ দিনে এদের চোখ ফোটে। হেয়ারের বাচ্চাগুলো পূর্ণাঙ্গ। জন্মের অল্পক্ষণ পরেই খরগোশ লাফাতে পারে। ৬-৮ মাসে প্রজননক্ষম হয়। এরা ৫-১০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

খরতা (alkalinity)

খরতা বলতে বোঝায় পানিতে মিশ্রিত খনিজ পদার্থের কারণে পানির স্বাভাবিক অবস্থার ভিন্নতা। সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের বিভিন্ন লবণ (দ্র) (রাসায়নিক) পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে সে পানিতে সাবান গুললে ভালো ফেনা হয় না। এ ক্ষেত্রে লবণগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি-অ্যাসিডের ধাতব লবণ তৈরি হয়। এই ধাতব লবণ সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে। খরতা দুই ধরনের– অস্থায়ী খরতা ও স্থায়ী খরতা। অস্থায়ী খরতার ক্ষেত্রে পানিতে দ্রবীভূত থাকে বিভিন্ন বাই-কার্বনেটের সল্ট বা লবণ। এ ধরনের খর পানি গরম করে ফুটিয়ে নিলে পানির খরতা চলে যায়। এটি ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

অন্য দিকে স্থায়ী খর পানির খরতার কারণ হল পানিতে ধাতব সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা। এই পানির খরতা দূর করার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

সু. ব.

খলিশা (*khalisa*)

এই মাছকে স্থানীয়ভাবে অনেকে খল্‌শা, খয়রা, খয়লা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেন। বৈজ্ঞানিক নাম *Colisa fasciatus*। এটি Clupeiformes বর্গের অন্তর্গত। খলিশা মাছের দেহ বেশ চাপা, পিঠের রঙ অনেকটা সবুজ এবং পেটের দিকের রঙ অনেকটা ফ্যাকাশে সাদা। সারা দেহে কমলা ও সবুজ রঙের ১৪টি ডোরা দাগ থাকে। এই দাগগুলো পিঠের দিক থেকে পেটের দিকে বিস্তৃত থাকে। এদের মাথা দেহের মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, দেহের আঁইশ ছোট ছোট ও চিরণ্যাকৃতির। প্রায় ১২.৭ সেন্টিমিটার লম্বা। পিঠের পাখনা কাঁটাবহুল এবং লেজের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। বক্ষপাখনাও বেশ লম্বা এবং তা পায়ুপাখনার দশম কাঁটা পর্যন্ত প্রলম্বিত। শ্রোণিপাখনা সূত্রবৎ। এটি পুচ্ছপাখনার গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, দিঘি,

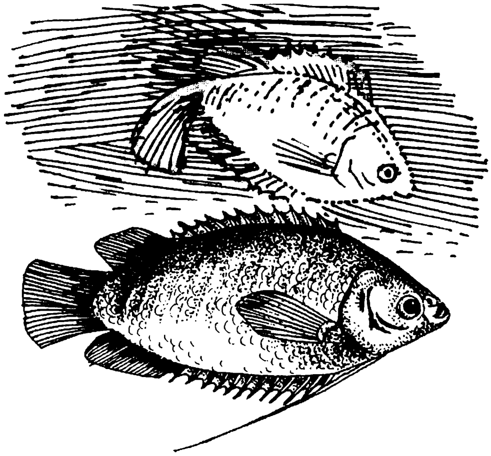

হাওড়-বাঁওড়ে পাওয়া যায়। এরা ঘোলা পানির চেয়ে পরিষ্কার পানিতেই বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। খলিশা মাছ জলের উপরিভাগের মাছ। এদের মুখ কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী এবং প্রসারণক্ষম। অর্থাৎ এরা সচরাচর নিজেদের মুখ বন্ধ বা ভাঁজ করে রাখে, কেবল খাওয়ার সময় এবং শ্বাস গ্রহণ করা ও ছেড়ে দেয়ার সময় মুখ খোলে। এরা জলে ভাসমান জলজ পোকা-মাকড়, মশার শূককীট ও মূককীট, শেওলা, কাদা-বালি, প্লাঙ্কটন নামক ছোট ছোট জলজ কীট বেশি পছন্দ করে। এরা সাধারণত দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত এসব খাবার গ্রহণ করে। বর্ষাকালে পুরুষ খলিশা মাছ ধানক্ষেত ও পাটক্ষেতে মুখ দিয়ে বুদ্বুদ তৈরি করে ভাসমান বাসা বাঁধে এবং বাসাটিকে খুব কড়া পাহারায় রাখে। এই বাসায় স্ত্রী খলিশা মাছ হালকা রঙের ডিম পাড়ে। খলিশা মাছ খেতে সুস্বাদু।

অ. ব.

খাড়া মানুষ হোমো ইরেক্টুস দ্র
খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন দ্র

খাদ্যশৃঙ্খল (food chain)

প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ বা স্বভোজী জীবেরাই মূলত উৎপাদক। যেসব উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম, তাদের প্রাথমিক উৎপাদক (primary producer) বলা হয়। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এতে সূর্যের আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শর্করাজাতীয় খাদ্যে তা আবদ্ধ হয়। প্রথম শ্রেণির খাদক (primary consumer) উৎপাদকসমূহকে ভক্ষণ করে শক্তি সঞ্চয় করে। পরে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক প্রথম শ্রেণির খাদককে ভক্ষণ করে শক্তি সংগ্রহ করে। অনুরূপভাবে, তৃতীয় শ্রেণির খাদক দ্বিতীয় শ্রেণির খাদককে ভক্ষণ করে এবং চতুর্থ শ্রেণির খাদক তৃতীয় শ্রেণির খাদককে ভক্ষণ করে শক্তি সংগ্রহ করে। এভাবে উৎপাদক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের খাদকের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিরাজ করে তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

প্রকৃতিতে প্রধানত তিন ধরনের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন– (১) পরভোজী খাদ্যশৃঙ্খল, (২) পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল এবং (৩) মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল।

উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে ক্রমশ ছোট এবং বড় প্রাণীর মধ্যে যে খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে, তাকে পরভোজী খাদ্যশৃঙ্খল বলে। এই ধরনের একটি খাদ্যশৃঙ্খল হল– ঘাস-হরিণ-বাঘ।

বড় জীব থেকে শুরু করে ক্রমশ ছোট জীবের মধ্যে যে খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে, তাকে পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়। এই ধরনের একটি খাদ্যশৃঙ্খল হল– মানুষ-মশা-ম্যালেরিয়ার জীবাণু।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের সাথে বিভিন্ন অনুজীব (micro-organisms) এবং প্রাণীর মধ্যে যে খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে, তাকে মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল বলে। এই ধরনের একটি খাদ্যশৃঙ্খল হল– মৃতদেহ-ছত্রাক-কেঁচো।

খাদ্যশৃঙ্খল যে কোনো পরিবেশের অবশ্যম্ভাবী এবং আবশ্যিক বিষয়। যে কোনো পরিবেশে, যেখানে কোনো না কোনো জীব তথা প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটি সুস্পষ্ট খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে। একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল প্রকৃতিতে এক জটিল

জাল বা চক্রের সৃষ্টি করে, যাকে খাদ্যজাল (food web) বলে। একটি খাদ্যজালে যেমন একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল জড়িত থাকে, ঠিক তেমনি একাধিক জীব তথা প্রাণী ও উদ্ভিদ একটি খাদ্যজালে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারে।

অ. ব.

খেজুর (date)

দীর্ঘজীবী শাখাহীন গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *ফিনিক্স সিলভেস্ট্রিস (Phoenix sylvestris)*। গোত্র পালমী (Palmae)। এই গাছটিই আমাদের দেশে সবখানে দেখা যায়। ৩০-৩৫ ফুটের মতো উঁচু হয়। দীর্ঘ শাখাহীন কাণ্ডের মাথায় পত্রমুকুট থাকে এবং কাণ্ডটি পত্রমূল দ্বারা আবৃত থাকে। পাতাগুলো পক্ষল ও পত্রদণ্ড প্রায় ৭-৮ ফুট লম্বা হয়। দণ্ড থেকে দু'দিকে পাতা বের হয়, আগা কাঁটায় পরিণত হয়। খেজুর গাছে পুং ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক পৃথক গাছে জন্মায়। ফুল ছোট ও সাদা রঙের। ফল হয় কমলা রঙের, মাংস তেমন থাকে না, বীজ খুব শক্ত হয়। যশোর ও উত্তরবঙ্গে বেশি খেজুর গাছ জন্মায়। শীতের আগে গাছের মাথার কাছে কাণ্ডের কিছু অংশ চেঁছে রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস সুস্বাদু, সুপেয়। এতে শতকরা ১৪ ভাগ শর্করা ও প্রচুর ভিটামিন থাকে। এই রস কাঁচা খাওয়া যায়। আবার অল্প জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করে খেতে আরো বেশি সুস্বাদু। রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। রস গাঁজিয়ে তাড়ি করা হয়।

আদিকাল থেকে আরব ও পশ্চিম এশিয়ায় খেজুর অন্যতম প্রধান খাদ্য। দক্ষিণ ইরাক, মদিনার আশেপাশের মরূদ্যান ও উর্বর অঞ্চল এবং দক্ষিণ আরবের উপকূলীয় এলাকায় শতাধিক রকম খেজুর জন্মে। উন্নত জাতের খেজুরের নামও খুব সুন্দর– সুগন্ধির মাতা, কনের আঙুল, সতী কন্যা, লাল চিনি ইত্যাদি। ইরাক, আরব ও ইরান উন্নত জাতের খেজুরের জন্য প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ইরাক পৃথিবীর বৃহত্তম খেজুর উৎপাদনকারী এলাকা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও ভালো খেজুর হয়। সেপ্টেম্বর মাসে খেজুর আহরণ শুরু হয়। পাকা খেজুরের রঙ লাল, অল্প পাকা বা কাঁচা খেজুরের রঙ হয় হলদে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ফিনিক্স ডেকটাইলিফেরা (Phoenix dactylifera)*। গোত্র পালমী। একে বাংলায় পিণ্ড খেজুর বলে।

খেজুরের গাছ থেকে দোলনা, চাঙ্গাড়ি, হালকা নৌকা হয়। পাতা থেকে ঝুড়ি, পাখা এবং গুঁড়ি থেকে ঘর ও খাল-নালার পুল হয়। খেজুর গুঁড়ি আবার খুঁটির কাজেও লাগে। পাকা খেজুরে শতকরা ৫০ ভাগ শর্করা, অল্প পরিমাণ প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ ও অজৈব নুন থাকে।

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত প্রচুর খেজুরের বীজ থেকে মনে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার অব্দেও সিন্ধু দেশের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

বি. ব.

খেসারি ডাল দ্র

গ

গজারি (sal tree)

ঢাকার ভাওয়াল, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, দিনাজপুর এবং রাজশাহীর লালমাটির বনাঞ্চল, এমনকি সাভারে উঁচু সুদৃশ্য বৃক্ষরাজির যে বনাঞ্চল দেখা যায় তা গজারি বন। গজারির অপর নাম শাল। দীর্ঘাকৃতি, আংশিক পর্ণমোচী বৃক্ষ গজারি Dipterocarpaceae গোত্রভুক্ত, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Shorea robwsta Gaerl n.f* এবং ইংরেজি নাম শাল ট্রি। বাকল লালচে খয়েরি বা ধূসর এবং মসৃণ বা লম্বালম্বি খাঁজকাটা। পাতা বেশ বড়, প্রায় গোলাকৃতি, চামড়ার মতো। পরিণত অবস্থায় উপর দিক চকচকে সবুজ এবং নিচের দিক সাদাটে। পুষ্পমঞ্জরি বেশ বড়। ফুল খুব ছোট, হলুদাভ হলেও মঞ্জরির জন্য বেশ সুন্দর দেখায়।। ফল লম্বা ডিম্বাকৃতি, লালচে থেকে ম্লান হলুদ-সবুজ রঙের বীজের অধিকারী। একবীজী কিন্তু অসমান আকারের পাঁচটি পাখার মতো স্থায়ী বৃতিযুক্ত। বীজ ডিম্বাকৃতি; মাংসল অসমান বীজপত্র বিশিষ্ট। সাধারণ অবস্থায় ১৮-৩০ মিটার উঁচু হয়ে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে সোজা হয়ে বেড়ে ওঠে। গজারি দাবানল-প্রতিরোধী। গজারি ফল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পাকে। ফল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি অনেক সময় গাছে থাকতেই বীজ গজিয়ে যায়। বীজের জিয়তা খুব কম সময় থাকে। গজারি কাঠ নির্মাণ কাজসহ গৃহস্থালি কাজে উপযোগী। এসব কাঠ হালকা খয়েরি সাদা কিন্তু সার-কাঠ খয়েরি রঙের। এর বাকল, পাতা এবং কচি ডগা ট্যানিং দ্রব্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। গজারির রেজিন প্রাকৃতিক রেজিনের মধ্যে অন্যতম। গজারি গাছ লাক্ষার কীটের প্রাথমিক পোশাক বিশেষ করে কুসুমী স্ট্রেইন-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

গণিত (mathematics)

ইংরেজি ম্যাথম্যাটিক্স্ (mathematics) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গণিত। ম্যাথম্যাটিক্স্ শব্দটি গ্রিক mathemata থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ'। গণিত একটি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্র, যার ভিত্তিমূল হচ্ছে

সংখ্যা। মানুষ আদিকালে যখন পশুপালন আরম্ভ করল, তখন পশু চরিয়ে ফেরার সময় সবগুলো ঠিক আছে কিনা তা গুণে দেখার দরকার হত। এরূপ গণনা থেকেই গণিতের শুরু। তাই বলা যায়, মূলত গণিত একটি বিজ্ঞান, যেখানে সংখ্যা, আকার ও স্থানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অধ্যয়ন বা গবেষণা হয়ে থাকে।

গণিতের প্রধান শাখাগুলো হল– পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি। প্রথম দিকে গণিতের দু'টি প্রধান শাখা ছিল– পাটিগণিত ও জ্যামিতি। পাটিগণিত হল সংখ্যার বিজ্ঞান। পাটিগণিতের কাজে সাহায্য করার জন্য অজানা পরিমাণ বা রাশি নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্ভাবিত হয় বীজগণিত। জ্যামিতি হল বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও তাদের সম্পর্কের বিজ্ঞান। যাযাবর জীবন কাটিয়ে মানুষ যখন ফসল ফলাতে শিখল, তাদের শস্য মজুদ ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আকৃতির বস্তু তৈরির প্রয়োজন হল, প্রয়োজন হল জমি মাপজোখের, তখন থেকে জ্যামিতির বিকাশ শুরু হয়। গতি সম্বন্ধে মাপজোখ করতে গিয়ে আসে ক্যালকুলাস। যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– ক্যালকুলাসের সাহায্যে জানা যায় একটি কামানের মুখ মাটি থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে রাখলে ঐ কামানের গোলা সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে।

সাধারণত এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু গণিতকে এমন একটি ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভাষার বর্ণমালার মতো গণিতেরও রয়েছে বর্ণমালা। এগুলোকে প্রতীক বলে। যেমন– সংখ্যা তৈরির জন্য সংখ্যাপ্রতীক বা অঙ্ক (১, ২, ৩ বা 1, 2, 3 ইত্যাদি); অজানা সংখ্যার জন্য বর্ণ (x, y, z ইত্যাদি); বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ দেখানোর জন্য সমীকরণ (x+y = 20 ইত্যাদি)।

মানবসভ্যতার বিকাশে গণিতের অবদান অনেক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গণিত এক অপরিহার্য সাথি।

হো. আ.

গণ্ডার (rhinoceros)

বৃহদাকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। দু'টি গ্রিক শব্দ, রাইনো (অর্থাৎ নাক) এবং সেরোস (অর্থাৎ শিং) মিলে রাইনোসেরোস (rhinoceros)। নাকের ঠিক ওপরে শিংয়ের অবস্থান। এই শিং গরু-ছাগলের মতো নয়। ত্বকের বিশেষ ধরনের অনেকগুলো কোষ মিলে এটি তৈরি হয়। সারা জীবন ধরে তা বাড়ে। ভেঙে গেলে আবার গজায়। সাদা গণ্ডারের শিং দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

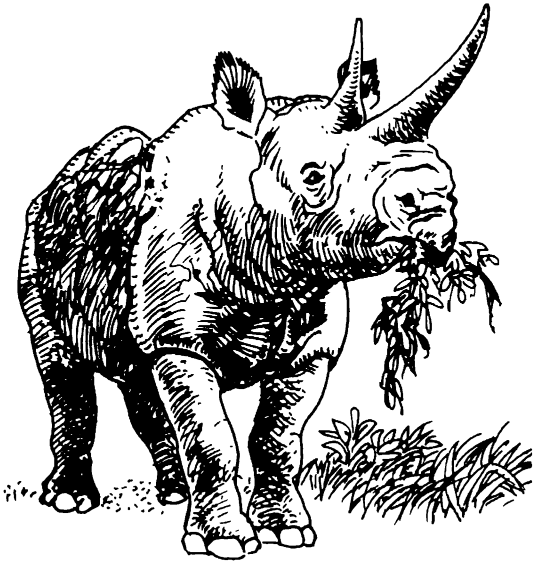

গণ্ডারের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে। আফ্রিকায় দু'টি এবং এশিয়ায় তিনটি দেখা যায়। ভারতীয় ও জাভার প্রজাতি একশিঙ্গী; আফ্রিকার প্রজাতি সাদা ও কালো এবং সুমাত্রার প্রজাতি দ্বিশিঙ্গী।

বিরাট শরীরের তুলনায় গণ্ডারের পা ছোট। পায়ে তিনটি করে ছোট ছোট খুর রয়েছে। শরীরের চামড়া পুরু হলেও বেশ ঢিলেঢালা। আফ্রিকার গণ্ডারগুলোর চামড়া মসৃণ। ভারতীয় গণ্ডার দেখতে বর্মপরা সৈনিকের মতো। শুধু কান ও লেজেই লোম থাকে। ভারতীয় এবং সাদা গণ্ডার বৃহত্তম। প্রায় ১.৮ মিটার উঁচু ও ৪.৫ মিটার লম্বা হয়, ওজন ৩০০০-৪০০০ কেজি। সুমাত্রার গণ্ডার ক্ষুদ্রতম গণ্ডার। প্রায় ১.৪ মিটার উঁচু ও ১০০০ কেজি ওজন হয়। গণ্ডার ঘাস, লতা-গুল্ম, পাতাযুক্ত শাখা-

সংখ্যা। মানুষ আদিকালে যখন পশুপালন আরম্ভ করল, তখন পশু চরিয়ে ফেরার সময় সবগুলো ঠিক আছে কিনা তা গুণে দেখার দরকার হত। এরূপ গণনা থেকেই গণিতের শুরু। তাই বলা যায়, মূলত গণিত একটি বিজ্ঞান, যেখানে সংখ্যা, আকার ও স্থানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অধ্যয়ন বা গবেষণা হয়ে থাকে।

গণিতের প্রধান শাখাগুলো হল– পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ইত্যাদি। প্রথম দিকে গণিতের দু'টি প্রধান শাখা ছিল– পাটিগণিত ও জ্যামিতি। পাটিগণিত হল সংখ্যার বিজ্ঞান। পাটিগণিতের কাজে সাহায্য করার জন্য অজানা পরিমাণ বা রাশি নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্ভাবিত হয় বীজগণিত। জ্যামিতি হল বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও তাদের সম্পর্কের বিজ্ঞান। যাযাবর জীবন কাটিয়ে মানুষ যখন ফসল ফলাতে শিখল, তাদের শস্য মজুদ ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আকৃতির বস্তু তৈরির প্রয়োজন হল, প্রয়োজন হল জমি মাপজোখের, তখন থেকে জ্যামিতির বিকাশ শুরু হয়। গতি সম্বন্ধে মাপজোখ করতে গিয়ে আসে ক্যালকুলাস। যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– ক্যালকুলাসের সাহায্যে জানা যায় একটি কামানের মুখ মাটি থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে রাখলে ঐ কামানের গোলা সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়বে।

সাধারণত এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু গণিতকে এমন একটি ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, যা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভাষার বর্ণমালার মতো গণিতেরও রয়েছে বর্ণমালা। এগুলোকে প্রতীক বলে। যেমন– সংখ্যা তৈরির জন্য সংখ্যাপ্রতীক বা অঙ্ক (১, ২, ৩ বা 1, 2, 3 ইত্যাদি); অজানা সংখ্যার জন্য বর্ণ (x, y, z ইত্যাদি); বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ দেখানোর জন্য সমীকরণ (x+y = 20 ইত্যাদি)।

মানবসভ্যতার বিকাশে গণিতের অবদান অনেক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গণিত এক অপরিহার্য সাথি।

হো. আ.

গণ্ডার (rhinoceros)

বৃহদাকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। দু'টি গ্রিক শব্দ, রাইনো (অর্থাৎ নাক) এবং সেরোস (অর্থাৎ শিং) মিলে রাইনোসেরোস (rhinoceros)। নাকের ঠিক ওপরে শিংয়ের অবস্থান। এই শিং গরু-ছাগলের মতো নয়। ত্বকের বিশেষ ধরনের অনেকগুলো কোষ মিলে এটি তৈরি হয়। সারা জীবন ধরে তা বাড়ে। ভেঙে গেলে আবার গজায়। সাদা গণ্ডারের শিং দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

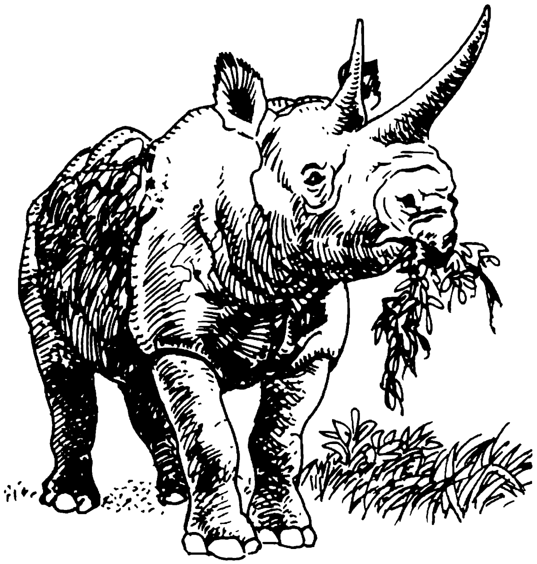

গণ্ডারের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে। আফ্রিকায় দু'টি এবং এশিয়ায় তিনটি দেখা যায়। ভারতীয় ও জাভার প্রজাতি একশিঙ্গী; আফ্রিকার প্রজাতি সাদা ও কালো এবং সুমাত্রার প্রজাতি দ্বিশিঙ্গী। www.boighar.com

বিরাট শরীরের তুলনায় গণ্ডারের পা ছোট। পায়ে তিনটি করে ছোট ছোট খুর রয়েছে। শরীরের চামড়া পুরু হলেও বেশ ঢিলেঢালা। আফ্রিকার গণ্ডারগুলোর চামড়া মসৃণ। ভারতীয় গণ্ডার দেখতে বর্মপরা সৈনিকের মতো। শুধু কান ও লেজেই লোম থাকে। ভারতীয় এবং সাদা গণ্ডার বৃহত্তম। প্রায় ১.৮ মিটার উঁচু ও ৪.৫ মিটার লম্বা হয়, ওজন ৩০০০-৪০০০ কেজি। সুমাত্রার গণ্ডার ক্ষুদ্রতম গণ্ডার। প্রায় ১.৪ মিটার উঁচু ও ১০০০ কেজি ওজন হয়। গণ্ডার ঘাস, লতা-গুল্ম, পত্রযুক্ত শাখ-

প্রশাখা খায়। প্রতিদিন গড়ে ত্রিশ-চল্লিশ কেজি খাবার খায়। পুরুষ-গণ্ডার পাঁচ-সাত বছরে এবং স্ত্রী-গণ্ডার তিন-চার বছরে প্রজননক্ষম হয়। পনেরো-আঠারো মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-গণ্ডার একটি বাচ্চা প্রসব করে। তবে সুমাত্রার গণ্ডারের গর্ভধারণকাল সাত-আট মাস। ত্রিশ-চল্লিশ বছর বাঁচে। বর্তমানে এরা বিলুপ্তির পথে।

আ. ন. ম. আ. র.

গতি (motion)

কোনো বস্তু যখন স্থানের মধ্যে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে তখন সে ঘটনাকে বলা হয় গতি। একটি বস্তু গতিশীল কিনা তা অবশ্য অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। পৃথিবীতে নানা জীব ও জড়ের গতি এবং আকাশে জ্যোতিষ্কসমূহের গতি মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে গতি সম্বন্ধে উৎসুক করে রেখেছে। গতি সম্পর্কে মানুষের সনাতন অনেক ধারণাই ছিল ভুল। এমনকি অ্যারিস্টোটলের মতো পণ্ডিত দার্শনিকও এ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দীর্ঘকাল স্থায়ী করে গিয়েছিলেন। যেমন একটি ধারণা ছিল– যতক্ষণ বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ থাকে ততক্ষণই এটি গতিশীল থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাকারী গালিলেও (দ্র) ও নিউটন (দ্র) এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, গতিবেগের পরিবর্তন করতেই শুধু বলের প্রয়োজন হয়, কোনো বাধা না পেলে একটি গতিশীল বস্তু বলপ্রয়োগহীন অবস্থায় সরলরেখায় সমবেগে গতিশীল থাকবে। এটি পদার্থের জড়তার ধর্ম।

তাঁরা আরো দেখিয়েছেন যে গতিবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ত্বরণ বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক। অবশ্য বস্তুটির ভর যত কম হবে একই বলপ্রয়োগের কারণে তার ত্বরণ তত বেশি হবে। স্বাভাবিক জড়তার নিয়ম ছেড়ে কোনো বস্তু যখন বক্র পথে চলে তখনো বুঝতে হবে তার উপর কোনো বল কাজ করছে। নিউটন তাঁর বিখ্যাত গতিসূত্রসমূহে গতির এসব মৌলিক নীতি সুন্দর ও সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথম সূত্রে বস্তুর গতি-জড়তার কথা আছে। দ্বিতীয় সূত্রে বল, ত্বরণ ও ভরের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তৃতীয় সূত্রে আছে প্রত্যেক ক্রিয়ার যে একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সে কথা। এই গতিসূত্রের ভিত্তিতে গড়া নিউটনীয় গতিবিদ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুর গতির নিখুঁত গাণিতিক নির্ণয়ন সম্ভব করে বিজ্ঞানকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল। এর ফলে সারা বিশ্বকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করার দাবি সম্ভব হয়েছে এবং বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকে নিউটনীয় গতিবিদ্যায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন বিজ্ঞান ঘটিয়ে তুলেছে। যদিও দৈনন্দিন যেসব বস্তুর গতি নিয়ে পৃথিবীতে আমাদের কাজ করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে এই গতিবিদ্যা নির্ভুল, কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আণবিক পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার গতির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম সৃষ্টি করেছে। এর দ্বারা বোঝা গেছে যে এ রকম বস্তুর অবস্থান ও গতিকে এক সঙ্গে নির্ণয় করতে গেলে উভয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, একটিকে নির্ভুল করতে গেলে অন্যটিকে অমোঘভাবে কিছু অনিশ্চয়তা মেনে নিতে হয়। নিউটনীয় সুনির্দিষ্টতার বদলে তখন অনেক কিছুকে সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু দেখা সম্ভব হচ্ছে। অন্য দিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ববাদ আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলমান বস্তুর ভর ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে বলে প্রমাণ করার পর এখানেও নিউটনীয় গতিবিদ্যা থেকে কিছুটা সরে যেতে হয়েছে। সাধারণ কাজে পুরানো গতিবিদ্যা হুবহু অনুসরণ সম্ভব হলেও আণবিক ও মহাজাগতিক ক্ষেত্রে এই দুই নতুন তত্ত্বের মাধ্যমেই অনেক কিছু ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে– এবং তা খুব সাফল্যের সঙ্গে সম্ভবও হচ্ছে।

মু. ই.

গতি / বলবিদ্যা (motion / mechanics)

বলবিদ্যার যে শাখা বলের ক্রিয়ার ফলে গতিপ্রাপ্ত বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা করে এর মধ্যে বল ও গতির সম্পর্ক এবং গতির বর্ণমালাও অন্তর্ভুক্ত। কাল ব্যবধান, দূরত্ব ও ভরকে মৌলিক হিসাবে নেয়া হয় এবং বস্তুর জড়তা ধর্ম রয়েছে বিবেচনা করা হয়। গতিশীল বস্তুর ভরবেগ শুধু দুই ভাগে ভাগ করা হয়– সৃতিবিদ্যা ও চলবিদ্যা। গতি বলবিদ্যার যে অংশে বস্তুর বিভিন্ন প্রকার সম্ভাব্য গতি ও তার ফলে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন

আলোচনা করা হয়, কিন্তু গতির কারণ বিবেচনা করা হয় না, তাকে সৃতিবিদ্যা বলে। আর যে অংশে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সম্পর্ক এবং বল প্রয়োগের ফলে উৎপন্ন গতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় চলবিদ্যা।

শা. ত.

গন্ধক (sulphur)

গন্ধক আমাদের একটি অতি পরিচিত পদার্থ। বহুকাল আগে থেকেই এটিকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করে আসছি। অনেক খনিতেই গন্ধক বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে প্রচুর গন্ধক রয়েছে। তবু পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ গন্ধক আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা ও টেকসাসের খনি থেকে। ইতালির সিসিলি দ্বীপ এবং জাপানেও গন্ধকের খনি আছে। লোহা, সিসা ও দস্তার খনিতে এদের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় গন্ধক থাকে। তবে এ সকল খনি থেকে গন্ধক তৈরি করা যায় না। খনিজগুলিকে পুড়িয়ে যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় তা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। পিঁয়াজ, রসুন ও মূলার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যের সাথে গন্ধক সংযুক্ত থাকে। এদের স্বাদ ও গন্ধের জন্য গন্ধকই দায়ী। কপির পাতা ও ডিমেও গন্ধক থাকে। পচা ডিমের গন্ধের জন্য দায়ী গন্ধক যৌগটির নাম হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। গ্যাসটি বেশ দুর্গন্ধযুক্ত হলেও এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য।

সাধারণ অবস্থায় গন্ধকের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। এটি পানিতে অদ্রবণীয় হলেও কার্বন ডাই-সালফাইডে বেশ দ্রবণীয়। গন্ধক তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না এবং কয়েকটি বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে। প্রকৃতিতে যে গন্ধক পাওয়া যায় তার দানাগুলি সুচের মতো লম্বা বা নানা পল-বিশিষ্ট হয়। ফুটন্ত অবস্থায় গন্ধককে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ঢেলে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করলে তা জমে গিয়ে অনেকটা রাবারের মতো শক্ত হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে নমনীয় গন্ধক (Plastic sulphur)।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সূত্রে গন্ধক খুবই সক্রিয় একটি মৌল। দু'একটি বাদে প্রায় সকল ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যৌগ তৈরি করে। বাতাসে এটি নীল শিখা সহকারে জ্বলে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। গ্যাসটি বিষাক্ত, অত্যন্ত কটু, দম আটকানো গন্ধযুক্ত ও জীবাণুনাশক।

গন্ধকের সঙ্গে কার্বন ও নিশাদল মিশিয়ে বারুদ তৈরি করা হয়। রাবারের সঙ্গে গন্ধক উত্তপ্ত করে রাবারকে ভালকানাইজ (vulcanise) করা হয়। এতে রাবার বেশ শক্ত ও স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়। জীবাণুনাশকরূপে ও সালফা ড্রাগ জাতীয় ঔষধ তৈরি করতে গন্ধকের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। দিয়াশলাই, নানা প্রকার রঙ ও সার তৈরি করতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। কাগজ-শিল্পে সালফার ডাই-অক্সাইডের বেশ ব্যবহার রয়েছে।

গন্ধকের প্রধান ব্যবহার রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনে। খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধনে, রঞ্জন-শিল্পে, সঞ্চয়ী বিদ্যুৎকোষে, ইস্পাতের তার তৈরি করতে, নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে এবং আরো বহু কাজে সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

গন্ধরাজ (gardenia)

বৈজ্ঞানিক নাম *Gardenia florida*। ফ্লোরিডা শব্দ থেকে বোঝা যায়, উত্তর আমেরিকা এর আদি নিবাস। বয়স্ক গাছ ৩-৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা শিরাযুক্ত, অনেকটা পেয়ারার মতো। ফুলের রঙ দুধসাদা। আস্তে আস্তে হলদেটে হতে থাকে। ফুল

অতিশয় সুগন্ধি ও চারদিক আমোদিত করে। ফুলের ১২টি দল ও ৬টি কেশর আছে। প্রধানত বসন্তে ও গ্রীষ্মকালে ফোটে। ফল হয় না। ডাল রোপণ করে অথবা কলম থেকে চারা হয়।

বি. ব.

গবেষণা, বৈজ্ঞানিক (scientific research)

বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য হল প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতররূপে জানা এবং তা ব্যবহার করে নানা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিজ্ঞানীরা এ জন্য পর্যবেক্ষণ করেন, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ও তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। সূক্ষ্মভাবে ও নির্ভুলভাবে নানা বস্তু ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যেমন– অণুবীক্ষণযন্ত্রের উদ্ভাবন ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্য করেছে দূরের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে। পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত ও তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে ও এদের মধ্যে সম্পর্ক বা নিয়ম অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। তত্ত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কল্পনা ও অনুমানকে ব্যবহার করেন, হিসাব-নিকাশ করেন, অঙ্ক কষেন ও নানা মডেল উপস্থিত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একটি মূল বৈশিষ্ট্য ও পূর্বশর্ত হল, যে কোনো উদ্ভাবিত তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত বা সমর্থিত হতে হবে। মেন্দেলিয়েফ (দ্র) বিভিন্ন রকম পরমাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যায়-সারণি উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর তত্ত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে সমর্থন পেয়েছে। নিউটন পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলবিদ্যার সূত্র ও অভিকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। www.boighar.com

টমাস এডিসনের (দ্র) গবেষণার ফসলরূপে আমরা পেয়েছি টেপ রেকর্ডার, টেলিফোন (দ্র), ক্যামেরা (দ্র) ইত্যাদি। জেমস ওয়াটের গবেষণা দিয়েছে স্টিম ইঞ্জিন, ডারউইনের (দ্র) গবেষণার ফসল হল প্রাণিজগতে বিবর্তনের তত্ত্ব। প্রফেসর আবদুস সালাম (দ্র) গবেষণার দ্বারা বিশ্বের মৌলিক বলগুলোর মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করেছেন। বড় বড় বিজ্ঞানী ছাড়াও পৃথিবীতে অসংখ্য বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, যন্ত্রনির্মাণ ও তত্ত্ব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আধুনিক সভ্যতা ও বস্তুগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাজ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

আ. আ.

গম (wheat)

দুনিয়ার সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ খাদ্যশস্য হিসাবে গম ব্যবহার করে। Graueiseae গোত্রভুক্ত গম শস্য প্রদানকারী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদগুলোর অন্যতম। এদিক থেকে এটি ধান, ভুট্টা, বার্লি, রাই, ওটস ইত্যাদির সমগোত্রীয়। গমের চারা সর্বাধিক দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গমের দানার রঙ সাধারণত সাদা, হলুদ বা লাল হয়ে থাকে এবং কোনো কোনো জাতে দানার ওপর দীর্ঘ আঁশ থাকে। দানার খোসা ছাড়ালে এর তিনটি প্রধান অংশ উন্মুক্ত হয়– ভ্রূণ, খুদ এবং শস্যল অংশ। ছোট্ট ভ্রূণটি হল ভবিষ্যতের নতুন চারা। দানার গায়ের কয়েক স্তর পাতলা আবরণ নিয়ে হয় খুদ, যা দানার প্রায় ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৩-৮৫ শতাংশ শস্যল অংশটিই গমের প্রধান অংশ, যা শর্করা ও আমিষে সমৃদ্ধ। ভ্রূণ ও খুদে থাকে প্রয়োজনীয় কিছু ভিটামিন (দ্র), খনিজ ও আঁশ। এগুলোসহ পুরো দানাটি গুঁড়ো করলে আমরা আটা পাই, যা পুষ্টির দিক থেকে সবচেয়ে ভালো। ভ্রূণ ও খুদ বাদ দিয়ে শুধু শস্যল অংশ রাখলে আমরা পাই ময়দা– এতে প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য-উপাদান বাদ পড়ে যায়। গোটা দানায় ৭১.৭৭% শর্করা, ১২.৩% আমিষ, ১.৮% তেল, ১.৭% আঁশ আর বাকি ১২.৫% পানি। নানাভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে গম থেকে বিচিত্র রুটি, বিস্কুট, পিঠা, সুজি, বিভিন্ন রকমের সেমাই (যেমন স্পেগেটি, নুড্‌ল্‌স্) ইত্যাদি খাদ্য তৈরি হয়। তা ছাড়া গমের খৈ, চিঁড়া, গোটা বা আধ ভাঙা অবস্থায় সেদ্ধ ইত্যাদি রূপেও প্রচুর খাওয়া হয়।

সাম্প্রতিক কালে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে উচ্চ ফলনশীল গমের প্রবর্তনের মাধ্যমেই আধুনিক সবুজ-বিপ্লব বহু দেশে খাদ্যশস্যের অভাব মেটাতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে গম চাষ তেমন না হলেও এখন এটি ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে। এতে সেচের পরিমাণ কম বলে অনেকে শুকনো মৌসুমে গম চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল ভূমি ও আবহাওয়াতেও এর চাষ সম্ভব। খাদ্য হিসাবেও এটি উন্নতমানের। আমাদের খাদ্যতালিকায় এটি ক্রমেই অধিকতর স্থান পাচ্ছে।

মু. ই.

গরান-বন (goran forest)

গরান একটি গাছের নাম। যে বন এই গাছে ভর্তি থাকে সে বনকে গরান-বন বলা হয়। সুন্দরবন (দ্র) এলাকায় গরান-বন রয়েছে। গরান গাছের কাঠ খুব মজবুত ও শক্ত। গরান কাঠের রঙ হলুদ। গাছটি বড় হয় না। মাঝারি আকারের গাছ।

গরান গাছের বাণিজ্যিক মূল্য খুব বেশি। এই গাছের কাঠ ঘরের খুঁটি, ছোট বাঁশের মাচা, ঠেকা দেওয়া ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছের বাকল থেকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। রাসায়নিক পদার্থ চামড়া ট্যান করার কাজে লাগে। জুতার সুখতলিতে লাগাবার চামড়া এই পদার্থ দিয়ে ট্যান করানো হলে জুতা টেকসই হয়। বাকল থেকে নির্গত এই রাসায়নিক পদার্থের নাম ট্যানিন। ট্যানিন প্লাস্টিক (দ্র) তৈরি ও মাছ ধরার জাল রঙ করার কাজেও লাগে।

ত. চ.

গরিলা (gorilla)

নর-বানরদের মধ্যে গরিলা বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী। বৈজ্ঞানিক নাম *গরিলা গরিলা (Gorilla gorilla)*। গরিলা আফ্রিকা মহাদেশের ক্যামেরুন, গ্যাবন, জায়ার, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশের সমতল ভূমি ও পাহাড়ি জঙ্গলে বাস করে।

গরিলার মাথা বড়, কান ছোট, নাসিকা প্রসারিত, কাঁধ প্রশস্ত, হাত দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী। গরিলা চার হাত-পায়ে চলাফেরা করে। দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষ-গরিলা ১.৭–২.০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ওজনে ১৩৫–২৭৫ কেজি। স্ত্রী-গরিলা আকারে পুরুষ-গরিলার প্রায় অর্ধেক। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, তবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-গরিলার পিঠ রুপালি। বয়স দশ ছাড়িয়ে গেলেই গায়ের রঙ ধূসর হতে থাকে।

এরা গাছের পাতা, কাণ্ড, বাঁশের কোঁড় ইত্যাদি খায়। দিনে খাবার সংগ্রহ করে, রাতে ঘুমায়। এরা সাধারণত মাটিতেই থাকে, ঘুমানোর সময় গাছে ওঠে। ডালপালা-পাতা দিয়ে শুধু রাতের জন্য বাসা বানায়। এরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিপদে না পড়লে কাউকে আক্রমণ করে না।

একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-গরিলার নেতৃত্বে এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। দলে দু' থেকে ত্রিশটি বিভিন্ন বয়সের গরিলা থাকতে পারে। স্ত্রী-গরিলা ২৫০–২৯০ দিন গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চার জন্ম দেয়।

গরিলা প্রায় ত্রিশ বছর বাঁচে। বর্তমানে এদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

আ. ন .ম. আ. র.

গরু (cow / ox)

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু সবচেয়ে উপকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। প্রায় ৮,০০০–১০,০০০ বছর পূর্বে মানুষ এদের পোষ মানায়। ইউরোপের বন্য এবং এশিয়ার কুঁজওয়ালা প্রজাতি থেকেই বিভিন্ন জাতের গরুর উৎপত্তি।

গরুর শরীর বড়সড়, লেজ লম্বা, খুর দ্বিধাবিভক্ত। অনেক গরুর শিং থাকে। আকার, আকৃতি ও বর্ণে একেক জাত একেক রকম। ওজনে ২০০-১০০০ কেজি। উচ্চতায় ১–১.৫ মিটার। দুধ উৎপাদনকারী জাতের মধ্যে হলস্টেইন-ফ্রিসিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, ব্রাউন-সুইস বিখ্যাত। মাংস উৎপাদনকারীর মধ্যে অ্যাবারডিন-অ্যাঙ্গাস, ব্রাহ্মণ, চারোলিয়াস, হারফোর্ড উল্লেখযোগ্য।

গরুর ওপরের চোয়ালে কোনো কর্তন-দাঁত নেই। গরু ঘাস বা খড়জাতীয় খাবার খায় বলে জটিল প্রক্রিয়ায় তা পরিপাক হয়। এর পাকস্থলী চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এরা খাদ্য প্রথমে সরাসরি গিলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জমা রাখে। অবসর সময়ে তা মুখে ফিরিয়ে এনে চিবোয় এবং পুনরায় গলাধঃকরণ করে।

বিদেশি দুধেল গাই (গরু)

বন্য গরু

গরুর দুধ ও মাংস পুষ্টিকর। গরুর দুধ থেকে ঘি, মাখন, পনির, মিষ্টি, আইসক্রিম (দ্র) ইত্যাদি এবং চামড়া থেকে জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরি হয়। এর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঔষধ (দ্র), সাবান (দ্র), আঠা প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গোবর জৈব সার। গরু লাঙ্গল ও বোঝা টানে।

২৭৫-২৮০ দিন গর্ভধারণের পর গাভী একটি বাছুরের জন্ম দেয়। বাছুর ২-৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। গরু ১৫-২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

গলগণ্ড (goitre)

গলার সম্মুখভাগে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধিকে গলগণ্ড বলা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন থাইরক্সিন দেহের বৃদ্ধি ও সার্বিক বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সঠিক মাত্রায় থাইরক্সিন উৎপাদনের জন্য দেহে আয়োডিনের (দ্র) দৈনিক চাহিদা মাত্র ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। কোনো কারণে দেহে আয়োডিনের দীর্ঘস্থায়ী অভাব দেখা দিলে থাইরয়েড গ্রন্থি কোষবৃদ্ধির মাধ্যমে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করে। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে থাইরয়েড গ্রন্থির স্থায়ী বৃদ্ধি দেখা দেয়, যা গলগণ্ড বা সাধারণ 'গয়টার' নামে পরিচিত।

খাদ্যে আয়োডিনস্বল্পতা গলগণ্ডের প্রধান কারণ। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং পাহাড়ি এলাকায় গলগণ্ডের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। এর কারণ ঐসব অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব। আবার কোনো থাইরয়েড-বিরোধী ঔষধ (সালফোনেমাইড, পিএএস) দীর্ঘকাল গ্রহণের ফলে অথবা উচ্চমাত্রায় দীর্ঘদিন ধরে আয়োডাইড খেলেও গলগণ্ড দেখা দিতে পারে।

গলগণ্ডের প্রতিকার খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি পূরণ। তা সম্ভব না হলে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারই শ্রেয়। গলগণ্ডের চিকিৎসা– অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গলগণ্ড অপসারণ, অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থি অক্ষত রেখে।

আ. র.

গড় (average)

দুই বা ততোধিক অথবা একগুচ্ছ সংখ্যা বা রাশির প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংখ্যা বা রাশিকে ঐ রাশিগুচ্ছের গড় (mean) বলে। গড় হল সংখ্যাগুচ্ছের মধ্যমান বা কেন্দ্রমান। সাধারণত সংখ্যা বা রাশিগুচ্ছের যোগফলকে সংখ্যা বা রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গড় পাওয়া যায়। যেমন ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এর গড় = (৪ + ৫ + ৬ + ৭ + ৮) ÷ ৫ = ৬। একে পাটিগাণিতিক গড়ও বলা হয়। অন্যভাবেও সংখ্যাগুলি থেকে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সংখা পাওয়া যায়, তাদের নাম দেয়া হয়েছে মধ্যক (median) ও প্রচুরক (mode)। মধ্যক হল সংখ্যা বা রাশিগুলির মধ্যে এমন একটি বিন্দু যা সংখ্যা বা রাশিগুলিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে। প্রচুরক হল সংখ্যাগুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বার উপস্থিত সংখ্যাটি।

স. রা.

গাঁজা (ganja)

গাঁজা এক ধরনের মাদকদ্রব্য। সিদ্ধি গাছের ফুল থেকে গাঁজা তৈরি হয়। সিদ্ধি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *'ক্যানাবিস সেটিভা' (Cannabis sativa)*। এটি বর্ষজীবী, দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ। সিদ্ধি গাছের পুরুষ ও স্ত্রী ভেদ আছে। গাঁজা সংগ্রহ করা হয় স্ত্রী জাতীয় সিদ্ধি গাছ থেকে। সিদ্ধি গাছের ফুল শুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে গাঁজা তৈরি করা হয়। সিদ্ধি গাছের পাতা শুকিয়ে ভাং বা হাশিশ নামক

মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়। এ গাছের আঠা থেকে চরস নামক মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়।

নেশার জন্য গাঁজার ধূম পান করা হয়। গাঁজার নেশাকারীর মধ্যে কখনো কখনো উন্মত্ততা দেখা যায়। দীর্ঘকাল গাঁজা নেশার ফলে স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিবিভ্রাট, এমনকি মস্তিষ্কবিকৃতিও দেখা দিতে পারে।

সি. না. হ.

গাঁদা (ganda)

বৈজ্ঞানিক নাম *টাগেটিস ইরেক্টা* (*Tagetes erecta* Linn, Compositae)। গুল্মজাতীয় খাড়া গাছ। তিন-চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা বহুখণ্ডিত, প্রত্যেক খণ্ডের ধার করাতের মতো, কিন্তু কোমল। গাছে ও পাতায় নরম রোঁয়া আছে। শাখা-প্রশাখা অনেক। কাণ্ডের পর্ব থেকে এবং মোটা ডাল থেকে ছোট ছোট শেকড় গজায়। সেসব ডাল কেটে পুঁতলে সেটাও গাছে পরিণত হয়। সেই গাছেও ফুল বড় বড় হয়। নানা রঙের ফুল হয়– হলুদ, গোলাপি, লাল ইত্যাদি। রঙের পার্থক্য থাকলেও একই গুণ ও প্রজাতিভুক্ত। আমাদের দেশে সাধারণত শীতের শুরুতে ফুল হয়। ভারতে সারা বছর এই ফুলের চাষ হয়।

ছোট ছোট চীনা ও জাপানি গাঁদা এখন এ দেশে এসেছে। এদের ফুলও হয় ছোট এবং একই ফুল একাধিক রঙের হয়। আবার বহু-পাপড়ি ও একক-পাপড়ির গাঁদাও আছে।

গাঁদার পাতার রস কানের ব্যথায়, পাঁচড়ায়, চোখের রোগে, ফোড়ায় ও কারবাঙ্কলে খুব উপকারী। শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে গাঁদার পাতা বেটে লাগিয়ে দিলে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

বি. ব.

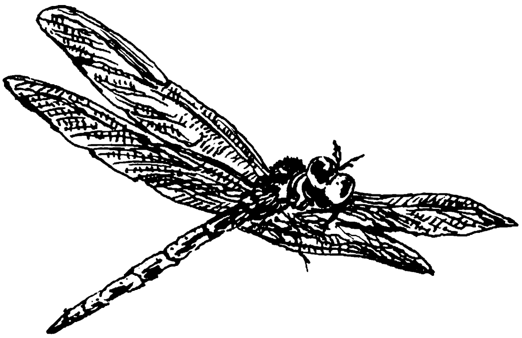

গাঙফড়িং (dragon-fly)

গাঙফড়িং বা ফড়িং অতি পরিচিত কীটপতঙ্গ। মাঠে-ঘাটে, পুকুর, জলা বা গাঙের ধারে রঙ-বেরঙের গাঙফড়িং উড়ে বেড়ায়। পৃথিবীতে ৫,০০০ প্রজাতিরও বেশি গাঙফড়িং আছে।

এদের মাথায় দুটো বিরাট যৌগিক চোখ আছে। প্রতিটিতে প্রায় ২০,০০০ পৃথক পৃথক চোখ আছে। চোয়াল বেশ মজবুত। উইপোকা, মশা, অন্যান্য কীটপতঙ্গ, এমনকি জাতভাইদেরও এটি খেতে পারে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ওজনের সমান খেয়ে ফেলে। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে এরা মানুষের বেশ উপকার করে।

এদের পাখা দু' জোড়া। বেশ লম্বা ও মজবুত। এরা সামনে-পেছনে দু'দিকেই দ্রুত উড়তে পারে। ওড়ার সময় এরা হেলিকপ্টারের মতো স্থিরও থাকতে পারে।

জীবনের প্রথম পর্বটা এরা পানিতেই কাটায়। স্ত্রী-গাঙফড়িং পানিতে ডুবে থাকা আগাছার ওপর ডিম পাড়ে। দু'তিন দিনে তা থেকে শিশু-ফড়িং বা নিম্ফ বেরোয়। এদের শরীর মোটা। মাথা মুখ বড়; কোনো পাখা নেই। এটি মশার শূককীট, ছোট পোকা-মাকড়, ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙাচি খেয়ে বড় হয়। এটি ফুলকার মতো অঙ্গের মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ গাঙফড়িংয়েরা শরীরের পাশের কতকগুলো ফুটোর মাধ্যমে শ্বাস নেয় শিশু-ফড়িং ৬ মাস থেকে ৩ বছরে অন্তত ১২ বার খোলস বদলায় এবং এর পর পূর্ণাঙ্গ গাঙফড়িং-এ পরিণত হয় পরিণত গাঙফড়িং ১-৩ মাস বাঁচে

আ. ন. ম. আ. র.

গাগারিন, ইউরি [১৯৩৪-১৯৬৮]

পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যচারী, সোভিয়েত নভোচারী। জন্ম ৯ই মার্চ ১৯৩৪, মস্কোর পশ্চিমে গ্ঝাৎস্কি নামক স্থানে। মৃত্যু ২৭শে মার্চ ১৯৬৮। তিনি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ট্রেনিং সেন্টার থেকে স্নাতক পাশ করে জেট পাইলট হিসাবে বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। সোভিয়েত নভোচারী প্রথম দলের সদস্য হিসাবে ১৯৬০ সালে তিনি মনোনয়ন পান। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ তিনি ভস্তোক্-১ নামের নভোযান নিয়ে মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ভস্তোক্-১-এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৭,৪০০ কিমি (১৭,০০০ মাইল)। যাত্রা শুরু থেকে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসতে ভস্তোকের ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় লাগে এবং তা ৮৯.১ মিনিট কক্ষপথে অবস্থান করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ৩২৭ কিমি (২০৩ মাইল)।

গাগারিন ১৯৬১-৬৩ সালে ট্রেনিং ডিরেক্টর হিসাবে মহিলা নভোচারীদের প্রশিক্ষণ দেন এবং সইউজ্ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু দুঃখজনক যে তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করার আগেই একটি মিগ প্রশিক্ষণ বিমানের দুর্ঘটনায় মারা যান। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ক্রেমলিনের দেয়ালে তাঁর দেহভস্ম রাখা হয়। তাঁর নামানুসারে চাঁদের পিঠের একটি আগ্নেয়গিরির নামকরণ করে পৃথিবীর নভোবিজ্ঞানীরা তাঁকে সম্মানিত ও স্মরণীয় করে রেখেছেন।

স. রা.

গাছ (tree)

গাছ হল কাষ্ঠল উদ্ভিদ। সাধারণত একটি প্রধান কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে এর ডালপালা বাড়ে। একাধিক কাণ্ডের উপর যে সকল কাষ্ঠল উদ্ভিদের ডালপালা বাড়ে সেগুলোর ইংরেজি নাম Shrub। বাংলায় বলা হয় গুল্ম বা ঝোপ। কোনো কোনো সময় গাছের প্রধান কাণ্ড নষ্ট হলে বা কেটে ফেললে সেটির গোড়া থেকে একাধিক কাণ্ড সৃষ্টি হয়, যেমন গামারি গাছে। আবার শাখা থেকে ঝুরি মূল মাটিতে নেমে এসে কাণ্ডের বিকল্প হিসাবে কাজ করে, যেমন বট গাছ। এ রকম গাছকে গুল্মের বা ঝোপের মতো দেখায়। আসলে এগুলো গাছ। যেসব অঞ্চলে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা পর্যাপ্ত সেখানে গাছ জন্মায়। মেরু ও তুন্দ্রা অঞ্চলে, পর্বত শিখরে ও অনুর্বর শুষ্ক রুক্ষ ভূমিতে গাছ জন্মায় না।

গাছ প্রধানত দুই প্রকার। অপুষ্পক ও সপুষ্পক। অপুষ্পক গাছকে কোনো বহনকারী গাছ বা কনিফার (Conifer) বলা হয়। এ সকল গাছের পাতার আকৃতি সুইয়ের মতো। সপুষ্পক গাছের পাতা সাধারণত চ্যাপটা। সপুষ্পক গাছের কাণ্ড সাধারণত তুলনামূলকভাবে কনিফারদের কাণ্ডের চেয়ে শক্ত। আম, জাম, কাঁঠাল সপুষ্পক এবং পাইন, ঝাউ ইত্যাদি অপুষ্পক গাছ। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন– সপুষ্পক বালসা গাছের কাণ্ড কনিফার গাছের চেয়ে নরম।

শীতপ্রধান ও শুষ্ক অঞ্চলে কনিফার জন্মে বেশি। এ সকল অঞ্চলে বাতাসের আর্দ্রতা কম এবং পানি থাকে মাটির অনেক গভীরে। পাতা সুইয়ের মতো হওয়ায় এর আয়তন ক্ষুদ্র। পাতা ঘাতসহ বা বেশ দৃঢ় এবং আয়তন জুড়ে গভীরে রয়েছে শ্বসন-ছিদ্র। এ কারণে এর পাতা থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হয় কম। যেখানে বাতাসে জলীয় বাষ্প কম ও মাটিতে পানির পরিমাণ কম এবং নিচু তাপমাত্রার কারণে মূল দ্রুত পানি শোষণে অক্ষম সেখানে জন্মানোর জন্য এ ধরনের গাছই উপযুক্ত। পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের অরণ্যে এরা জন্মায় বেশি। এরা চিরসবুজ।

গ্রীষ্মমণ্ডলে সপুষ্পক গাছ জন্মায় অধিক। এদের বেশির ভাগই শীতে পত্র ঝরিয়ে থাকে। গ্রীষ্মে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। মাটিও থাকে পানিতে ভরা।

শীতে মাটি ও বাতাসে জলকণা কমে যায়। পাতা থাকলে বাষ্পমোচন বেশি হবে তাই ওরা পত্র ঝরায়। সামান্য কিছু সপুষ্পক গাছ ছাড়া অধিকাংশেরই দ্বিপত্রী বীজ থাকে।

বীজ থেকে গাছ জন্মায়। গাছের কাণ্ডের বাইরে বাকল থাকে। বাকল গাছকে বাইরের আঘাত ও পরিবর্তনশীল তাপ থেকে রক্ষা করে। বাকলের কোষ মৃত, তবে বাকল বায়ুরোধী ও জলরোধী। তবে এর মাঝে মাঝে শ্বসন-ছিদ্র বা লেন্টিসেল থাকে। গাছের কাণ্ড থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়। গাছ বিশাল বড়ও হয়। এর শিকড়ও ছড়িয়ে যায় অনেক দূরে। তবে বেশি গভীরে যায় না।

ত. চ.

গাজর (carrot)

গাজরের বৈজ্ঞানিক নাম *Daucas carota* L. এবং গোত্র Umbelliferae। বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী। সোজা শাখাবিশিষ্ট কাণ্ড ১ মিটারের মতো উঁচু। কাণ্ড মাংসল স্থূল মূল (Tap roof) থেকে ওঠে। ঐ স্থূল মূলই গাজর নামে পরিচিত যা ২-১২ ইঞ্চি লম্বা হতে পারে। পাতা পক্ষবৎ বহুভাগে বিভক্ত ধনিয়া পাতার মতো। ফুল সাদা বা হলদেটে। ছাতার আকৃতিতে গুচ্ছভাবে ফোটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাণ্ড রোমশ এবং সাদা রঙের। মাংসল খাদ্য সঞ্চয়ী শিকড়ের রঙ সাধারণত আকর্ষণীয় কমলা হলুদ। এ ছাড়া সাদা, হলুদ, হালকা বেগুনি, গাঢ় লাল, গাঢ় বেগুনি রঙেরও হতে পারে। শিকড়ের আকৃতি খাটো খুবার মতো থেকে চোঙাকৃতি হতে পারে। বীজের মাধ্যমে গাজরের বংশবৃদ্ধি হয়। জল নিকাশের সুব্যবস্থাসম্পন্ন হালকা বেলে মাটি গাজর চাষের জন্য উপযোগী। গাছের উপরের অংশ ফেলে দিয়ে শিকড়টা সহজেই শুকনো বালির সঙ্গে কাঠের ছাই এবং কয়লা মিশিয়ে ৫-৬ মাস কোনো প্রকার মানের ক্ষতি না করে সংরক্ষণ করা যায়। গাজর সবজি, সুপ, স্ট্যু, তরকারি, শলুয়া বা সালাদে ব্যবহার করা হয়। গাজর প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং ইউরিক এসিড নির্মূল করে।

শা. আ.

গাটা-পার্চা (gutta-percha)

গাটা-পার্চা হল রাবারের মতো এক ধরনের পদার্থ। মালয়, বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে Sapotaceae নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। ঐ উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখায় ছিদ্র করলে এক রকম আঠালো রস বের হয়ে আসে। ঐ রস কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে জমে যায়। সেই জমাট রস থেকে প্লাস্টিকের মতো এক প্রকার পদার্থ তৈরি করা হয়। এই পদার্থের নামই গাটা-পার্চা। গাটা-পার্চা কতকগুলি তার্পিন জাতীয় হাইড্রোকার্বনেরই সংমিশ্রণ। সাদা, পিঙ্গল বা বাদামি রঙের এই পদার্থটি বেশ শক্ত এবং কম প্রসারণশীল। তবে তাপ দিলে এর প্রসারতা বাড়ে। কার্বন ডাই-সালফাইড, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি দ্রাবকে গাটা-পার্চা দ্রবীভূত হয়। নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি হয় এই গাটা-পার্চা দিয়ে। বিশেষত তড়িৎশিল্পে কুপরিবাহী পদার্থ হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। গাটা-পার্চা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই আগুনের সংস্পর্শ থেকে একে দূরে রাখাই শ্রেয়।

আ. হ. খ.

গাধা (ass)

ঘোড়া ও জেব্রার মতো গাধাও এক-খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। বুনো গাধার দুটো প্রজাতি আছে। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে আফ্রিকার প্রজাতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এশিয়ার প্রজাতি বাস করে। বর্তমানে এরা বিলুপ্তির পথে। বুনো গাধাগুলো থেকেই গৃহপালিত গাধার উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাদেশে কোনো গাধা নেই বললেই চলে।

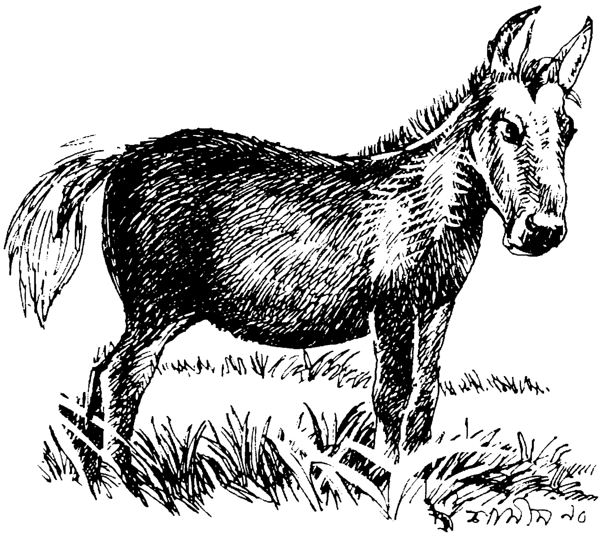

গাধা ছোটখাটো ও গাঁট্টাগোট্টা প্রাণী। ৯০-১৫০ সেন্টিমিটার উঁচু হয়। বুনো গাধা গৃহপালিত গাধা থেকে বড় হয়। আফ্রিকার গাধা নীলচে-ধূসর থেকে হলদে-বাদামি। এশিয়ার গাধা কিছুটা হালকা রঙের। দু' প্রজাতিরই পেটের নিচটা সাদাটে। পিঠ বরাবর ও পায়ে গাঢ় দাগ আছে। এর পা ছোট, কান লম্বা, কেশরগুলো খাটো ও কালো, লেজের গোছা বড়। এরা ঘণ্টায় ৫৫-৬৫ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে।

গৃহপালিত গাধাগুলোর বেশ কিছু জাত রয়েছে। হালকা জাতের গাধা দৌড়ের জন্য এবং ভারী জাতের গাধা মাল টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। গাধা ঘোড়ার মতোই ঘাস ও শস্যদানা খায়।

ঘোড়া ও গাধার মিলনে খচ্চরের (দ্র) জন্ম হয়। এদের প্রজননক্ষমতা থাকে না। এরা গাধা থেকেও অধিক পরিশ্রমী হয়।

১১-১২ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-গাধা একটি শাবকের জন্ম দেয়। এটি ২-৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, প্রায় বিশ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

গাব

অত্যন্ত অনাদরে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকা গাছের মধ্যে গাব অন্যতম। Ebenaceae গোত্রের গাবের বৈজ্ঞানিক নাম *Diospyros peregrina* L.। চিরসবুজ মধ্যমাকৃতির গাবের কাণ্ড গোলাকৃতি কিন্তু কিছুটা আঁকাবাঁকা। বর্ণ ঘোর কালো। শাখা এমনভাবে বিন্যস্ত যে গাছের উপরটা গোলাকৃতি এবং ডালগুলো বাঁকা হয়ে প্রায় ভূস্পর্শী। পাতা কালচে সবুজ, দীর্ঘ, আয়তাকৃতি, স্থূলকোণী এবং খুব নিবিড় পাতায় সম্পূর্ণ বৃক্ষ আচ্ছাদিত। ফলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ঠিক ওপরের আকাশ দেখা দুষ্কর। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন প্রায় সকল বৃক্ষ পাতাহীন, ছায়াহীন, গাব গাছ তখনো পত্রশোভিত থাকে এবং আশপাশে স্নিগ্ধ পরিবেশ বজায় রাখে। উপকূলে বা দেশের অভ্যন্তরের নিচু এলাকায় প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার তোড়ে যখন সবকিছু ভেসে যায়, গাব গাছ তখনো দাঁড়িয়ে থাকে। গরমের শুরুতে এর পুষ্পায়ন আরম্ভ হয়। ফুল একলিঙ্গিক এবং গাছও একলিঙ্গিক। সাদাটে পাঁচটি পাপড়ি মৃদু সুগন্ধি। গাব ফল গোলাকৃতি, মাংসল, প্রথমে সবুজ এবং পাকলে খোসার বাইরের দিক সবুজ হলুদ এবং ভিতর দিক হলুদ লালে মেশানো চমৎকার বর্ণ। এর শাঁস আঠালো। কাঁচা গাবের রস কষ নৌকা, জাল, ঘরের বেড়া, চামড়ার নানা কাজে লাগে। পাকা ফল কাক বানরই নয়, সকল বয়সের মানুষের প্রিয়। ফলের রস আমাশয়, বাকল পৌনঃপুনিক জ্বরে এবং ফল হিক্কা, বাত রোগে উপকারী।

শা. আ.

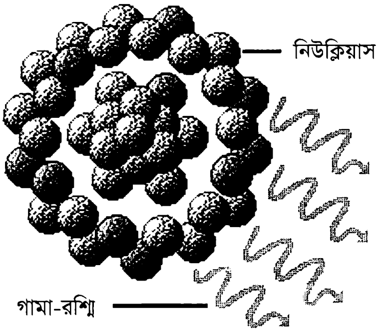

গামা-রশ্মি (gamma rays)

এক্স-রের মতো কিন্তু ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ। কোনো উত্তেজিত পরমাণু যখন উচ্চতর উত্তেজন-অবস্থা থেকে নিম্নতর উত্তেজন-অবস্থায় যায় তখন গামা-রশ্মি নির্গত হয়। গামা-রশ্মির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। এটি আধান-নিরপেক্ষ এবং তাড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয় না। এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য $১০^{-১০}$ মিটার থেকে $১০^{-১৪}$ মিটার এবং শক্তি $১০^{-১৫}$ জুল থেকে $১০^{-১১}$ জুল হয়। এই রশ্মির ভেদনক্ষমতা খুব বেশি, কয়েক সেন্টিমিটার সিসার পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে। গামা-রশ্মির একটি পরিচিত উৎস হল কোবাল্ট-৬০। এই রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে এই রশ্মি নির্গত হতে পারে। এই রশ্মি ফোটন কণিকার স্রোত হিসাবে নির্গত হয়।

শা. ত.

গালভানি, লুইজি [১৭৩৭-১৭৯৮]

ইতালির চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী। গালভানির (Luigi Galvani) জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর ১৭৩৭; মৃত্যু ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৮। তিনি প্রাণিদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

লুইজি গালভানি

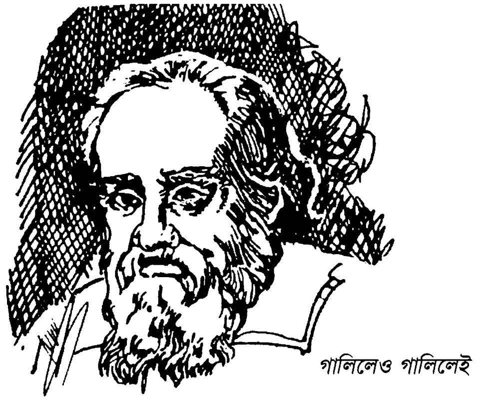

গালিলেও গালিলেই

সম্পর্কীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পরীক্ষার সূত্র ধরেই আলেসান্দ্রো ভোল্‌তা চলবিদ্যুৎকোষ আবিষ্কার করেন।

গালভানি বলোগনার মেডিক্যাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্নাতক হওয়ার পর এই স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি ভেষজবিদ্যা (দ্র), শল্যবিদ্যা (দ্র) ও শারীরবিদ্যা (দ্র) শিক্ষাদান ও চর্চা করতেন। এই সময় (১৭৮০) তিনি মাংসপেশি এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর স্থির-বিদ্যুতের প্রভাব পরীক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চামড়া ছাড়ানো, লবণ-পানিতে সিক্ত একটি ব্যাঙ তামার তার দিয়ে লোহার রেলিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেন। অতঃপর ঐ ব্যাঙের স্নায়ুরজ্জুতে পিতলের আংটা দিয়ে সংযোগ দেওয়া মাত্রই ব্যাঙের মাংসপেশির সঙ্কোচন দেখতে পান। এ থেকে তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হন যে প্রাণীর স্নায়ু এবং মাংসপেশিসমূহে তড়িৎদ্রবণ বিদ্যমান। আলেসান্দ্রো ভোল্‌তা পরবর্তী সময়ে প্রমাণ করেন যে এই বিদ্যুৎ মূলত লবণ-পানিতে সিক্ত ধাতব পাত থেকে উৎপন্ন হয়; এর উৎস প্রাণিদেহ নয়। গালভানির এই গবেষণাই ইলেকট্রো-ফিজিওলজি বা নিউরো-ফিজিওলজির ভিত্তি। তাঁরই নামানুসারে তড়িৎমাপক যন্ত্রের নাম রাখা হয়েছে গ্যালভানোমিটার (galvanometer) এবং লোহার উপর দস্তার প্রলেপকে বলা হয় গালভানাইজেশন।

স. রা.

গালিলেও গালিলেই [১৫৬৪-১৬৪২]

রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় বিজ্ঞানী গালিলেও গালিলেই (Galileo Galilei) বাঙালির কাছে সাধারণত গ্যালিলিও নামে পরিচিত। এঁকে আধুনিক পরীক্ষণ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোলকের নিয়ম আবিষ্কার করেন। কথিত আছে যে পিসা ক্যাথিড্রালের দীর্ঘ ঝুলন্ত বাতিটির দোলনকাল হাতের নাড়ির সাহায্যে পরিমাপ করেই তিনি এই আবিষ্কারটি করেছিলেন। এ থেকেই দোলক ঘড়ির উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল।

শুরুতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করলেও শেষ অবধি গণিত ও পদার্থবিদ্যাই তাঁর বিষয় হয় এবং ২৫ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর আগেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পড়ন্ত বস্তুর নিয়মটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল তা হল– একই উচ্চতা থেকে ফেললে ভারী বস্তু হালকা বস্তুর আগে মাটিতে পড়বে। গালিলেও পড়ার গতির ত্বরণ সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল ধারণা থেকে দেখান যে নিচে পড়ার গতি ওজনের উপর নির্ভর করে না। এ সম্পর্কে কাহিনী হল, তিনি পিসার হেলানো গম্বুজের উপর থেকে ভারী ও হালকা জিনিস এক সঙ্গে ফেলে অনেক দর্শকের সামনে প্রমাণ করেন যে এরা এক সঙ্গে মাটিতে পড়েছে। গবেষণাগারে সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে গতিবিদ্যার মৌলিক কিছু সাধারণ সূত্র গালিলেও প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আদিবেগ ও ত্বরণ জানা থাকলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেগ কত হবে, কত দূরত্ব অতিক্রম করবে ইত্যাদি। জড়তার নিয়মও গালিলেওর আবিষ্কার। এভাবে তিনি পরবর্তী কালে নিউটনীয় গতিবিদ্যার জন্য পথ করে দেন। তিনিই দেখান যে সমগতিতে চলন্ত বস্তুর

প্রত্যেকের নিজস্ব একটি জড়তা কাঠামো রয়েছে। এ রকম এক কাঠামো থেকে অন্য কাঠামোর গতি পর্যবেক্ষণ করলে এদের মধ্যে একটি আপেক্ষিকতা থাকবে, যাকে এখন গালিলীয় আপেক্ষিকতা বলা হয়।

গালিলেও আর যে বিষয়টিতে দৃষ্টিভঙ্গির অগাধ পরিবর্তন এনেছেন তা হল জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র)। সেকালের সবচেয়ে উন্নত কিছু দূরবীক্ষণযন্ত্র তিনি নিজে তৈরি করেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণে দুরবিনকে কাজে লাগিয়ে চমৎকার সব আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়ে দেখান যে চাঁদের ভূমি এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে-খাদে ভর্তি, এর আলো ধার করা, ছায়াপথ অসংখ্য তারার সমষ্টি ইত্যাদি। বৃহস্পতির (দ্র) চারটি চাঁদ (দ্র) তিনি আবিষ্কার করেন, শনিগ্রহের (দ্র) অদ্ভুত আকৃতিও তিনিই প্রথম লক্ষ করেন। তাঁর বহু সিদ্ধান্ত অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও মানতে চান নি। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে সবাইকে শেষ পর্যন্ত তা মানতে হয়েছে। তাঁর আগে কোপার্নিকাস (দ্র) সূর্যের (দ্র) চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন সেটি সবার কাছে অগ্রহণীয় ও নিন্দনীয় হলেও গালিলেও একে যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো সমর্থন দেন। এর ফলে তাঁকে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের রোষানলে পড়তে হয়। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবন তাঁকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং এ অবস্থায় ১৬৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত হন।

মু. ই.

গিবন (gibbon)

গিবনকে বাংলায় বলা হয় উল্লুক। এটি নর-বানর জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। একে বলা হয় ছোটখাটো লেজহীন বানর। মানুষের করোটির সঙ্গে উল্লুকের করোটির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই একে বানর বলার চেয়ে নর-বানর (ape) বলাই সঙ্গত। বিজ্ঞানীরা আরো লক্ষ করেছেন যে, মানুষের গালে যেমন থলে নেই এবং মেরুদণ্ডের শেষে লেজ নেই, তেমনি উল্লুকেরও মুখে থলে ও দেহের পেছন দিকে লেজ নেই। উল্লুকের দেহের রঙ একেবারে কালো। তবে চোখের

ভুরুর উপর সাদা লোম থাকে। একে সাদা রেখার মতো দেখায়। এদেরকে উপমহাদেশের আসাম রাজ্যে দেখা যায়। এরা দল বেঁধে চলাফেরা করে। কখনো একাও চলে। মাটির উপর ওরা মানুষের মতোই দুই পায়ে হেঁটে চলে। সকাল-সন্ধ্যা এরা বিশ্রী শব্দ তোলে। এটি খুবই বিরক্তি উদ্রেককর। কোনো জায়গার উল্লুক চিৎকার দিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জায়গার উল্লুকেরাও সোরগোল তুলতে থাকে।

উল্লুক গাছের উপর থাকতে পছন্দ করে। খাওয়ার জন্যই কেবল নিচে নামে। ফলমূলই ওদের প্রধান

আহার্য। পাখির ডিম ও বাগে পেলে পাখি ধরেও ওরা খেয়ে ফেলে। পোকা-মাকড় পেলে আরো বেশি মজা করে খায়।

উল্লুক সাধারণত একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা মায়ের স্তন পান করে। মা-বাবা বাচ্চার যত্ন নেয় এবং বাচ্চা সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ওকে কাছে রাখে।

ত. চ.

গিয়ার চাকা (gear spindle)

অধিকাংশ আধুনিক যন্ত্রের জন্য গিয়ার (gear) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গিয়ারের সাহায্যে একটি চাকা বা ধুরার (spindle) গতির (দ্র) দিকপরিবর্তন করা যায়, গতি বাড়ানো বা কমানো যায় এবং যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন কাজের জন্য গিয়ার চাকার উপরে বিভিন্ন রকম দাঁত কাটা হয়।

মোটরগাড়ি, ঘড়ি, গম ভাঙার মেশিন ইত্যাদিতে আমরা নানা রকম গিয়ারের ব্যবহার দেখতে পাই। মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ব্যবহার করে আমরা যখন গাড়ির চাকার দিকপরিবর্তন করি তখন যে গিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ওয়ার্ম গিয়ার। গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তিকে পেছনের চাকায় ঘূর্ণনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সঞ্চারণ (transmission) গিয়ার এবং অন্তর (differential) গিয়ার ব্যবহার করা হয়। ইঞ্জিনের শক্তি প্রথমে ফ্লাই হুইলে ঘূর্ণনশক্তিরূপে প্রেরণ করা হয় এবং গিয়ারব্যবস্থা ব্যবহার করে ইচ্ছে মতো চাকার ঘূর্ণনগতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইঞ্জিনের গতি ও গিয়ারের ঘূর্ণনগতির অনুপাত বদলাবার জন্য বিভিন্ন গিয়ার ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ে ওঠার সময় গাড়ির প্রথম গিয়ার ব্যবহার করা হয়। কারণ বল বাড়াবার জন্য আমরা যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণ করি। সমতল পথে দ্রুত গতির জন্য উচ্চ গিয়ার ব্যবহার করা হয় ইঞ্জিনের চাকার তুলনায় গিয়ারের চাকা বেশি বেগে ঘোরাবার জন্য।

আ. আ.

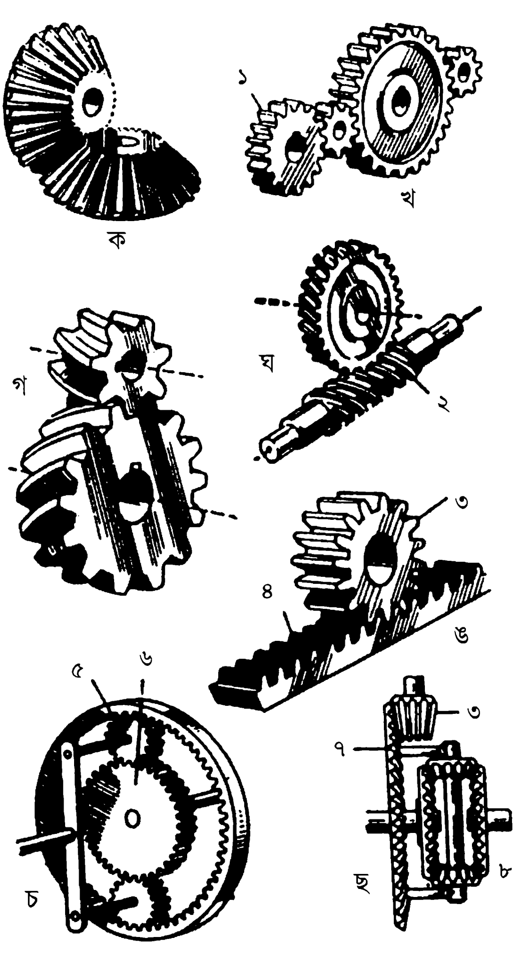

ক. বেভেল গিয়ার, খ. গিয়ার সমাবেশ, গ. হেলিক্যাল গিয়ার, ঘ. ওয়ার্ম গিয়ার, ঙ. র‍্যাক ও পিনিয়ন, চ. সূর্য ও গ্রহ বা এপিসাইক্লিক গিয়ার ব্যবস্থা, ছ. ডিফারেনশিয়াল গিয়ার
১. কগ্‌ বা গিয়ার-চাকা, ২. ওয়ার্ম, ৩. পিনিয়ন, ৪ র‍্যাক, ৫. গ্রহ-চাকা, ৬. সূর্য-চাকা, ৭. মুকুট, ৮. ডিফারেনশিয়াল অংশ

গুণন (multiplication)

গুণন হচ্ছে সমান আকারের একাধিক সংখ্যা যোগ করার দ্রুততর পদ্ধতি। সমান রাশি বা সংখ্যার যোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত,সহজ ও দ্রুততর করার জন্য গুণনের আবিষ্কার। যেমন ১২+১২+১২+১২+১২ = ৬০। এভাবে ১২-কে ৫ বার লিখে যোগ করার চেয়ে ১২-এর সঙ্গে ৫ গুণ করলে কাজটি আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গণিতের নিয়মে একে লেখা হয় ১২×৫ = ৬০। এখানে ১২-কে গুণ্য, ৫-কে গুণক এবং ৬০-কে গুণফল বলে। আর × হল গুণনের চিহ্ন বা প্রতীক। সুতরাং গুণন হল কোনো বস্তু, দ্রব্য বা সংখ্যা সমান পরিমাণে একাধিক বার বৃদ্ধি পেলে তা গণনা বা যোগ করার প্রক্রিয়া। কোনো সংখ্যা বা রাশি সমানভাবে বৃদ্ধি পেলেই তার সমষ্টি গুণন প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা যায়; অসমান রাশি বা সংখ্যার সমষ্টি গুণনের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না।

যেমন ৫-কে ৪ বার যোগের (৫+৫+৫+৫) কাজটি গুণনের সাহায্যে করা যাবে, কিন্তু ৫-এর সঙ্গে অসমান ৪ বা ৭ যোগ করার (৫+৪+৭) কাজটি গুণনের মাধ্যমে করা যাবে না, এতে যোগ প্রক্রিয়াই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে গুণনকে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যায়।

সকল প্রকার গুণনসমস্যাকে যোগের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সকল যোগসমস্যা গুণন দ্বারা সমাধান করা যায় না। কোনো সংখ্যাকে ১ বা ১-কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাই ১-কে গুণনের অভেদ বা আইডেনটিটি বলে। যেমন ৭x১=৭ বা ১x৬=৬। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হবে। যেমন ৫x০=০। গুণ্য ও গুণকের বিন্যাসে পরিবর্তন করলেও গুণফলের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন ৪x৩=১২ আবার ৩x৪=১২। একে গুণের বিনিময়-বিধি বলে। দুইয়ের অধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলোকে যে কোনো দলে ফেলে গুণ করলে গুণফল একই থাকবে। যেমন ৫, ২, ৭-এর ক্ষেত্রে (৫x২)x৭=৭০ আবার ৫x(২x৭)=৭০। একে গুণের সংযোগ-বিধি বলে। দু'টি বাস্তব সংখ্যা গুণ করলে একটি বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন ৫x৭=৩৫। একে গুণের আবদ্ধতা-সূত্র বলে। মজার ব্যাপার হল ৯ দিয়ে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তার অঙ্কগুলোর সর্বশেষ যোগফল ৯ হয়। যেমন ৪x৯=৩৬, আবার ৩+৬ = ৯; ৩৫x৯=৩১৫, ৩+১+৫ = ৯; ১১১x৯=৯৯৯, ৯+৯+৯ = ২৭, আবার ২+৭=৯; গুণনের পূর্বশর্ত হচ্ছে যোগ-প্রক্রিয়া।

হো. আ.

গোল্ডফিশ (goldfish)

গোল্ডফিশ বা সোনালি মাছ সাইপ্রিনিফর্মেস বর্গের একটি বাহারি মাছ হিসাবে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Carossius auratus*। শৌখিন মৎস্যচাষিরা অ্যাকোয়ারিয়ামে (দ্র) এই মাছ শখ করে লালন-পালন করেন।

সোনালি মাছ পুঁটি জাতীয় মাছ। এদের মাইনর কার্প বলা হয়। এই মাছের দেহ অনেকটা সোনালি হওয়ার ফলে এদের দেহ সোনালি দেখায়, ঝকমক

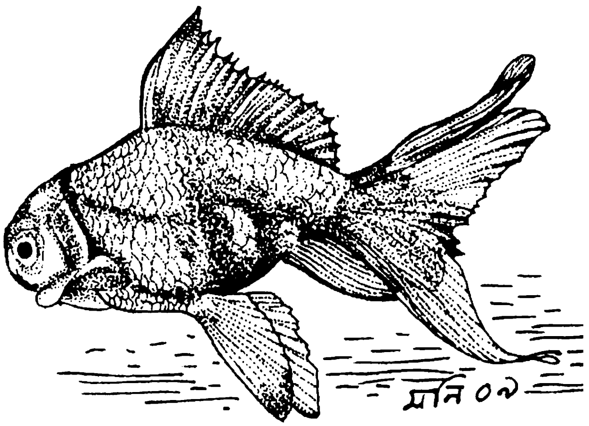

করে। গোল্ডফিশের বেশ কিছু প্রজাতি বা জাত রয়েছে। এদের প্রায় সবার দেহই সোনালি রঙের, তবে কারো কারো দেহে রুপালি রঙের ছোপও থাকে। দেহের বাইরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের জাতে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন– কারো কারো নাকের উপর ফুলকপির মতো অঙ্গবিশেষ থাকে, কারো চোখ বাইরের দিকে বের করা, কারো চোখের নিচে ফোলানো থলি ইত্যাদি। তবে দেহের গড়ন যা-ই হোক না কেন সব জাতের গোল্ডফিশই সুন্দর। প্রায় সব শৌখিন অ্যাকোয়ারিয়াম মালিক গোল্ডফিশকে বিশেষ আদরের সঙ্গে পোষেন। অনেক দোকানে অ্যাকোয়ারিয়ামের এই মাছ প্রদর্শন করার জন্য রাখা হয়। এতে দোকানের সৌন্দর্যও বাড়ে।

সাধারণত গোল্ডফিশ অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রজনন করতে পারে। তবে শৌখিন অ্যাকোয়ারিয়াম-মালিকগণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় এদের ছানা-পোনা তৈরি করেন।

অ্যাকোয়ারিয়ামে লালন-পালনের সময় গোল্ডফিশকে বড়ির মতো খাবার খেতে দেওয়া হয়। এ ধরনের খাবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। গোল্ডফিশের আয়ু কয়েক বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে জলের কারণে বা খাবারের কারণে অসুখ হয়েই গোল্ডফিশ বেশি মারা যায়।

ত. চ.

গোলপাতা (water coconut)

গোলপাতা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Nipa frutcans van wurmb*, গোত্র Palmac এবং ইংরেজি নাম ওয়াটার

গোলপাতা গাছ ও গাছের গোড়ায় ফল

কোকোনাট (Water Coconut)। সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের প্লাবিত কিনারায় গোলপাতা গাছ দেখা যায়। পাতা কিন্তু গোল আকৃতির নয়। পাতা সোজা ৯ মিটারের মতো লম্বা। পত্রবৃন্ত দৃঢ়। ১.২–১.৫ মিটার লম্বা। ফুল এককোষী। ফল প্রায় নারিকেলের মতো, ছোট। এক একটি ফলযুক্ত গর্ভপত্রী যাতে বহু ডিম্বাকৃতি ১ কোষী ১ বীজ গর্ভপত্র রয়েছে। এক একটি বীজ মুরগির ডিমের আকার মাংসল এবং আঁশযুক্ত বীজ বহিস্তক ও স্পঞ্জের মতো অন্তস্তক। বীজ খুব শক্ত। গোলপাতার ভালো বৃদ্ধির জন্য প্রচুর আলো, প্লাবন ও স্রোত দরকার। গোলপাতা বীজের সাহায্যে এবং রাইজোমের পৃথকীকৃত শাখার সাহায্যে বংশবিস্তার করে। জলাশয় বা মাটির পট পানিতে ডুবিয়ে রেখে সামান্য কিছু লবণ গুলে বাড়িতে গোলপাতা গাছ লাগালে আকর্ষণীয় বাগান-উদ্ভিদ হয়ে ওঠে। ফিলিপাইনে গোলপাতার পুষ্পমঞ্জরির স্প্যাডিক্সের বোঁটা থেকে রস (প্রায় ১৭% চিনি) সংগ্রহ করে তা দিয়ে চিনি, অ্যালকোহল (দ্র), ভিনিগার তৈরি করা হয়। ঘরের ছাউনি, বেড়া, বড় নৌকার ছাউনি ইত্যাদি কাজে গোলপাতা গাছের পাতা প্রয়োজনীয় উপাদান। কচি কাণ্ডশীর্ষ সবজি হিসাবে এবং কচি ফলবৃন্ত বা বীজ কাঁচা খাওয়া যায়।

শা. আ.

গোলমরিচ মরিচ দ্র

গোলাপ (rose)

ঘন কাঁটাভরা গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ (দ্র)। পাতা দেখতে অনেকটা গোলাকার ও কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা। পাতার শিরায় মাঝে মাঝে কাঁটা দেখা যায়। কচি কাণ্ডের আগায় ঘন পাপড়িবিশিষ্ট ফুল হয়। ফুল কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে ফোটে। গন্ধ চমৎকার। আবার গন্ধহীন গোলাপও আছে। গন্ধহীন বা সুগন্ধ সব গোলাপই দেখতে খুব সুন্দর। এর বীজ হয় টোপাকুলের মতো। বীজ, কলম বা ডাল কেটে পুঁতলেও গাছ হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *Rosa damascena* Mill, গোত্র Rosaceae। বাংলায় প্রচলিত নাম গোলাপ। হিন্দিতে ও ইউনানি চিকিৎসকদের কাছে এর নাম গুলা। প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃতে এর নাম শতপত্রী বা শেউতি। প্রাচীন কয়েকটি প্রজাতির বুনো গোলাপের উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের পাদদেশের বন-জঙ্গল। গোলাপের প্রাচীন প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে দামেশ্‌ক্ গোলাপ। এ জন্য বোটানিক্যাল নামের পাশে 'দামাসকেনা' যুক্ত আছে।

গোলাপ গোত্রে ঔষধি, গুল্ম ও বৃক্ষ এই তিন ধরনের উদ্ভিদ আছে। অনাদিকাল থেকে গোলাপ পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয়। বাগানের ছোট্ট গোলাপ থেকে দীর্ঘগুল্ম বা লতানো গোলাপসহ শত শত রকমের গোলাপ রয়েছে। প্রধানত ৭টি প্রজাতি থেকে আধুনিক সঙ্কর গোলাপের উৎপত্তি। টবে বা জমিতে সবখানে গোলাপ ভালো জন্মে। উন্মুক্ত, উঁচু, রৌদ্রময় ঝড়ো বাতাসহীন উর্বর জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে। ঈষৎ বালুময় দোআঁশ মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে বিশেষ

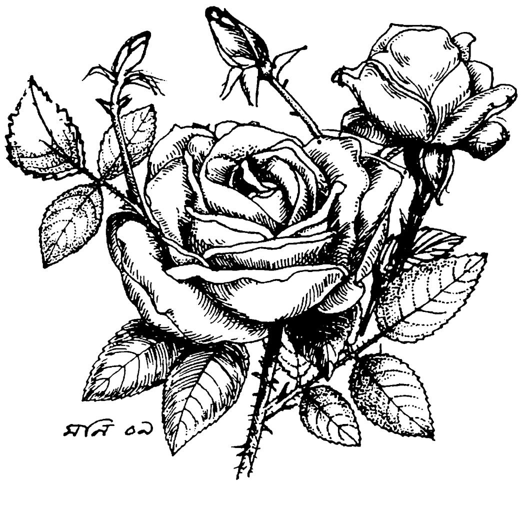

উপযোগী। গোলাপ থেকে আতর, সুগন্ধি, গোলাপ জল, রোজ (rose) সিরাপ প্রভৃতি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। গোলাপের গবেষণার জন্য লন্ডনের ন্যাশনাল রোজ সোসাইটির (স্থাপিত ১৮৭৬) অবদান উল্লেখযোগ্য।

বি. ব.

গ্যানিমিড (ganymede)

সৌরজগতে বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ। এর ব্যাস ৫২৬২ কিলোমিটার। গ্যানিমিডের ভর আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের প্রায় আড়াই গুণ। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গালিলেও (দ্র) তাঁর দুরবিনের সাহায্যে বৃহস্পতির যে চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন গ্যানিমিড তাদেরই একটি। অপর তিনটি উপগ্রহ হচ্ছে আইও, ইউরোপা এবং ক্যালিস্টো। এ জন্য এই চারটি উপগ্রহকে বলা হয় গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ। ১০ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে গ্যানিমিড প্রদক্ষিণ করে চলেছে বৃহস্পতিকে।

সু. ব.

গ্যালাক্সি (galaxies)

নক্ষত্রমণ্ডলীয় এক বিশাল ঝাঁক, এই মহাবিশ্বের (দ্র) প্রধান উপাদান। নক্ষত্র ছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস ও সূক্ষ্ম মহাজাগতিক ধূলিকণা।

গ্রিক Galaxy শব্দের অর্থ হল ছায়াপথ (দ্র)। প্রথম দিকে রাতের আকাশকে বেষ্টন করে যে তারকারাজি দেখা যায়, সেটিকে বোঝানোর জন্য গ্যালাক্সি শব্দটি ব্যবহার হত। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, এরূপ নক্ষত্র-ঝাঁক মহাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ রয়েছে। তখন থেকে সাধারণভাবে নক্ষত্র-ঝাঁককে গ্যালাক্সি এবং রাতের আকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্র-ঝাঁকটিকে ছায়াপথ (Milky way) নামে অভিহিত করা হয়।

বিগ্ ব্যাং তত্ত্ব (দ্র) অনুযায়ী মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের কোনো কোনো স্থানে অভিকর্ষের (gravity) তারতম্য দেখা দেয়। এর ফলে ঐ স্থানের গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বেঁধে মাতৃছায়াপথ বা প্রোটোগ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়। এই প্রোটোগ্যালাক্সিতে পরবর্তী সময়ে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি হয়। গ্যালাক্সির একটি কেন্দ্র থাকে এবং

এর নক্ষত্ররাজি ও অন্যান্য উপাদান ঐ কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। গ্যালাক্সিগুলো ঝাঁক বেঁধে থাকে। গড়পড়তা প্রতিটি ঝাঁকে কয়েকটি থেকে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি থাকে।

আমাদের নিকটতম গ্যালাক্সির নাম হল ম্যাজেলানিক মেঘ (Magellanic clouds) এবং এটি পৃথিবী (দ্র) থেকে ১৫০,০০০ আলোকবর্ষ (দ্র) দূরে।

এ পর্যন্ত জানা মহাবিশ্বের ১০ হাজার কোটি ($১০^{১১}$) গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরেরটি ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

মু. হা.

গ্যালেন [১৩০-২০০]

রোমান শাসনামলে যে গ্রিক চিকিৎসক সর্বাধিক খ্যাতি ও বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করেন তাঁর নাম গ্যালেন (Galen)। তাঁর জন্ম ১৩০ খ্রিস্টাব্দে। চিকিৎসা পেশায় পারদর্শিতার জন্য তিনি রোম সম্রাট মার্কুস অরেলিউসের সভায় বৈদ্য পদে নিযুক্ত হন। গ্যালেনের প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

পরীক্ষামূলক শারীরতত্ত্বের (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা গ্যালেন একাধারে ছিলেন দক্ষ পেশাজীবী ও চিকিৎসাশাস্ত্রের (দ্র) শিক্ষক। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার জন্যই তাঁর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। শারীরস্থান,

www.boighar.com

শারীরতত্ত্ব (দ্র), রোগতত্ত্ব, ভেষজচিকিৎসা, ফার্মেসি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৯টি, ১৭টি, ৬টি, ১৪টি ও ৩০টি। এ ছাড়াও রয়েছে নাড়ি (দ্র) সম্পর্কিত ১৬টি প্রবন্ধ। তাঁর বিশালায়তন রচনাবলি তৎকালীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসাবে পরিচিত। গ্যালেনের ব্যবহৃত ভেষজ ঔষধের নিষ্কাশগুলোকে বলা হয় 'গ্যালেনিক্যাল্‌স'।

এতসব সত্ত্বেও তাঁর রচনায় তথ্যগত ভুলভ্রান্তি কম নয়, বিশেষ করে আন্তরযন্ত্রের বর্ণনায়। সেকালে মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদের উপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা হয়তো এসব ভ্রান্তির অন্যতম কারণ। এ ছাড়াও গ্যালেনের সঞ্জীবনীতত্ত্ব (ভাইটালিজম), পুঁজতত্ত্ব কিংবা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ থেকে বাম অংশে রক্তপ্রবাহের তত্ত্ব ছিল আগাগোড়া ভুল।

তবু গ্যালেনের রচনা যেমন তাঁর জীবদ্দশায়, তেমনি ২০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। এর প্রভাব চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নতুন উদ্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। রেনেসাঁস যুগের প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটান।

রু. হা.

গ্যাস (gas)

যে অবস্থায় পদার্থের অণু (দ্র) বা পরমাণু (দ্র) পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং স্বাধীনভাবে ছুটোছুটি করতে পারে তাকে গ্যাস বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস যদি আমরা নিই তার নির্দিষ্ট ওজন থাকবে। কিন্তু এর নির্দিষ্ট আয়তন বা আকার থাকবে না। আদর্শ গ্যাসের বেলায় অণুগুলোর নিজস্ব আয়তন এদের দখল করা জায়গার আয়তনের তুলনায় নগণ্য। এদের মধ্যে কোনো আকর্ষণবলও কাজ করে না। এর অণুগুলো সম্পূর্ণ মুক্তভাবে চলতে পারে বলে আয়তন বৃদ্ধির সময় কোনো কাজ করে না। বাস্তব গ্যাসের বেলায় অণুদের মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ কাজ করে। ফলে আয়তন বৃদ্ধির সময় গ্যাসের অণুদের কিছু কাজ করতে হয়। এই গ্যাস বিস্তারলাভ করার সময় কিছুটা গতিশক্তি হারায় ও ঠাণ্ডা হয়। রিফ্রিজারেটরে এই নীতি ব্যবহার করে রিফ্রিজারেটরের ভিতরটা ঠাণ্ডা করা হয়। আদর্শ গ্যাসের বেলায় এর আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি সুন্দর সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই সূত্রটি হল $pV = nRT$, এখানে p হচ্ছে গ্যাসের চাপ, V এর আয়তন, T পরম তাপমাত্রা, R হচ্ছে গ্যাস ধ্রুবক এবং n হচ্ছে কত মোল গ্যাস নেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা। গ্যাসের এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা থার্মোমিটার তৈরি করতে পারি। গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুসারে, গ্যাসের তাপমাত্রা আসলে গ্যাসের অণুর ছোটাছুটির কারণে উৎপন্ন গতিশক্তিরই প্রকাশ। গ্যাসের আর একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হল, যে ধরনের অণুই হোক না কেন, একই তাপমাত্রা, চাপ ও আয়তনে একই সংখ্যক গ্যাস-অণু থাকবে।

আ. আ.

গ্যাস, নিষ্ক্রিয় (inert gas)

কিছু কিছু পরমাণু (দ্র) যেমন হিলিয়াম (দ্র), আর্গন (দ্র), ক্রিপটন, জেনন ও র‍্যাডন সাধারণভাবে অন্য কোনো মৌলের (দ্র) সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না। এর কারণ হল, এই সব পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনকক্ষে যতগুলো ইলেকট্রন অনুমোদিত তা পূর্ণ। রাসায়নিক বিক্রিয়া মানেই দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ও বাইরের ইলেকট্রনকক্ষের ইলেকট্রনসমূহের নতুন বিন্যাস ঘটানো। সাধারণ পরমাণুর বেলায় এটি ঘটে বলে বিভিন্ন পরমাণুর রাসায়নিক বন্ধনে নানা রকম অণু সৃষ্টি হয়। নিষ্ক্রিয়

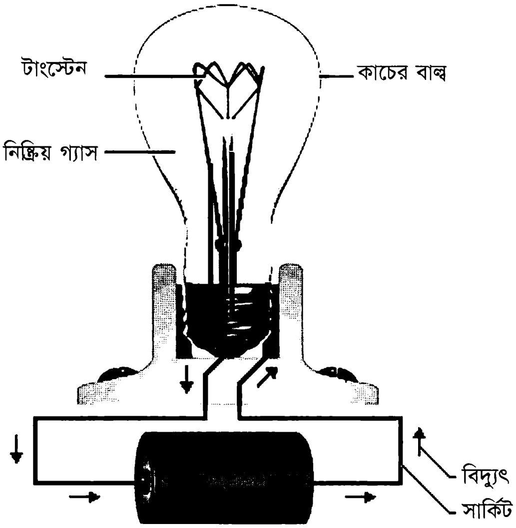

গ্যাসের বেলায় সাধারণভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটলেও ফ্লুরিন, অক্সিজেন (দ্র) ও কিছু কিছু ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং কেলাসিত যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করা গেছে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অনেক ব্যবহার আছে রাসায়নিক কারখানায় ও ল্যাবরেটরিতে। যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ রাখা প্রয়োজন সেখানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের একটি পরিবেশ রাখা হয়ে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে নোব্‌ল্ গ্যাস বা বিরল গ্যাসও বলা হয়ে থাকে।

আ. আ.

গ্যাস, প্রাকৃতিক (natural gas)

প্রাকৃতিক গ্যাস খনি থেকে পাওয়া গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন (দ্র), যা জ্বালানি (দ্র) ও শিল্প-কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে একটি মাত্র খনিজ জ্বালানি আমাদের দেশে বেশ খানিকটা রয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল এই প্রাকৃতিক গ্যাস। এটি আমাদের মূলবান সম্পদগুলোর অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের অধিকাংশই হল সবচেয়ে হালকা হাইড্রোকার্বন মিথেন (দ্র)। এর সঙ্গে অল্প পরিমাণে জটিলতর হাইড্রোকার্বন ইথেন, প্রোপেন ও বুটেন মেশানো থাকে। অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাসে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসও থাকতে পারে।

প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেলের মতোই পেট্রোলিয়াম (দ্র) জাতীয় পদার্থ। উভয়ের উৎসও একই রকম এবং অনেক ক্ষেত্রে একই খনিতে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ বছর আগে আজকের স্থলভাগের অনেক অংশ সমুদ্রতলে ছিল। তখন সেখানকার ক্ষুদ্র জলীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী যা প্লাঙ্কটন নামে পরিচিত, সেসবের মরদেহ ক্রমে সমুদ্রতলে জমে উঠেছিল। পরে স্তরে স্তরে পলি তার উপর জমা হয়ে সেগুলো চাপা পড়ে যায়। বহুকাল ধরে প্রচণ্ড চাপ, তাপ আর জীবাণুর ক্রিয়ায় সেগুলোই পরিণত হয়েছে গ্যাস ও তেলে। এসব গিয়ে জমেছে সচ্ছিদ্র বেলেপাথর আর চুনাপাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে। শিলার ভাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে যেখানে ধনুকাকৃতির শক্ত অপ্রবেশ্য শিলাস্তর তেল-গ্যাসপূর্ণ সচ্ছিদ্র স্তরকে ঢেকে সেই তেল বা গ্যাসকে আটকে ফেলেছে সেখানে কূপ খনন করে তা পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিক জরিপে এবং পদার্থবিদ্যার আধুনিক কিছু কৌশল ব্যবহার করে এ রকম খনি আবিষ্কারের প্রাথমিক সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। ইতিবাচক লক্ষণ দেখা গেলে তখন কূপ খনন করে দেখা হয় আদৌ তেল বা গ্যাস আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশে সম্ভাবনা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাইসমিক সার্ভে বা ভূকম্পন জরিপ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এতে মাটির কিছু গভীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভূকম্পন তরঙ্গগুলো বিভিন্ন শিলাস্তরে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এ থেকে শিলাস্তরের প্রকৃতি, পরম্পরা, ধনুকাকৃতি ভাঁজ আছে কিনা ইত্যাদি বোঝা যায়।

পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প-কারখানায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং বাড়ির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুতের শতকরা ৮৮ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস দহনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। শিল্প-কারখানায়, ইটের ভাটায় এবং বেশ কিছু শহরে রান্নার চুলায়ও জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশসচেতনতা জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ তেল, কয়লা ইত্যাদির তুলনায় এতে বায়ুদূষণ (দ্র) কম হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্য প্রধান ব্যবহার হল শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে। আমাদের দেশে ইউরিয়া (দ্র) সার (দ্র) তৈরির কাঁচামাল হিসাবে বিভিন্ন সার-কারখানায় প্রচুর গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। বহু দেশে ঔষধ, প্লাস্টিক,

ডিটারজেন্ট (দ্র), রঙ, সিনথেটিক কাপড় ইত্যাদি উৎপাদনের যে পেট্রোকেমিক্যাল্‌স শিল্প, তাতে প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে এর সাধারণ অংশটি যথারীতি সরবরাহ করার আগে এর তরল হাইড্রোকার্বন উপাদানগুলো আলাদা করে নিয়ে মূল্যবান তরল জ্বালানি ও কাঁচামাল পাওয়া যায়। এভাবে বুটেন ও প্রোপেনের মিশ্রণ এলপিজি (লিক্যুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) (দ্র) অথবা কনডেনসেট নামে পরিচিত খনিজ তেল সদৃশ পেনটেন, হেক্সেন ও হেপটেনের মিশ্রণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ যদিও একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবু সর্বশেষ অনুমান অনুসারে ১০.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত খনিগুলোতে আছে সম্ভবত। এখন উত্তোলিত গ্যাসের ৪৫% বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসাবে, ২৩% অন্যান্য জ্বালানি হিসাবে এবং ৩২% ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যথেষ্ট নতুন মজুদ আবিষ্কৃত না হলে উৎপাদনহার বর্তমানের কাছাকাছি রাখলেও দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। এর দক্ষ ও যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ তাই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মু. ই.

গ্যাসোলিন (gasoline)

বিশেষ তরল পদার্থ যা পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায়। এটি পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে ৭০° সে. থেকে ১২০° সে. এর মধ্যে প্রাপ্ত তরল হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ। এটি যেসব হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ তা হল হেক্সেন (C_6H_{14}), হেপ্টেন (C_7H_{16}), অকটেন (C_8H_{18}) ইত্যাদি। তরল জ্বালানি হিসাবে মোটরগাড়িতে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির সময় এটি ব্যবহৃত হয়।

সৈ. তা. আ.

গ্রহ (planet)

সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকার আকাশের (দ্র) দিকে তাকালে অসংখ্য তারা বা জ্যোতিষ্ক ঝলমল করতে দেখা যায়। রাত যত গভীর হতে থাকে আকাশে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। এই জ্যোতিষ্ক সব এক রকম নয়। কতকগুলো জ্যোতিষ্কের আলো স্থির আর কতকগুলো মিটমিট করে জ্বলে। যেসব জ্যোতিষ্কের আলো স্থির তাদের গ্রহ বলে এবং যেগুলো মিটমিট করে জ্বলে তাদের নক্ষত্র বলে। গ্রহের নিজের আলো নেই, নক্ষত্রের নিজস্ব আলো রয়েছে। নক্ষত্রের আলোয় গ্রহ আলোকিত হয়। সৌরজগতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৯টি গ্রহ সূর্যের (দ্র) চারিদিকে অনবরত ঘুরছে। সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে বাইরের দিকে অবস্থিত ৯টি গ্রহ হচ্ছে যথাক্রমে বুধ (দ্র), শুক্র (দ্র), পৃথিবী (দ্র), মঙ্গল (দ্র), বৃহস্পতি (দ্র), শনি (দ্র), ইউরেনাস (দ্র), নেপচুন (দ্র) ও প্লুটো (দ্র)। বুধ সৌরজগতে সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এ জন্য এর তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ। শুক্রকে পৃথিবী থেকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। শুক্রের আবহমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) ঘন মেঘে পরিপূর্ণ। সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ পৃথিবী সৌরজগতের গ্রহগুলো থেকে একটু স্বতন্ত্র। এটি মানুষ ও প্রাণীর মতো জীবের বসবাসের উপযোগী গ্রহ। এর চার ভাগের তিন ভাগ পানি, যা জীবের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে মনে হয় একটি নীল গ্রহ। সৌরজগতে পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান, সূর্য থেকে ২২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। মঙ্গলের পৃষ্ঠতলকে কমলা-লাল চূর্ণ পাথরের মরুভূমি (দ্র) বলা যায়। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৭৭ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহে পানি নেই এবং আবহাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের পাতলা আস্তরণে ছাওয়া। এতে পৃথিবীর মতো ঋতুচক্র রয়েছে। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। পৃথিবীর মতো ১৩০০ গ্রহ এতে পুরে রাখা যায়। বৃহস্পতির বেশ ক'টি উপগ্রহও রয়েছে। শনি গ্রহকে বৃহস্পতির ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বলা চলে। একে একটি গ্যাসের গোলকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই গ্রহের চারদিকে রয়েছে আকর্ষণীয় বলয় বা রিং। বুধ থেকে শুরু করে শনি পর্যন্ত সব গ্রহই খালি চোখে দেখা যায়।

ইউরেনাস হল প্রথম গ্রহ যা টেলিস্কোপের সাহায্যে আবিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে ১৭৮১ সালে

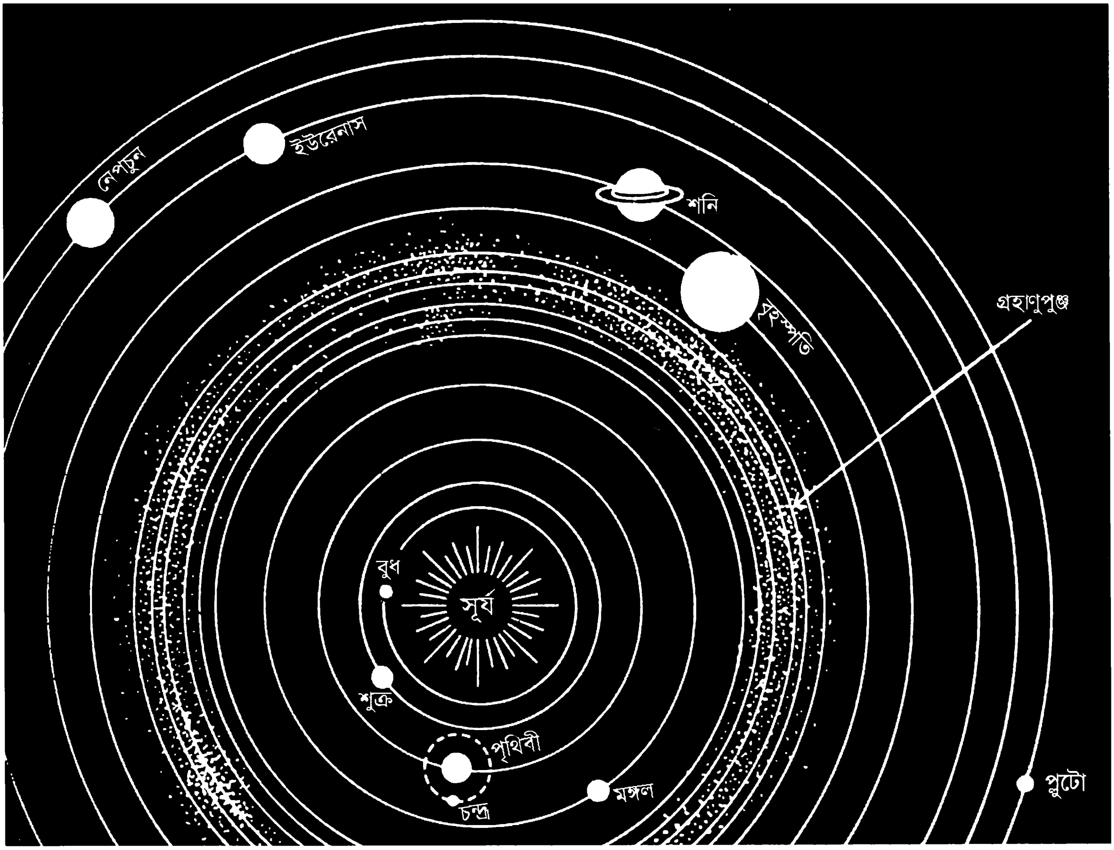

সূর্য ও তার নয়টি গ্রহ

উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) ইউরেনাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এর পরই আসে নেপচুন। ইউরেনাস ও নেপচুন উভয়ই গ্যাসের গোলক এবং পৃথিবীর চার গুণ বড়। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হচ্ছে প্লুটো। এটি বেশ ঠাণ্ডা ও আকারে চাঁদের চেয়েও ছোট। তবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে অনুষ্ঠিত আইএইউ'র ১৬শ সাধারণ অধিবেশনে প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। প্লুটোর স্থান হয়েছে এখন বামন গ্রহের তালিকায়।

সে. শা.

গ্রহণ (eclipse)

আমরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কথা শুনেছি এবং কখনো তা দেখেছিও। মহাশূন্যে যখন পৃথিবী (দ্র), চাঁদ (দ্র) ও সূর্য (দ্র) একই রেখা বরাবর অবস্থান করে তখন যে ঘটনা ঘটে বা আমরা যা দেখতে পাই তা-ই গ্রহণ। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যখন চাঁদ একই রেখা বরাবর অবস্থান করে এবং তার ফলে পৃথিবীতে চাঁদের ছায়া পড়ে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। আর সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে যখন পৃথিবী একই রেখা বরাবর অবস্থান করে এবং চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। গ্রহণ আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে। সূর্যগ্রহণ খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়। সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সহজে দেখা যায় না। চাঁদ মাসে এক বার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসে, কিন্তু বছরে এক বার কি দু'বার এটি সরাসরি সূর্যের সামনে আসে। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। ঘটনাক্রমে কখনো যদি পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্যের আকার সমান দেখা যায়, তখনই সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ঘটে এবং এই গ্রহণ মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। পূর্ণগ্রহণের সময় আকাশ (দ্র) অন্ধকার হয়ে যায় এবং চাঁদের কালো চাকতিটির (black disk) চারপাশে সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখা যায়। সূর্যের

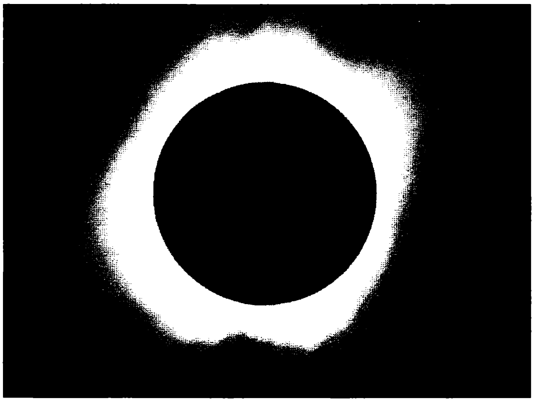

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ছবি

পূর্ণগ্রহণ কদাচিৎ দেখা যায়। যখন চাঁদ সূর্যের অংশবিশেষ ঢেকে দেয় তখন সূর্যগ্রহণ ঘটে। সূর্যের আংশিক গ্রহণই সচরাচর দেখা যায়। গ্রহণের সময় পৃথিবীর যেসব জায়গায় চাঁদ ওঠে সেসব জায়গা থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্রগ্রহণ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদকে বেশ অন্ধকার ও লালচে দেখায়, কিন্তু চাঁদ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় না।

সে. শা.

গ্রহাণু / গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroid)

মহাশূন্যে মঙ্গল (দ্র) গ্রহ (দ্র) পেরুলেই গ্রহাণুর দেখা পাওয়া যায়। গ্রহাণুর ইংরেজি প্রতিশব্দ অ্যাস্টিরয়েড (asteroid), যার অর্থ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক (little star)। কিন্তু গ্রহাণু তারকা বা জ্যোতিষ্ক নয়। গ্রহাণু আসলে নিরেট পাথরের টুকরোর মতো বস্তু। এই বস্তু বা গ্রহাণুগুলো মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। মহাশূন্যে হাজার হাজার গ্রহাণু রয়েছে। প্রত্যেক গ্রহাণু নিজ পথে চলাচল করে। কিছু কিছু গ্রহাণু একত্রে কাছাকাছি থেকে দল বেঁধে চলাচল করে। ফলে তাদের মৌমাছির (দ্র) ঝাঁকের মতো দেখায়। বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুর সঠিক সংখ্যা বের করতে পারেন নি। গ্রহাণুগুলো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। কতকগুলো গ্রহাণু এত ছোট যে এদের দূরবীক্ষণযন্ত্র (দ্র) দিয়ে দেখতে হয়। আবার কতকগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহাণুটির নাম সেরেজ (ceres)। এর ব্যাস ৭০০ কিলোমিটার। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গ্রহাণুগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানীরা এদের আকৃতির কথা জেনেছেন এবং এদের মজার মজার আকৃতির কথা বলেছেনও। গ্রহাণু গ্রহের মতো গোল নয়। এবড়ো-খেবড়ো ধারবিশিষ্ট গ্রহাণুগুলোর জ্বালামুখ (craters) রয়েছে। বেশ কিছু গ্রহাণু গোল আলুর (potato) মতো দেখতে। কিছু কিছু গ্রহাণু দেখতে ভেঙে যাওয়া খণ্ডের মতো। গ্রহাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু তথ্য দিতে পারলেও গ্রহাণুর রহস্য ভেদ করতে পারেন নি। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে এত ফাঁক দেখে বিজ্ঞানী কেপ্‌লার (দ্র) ধারণা করেছিলেন যে এই ফাঁকা জায়গায় আরেকটি গ্রহ রয়েছে। তাঁর এই ধারণা থেকে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা গ্রহ খুঁজে পান নি বটে, তবে হাজার হাজার গ্রহাণুর সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, অনেক অনেক আগে হয়তো এখানে কোনো আস্ত গ্রহই ছিল এবং সেই গ্রহ ভেঙেই এই হাজার হাজার গ্রহাণুর সৃষ্টি হয়েছে।

সে. শা.

গ্রাফাইট (graphite)

কার্বন (দ্র) নামক মৌলের (দ্র) একটি কেলাসিত রূপ। গ্রাফাইট একটি ধূসর রঙের পদার্থ এবং ধাতুর মতো এর

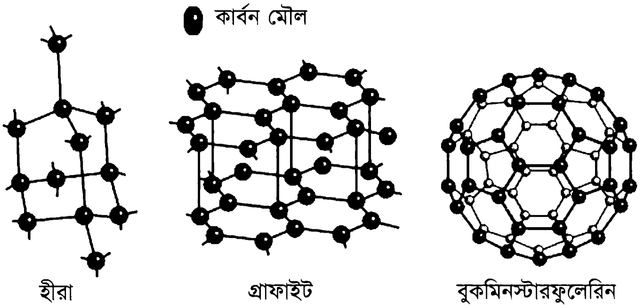

গ্রাফাইটের যৌগ

টর্চ-ব্যাটারির মধ্যে যে কালো দণ্ডটি থাকে সেটি গ্রাফাইটের তৈরি

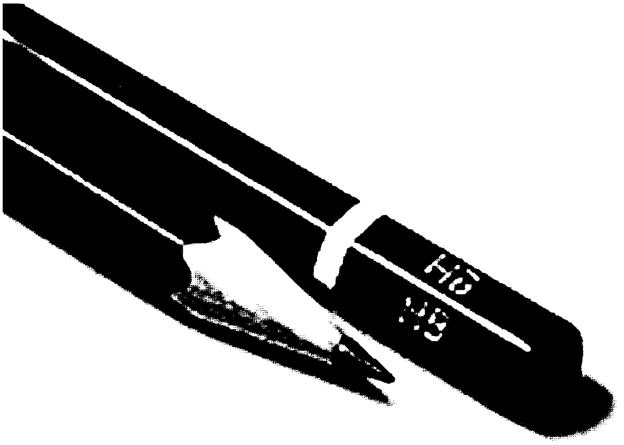

পেন্সিলের সিস– গ্রাফাইট ও কাদা মিশিয়ে তৈরি হয়

ঔজ্জ্বল্য আছে। পদার্থটি তাপ (দ্র) ও তড়িতের (দ্র) উত্তম পরিবাহী। গ্রাফাইট একটি নরম পদার্থ। একে স্পর্শ করলে সাবানের (দ্র) মতো পিচ্ছিল বলে মনে হয়। একে কাগজে ঘষলে কালো দাগ পড়ে। কাঠপেন্সিলের সিস ও পিচ্ছিলকারক তেলের উপাদান হিসাবে গ্রাফাইটের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। তড়িৎদ্বাররূপে এবং অগ্নিসহ মুচি (crucible) তৈরির কাজেও এ জিনিসটির ব্যবহার রয়েছে। গ্রাফাইট একটি খনিজ পদার্থ। ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে কয়লার (দ্র) পরমাণু স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে কেলাসিত (দ্র) গ্রাফাইটে পরিণত হয়। অতি উৎকৃষ্ট কয়লার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে কৃত্রিম উপায়ে গ্রাফাইট তৈরি করা যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় এটি সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। উচ্চ তাপে (প্রায় ৭০০° সে.) গ্রাফাইট অক্সিজেনের (দ্র) সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস তৈরি করে। তড়িৎশলাকা হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। টর্চ-ব্যাটারির মধ্যে যে কালো শলাকাটি থাকে সেটি গ্রাফাইটের তৈরি। কাদার সঙ্গে গ্রাফাইট মিশিয়ে কাঠপেন্সিলের সিস তৈরি করা হয়। কাদা মেশানোর ফলে এটি বেশ শক্ত হয় এবং সহজে ভাঙে না।

আ. হ. খ.

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect)

শীতপ্রধান দেশে ফুল, ফল ও শাক-সবজি সারা বছর ফলানোর জন্য এক ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়। কাচের ঘর নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। ফলে গ্রীষ্মের শাক-সবজি শীতে, শীতের শাক-সবজি গ্রীষ্মে ফলানো সম্ভব হয়। এই কাচের ঘরের নাম গ্রিনহাউস। গ্রিনহাউস সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দেয় না, তবে তাপশক্তির কিছু অংশ আচ্ছাদনের মধ্যে ধরে রাখে।

একজন সুইডিশ বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ ১৮৯৬ সালে প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও গ্রিনহাউসের মধ্যে মিল খুঁজে পান। তিনিই প্রথম গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কথাটি ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানীর নাম স্ভান্তে আরেনিয়াস (Svante Arrhenius)। গ্রিনহাউস ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উভয়ই কিছু তাপ ধরে রাখে। সূর্যালোক গ্রিনহাউসে যখন প্রবেশ করে তখন তাপ ভিতরের মাটি ও উদ্ভিদকে উষ্ণ করে। পরে উদ্ভিদ ও মাটি কিছু তাপ ছেড়ে দেয়। কিন্তু গ্রিনহাউসের অভ্যন্তর বেশ উষ্ণ থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ যেভাবে অবস্থান করে তার প্রক্রিয়া একটু জটিল। কিন্তু ফলাফল গ্রিনহাউসের অনুরূপ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের রশ্মি আসতে বাধা দেয় না, তবে সূর্যের আলো জীবমণ্ডল ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করার পর কিছু তাপ জীব ও পৃথিবী থেকে ফিরে আসে। ছেড়ে দেওয়া এ তাপ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, ওজোন ইত্যাদি দ্বারা শোষিত হয়। এসব গ্যাসকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। তাপ শোষণের ফলে গ্যাসগুলো উষ্ণ হয় এবং বায়ুমণ্ডলের সবদিকে তাপ পাঠাতে থাকে। কিছু তাপ মহাশূন্যে যায়। বাকিটা

পৃথিবীতে ফিরে আসে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলে মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড ও অন্যান্য কিছু প্রাকৃতিক কারণে গ্রিনহাউস গ্যাসমসূহের পরিমাণ বাড়ছে। সুতরাং তাপমাত্রা ধরে রাখার জন্য বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ পুরু একটি গ্যাসের স্তর। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে দেওয়া তাপ-শোষণের পরিমাণ বাড়বে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই হল গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

ত. চ.

গ্লাইডার (glider)

গ্লাইডার হচ্ছে ইঞ্জিনবিহীন প্লেন, যা পাখিদের ডানা ও এদের ওড়ার কৌশল অনুকরণ করে নির্মাণ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্লাইডার নির্মাণ

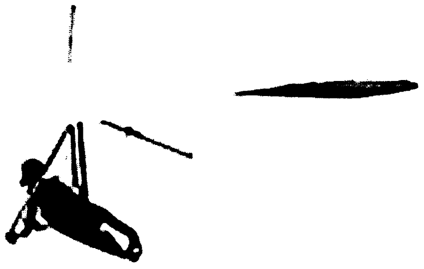

শুরু হয়। এর আগে মানুষ আকাশে (দ্র) উড়বার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে হাইড্রোজেন (দ্র) গ্যাসের (দ্র) বেলুন ব্যবহার করে। গ্লাইডারের ডানা, লেজ, দেহ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অনেকটা ইঞ্জিনচালিত প্লেনের মতোই। গ্লাইডারের ডানা একটু কাত করা থাকে। ফলে তা বাতাসের মধ্য দিয়ে চলার সময় একটি ঊর্ধ্বচাপ লাভ করে। এই ঊর্ধ্বচাপ গ্লাইডারের ওজনকে বহন করে।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (দ্র) প্রথমে গ্লাইডার ব্যবহার করে উড়তে শেখেন। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে তাঁরা পরে পেট্রোল ইঞ্জিনচালিত প্লেন উদ্ভাবন করেন ১৯০৩ সালে। গ্লাইডার চালাবার সময় কোনো পাহাড়ের ধার থেকে চালক লাফিয়ে পড়েন গ্লাইডার নিয়ে। অনেক সময় ইঞ্জিনচালিত গাড়ির সাহায্যে বা দড়ি টেনে গ্লাইডারকে প্রাথমিক গতি দেওয়া হয়। গ্লাইডার প্লেন এত হালকা যে বাতাসের গতিকে সম্বল করে বহুদূর ও বহু উঁচু পর্যন্ত এটি উড়তে পারে। ১২,০০০ মিটার উচ্চতায় উড়বার ও ৬৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমণের রেকর্ড আছে গ্লাইডারের। গ্লাইডার চালনার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক একটি ক্রীড়া।

আ. আ.

গ্লিসারিন (glycerine)

গ্লিসারিন বর্ণহীন, মিষ্টি স্বাদযুক্ত, সিরাপের মতো ঘন জৈব তরল পদার্থ। এর রাসায়নিক সঙ্কেত $CH_2OH\text{-}CHOH\text{-}CH_2OH$। এটি ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল শ্রেণির যৌগ। পানি এবং অ্যালকোহলে দ্রবণীয়, কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম ও বেনজিনে অদ্রবণীয়। ১৭০° সে. তাপমাত্রায় অবিযোজিত অবস্থায় গ্লিসারিন বাষ্পীভূত হয়। এর স্ফুটনাঙ্ক ২৯০° সে.। ০° সে. তাপমাত্রায় শীতল করলে গ্লিসারিন বরফের মতো কেলাসিত হয়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী শিলে চর্বিকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করে গ্লিসারিন উৎপাদন করেন। উদ্ভিদ-তেল, যেমন– নারকেল তেল, বাদাম তেল, পাম তেল, সরিষার তেল, জলপাই তেল ও প্রাণীর চর্বিতে ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টাররূপে গ্লিসারিন বিদ্যমান থাকে। নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুতকরণে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয়, যা বিস্ফোরক পদার্থ করডাইট ও ডিনামাইট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রসাধনী দ্রব্যাদি, টুথপেস্ট, স্বচ্ছ সাবান এবং ছাপার কালি, জুতার কালি ও রঙ প্রস্তুতিতে, ঔষধ শিল্পে ও চর্মরোগ নিয়ন্ত্রণে, খাদ্য ও ফল সংরক্ষক হিসাবে গ্লিসারিনের ব্যবহার রয়েছে। আঠালো বৈশিষ্ট্যের জন্য ঘড়িতে পিচ্ছিলকারক হিসাবে এবং শীতপ্রধান দেশে মোটরযানে হিমরোধক হিসাবে এর ব্যবহার হয়। সিগারেটের তামাক আর্দ্র এবং সেলুফেন নরম রাখতে প্রচুর গ্লিসারিন লাগে।

সাবান তৈরির প্রক্রিয়ায় এটি উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়।

সৈ. তা. আ.

www.boighar.com

গ্লু (glue)

পানিতে প্রলম্বিত অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ঘটিত যৌগের মিশ্রণের কোলয়ডীয় কণা। গ্লু হল ভারী, আঠালো তরল যার দ্বারা কোনো জিনিস বা বস্তুকে জোড়া লাগানো যায়, যুক্ত করা যায় বা আটকে দেয়া যায়। সর্বোত্তম গ্লু এমন জোড়া লাগায় বা এমন জয়েন্ট বা সন্ধি তৈরি করে যা ঠাণ্ডা, গরম, ভেজা বা শুকনো কোনো অবস্থায়ই খোলে না। কোনো আদর্শ বা প্রমাণ গ্লু বলতে কিছু নেই। কারণ একই গ্লু দিয়ে সব রকমের পদার্থের জিনিস জোড়া লাগানো বা সংযুক্ত করা যায় না। বিভিন্ন পদার্থ জোড়া লাগাতে বিভিন্ন গ্লু ব্যবহার করতে হয়।

গ্লু প্রধানত দু' রকমের তৈরি হয়– এক রকম প্রাকৃতিক বস্তু থেকে। অপর রকম তৈরি হয় সিনথেটিক বস্তু থেকে। প্রাকৃতিক গ্লু তৈরি করা হত প্রাণী থেকে, বিশেষ করে এদের চামড়া, হাড় ও ক্ষুর থেকে। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক গ্লু তৈরি হত মাছ থেকে। প্রাণীর হাড়, চামড়া ও ক্ষুরা বা মাছকে পানির সাথে মিশিয়ে সেদ্ধ করা হত। এই দ্রবণ ঘন হয়ে পাত্রের তলায় আস্তরণে বা পরতে (গ্লুতে) পরিণত হত। কাঠের আসবাবপত্র (furniture) তৈরির কাজে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে মিশরে এই ধরনের গ্লু ব্যবহার করা হত। সিনথেটিক রেজিন গ্লু তৈরি হয় কৃত্রিম বা মানুষের তৈরি বিভিন্ন পদার্থ থেকে। গৃহকর্মে ব্যবহৃত সবচেয়ে বেশি দরকারি বা গুরুত্বপূর্ণ গ্লু হল এপক্সি (epoxy) গ্লু। এগুলো তৈরি হয় প্লাস্টিক থেকে। এতে দু'টি অংশ থাকে– একটি রেজিন ও অপরটি কঠিনকারক (hardner)। এ দু'টি পৃথক দু'টি টিউবে রাখা হয়। ব্যবহারের সময় এদেরকে একত্রিত করে বা মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়। এরা অতিদ্রুত জমে অত্যন্ত শক্ত জলরোধী (waterproof) সন্ধি বা জয়েন্ট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ বস্তুকে সুপার গ্লু দিয়ে ২/১ মিনিটের মধ্যেই জোড়া লাগানো যায়। যে দু'টি জিনিসকে জোড়া লাগাতে হবে তাদের যে কোনো একটির গায়ে সুপার গ্লু লাগিয়ে অপরটি চেপে ধরলেই মুহূর্তেই জোড়া লেগে যায়। এই গ্লু ব্যবহারের অসুবিধা হল এটি বেশ দামি এবং অতি সহজে আঙুল আঠায় আটকে যেতে পারে। অনেক আধুনিক গ্লুতে বিষাক্ত দ্রাবক (solvent) ব্যবহার করা হয়। গ্লু শক্ত হওয়ার সময় এই দ্রাবক বাষ্পায়িত হয়। এই বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ করে কোনো

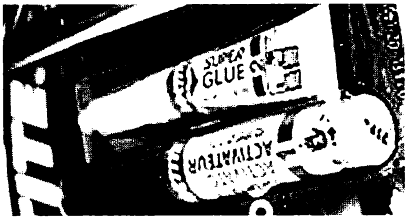

ঘরে গ্লু ব্যবহার করা উচিত নয়। কখনো গ্লু-এর ঘ্রাণ নেওয়া বা শুঁকে দেখাও উচিত নয়। এতে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

শা. ত.

গ্লুকোজ (glucose)

সাদা দানাদার মিষ্টি স্বাদযুক্ত জৈব পদার্থ। গ্রিক শব্দ গ্লুকাস থেকে এ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ মিষ্টি। এর রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_{12}O_6$। পানিতে সম্পূর্ণ এবং অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয়। প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আঙুরের রসে পাওয়া যায় বলে গ্লুকোজের অপর নাম দ্রাক্ষা শর্করা। আলু, গম, যব, চাল প্রভৃতি শ্বেতসার আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। জলীয় দ্রবণ থেকে কেলাসিত গ্লুকোজের অণুতে এক অণু কেলাস পানি যুক্ত থাকে। এই গ্লুকোজের গলনাঙ্ক ৮৩° সে.। অ্যালকোহল থেকে কেলাসিত অনার্দ্র গ্লকোজেরু গলনাঙ্ক ১৪৬° সে.। এর অণুতে ছয়টি কার্বন পরমাণু ও একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকায় গ্লুকোজকে অ্যালডোহেক্সোজ বলে। এর অপর নাম ডেক্সট্রোজ, কারণ এটি আলোক-সক্রিয় এবং ডান ঘূর্ণি। এর অণুতে পাঁচটি অ্যালকোহলীয় হাইড্রক্সিল মূলক ও একটি অ্যালডিহাইড মূলক আছে। তাই গ্লুকোজ অ্যালকোহল ও অ্যালডিহাইড সদৃশ-বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। গ্লুকোজ রক্তের একটি স্বাভাবিক উপাদান। জীবে শক্তি সরবরাহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পথ্যরূপে নানা রকম ঔষধ ও ভিটামিন 'সি' প্রস্তুত করার কাজে, ফল সংরক্ষণে, আয়নায় রুপালি প্রলেপ প্রদানে এবং বিভিন্ন দ্রব্যের সিরাপ, জেলি, মিষ্টিকারক হিসাবে এর ব্যবহার আছে।

সুস্থ মানুষের রক্তে শতকরা ০.০৮ ভাগ থেকে ০.১১ ভাগ গ্লুকোজ থাকে। ফুলের মধুতে ও মিষ্টি ফলে গ্লুকোজ মুক্ত অবস্থায় থাকে।

সৈ. তা. আ.

ঘ

ঘড়ি (clock, watch)

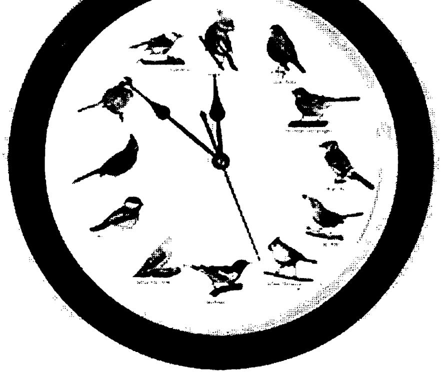

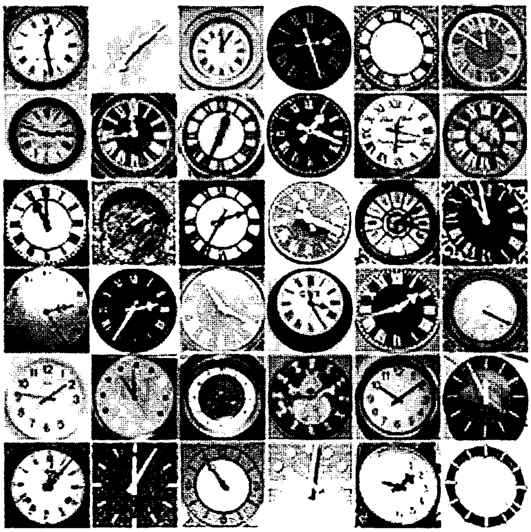

যা-কিছু সময় নিরূপণ করতে সাহায্য করে তা-ই 'ঘড়ি'। সুদূর অতীতে জলঘড়ি, বাতিঘড়ি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদি সময় হিসাব করার কাজে ব্যবহৃত হত, কারণ এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কিছু সময়ের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন অবশ্য ঘড়ি বলতে আমরা টাওয়ারঘড়ি, দেওয়ালঘড়ি, টেবিলঘড়ি, পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি ইত্যাদিই বুঝি। এগুলো হয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাকা ইত্যাদির গতির মাধ্যমে চালিত অথবা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় চালিত। এসব ঘড়ির কলকব্জার তিনটি কাজ– ঘড়ির চলার শক্তি সরবরাহ করা, সময় নিরূপণ করা এবং সময় দেখানো। যান্ত্রিক ঘড়িতে চলার শক্তি আসে হয় মাঝে মাঝে উপরে তুলে দেওয়া ঝুলন্ত ভারী বস্তুর ক্রমপতনের দ্বারা অথবা দম দেওয়া স্প্রিং ধীরে ধীরে খুলে যাওয়ার দ্বারা। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটাই অধিক প্রচলিত। যান্ত্রিক ঘড়িতে সময় নিরূপণের কাজ করে বার বার একই হারে পুনরাবৃত্ত হয় এমন কোনো গতি। সাধারণত দোলকের দোলন অথবা হেয়ার স্প্রিং নামক স্প্রিং-এর বারংবার গোটানো আর খুলে যাওয়ার কারণে একবার এদিক আরেক বার ওদিক আবর্তনশীল চাকা ব্যালেন্স হুইল এই কাজ করে।

ঘড়িতে পতনশীল ভার অথবা দম দেওয়া মেইন স্প্রিংকে নিজ গতিতে পড়ে যেতে বা খুলে যেতে দেওয়া হয় না। এস্কেপ হুইল নামের একটি চাকা গিয়ারের মাধ্যমে ঘড়ির মূল চালনাশক্তির সাহায্যে ঘুরতে থাকে, কিন্তু ঘোরার সময় দোলক অথবা ব্যালেন্স হুইল তার পুনরাবৃত্ত গতির প্রত্যেক বার এস্কেপ হুইলকে খানিকক্ষণ আটকে রেখে আবার একটু চলতে দেয়। এই একটু একটু করে চলাটাই বিভিন্ন গিয়ারব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন হারে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটায় সঞ্চারিত হয়। এস্কেপ হুইলকে বাধা দেওয়ার আঘাতেই ঘড়ির চিরপরিচিত টিকটিক শব্দ সৃষ্টি হয়। ঐ একই প্রক্রিয়ায় দোলক অথবা ব্যালেন্স হুইল নিজেও মূল চালকশক্তির কাছ থেকে একটু একটু ধাক্কা খেয়ে তার হারিয়ে ফেলা শক্তিটুকু পূরণ করে নেয়।

যান্ত্রিক ঘড়ি চীন দেশে এক হাজার খ্রিস্টাব্দের দিকে এবং ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম চালু হলেও তাতে সময় নিরূপণের কাজটি ভালোভাবে হত না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দোলকঘড়ি এবং একই শতাব্দীর শেষ দিকে স্প্রিংভিত্তিক ব্যালেন্স হুইল উদ্ভাবনের পরই ঘড়ি যথেষ্ট নিখুঁত সময় নির্দেশ করতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যান্ত্রিক ঘড়ির উৎকর্ষ প্রায় আজকালকার মতো অবস্থাতেই পৌঁছে যায়। নাবিকদের প্রয়োজনে অতি নিখুঁত ঘড়ি ক্রনোমিটার তখন প্রথম তৈরি হয়। স্প্রিং ব্যালেন্স ঘড়িকে ক্রমাগত ছোট করে পরে পকেটঘড়ি ও হাতঘড়ি হিসাবে ব্যক্তিগত পরিধানের জিনিসে পরিণত করে

বৈদ্যুতিক ঘড়ি ব্যাটারিচালিত হলে এতে সময় নির্দেশের কাজ করে দোলক, ব্যালেন্স হুইল অথবা

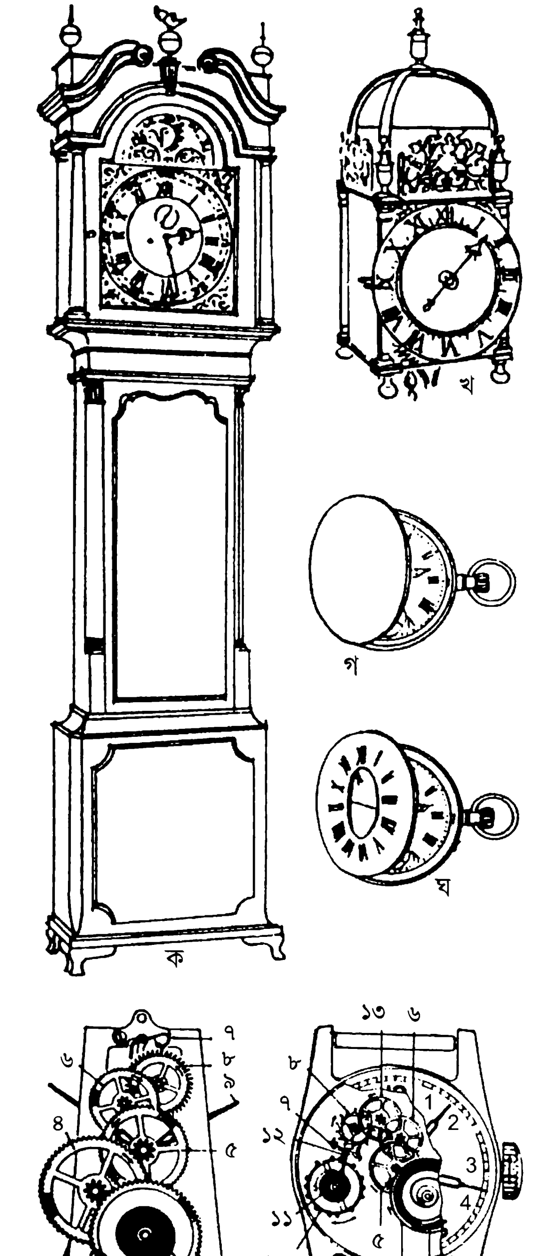

ক. গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি, খ. লণ্ঠন ঘড়ি, গ. শিকারির ট্যাক-ঘড়ি, ঘ. আধা-শিকারি ঘড়ি, ঙ. পেন্ডুলাম ঘড়ির কলকব্জা। চ. স্প্রিং-চালিত ঘড়ির কলকব্জা : ১. মেইন স্প্রিং, ২. প্রধান চাকা (ব্যারেল), ৩. পেন্ডুলাম, ৪. মধ্যবর্তী চাকা, ৫. সেন্টার হুইল, ৬. তৃতীয় চাকা, ৭-৮. এস্কেপমেন্ট, ৯. ঘণ্টার কাঁটা, ১০. ব্যালান্স, ১১. হেয়ার স্প্রিং, ১২. লিভার, ১৩. চতুর্থ চাকা

কোয়ার্জ কেলাসের সৃষ্ট বৈদ্যুতিক স্পন্দন। মেইন্‌স্ সরবরাহ থেকে আসা পরিবর্তী বিদ্যুতের সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি বা পর্যাবৃত্তিহার থাকে বলে তাকেই মেইন্‌সের বিদ্যুৎচালিত ঘড়িতে সময় নির্দেশের কাজে ব্যবহার করা যায়। বৈদ্যুতিক ঘড়িতে সময় দেখানোর কাজ বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে কাঁটা অথবা সংখ্যা লেখা ফিতা ঘুরিয়ে হতে পারে, আবার সরাসরি বৈদ্যুতিক বর্তনীর ক্রিয়ায় সংখ্যার ছবি ফুটিয়ে তুলেও হতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিটি বেশি ব্যবহার করা হয় আজকাল ছোট্ট 'চিপ' বা একটুখানি সিলিকন (দ্র) চিলতের ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক সমন্বিত বর্তনীর ডিজিটাল ঘড়িতে। এর সঙ্গে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে নামে পরিচিত ব্যবস্থাটি ব্যবহৃত হয় সংখ্যা ফুটিয়ে তোলার জন্য। এসবে কোনো গতিশীল অংশ থাকে না, সব কিছুতে বিদ্যুৎ খরচ হয় অতি সামান্য– ছোট্ট একটি ব্যাটারিতে বহু দিন চলে যায়।

কোয়ার্জ (দ্র) কেলাসের স্পন্দনভিত্তিক ঘড়ি ত্রিশের দশক থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো খুব নিখুঁত সময় দেয়। আর চল্লিশের দশকে পারমাণবিক স্পন্দনকে সময় নিরূপণের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে এমন ঘড়ি উদ্ভাবিত হয় যাতে এক লক্ষ বছরে দুই সেকেন্ডের চেয়ে বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। বিশ শতকের সত্তরের দশকে যে ডিজিটাল ঘড়ি চালু হয়েছে তার জনপ্রিয়তা প্রধানত অতি সস্তা ও বহুমুখী হবার কারণে।

প্রাচীন কাল থেকেই ঘড়ির সঙ্গে সময় নির্দেশের কাজ ছাড়াও শোভা বর্ধনের কাজেরও সম্পর্ক ছিল। প্রাসাদের বিশাল ঘড়ির জবড়জং ভাস্কর্যেই হোক আর ছোট্ট হাতঘড়ির সূক্ষ্ম অলঙ্করণেই হোক, এই দিকটি বরাবর মনোযোগ পেয়েছে, এখনো পাচ্ছে তার আধুনিক সংস্করণে।

মু. ই.

ঘড়িয়াল (gavial)

ক্রোকোডাইলিয়া বর্গের সরীসৃপ ঘড়িয়াল, ঘড়েল, গেভিয়াল, মেছো কুমির বা বাইশাল বিরল প্রজাতির মিঠা পানির কুমির। বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus*। অত্যন্ত লম্বা নাক ও চোয়ালের জন্য

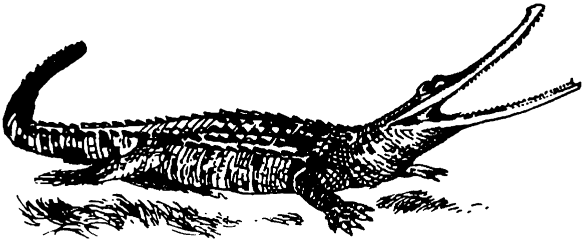

এটি অন্যান্য কুমির থেকে আলাদা। এর ০.৯-১.২ মিটার লম্বা চোয়ালটি মাছ ধরার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। পুরুষ-ঘড়িয়ালের ওপরের চোয়ালে, নাকের ঠিক ওপরে কলস বা ঘড়া আকৃতির একটি পিণ্ড থাকে। শোনা যায়, এ থেকেই ঘড়িয়াল নামের উৎপত্তি। শুধু ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট নদীতে এর দেখা মেলে।

অন্যান্য কুমিরের মতোই এর পিঠ ও লেজ কাঁটাযুক্ত শক্ত আঁশে মোড়ানো। সরীসৃপ (দ্র)-জাতীয় প্রাণী হলেও এর হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। এর হাতে পাঁচটি ও পায়ে চারটি করে আঙুল ও নখর রয়েছে। চোখ অপেক্ষাকৃত বড়। চোয়ালে দাঁতের সংখ্যা শতাধিক। ঘড়িয়াল লম্বায় ৪.৫-৯ মিটার হতে পারে। পুরুষ-ঘড়িয়াল আরো মিটার খানেক বড় হয়। এর গায়ের রঙ কালচে-ধূসর হলেও বাচ্চাগুলো কিছুটা উজ্জ্বল।

চৈত্র এদের প্রজনন ঋতু। স্ত্রী-ঘড়িয়াল বালিতে ৬০-৯০ সেন্টিমিটার গর্ত করে একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশটি ডিম পাড়ে। ক্যাপসুল আকৃতির ধবধবে সাদা ডিমগুলো প্রায় ১০ সেন্টিমিটার লম্বা। ষাট থেকে পঁচাত্তর দিনে ডিম ফুটে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা বাচ্চা বের হয়। এটি তিন বছরেই ১.৫ মিটার লম্বা হয়ে যায়। ঘড়িয়াল চার-পাঁচ বছরে প্রজননক্ষম হয়। এরা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

ঘনত্ব (density)

কোনো বস্তুর ঘনত্ব বলতে বোঝায় সেই বস্তুর প্রতি একক আয়তনের ভর। যেমন– আমরা যদি এক ঘন সেন্টিমিটার পানি নিই, তার ওজন হবে এক গ্রাম। পানির ঘনত্ব তা হলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক গ্রাম। আমরা যদি পানির আয়তন ঘন সেন্টিমিটারের পরিবর্তে ঘন মিটারে মাপি, তা হলে দেখা যাবে, এক ঘন মিটার পানির ভর দাঁড়াবে দশ লক্ষ গ্রাম বা এক হাজার কিলোগ্রাম। (কারণ এক ঘন মিটার = ১০,০০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার)। তা হলে SI এককে পানির ঘনত্ব হল প্রতি ঘন মিটারে এক হাজার কিলোগ্রাম। আমরা যদি একই আয়তনের বিভিন্ন বস্তু নিই, তা হলে তাদের ভর বিভিন্ন হবে। ঘনত্বকে পরমভাবে নির্ধারণ না করে তুলনামূলকভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। একে বলা হয় আপেক্ষিক ঘনত্ব। একই আয়তনের পানির তুলনায় সিসার ভর ১১.৩ গুণ এবং সোনার ভর ১৯.৩২ গুণ। এ জন্য পানির তুলনায় সিসার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১১.৩ এবং সোনার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১৯.৩২। যেসব বস্তুর ঘনত্ব পানির চেয়ে কম তা পানিতে ভাসে। বরফের ঘনত্ব পানির চেয়ে কম বলে বরফ পানিতে ভাসে।

নির্মাণকাজে কোনো বস্তু ব্যবহার করার সময় অনেক সময়ই ঘনত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উড়োজাহাজ নির্মাণের সময় হালকা ধাতু, যেমন অ্যালুমিনিয়াম, পছন্দ করা হয়। লোহার জাহাজ যে পানিতে ভাসে তার কারণ জাহাজের মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে এবং জাহাজের সার্বিক ঘনত্ব পানির তুলনায় সে জন্য কম। যে কোনো বস্তুর ঘনত্ব নির্ধারণ করবার সাধারণ সূত্র হল

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$$

তরল পদার্থের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ধারণের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার করা হয়।

আ. আ.

ঘনীভবন (condensation)

কোনো বস্তুকে এর গ্যাসীয় দশা থেকে ঠাণ্ডা করে এনে তরল দশায় নিয়ে যাওয়াকে ঘনীভবন বলা হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলোর গতিশক্তি বেশি থাকে এবং এরা ছুটোছুটি করে। কোনো ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে এসে বা অন্যভাবে গ্যাসের অণুগুলো যদি গতিশক্তি হারায়, তা হলে এরা একত্রিত হয়ে জমাট বাঁধতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে জলীয় বাষ্প উপরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয় ও ঘনীভূত হয়ে জলকণার সৃষ্টি করে। শীতের দিনে টিনের চাল বা ধানের শিষে যে শিশিরবিন্দু জমে, সেটাও জলীয় বাষ্পের

ঘনীভবন। কোনো ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা আর কোনো অবলম্বন পেলে এই ঘনীভবনের কাজ ত্বরান্বিত হয়। একটি ট্রের মধ্যে বরফ (দ্র) রেখে তার নিচে কেতলিতে পানি গরম করে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করলে এই ঘনীভবন প্রক্রিয়া সহজে দেখানো যায়।

কোনো হাঁড়িতে পানি জ্বাল দিলে একটু উপরে যা ধোঁয়ার মতো দেখা যায়, তা আসলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে জলকণা সৃষ্টি হয়, ঘনীভবনের ভিতর দিয়ে সেটা দৃশ্যমান হয়ে উঠে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

আ. আ.

ঘর্ষণ (abrasion)

আমরা যখন কোনো মসৃণ তলকে অন্য একটি মসৃণ তলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাই, তখন বেশি বাধা পাই না। কিন্তু অমসৃণ কোনো তলের উপর দিয়ে অন্য একটি অমসৃণ তলকে টেনে নিয়ে যেতে বেশ বলপ্রয়োগ করতে হয়। বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং করার সময় ক্রীড়াবিদদের খুব অল্প বলপ্রয়োগ করতে হয়। একটি সাধারণ অমসৃণ পথের উপর এই স্কেটিং সম্ভব নয়। কোনো তলের ওপর দিয়ে অন্য একটি তলকে টেনে নেবার সময় যে বল এই চলাকে বাধা দেয় তাকেই ঘর্ষণ বলা হয়। থেমে থাকা অবস্থায় এই ঘর্ষণ কাজ করে না। চলতে শুরু করলেই ঘর্ষণবল কাজ করতে শুরু করে। গতি যত বেশি হয় এবং টেনে নেওয়ার বস্তু যত ভারী হয়, ঘর্ষণবলও তত বৃদ্ধি পায়। তেল বা পিচ্ছিলকারক কোনো বস্তু ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যেতে পারে। মানুষ যে আগুন আবিষ্কার করেছিল, তা পাথরের সঙ্গে পাথর বা কাঠের সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণকে ব্যবহার করে। ঘর্ষণবলের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুকে সরাতে গেলে কাজ করতে হয়। এই কাজ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা দিয়াশলাই জ্বালাবার সময় বারুদকে গরম করতে ঘর্ষণ ব্যবহার করি। পথ চলার সময় জুতার তলা ও মাটির মধ্যে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না। গাড়ি থামাতে যে ব্রেক ব্যবহার করা হয় তা ঘর্ষণবলকে ব্যবহার করে। চলন্ত গাড়ির ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয়, তা শোষণ করার জন্য ও ঘর্ষণকে কমাবার জন্য মবিল ব্যবহার করা হয়।

আ. আ.

ঘাস (grass)

উদ্ভিদজগতে খুব বিচিত্র, সর্বব্যাপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্ভিদপরিবার হল ঘাস, উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায় যে গোত্রের নাম Gramicae। যত্রতত্র মাটিকে সবুজ করে রাখে দূর্বা প্রভৃতি সাধারণ ঘাস; ধান, গম, ভুট্টা, যব, বার্লি ইত্যাদি শস্য; আখ ও বাঁশের মতো দীর্ঘ শক্ত কাঠের গাছ– এরা সবাই ঐ ঘাসপরিবারের অন্তর্গত। দূর্বা ঘাসের বৈজ্ঞানিক নাম *Cyuodou dactytou pers*। এগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো সবই ঘাস। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এদের পাতা। কাণ্ডের বিপরীত থেকে পর পর একটি করে পাতা বের হয়। গাঁটে গাঁটে বিভক্ত কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁটের উপরটায় পাতার নিম্নাংশ আবরণী দিয়ে মোড়ানো থাকে। পাতার অন্য প্রধান অংশ ফলকটি সরু এবং চ্যাপটা ফিতার মতো। আবরণী আর ফলকের সংযোগস্থলে লিগুইল নামক ছোট আর একটি অংশ থাকে। এটি অনেকটা সারিবদ্ধ কিছু আঁশের আকৃতির। কাণ্ডের দু'টি গাঁটের মাঝখানটা অনেক ক্ষেত্রে ফাঁপা হয়ে থাকে। সব রকম ঘাসের ফুল আসে ফুলগুচ্ছের আকারে। এর পরাগ-সংযোগ হয় পরাগ বাতাসে উড়ে গিয়ে। ঘাসের মূল হয়ে থাকে ঝাঁকড়া গুচ্ছমূল।

সব রকম ঘাসকে সাধারণত ছয় প্রকারে ভাগ করা যায়। এগুলো হল পশুচারণের ঘাস, ভূমি আচ্ছাদনের ঘাস, শস্য জাতীয় ঘাস, আখ এবং কাষ্ঠময় ঘাস (যেমন বাঁশ)। দুনিয়ার প্রধান খাদ্যশস্যের সবগুলো উৎস ঘাস স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের দেশের একটি প্রধান নির্মাণসামগ্রী বাঁশের জন্যও এটি মূল্যবান। আমাদের চিনি আসছে আখ থেকে। পশুপালন বিশেষভাবে নির্ভর করছে কাঁচা ঘাস আর খড়ের উপর। ঘাসের গুচ্ছমূল মাটিকে ঘন জালের মতো আঁকড়ে রাখে বলে ঘাসে আবৃত ভূমি সহজে ক্ষয় হতে পারে না। সবুজ কার্পেটসদৃশ ঘাস সৌন্দর্য আস্বাদনে, হেঁটে বেড়াতে বা খেলার মাঠে যে প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনে তা বলাই বাহুল্য। ঘাসের একটি চমৎকার গুণ হল, এর মূল কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেকগুলো নতুন পার্শ্বকাণ্ড গজায়। ওপর থেকে ছেঁটে দিলে বা গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে ফেললে এই পার্শ্বকাণ্ড গজাবার কাজ বরং ত্বরান্বিত হয়। আমাদের পরিচিত

শস্যগুলোর মতো কোনো কোনো ঘাস মৌসুম-শেষে মরে যায়। আবার অন্য কিছু ঘাস বহুবর্ষজীবী।

মু. ই.

www.boighar.com

ঘাসফড়িং (grasshopper)

ঘাসের রঙের মতো সবুজ বর্ণের এক ধরনের পোকার নাম ঘাসফড়িং। এটি আর্থ্রোপোডা পর্বের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। শীতের ভোরে শিশিরে ভেজা ঘাস বা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলার সময় এদেরকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে দেয়া যায়। এর ইংরেজি নামের সঙ্গে এভাবে চলার সঙ্গতি রয়েছে। গ্রাস অর্থ ঘাস; হপার মানে যারা লাফিয়ে চলে। অর্থাৎ ঘাসে ঘাসে লাফিয়ে চলা প্রাণীটির নাম গ্রাসহপার। ঘাসফড়িং নানা জাতের হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে ঘাসফড়িং রয়েছে।

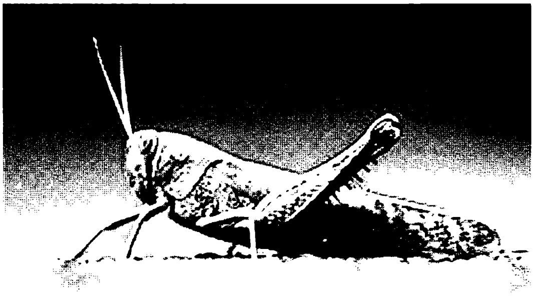

ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু। এর দেহে তিন জোড়া উপাঙ্গ থাকে– দেহের প্রতি পাশে তিনটি করে উপাঙ্গ। পেছনের উপাঙ্গজোড়া সম্মুখের ও মাঝের উপাঙ্গজোড়ার তুলনায় অনেক বড়। মাথার আকৃতি ত্রিকোণ। পূর্ণবয়স্ক ঘাসফড়িং-এর শুঙ্গ দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় খাটো। পেছনের উপাঙ্গের উপর চাপ দিয়েই ওরা জোরে লাফ দেয়। শুঙ্গ স্পর্শকাতর। শুঙ্গ দিয়ে ঘাসফড়িং কোনটা খাদ্য, কোনটা অখাদ্য এবং শত্রুর উপস্থিতি ইত্যাদি অনুভব করে। স্ত্রী-ঘাসফড়িং ক্ষেতের মাটিতে বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে, যথা ধান (দ্র), গম (দ্র), ভুট্টার (দ্র) গোড়ায় গুচ্ছে গুচ্ছে ডিম পাড়ে। এরা ঘাস, ধান, গমসহ অনেক প্রকার শস্যের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। শীতকালে ঘাসে বা জঙ্গলে ঘাসফড়িং শীতনিদ্রা যাপন করে। এটি ওদের পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময়।

ত. চ.

ঘুঘু (dove)

Columbiformes ঘুঘু মাঠচরা পাখি। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির ঘুঘু দেখা যায়– ছিট-ঘুঘু বা Spotted dove *(Streptopelia chinensis)* এবং কালী-ঘুঘু বা Red hertied dove *(Strouquebarica)*।

ছিট-ঘুঘু আকারে পায়রার চেয়ে একটু ছোট, গায়ে গোলাপি রঙের উপর সাদা ছিটা এবং ঘাড়ের কাছে কালোর উপর সাদা সাদা ছিট। পোষ মানে। নির্ভয়ে বাগানে, বারান্দায় ঘোরে। ঘুলঘুলি বা কড়ি-বরগার ফাঁকে বাসা বাঁধে। কালী-ঘুঘু সংখ্যায় কম। স্ত্রী-পাখি দেখতে ছিট-ঘুঘুর মতো। পুরুষ-পাখির দেহের রঙ গোলাপি আঁচসহ পাটকিলে। ছিট-ঘুঘু থেকে ছোট। গলায় কালো বেড়, তাই কন্ঠি-ঘুঘুও বলে। শস্যদানাই মূল খাবার।

একবারে দুটো ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ সাদা। মা-বাবা পালা করে দিন পনেরো তা দেয়। বাচ্চা তিন সপ্তাহ পর উড়তে শেখে। লোকালয়ে কালী-ঘুঘু পছন্দসই না।

ত. চ.

ঘুড়ি (kite)

কাগজের (দ্র) সঙ্গে বাঁশের (দ্র) চিকন কঞ্চির হালকা কাঠামো লাগিয়ে আমাদের সাধারণ পরিচিত ঘুড়ি তৈরি হয়। বিশেষভাবে সুতোয় বেঁধে একে দীর্ঘ সুতোর প্রান্তে আকাশে (দ্র) ওড়ানো বহু দেশেই একটি মজার খেলা হিসাবে বিবেচিত। ঘুড়ির আকাশে ওড়ার কৌশলটি

দেশ-বিদেশের নানা রকম ঘুড়ি

নির্ভর করে এর উপর দিয়ে বাতাসের (দ্র) প্রবাহের উপর। বায়ুপ্রবাহ যে দিক থেকে আসছে সেটি বুকের দিকে রেখে সঠিক কোণে নাক উঁচিয়ে ঘুড়ি খাড়া থাকলেই তা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। এ অবস্থায় এর সামনের দিকে বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী চাপ পিঠের দিকের নিম্নমুখী চাপের তুলনায় বেশি থাকে। ঘুড়ি যেভাবে তৈরি হয়, এতে সুতা যেভাবে বাঁধা হয় এবং তাতে যেভাবে টান পড়ে, তার ফলেই ঘুড়ি সঠিক কোণ করে খাড়া থাকতে পারে। ঘুড়ি ওড়াবার জন্য একটি ন্যূনতম বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন হয়। ওড়া শুরু করার সময় সুতা টেনে টেনে বা তা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘুড়ির উপর বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। উপরেও কোনো সময় বায়ুপ্রবাহ কমে গেলে এমনি করে টেনে টেনে ঘুড়িকে আরো উপরে এমন স্তরে আনার চেষ্টা করা হয় যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ রয়েছে।

আমাদের পরিচিত ঘুড়ির চেয়ে আকারে, চেহারায় ভিন্ন রকমের ঘুড়ি নানা দেশে প্রচলিত আছে। খুবই আলাদা রকমের একটি ঘুড়ি হল বাক্সঘুড়ি– ছাদ ও তলাবিহীন এক বা একাধিক বাক্সের আকারে এটি তৈরি হয়। ঘুড়ি যদিও চীন দেশে হাজার বছর আগে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত প্রচলিত, বাক্সঘুড়ি কিন্তু উদ্ভাবিত হয়েছে মাত্র ১৮৯৩ সালে। এর পর পর মানুষের বিমান তৈরির প্রচেষ্টায় বাক্সঘুড়ির নির্মাণকৌশলটি একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রথম বিমানের উদ্ভাবক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ও (দ্র) বাক্সঘুড়ি নিয়ে কাজ করেছেন।

দেশে দেশে আমোদ-উৎসবের জন্য নানা বাহারি ঢঙের ঘুড়ি ওড়াবার রীতি আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজেও অতীতে ঘুড়ি ব্যবহৃত হত। ১৭৫২ সালে আমেরিকায় বজ্রসঙ্কুল এক ঝড়ের দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে বজ্রের স্থির-বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (দ্র)– এ কথা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবিদিত। এক সময় আবহাওয়া (দ্র) বিভাগ বাক্সঘুড়ির সঙ্গে পরিমাপ যন্ত্রপাতি আকাশে পাঠাত। সমুদ্রে জীবনতরী থেকে রেডিওসঙ্কেত দেওয়ার জন্য ঘুড়ি উড়িয়ে অ্যান্টেনা (দ্র) তুলে দেওয়া হত।

মু. ই.

ঘুম (sleep)

ঘুম শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটি মানুষের দিন-রাত্রির অনেকটা সময় হরণ করে নেয়। বিজ্ঞানীদের মতে, ঘুম পেশির নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যা নির্দিষ্ট বিরতিতে সক্রিয় অবস্থায় ফিরে আসে। ঘুম দেহের উপর পরিবেশের উদ্দীপক সংবেদী ক্রিয়া হ্রাস করে। অর্থাৎ ঘুম নির্দিষ্ট বিরতিতে সংঘটিত চেতনাহ্রাসকারী একটি প্রক্রিয়া। একজন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দৈনিক ৪ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। যারা ৪ ঘণ্টার কম ঘুমায় তারা অধিক কর্মচঞ্চল ও সচেতন থাকে। তবে ৪ ঘণ্টার কম ও ১০ ঘণ্টার বেশি যারা ঘুমায়, তারা স্বল্পায়ু হয় বলে অনেকের ধারণা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের পরিমাণ কমে ও বাড়ে। সদ্যোজাত শিশু (দ্র) দিনে ১৬–২০ ঘণ্টা ঘুমায়। এই শিশু যৌবনে ঘুমায় এর অর্ধেক সময়। ৬০

বছর বয়স থেকে ঘুম কমে যায়।

অতিঘুম ও অতিজাগরণ দুটোই দেহের জন্য ক্ষতিকর। যারা অতিরিক্ত কাজ ও লেখাপড়ার জন্য পর পর রাত জাগে এবং দিনেও ঘুমায় না, তাদের দেহে কঠিন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। একনাগাড়ে ৬০ থেকে ২০০ ঘণ্টা জেগে থাকলে দেহে ক্লান্তি নামে, মেজাজ খিটখিটে হয়। যারা এভাবে জেগে থাকে, তাদের বোধশক্তি কমে যায় এবং গভীর মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। যদি তাদের জাগরণের মাত্রা আরো বাড়ে, তা হলে তারা বিভ্রান্তিজনক ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকে। এক সময় কাজে একেবারে অমনোযোগী হয়। প্রলাপ বকে এবং খ্যাপামি করে। পরবর্তী কালে তার হাত কাঁপা, চোখের পাতার অবশতা, মুখে কথা আটকে যাওয়া, আলাপের সময় ভুল শব্দ প্রয়োগ এবং অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দেখা দেয়, এমনকি শেষে সে পাগলও হয়ে যেতে পারে। অধিক ঘুম মনে বিরক্তিভাব ও বিমর্ষতার উদ্রেক করে। এতে হঠাৎ করে পেশি অবশ হয়ে যেতে পারে; 'ক্লেইন-লেভিন সিন্ড্রোম' নামের একটি উপসর্গও দেখা দেয়। বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে অধিক ঘুম ও খাদ্যগ্রহণ এই রোগের লক্ষণ।

ত. চ.

ঘোড়া (horse)

হাজার হাজার বছর ধরে ঘোড়া উপকারী জন্তু হিসাবে পরিচিত। রেলগাড়ি (দ্র) ও মোটরগাড়ি (দ্র) আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ঘোড়াই ছিল স্থলপথের প্রধান বাহন। পূর্বে যুদ্ধ, মাল টানা ইত্যাদিতে ঘোড়া ব্যবহৃত হত। বর্তমানে প্রধানত খেলাধুলাতেই ঘোড়া ব্যবহৃত হয়।

ঘোড়া এক-খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই ঘোড়া দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, ২৫-৩০ সেন্টিমিটার উঁচু ইওহিপ্পাস (eohippus) নামক প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ঘোড়ার উৎপত্তি হয়েছে। এরা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করত।

ঘোড়ার মাংসপেশি অত্যন্ত মজবুত। এর লম্বা পাগুলো বেশ শক্তিশালী। তাই ঘোড়া ঘণ্টায় ৬০-৬৫ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। এর ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি ও স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত প্রখর।

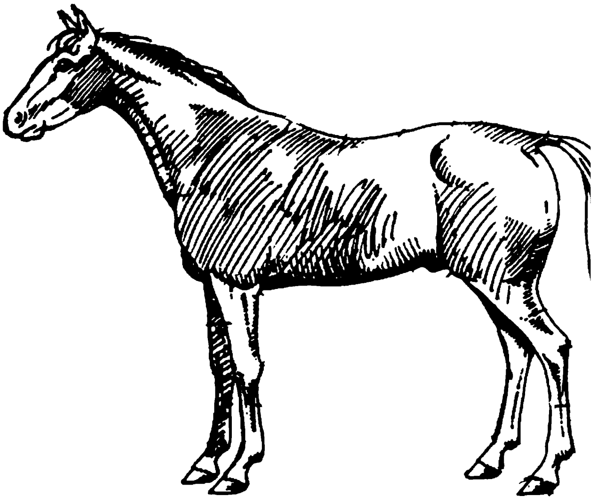

পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ জাতের ঘোড়া রয়েছে। আকার-আকৃতিতে এককেটি ঘোড়া একেক রকম। ঘাড়ের উচ্চতা ১৪৭ সেন্টিমিটারের কম হলে পোনি (pony) অর্থাৎ টাট্টু ঘোড়া এবং বেশি হলে ঘোড়া বলা হয়। এর ওজন ৩৫০-১০০০ কেজি হয়ে থাকে। ৭৬ সেন্টিমিটার উঁচু আর্জেন্টিনার ফ্যালাবেলা পোনি ক্ষুদ্রতম ঘোড়া। ব্রিটেনের ১৭৩ সেন্টিমিটার উঁচু শায়ার ঘোড়া বৃহত্তম। এ ছাড়া আরোব্রেড, স্ট্যান্ডার্ডব্রেড, অ্যারাবিয়ান, বেলজিয়ান, শেটল্যান্ড পোনি, ওয়েলস পোনি উল্লেখযোগ্য জাত।

ঘোড়ার শক্তিশালী দাঁত থাকলেও ঘোড়া শুধু ঘাস ও শস্যদানা খায়। প্রায় ১১ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-ঘোড়া একটি শাবক প্রসব করে। এটি ২-৩ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ঘোড়া বিশ বছরের বেশি বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

চ

চক (chalk)

খড়িমাটি, প্রকৃতিজাত ক্যালসিয়াম কার্বনেট। প্রাচীন কালের সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক জীবের কঠিন খোলস জমে খড়িমাটির সৃষ্টি হয়েছে। চক হল চুনাপাথরের (দ্র) নরম, সাদা ও ভঙ্গুর আকার। ইংল্যান্ডের সমুদ্র-উপকূলে প্রায় হাজার ফুট উঁচু চকের পাহাড় দেখা যায়। চককে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস ও চুন পাওয়া যায়। কৃত্রিমভাবে তৈরি চককে প্রেসিপিটেড চক বলে। অম্ল-রোগের চিকিৎসায় এই জিনিসটি ব্যবহৃত হয়। স্কুল-কলেজে ব্ল্যাক বোর্ডে যে পেন্সিল-চক দিয়ে লেখা হয়, তা সাধারণত ক্যালসিয়াম সালফেট দ্বারা তৈরি হয়, কার্বনেট দ্বারা নয়।

আ. হ. খ.

চকোলেট (chocolate)

এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার। কোকো (দ্র) নামক এক ফলের বীজ থেকে এটি উৎপাদিত হয়। কোকো ফল পাকলে ভেতর থেকে বীজ বের করে গাঁজন, সিদ্ধ, পেষণ ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে প্রথমে কোকোমাস বা চকোলেট লিকার উৎপাদন করা হয়। সেই লিকারের সঙ্গে দুধ, চিনি, অতিরিক্ত কোকো, বাটার ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করা হয় চকোলেট। পৃথিবীর অনেক কিছুর মতো চকোলেটও মানুষের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফল।

ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলে প্রথম কোকো গাছ আবিষ্কৃত হলেও ইংল্যান্ডেই প্রথম চকোলেট পানীয় কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু সেগুলো তেমন সাফল্য দেখাতে পারে নি। ১৭৬৫ সালে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স অঙ্গরাজ্যে বিশ্বের প্রথম আধুনিক চকোলেট পানীয় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সালে কনরাড ভন হাউটেন নামে এক ওলন্দাজ রসায়নবিদ তরল চকোলেট থেকে অতি তৈলাক্ত চকোলেট বাটার নিংড়ে নিয়ে তা দিয়ে কোকো পাউডার প্রস্তুত করেন। এর পরে আরো দু' দশক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কোকো বাটার এবং চিনি মিশিয়ে চকোলেট পেস্ট তৈরি করা হয়। এই চকোলেট পেস্ট থেকেই খাবার চকোলেট প্রস্তুত হতে থাকে।

১৮৭৬ সালে সুইজারল্যান্ডের একটি চকোলেট তৈরির কারখানা কোকো বীজের গুঁড়ো (কোকোনিব), চিনি, চর্বি ও ঘনীভূত দুধ সহযোগে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম উন্নত ধরনের চকোলেট প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। পিঠার আকারে সংরক্ষণযোগ্য এই চকোলেটই পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে ছোট-বড় সবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখন শুধু মিষ্টি চকোলেটই তৈরি হয় না, টক, ঝাল, মিঠেকড়া হরেক স্বাদের চকোলেট হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কেক-পেস্ট্রি-বিস্কুট, কাস্টার্ড, পুডিং, আইসক্রিম, সস ইত্যাদি তৈরির কাজেও পাউডার চকোলেট বা তরল চকোলেট ব্যবহৃত হয়।

সুজ. ব.

চক্ষু (eye)

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ হচ্ছে দর্শন-ইন্দ্রিয়। মানুষের দুটো চোখ আকৃতিতে মোটামুটিভাবে বলের মতো গোল। অক্ষিগোলকের প্রতিটি একটি করে অক্ষিকোটরে অবস্থিত। চোখের কার্যক্রমের সঙ্গে ক্যামেরার কার্যক্রমের তুলনা করা হয়।

চোখের উপরে ও নিচে চোখের পাতা থাকে। চোখের পাতা চোখকে আঘাত, ধুলোবালি ও রোগজীবাণু

থেকে রক্ষা করে। প্রতিটি চোখের সঙ্গে সংযুক্ত ছয়টি মাংসপেশির সাহায্যে চোখকে বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়।

অক্ষিগোলক চোখের প্রধান অংশ। অশ্রুগ্রন্থি অক্ষিগোলকের উপরে থাকে। এই গ্রন্থি অশ্রু তৈরি করে এবং চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখে।

ক

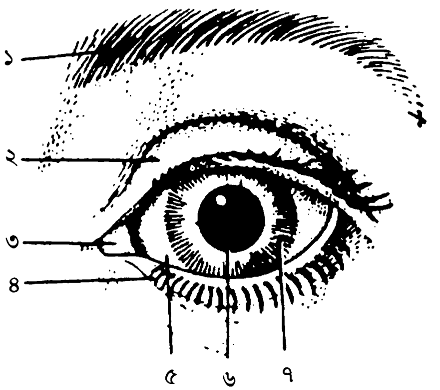

খ

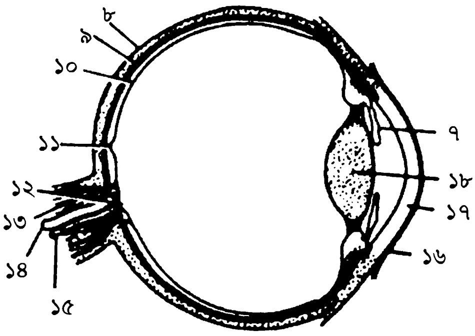

মানবচক্ষু*: ক. বহিরঙ্গ, খ. চক্ষুগোলকের অনুভূমিক কর্তিত রূপ। ১. ভুরু, ২. চোখের পাতা, ৩. চোখ মিটমিট করার সংশ্লিষ্ট ঝিল্লি, ৪. চোখের পাতার লোম, ৫. নেত্রগোলক, ৬. তারারন্ধ্র, ৭. কনীনিকা, ৮. শ্বেতপটল, ৯. কৃষ্ণমণ্ডল বা রঞ্জক স্তর, ১০. অক্ষিপট, ১১. হলুদবিন্দু (ম্যাকুলা ল্যুটিয়া), ১২. কৃষ্ণবিন্দু বা অক্ষিচক্র,১৩. রক্তবাহ ঘিরে অক্ষিস্নায়ু, ১৪. অক্ষিপট ধমনি, ১৫. অক্ষিপট শিরা, ১৬. নেত্রবর্ত্ম (নেত্রঝিল্লি), ১৭. অচ্ছোদপটল (নেত্রস্বচ্ছ), ১৮. পরকলা (লেন্স)*

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর– স্ক্লেরা (sclera), কোরয়ড (choroid) ও রেটিনা (retina)। স্ক্লেরা বাইরের স্তর, যা শক্ত কোষকলা দিয়ে তৈরি। স্ক্লেরার সামনের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্নিয়া (cornea)। কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে। চোখের পাতার অভ্যন্তরভাগ এবং কর্নিয়া স্ক্লেরার মধ্যকার অংশ কনজাংটিভা (conjunctiva) নামক পাতলা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে।

কোরয়ড নামক মধ্যস্তরে অসংখ্য রক্তনালি ও কালো রঞ্জক পদার্থ (pigment) রয়েছে। কোরয়ডের সামনের দিকে সিলিয়ারি (ciliary) ও আইরিস (iris) নামক দুটো পেশি যুক্ত থাকে।

আইরিস অনৈচ্ছিক মাংসপেশি দিয়ে তৈরি গোল পর্দা। আইরিসের মাঝখানে চোখের মণি (pupil) বা চক্ষুতারা নামক একটি ছিদ্র থাকে। আইরিসের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে চক্ষুতারা ছোট ও বড় হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য ভেতরে আলোকরশ্মির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

কোরয়ড চোখের লেন্সের (lens) বা পরকলার অবস্থান নিশ্চিত করে। লেন্সের সামনে ও পেছনে তরল ও জেলি সদৃশ পদার্থে পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

রেটিনা চোখের অভ্যন্তরে অবস্থিত আলোকসংবেদী স্তর। রেটিনাতে রড্‌স্ (rods) ও কোন্‌স্ (cones) নামক আলোকরশ্মিগ্রাহী বিশেষ স্নায়ুকোষ থাকে। রড্‌স্ অল্প আলোতে এবং কোন্‌স্ বেশি আলোতে দেখতে সাহায্য করে। রেটিনা থেকে স্নায়ুগুচ্ছ একত্র হয়ে অক্ষিস্নায়ু (optic nerve) গঠন করে মস্তিষ্কে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমেই দর্শন-উদ্দীপনা মস্তিষ্ককোষে পৌঁছায়।

কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব পর্যায়ক্রমে কর্নিয়া, জলীয় পদার্থের প্রকোষ্ঠ, লেন্স ও জেলির মতো পদার্থের মধ্য দিয়ে রেটিনার উপর পড়ে উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়ায় সেই প্রতিবিম্ব আমরা সোজাভাবে দেখি।

চোখে বিশেষ ধরনের জীবাণু সংক্রমণেরনাম চোখ ওঠা। কোনো কারণে কর্নিয়া সাদা অস্বচ্ছ হয়ে গেলে মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া সংযোজন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

চোখ ভালো রাখার উপায় হচ্ছে নিয়মিত চোখ পরিষ্কার করা এবং সুষম ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা।

আ. আ. হা.

চক্ষুরোগ (opthalmic disease)

চোখের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট রোগ চক্ষুরোগ নামে অভিহিত। নানা ধরনের চক্ষুরোগের মধ্যে চোখে ছানি পড়া, গ্লুকোমা, চোখে জীবাণু সংক্রমণ,রাতকানা রোগ, চোখের প্রদাহ, অন্ধত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চোখে ছানিপড়া (cataract) রোগ সাধারণত বার্ধক্যজনিত কারণে দেখা দেয়। তবে ডায়াবেটিস রোগে অল্প বয়সেও ছানিপড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ রোগে চোখের লেন্সের কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ অংশ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ফলে আলোকরশ্মি চোখে প্রবেশ করতে না পারায় রোগীর দেখতে অসুবিধা হয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অস্বচ্ছ লেন্স অপসারণ করার পর চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স

(contact lens) চোখে পরিধানের মাধ্যমে ছানিপড়া রোগী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে থাকে।

চোখের উপরিভাগে কর্নিয়া নামক অংশে আঘাত, সংক্রমণ বা অন্য কারণে অস্বচ্ছতা দেখা দিতে পারে। অস্বচ্ছ কর্নিয়া অন্ধত্বের অন্যতম কারণ। এর চিকিৎসার একমাত্র উপায় কর্নিয়া সংস্থাপন।

গ্লুকোমা (glaucoma) রোগে চোখের ভেতরকার তরল পদার্থের সঞ্চলন ও বিশোষণে গোলযোগ দেখা দেওয়ার কারণে উক্ত তরল পদার্থের চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে অক্ষিস্নায়ুতে চাপ পড়ে এবং চোখে ব্যথা অনুভূত হয়। সময়মতো চিকিৎসা করা না হলে এই চাপের কারণে অক্ষিস্নায়ু (optic nerve) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অন্ধত্ব সৃষ্টি হতে পারে। ঔষধ সেবনে এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

জীবাণু সংক্রমণের ফলে চোখের বিভিন্ন অংশে রোগ দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে চোখের পাতায় গুটি আকৃতির অঞ্জনি (sty) সৃষ্টি, চোখের পাতার ভেতরে প্রদাহ বা 'চোখ ওঠা' (conunctivitis) উল্লেখযোগ্য। 'চোখ ওঠা' রোগ খুবই ছোঁয়াচে।

শরীরে ভিটামিন-এ'র ঘাটতি পড়লে শিশুদের 'রাতকানা রোগ', এমনকি অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে। অক্ষিগোলকের পেছন দিকে অবস্থিত অক্ষিপট বা রেটিনা (retina) নামক অংশে ক্যান্সার, চিকিৎসাবিহীন রাতকানা রোগ, দীর্ঘকালীন ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ, বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতা ইত্যাদি কারণে রেটিনা নষ্ট হয়ে অন্ধত্ব সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও চোখে ক্ষীণদৃষ্টি (myopia), দীর্ঘদৃষ্টি (hypermetropia) ইত্যাদি দৃষ্টিসংক্রান্ত গোলযোগ সচরাচর দেখা যায়, যা চশমা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য।

সি. না. হ.

চড়ুই (sparrow)

এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি পাখি। চড়ই, চড়াই ও চটকা নামেও এ পাখি পরিচিত। চড়ুই Passeriformes বর্গের গোত্রভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম *Passer dowesticus*। এরা গাছের ডালে ও ভূমিতে বিচরণ করে। এদের দেহের দৈর্ঘ্য ১৪–১৮ সেমি (৫–৭ ইঞ্চি) পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের প্রতি পায়ে চারটি আঙুল থাকে। আঙুলগুলোর একটি পেছনের দিকে এবং অপর তিনটি

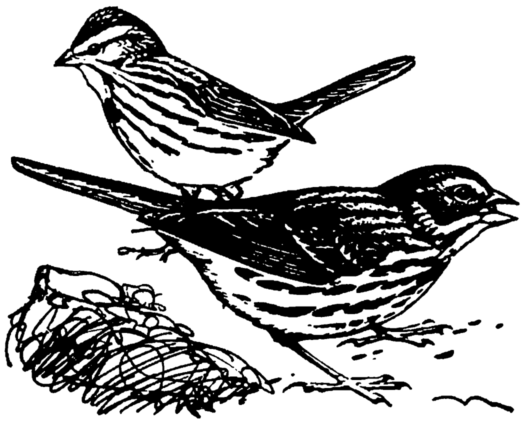

সামনের দিকে ছড়ানো। আঙুলের এই বিশেষ ধরনের বিন্যাস চড়ুইকে এক দিকে মাটির উপর এবং অপর দিকে গাছের ডালে বিচরণে সাহায্য করে। এদের ঠোঁট ছোট, বাংলা ব-অক্ষরের মতো। এরা গাছের নতুন পাতা, মুকুল, ছোট ফল, শস্যবীজ এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে এরা তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রচণ্ড কলরব করে।

বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক জাতের চড়ুই দেখা যায়। এদের মধ্যে গৃহ-চটক (house sparrow), তরু-চটক (tree sparrow), খয়রা তরু-চটক (brown tree sparrow) ও পীতগণ্ড চটক (yellow throated sparrow) উল্লেখযোগ্য। গৃহ-চটক লোকালয়ে নীড় বেঁধে বাস করে এবং লোকালয় থেকেই খাদ্য জোগাড় করে। বছরে কয়েক বার বাসা বেঁধে প্রতি বারে এরা ৩ থেকে ৫টি ডিম পাড়ে। বাসা বাঁধার কাজে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই অংশ নেয়। পীতগণ্ড চড়ুই বনাঞ্চলে গাছের কোটরে নীড় নির্মাণ করে। খয়রা চটক ও তরু-চটক লোকালয়ের কাছাকাছি ফসলের জমিতে ও বনভূমিতে চলাফেরা করে।

মু. আ.

চন্দন (sandal wood)

চন্দন Santalaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Santalum album* L, ইংরেজিতে স্যান্ডালউড (Sandal wood)। ছোট থেকে মধ্যম আকারের চিরসবুজ এবং আংশিক পরজীবীবৃক্ষ। চন্দনবৃক্ষ আংশিক পরজীবী এ কারণে যে দেখা গিয়েছে– চন্দন

তার প্রয়োজনীয় চুন এবং পটাস সরাসরি নিজ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে গ্রহণ করে; পক্ষান্তরে এর পোষকের হস্টোরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস শোষণ করে। চন্দনবৃক্ষ সরল ও সরু। উপযুক্ত পরিবেশে ১৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু এবং ২.৫ মিটার ব্যাস সম্পন্ন হতে পারে। ভারতের তুলনামূলকভাবে অধিক শুষ্ক পার্বত্যাঞ্চলে, বিন্ধ্যা পর্বত থেকে দক্ষিণে মহীশুর, তামিলনাড়ু এবং মায়ানমারে এ বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। চন্দনবৃক্ষ সব স্থানেই জন্মে তবে এর সার কাঠ, যা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদিত হয় তা ৬০০-৯০০ মিটার উঁচুতে জন্মানো বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায়। অন্যত্র কাঠ হয় নিম্নমানের। পাতা রসালো, পাতলা, চন্দ্রাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্ব বর্শাফলাকৃতি। ফুল খড় রঙের– খয়েরি, বেগুনি, লালচে বেগুনি বা বেগুনি। কোনো গন্ধ নেই। দু' হাজার বছরেরও আগে থেকে চন্দন সুগন্ধি বা পারফিউম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বীজ থেকে চন্দন গাছ হলেও পোষক পরজীবী সম্পর্ক ঠিক না হলে ঠিক মতো বৃদ্ধি ঘটে না। চন্দন গাছ সব সময়ই উৎপাদন করা হয়। কাঁটা হয় না, কেননা এর শিকড় চন্দন তেলে সমৃদ্ধ। কাঠ যত গাঢ় রঙের, তেল তত অধিক। কাঠ এবং তেল উভয়ই ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

শা. আ.

চন্দ্রশেখর, সুব্রহ্মণ্যম [১৯১০-১৯৯৫]

সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর একজন জগৎবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতবেত্তা। চন্দ্রশেখরের জন্ম ১৯শে অক্টোবর ১৯১০ সালে, লাহোরে। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর আয়ার ব্রিটিশ ভারতে একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় হল, তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রমনের ভাইপো। সি. ভি. রমন ১৯৩০ সালে তাঁর আবিষ্কৃত রমনক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, পঞ্চাশ বছর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর ১৯৮০ সালে একই সম্মান অর্জন করেন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য। চন্দ্রশেখর তাঁর গবেষণার অবদান রেখেছেন পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী শোয়ার্জচাইল্ড-এর (Schwarzschild) মতে বিজ্ঞানের এই শাখায় এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে চন্দ্রশেখর অবদান রাখেন নি। চন্দ্রশেখরের সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হল 'চন্দ্রশেখর সীমানা'। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে কোনো মৃত নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হয়, তা হলে তা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হতে থাকবে। কোনো বলই এই সঙ্কোচনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ১৯৩০ সালে চন্দ্রশেখর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এসসি. পাশ করে কেম্ব্রিজে ভর্তি হন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করতে। সেখানে তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক স্যার আর্থার এডিংটনের ছাত্র ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে হচ্ছে কৃষ্ণবিবরের ওপর লেখা 'কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে গাণিতিক তত্ত্ব' (The Mathematical Theory of Black Holes)। তিনি শিকাগোয় ১৯৯৫ সালের ২১শে আগস্ট পরলোক গমন করেন।

আ. আ.

চরক (Charak)

আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার বিখ্যাত আচার্য এবং এই বিষয়ের ওপর 'চরকসংহিতা' গ্রন্থের প্রণেতা। 'চরকসংহিতা'কেও সংক্ষেপে চরক বলে। আয়ুর্বেদ-চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী এই চরক যে কে ছিলেন তা পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না। আচার্য চরক তাঁর বিশাল গ্রন্থে চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, রোগ ও রোগনিরাময় এই চার রকম বিষয় বিভাগ করে শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'চরকসংহিতা' বাংলায় পাঁচ বার অনূদিত ও টীকাকৃত হয়েছে। এই অসামান্য গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের রোগ ও রোগের প্রতিকারের বিশদ ব্যাখা পাওয়া যায়। বর্তমান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) এই গ্রন্থের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

চরককে কেউ কেউ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। আবার বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদের সাক্ষ্য অনুসারে অনেকে স্থির করেছেন, চরক ছিলেন খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে সম্রাট কনিষ্কের খাস চিকিৎসক। চরকের নাম মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত 'নাবনীতক' নামে এক চিকিৎসাগ্রন্থে পাওয়া যায়। ৭ম-৮ম শতকে আরব-পারসিকদের ভাষায় চরকের অনুবাদ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ৯ম শতকে 'রাজী' নামের এক

আরব চিকিৎসক তাঁর গ্রন্থে 'চরকসংহিতা' উদ্ধৃত করেছেন। আবূসীনা, অববূসী ও অবূসরাবী নামে আরবি চিকিৎসাগ্রন্থের লাতিন অনুবাদে একাধিক বার চরকের উল্লেখ আছে। আল মনসুর চরকের 'সর্পচিকিৎসা'র অনুবাদ করিয়েছিলেন। আলবেরুনীর (দ্র) উক্তিতেও চরকের অনুবাদের কথা জানা যায়।

আচার্য চরকের অমর বাণী– 'চিকিৎসকের নিজের জীবন বিপন্ন হলেও রোগীর অপকার হয় এমন কোনো কাজ করা চলবে না, রোগীর আরোগ্যের জন্য চিকিৎসক সমস্ত অন্তর দিয়ে যত্ন করবেন।'

বি. ব.

চর্মরোগ (dermatosis)

দেহ-ত্বকে সৃষ্ট রোগসমূহ চর্মরোগ নামে পরিচিত। জীবাণু (দ্র), ভাইরাস (দ্র), ছত্রাক (দ্র) ও অন্যান্য পরজীবীসংক্রমণ, দাহ, প্রদাহ. এলার্জি (দ্র) ইত্যাদি নানা কারণে চর্মরোগ দেখা দিয়ে থাকে।

জীবাণুসংক্রমণের ফলে ত্বকে ফোড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে, ত্বকে পুঁজভর্তি ফোস্কা এবং অনুরূপ ক্ষত দেখা দিয়ে থাকে। ছত্রাকসংক্রমণে ত্বকে কিংবা পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা, দাদ (ring-worm) ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। ভাইরাসের সংক্রমণে ঠোঁটে জ্বরঠোসা (cold sores) দেখা দিতে পারে।

প্রদাহের ফলে যেসব চর্মরোগ সচরাচর দেখা দেয়, সেসবের মধ্যে একজিমা (eczema) উল্লেখযোগ্য। এ রোগে ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, ত্বকে চুলকানি সৃষ্টি হওয়া, আক্রান্ত স্থান থেকে রস নিঃসৃত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। আগুন, বৈদ্যুতিক স্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থ, প্রচণ্ড রোদের তাপ ইত্যাদির প্রভাবে ত্বক পুড়ে যাওয়ার ফলেও চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ত্বকে টিউমার বা ক্যান্সার (দ্র) জাতীয় চর্মরোগও কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে অনেকেরই ব্রণ (দ্র) নামক চর্মরোগ দেখা দেয়। মুখমণ্ডল, বুক, পিঠ প্রভৃতি স্থানে ব্রণ দেখা দিতে পারে। শ্বেতী, সেবোরিয়া, খোসপাঁচড়া ইত্যাদিও চর্মরোগের অন্তর্গত। অধিকাংশ চর্মরোগ খুব ছোঁয়াচে। তাই চর্মরোগের সংস্পর্শ থেকে সতর্ক থাকা এবং এগুলোর আশু চিকিৎসা দরকার।

সি. না. হ.

চলক (variable)

কোনো ব্যবস্থায় যা পরিবর্তনশীল অথবা ধ্রুব নয় তা-ই চলক। গাণিতিক ভাষায় চলক এমন এক বা একাধিক পদ বা প্রতীক যাকে বিভিন্ন সংখ্যামানবিশিষ্ট বলে বিবেচনা করা হয় বা নির্দেশ করা যায়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় একাধিক সদস্যবিশিষ্ট কোনো সংখ্যা সেট (R)-এর যে কোনো সদস্য (x) একটি চলক।

স্বাধীন চলক যে চলকের উপর অপর একটি চলকের মান নির্ভর করে তাকে স্বাধীন চলক বলে। $y = ax^2+bx+c$ সমীকরণে x-কে স্বাধীন চলক বলে।

অধীন চলক যে চলক অপর একটি চলকের উপর নির্ভর করে তাকে অধীন চলক বলে। $y = ax^2+bx+c$ সমীকরণে y-এর মান x-এর মানের উপর নির্ভরশীল, তাই y একটি অধীন চলক।

বিচ্ছিন্ন চলক ধরা যাক k একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং $u = \{x:x = 1, 2, ...k\}$। যদি x u–এর কোনো একটি উপাদানকে প্রকাশ করে তবে x-কে বিচ্ছিন্ন চলক বলে।

অবিচ্ছিন্ন চলক ধরা যাক a, b দু'টি নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা, $a<b$ এবং $v = \{x:a<x<b\}$। যদি x v-এর যে কোনো এটি উপাদানকে প্রকাশ করে যার মান a এবং b-এর মধ্যে, তবে x-কে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে।

স. রা.

চলচ্চিত্র (motion picture)

শব্দটির অর্থ গতিশীল বা চলমান চিত্র। ইংরেজিতে একেই বলে 'মোশন পিকচার', 'মুভিজ' বা 'ফিল্ম' (দ্র)। বিশ্বের বহুতর শিল্পমাধ্যমের ইতিহাসে বয়সে কনিষ্ঠতম এই মাধ্যমটি কথাসাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের নানা শাখার সুবিধাকে ব্যবহার করে আজ সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয়তম মাধ্যমে পরিণত হলেও এর উদ্ভাবনের ইতিহাস খুবই প্রাচীন এবং পর্যায়ক্রমিক।

চলচ্চিত্রের প্রাক-ইতিহাসের সূচনা প্রাচীন গ্রিসে আরিস্টোটল (দ্র), ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের (দ্র) আলোকতত্ত্বের চর্চার ভেতর দিয়ে। আরব দেশীয় বিজ্ঞানী আবু আলী আল্ হাসানের বিশ্লেষণ থেকে প্রথম

বেরিয়ে আসে অনিয়ত দৃষ্টির তত্ত্ব, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'পারসিসটেন্স অব ভিশন' (persistence of vision)। এই তত্ত্বই চলচ্চিত্র সৃষ্টির মূল সূত্র বলে অভিহিত।

চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়ার বহু আগে থেকে অবশ্য জাপান, চীন, জাভা, বালি দ্বীপ ও তুরস্কে ছায়ানাট্যের একটি ধারা গড়ে ওঠে। আগ্রহোদ্দীপক সব গল্প আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিসহকারে প্রদর্শনযোগ্য এই শিল্পমাধ্যমের প্রধান সহায়ক আলো আর ছায়ার খেলা।

আরব বিজ্ঞানী আল্ হাসানের গবেষণাসূত্রকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে রজার বেকন (Roger Bacon ১২১৪-১২৯২) প্রতিফলনতত্ত্ব ও লেন্স (দ্র) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। বেকনই প্রথম বলেন, আলো ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ নয়, গতির প্রবাহ। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পুরোধাপুরুষ বহুমুখী মৌলিক প্রতিভার অধিকারী লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (দ্র) একটি কৃত্রিম চোখ তৈরি করে তার ওপর কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি কী রূপ ধারণ করে তার ব্যাখা তুলে ধরেন। তাঁর 'ক্যামেরা অব্‌স্‌ক্যুরা' (Camera Obscura) চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যান্ত্রিক ভিত্তিস্বরূপ। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইওহানেস কেপলারের (দ্র) আবিষ্কৃত দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঔজ্জ্বল্যের ওঠা-পড়া সংক্রান্ত তত্ত্বও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তত্ত্বের সূত্রায়নে প্রভূত অবদান রাখে।

১৮২৪ সালে বিখ্যাত ইংরেজি শব্দকোষ 'থেসরাস' (Thesaurus) এর সঙ্কলন ও সম্পাদক পিটার মার্ক রজেট (১৭৭৯-১৮৬৯) তাঁর উদ্ভাবিত একটি তত্ত্বের

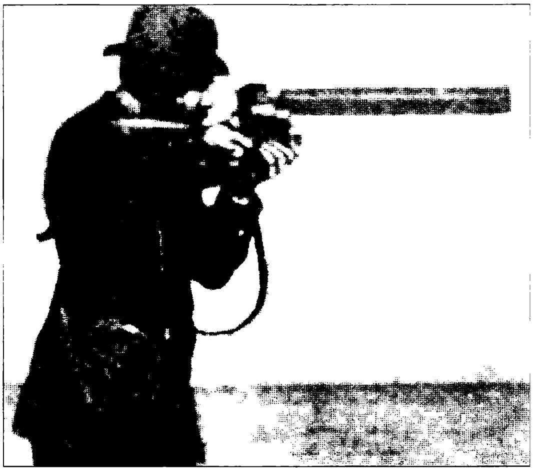

ই. জে. মারের ক্যামেরা– ফটোগ্রাফিক গান

লুমিয়্যার ভ্রাতৃদ্বয়

মাধ্যমে বলেন, মানুষের চোখ যে কোনো দৃশ্যই দেখুক না কেন, সেটা আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে মুছে যায় না, ধরে রাখে কিছুটা সময়। এই ধরে রাখার সময়ের পরিমাপ হচ্ছে এক সেকেন্ডের ১২ ভাগের ১ ভাগ। এক সার ছবি যদি এমনভাবে দেখানো হয় যাতে প্রতি সেকেন্ডে ১২ বার করে ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তবে আড়ালটা আর ধরা পড়বে না। মনে হবে, স্থির ছবিগুলো সচল, নড়াচড়া করছে।

এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই অসংখ্য বিজ্ঞানী নানাভাবে স্থির ছবিকে চলমান করার চেষ্টা করতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে স্থির চিত্রকে চলমান করার যেসব যন্ত্র জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলো যেমন বিচিত্র, তেমনি নানা নামে অভিহিত হত।

চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শনের কৌশল প্রথম কে আবিষ্কার করেন এ নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উদ্ভাবক মোটামুটি একই সময়ে চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণাকাজে ব্যাপৃত হন। এঁদের মধ্যে ফরাসি দেশের জুল এতিয়েন মারে, ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ড মাইব্রিজ (Eadweard Muybridge) এবং আমেরিকায় টমাস আলভা এডিসনের (দ্র) গবেষণাগারে নিযুক্ত ইংরেজ গবেষক কে. এল. ডিকসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই চলচ্চিত্র কোনো একক ব্যক্তির নয়, বিভিন্ন উদ্ভাবকের কৃতিত্বের সমষ্টিগত ফসল।

ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী জুল এতিয়েন মারে ১৮৮২ সালে আবিষ্কার করেন 'ফটোগ্রাফিক গান' (photo-gaphic gun)। বন্দুকের মতো দেখতে এই ক্যামেরা চলমান বস্তুর ছবি তোলার ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তোলে। ছবি দেখানোর যন্ত্রের উদ্ভাবনেরও শুরু হয় এ সময়ই। ফ্রান্সের লুই লেপ্রাঁস্ সেলুলয়েড ফিল্ম উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালে জর্জ ইস্টম্যান (১৮৫৪–১৯৩২) আবিষ্কার করলেন কোডাক ফিল্ম ও কোডাক ক্যামেরা। এরপর শুরু হল ছবি তৈরির পালা। এডিসনের স্টুডিওতে তৈরি হল পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র 'হাঁচি'। ঐ একই সময়ে ইংল্যান্ডে উইলিয়াম গ্রিন ফ্রিজ (১৮৫৫-১৯২১) সচল ছবি তোলার ক্যামেরা উদ্ভাবন করে চালু করলেন ছবি দেখানোর পদ্ধতি। ইংল্যান্ডে তৈরি হল প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও রবার্ট উইলিয়াম পলের (১৮৬৯–১৯৪৩) উদ্যোগে।

আ. হু.

চশমা (spectacles)

বিশেষ লেন্সে (দ্র) তৈরি চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টির কোনো কোনো ত্রুটির প্রতিবিধান করা যায়। অবশ্য অতিরিক্ত আলো থেকে চোখকে আরাম দেবার জন্য, বিশেষ কাজ করতে গিয়ে চোখের নিরাপত্তার জন্যও কখনো কখনো চশমা ব্যবহার করতে হয়। দৃশ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত সংবেদনশীল রেটিনার (দ্র) উপর স্পষ্ট ফোকাস ফেললে তবেই আমরা ঠিকমতো দেখি। কিন্তু চোখের কোনো ত্রুটির জন্য এ রকম ফোকাস করা অনেক সময় সম্ভব না হওয়ায় ঝাপসা দেখা যেতে পারে। চশমা আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে এর প্রতিবিধান করে।

দূরবর্তী বস্তু থেকে আসা আলো রেটিনায় পৌঁছানোর আগেই ফোকাসে উপনীত হলে তার দৃশ্য ঝাপসা মনে হবে। এই ত্রুটিকে বলা হয় নিকটদৃষ্টি বা মায়োপিয়া। যথাযথ অবতল লেন্স (মাঝখানে পাতলা, কিনারায় পুরু) ব্যবহার করে এই ফোকাসকে যথাস্থানে নেওয়া যায়। এ রকম লেন্সের পাওয়ার ঋণাত্মক। এর বিপরীত ত্রুটি হল দূরদৃষ্টি বা হাইপারমেট্রোপিয়া– খুব কাছের বস্তু থেকে আসা আলো ফোকাস হওয়ার আগেই রেটিনাতে পৌঁছে যাওয়া। উত্তল লেন্স (মাঝখানে পুরু) ব্যবহার করে এর প্রতিবিধান হয়, যার পাওয়ার ধনাত্মক। সাধারণত বয়স চল্লিশের ওপরে গেলে সবারই এ রকম ত্রুটি দেখা দেয় এবং কাছের জিনিস দেখার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় বাচ্চাদের ট্যারা চোখের প্রতিকারেও চশমা ব্যবহার করা হয়। আলোকরশ্মি চোখের দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একত্রিত হলে অ্যাস্টিগমেটিজ্‌ম্ বা বিষমদৃষ্টি নামে আর একটি ত্রুটি দেখা যায়, যা সিলিন্ড্রিক্যাল বা বেলনাকৃতি লেন্সে সারে। ছানি পড়ে অস্বচ্ছ হয়ে গেলে চোখের নিজস্ব লেন্স সরিয়ে ফেলে হয়তো অভ্যন্তরীণ প্রান্তিক লেন্স দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয় অথবা বহিঃস্থ চশমা দিয়ে আলো ফোকাস করার ব্যবস্থা করতে হয়। নিকটদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি উভয় ত্রুটিই একসঙ্গে থাকলে বাইফোকাল চশমা নেওয়া যায়। এতে লেন্সের দুই অংশের দু' রকম পাওয়ার থাকে।

চক্ষুচিকিৎসক চোখ পরীক্ষা করে, নানা রকম লেন্সের মধ্য দিয়ে তাকাতে দিয়ে চশমার ব্যবস্থাপত্র

দেন। অপটিশিয়ানেরা সেই অনুসারে চশমা তৈরি করে দেন। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো ১২৭৫ সালের দিকে চীন ভ্রমণের সময় সেখানে চশমার ব্যবহার দেখেছেন। ইউরোপে এটি প্রচলিত হয় আরো পরে। ১৭৮৪ সালে আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বাইফোকাল চশমা উদ্ভাবন করেন। আজকাল চশমার বিকল্প হিসাবে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয়। এতে প্লাস্টিকের ছোট্ট পাতলা লেন্স সরাসরি চোখের মণির উপরে পাতলা অশ্রুস্তরের উপর ভাসে। সূর্যালোকের ছটায় আরামে দেখার জন্য আজকাল পোলারায়িত চশমা পাওয়া যায়। ফটোক্রোমিক লেন্সের চশমা আলো অনুযায়ী স্বচ্ছ-সাদা অথবা গাঢ় রঙ ধারণ করে।

মু. ই.

চাঁদ (moon)

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী (দ্র) থেকে এর গড় দূরত্ব ৩৮৪,০০০ কিলোমিটার। এ ছাড়া পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব ৩৫৬,৪১০ কিলোমিটার ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪০৬,৭০০ কিলোমিটার। নিজ অক্ষরেখার চারদিকে চাঁদের আবর্তনকাল এবং পৃথিবীর চারদিকে এর পরিক্রমণকাল একই। এ কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের কেবল এক পিঠই দেখা যায়। এর অপর পিঠ কখনোই দেখা যায় না। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-৮ নভোযানযোগে চাঁদ প্রদক্ষিণকালে তিন জন মার্কিন নভশ্চর (দ্র) সর্বপ্রথম চাঁদের অপর পিঠ দেখেন। চাঁদ সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের (দ্র) মধ্যে অবস্থান করে তখন অমাবস্যা হয়। অপর দিকে পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে অবস্থান করে তখন পূর্ণিমা হয়।

চাঁদের বুকে বেশ কিছু সমভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বিরাট বিরাট গর্ত আছে। যে পরিমাণ সূর্যের আলো চাঁদের পিঠে পড়ে তার শতকরা ৭ ভাগ প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র এবং পানির ওপর চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণের পার্থক্যের কারণে জোয়ার-ভাটা (দ্র) হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অবশ্য সূর্যের আকর্ষণের চেয়ে চাঁদের আকর্ষণ সোয়া দুই গুণ বেশি। চাঁদের এ আকর্ষণশক্তি স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলে ও ভূপৃষ্ঠের জলরাশির উপর

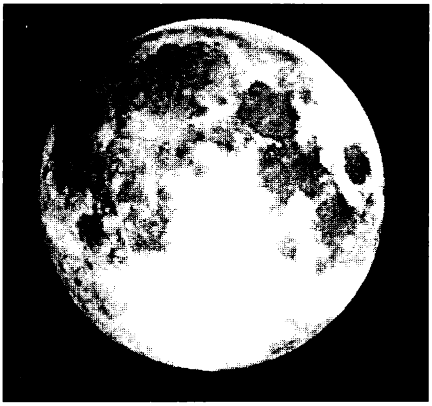

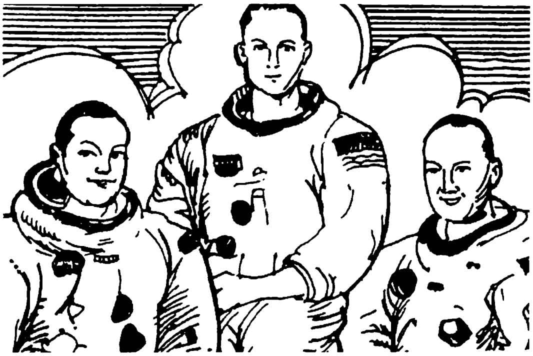

বাম দিক থেকে আর্মস্ট্রং, যিনি প্রথম চাঁদে নামেন, তার পর কলিন্স ও অলড্রিন

কার্যকর। আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশে এবং তার বিপরীত অংশে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠলে জোয়ার হয়। স্থান দু'টির মাঝামাঝিতে সমকোণে অবস্থিত অপর স্থান দু'টিতে পানি নেমে ভাটা হয়।

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই (ওয়াশিংটন সময় রাত ১০.৪৬ মিনিটে) নীল আর্মস্ট্রং সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। অ্যাপোলো-১১ নভোযানের 'ঈগল' নামক লুনার মড্যুল এ কাজে ব্যবহার করা হয়। ঈগলের 'পাইলট' ছিলেন এডউইন ই. অলড্রিন। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন যখন চাঁদের পিঠে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখন 'কলম্বিয়া' নামক মূল যান বা 'কমান্ড মড্যুল'-এর পাইলট মাইকেল কলিন্স চাঁদ প্রদক্ষিণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

চাঁদ থেকে সংগ্রহ করে আনা শিলাখণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চাঁদে কোনো পানি নেই এবং কোনো জৈব পদার্থ নেই। এ ছাড়া চাঁদে বাতাস নেই, তাই সেখানে কোনো শব্দও নেই। চাঁদের বুকে শৈত্য ও উত্তাপের পার্থক্য অনেক বেশি। নিরক্ষরেখা বরাবর চাঁদের উপরিভাগে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা –১৭১° সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১৭° সেলসিয়াস। মানুষের বসবাসের জন্য চাঁদের পরিবেশ তাই মোটেও অনুকূল নয়।

মু. আ.

চাঁপা (champak)

সুন্দর, উঁচু ও হরিৎ বৃক্ষ। এ গাছের কাণ্ড লম্বা, সোজা ও গোল। এর উচ্চতা তেত্রিশ মিটারেরও বেশি হতে পারে। ভালো গাছের গুঁড়ি বেশ মোটা হয়ে থাকে এবং তেমন ক্ষেত্রে কাণ্ডের বেড় পাঁচ মিটারেরও বেশি হয়। চাঁপার বৈজ্ঞানিক নাম *মাইকেলিয়া চম্পকা (Michelia champaca)*। এ গাছ Magnoliaceae গোত্রভুক্ত। এ গাছের কাঠ খুব দামি। ভালো আসবাবপত্র তৈরির কাজে তা ব্যবহার করা হয়। এর সার-কাঠের রঙ কিঞ্চিৎ হলদে এবং অসার-কাঠের রঙ সাদা। অসার-কাঠ অবশ্য পরিমাণে কম। কাঠ সোজা ও আঁশযুক্ত, তাই সহজে পালিশ করা যায়। গাছের ফুল থেকে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায়। অন্যান্য সুগন্ধি তৈরিতেও তা ব্যবহার করা হয়। চাঁপা ফুল থেকে এক রকম রঙ পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে রেশমি কাপড় রঙ করা হয়।

মু. আ.

চা (tea)

চা বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয় এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী উদ্ভিদ। বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৫১টি। এর মধ্যে ১৩১টি সিলেটে, বাকিগুলো চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লায়। Theaceae গোত্রের অধীন চা-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Camellia sinensis*। চা চিরসবুজ গুল্ম বা বৃক্ষ যা স্বাধীনভাবে বাড়তে দিলে ৩০-৫০ ফুট উঁচু হতে পারে। বাগানে এ গাছ ছাঁটাই করে ২-৫ ফুট উচ্চতায় রাখা হয়। চা-পাতা বল্লমাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি। সরল অর্থাৎ প্রান্ত খাঁজকাটা। ফুল সাদা ও সুরভিত। ফল খয়েরি সবুজ, ক্যাপসুল, বীজ গোলাকৃতি চ্যাপটা খয়েরি। চা একটি ছায়ানুরাগী উদ্ভিদ এবং হালকা পাতা সম্পন্ন বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন জমিতে উন্মুক্ত জমির চেয়ে ভালো জন্মে। তুষারপাত বা ঠাণ্ডা শুষ্ক আবহাওয়া চা গাছের জন্য ক্ষতিকর। বীজ থেকে চা গাছ হলেও জাতের মান ঠিক রাখা এবং দ্রুত বাগান সৃষ্টির জন্য অঙ্গ কেটে চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রচলিত। প্রজনন কাজে অবশ্য বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি করা হয়। চা গাছের সতেজ

অঙ্গজ বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখার জন্য নিয়মিত গাছ ছাঁটাই করা হয়। চায়ের নতুন গজানো একটি পত্রকুঁড়ি এবং তার পরের নিচের দু'টি পাতাসহ ডগা ছিঁড়ে নেয়ার নাম 'পাতিতোলা'। এ পাতিই প্রক্রিয়াজাত করার পর চা নামে পরিচিত।

শা. আ.

চাকা (wheel)

চাকা কবে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কে প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছে তা জানা যায় নি। কিন্তু এশিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে যে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই চাকার মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। কাঠের বেলনাকার গুঁড়ি থেকে তৈরি দুটো চাকার চক্রকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে একটি দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। এই দণ্ডকে বলা হয় অক্ষধুরা বা চক্রনেমি।চাকার যে বিন্দুর ভিতর দিয়ে অক্ষধুরা প্রবেশ করে তাকে বলা হয় বিয়ারিং। অক্ষধুরার ওপরে গাড়ির ওজন চাপানো হয়। চাকা ঘুরবার সময় অক্ষধুরা স্থির থাকে এবং চাকার চক্রকেন্দ্র বা চক্রনাভির সঙ্গে এর ঘর্ষণ হয়। এর ফলে বেশ কিছু শক্তি খরচ হয় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। এতে গাড়ির গতি যেমন মন্থরিত হয়, তেমনি চক্রনাভি ও অক্ষধুরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় দ্রুত।

দীর্ঘ সময় ধরে চাকার ব্যবহারে নানা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে মিশরে মাঝখানে ফাঁকা ও অরযুক্ত চাকার উদ্ভাবন ঘটে। এর ফলে চাকা অনেকটা হালকা হয় ও তাতে ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলো বেশ দ্রুত চলতে পারে। চক্রনাভি ও অক্ষধুরার মধ্যে ঘর্ষণ কমাতে বলবিয়ারিং-এর প্রচলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইস্পাতের বল চক্রাকারে বসানো থাকে চক্রনাভি ও অক্ষধুরার মধ্যে। চক্রনাভি এর ফলে অক্ষধুরার সঙ্গে ঘর্ষণ খেতে খেতে না চলে ঘুরে ঘুরে চলে এবং ঘর্ষণ অনেক কমে যায়। ঘর্ষণ কমাবার জন্য এখানে তেল বা গ্রিজও ব্যবহার করা হয়। চাকার পরিধির উপরে রাবারের টায়ার ও টিউব ব্যবহার করার ফলে ঝাঁকুনিও কম লাগে।

ডাঙায় চলা সব রকম যানবাহন, যেমন– বাইসাইকেল, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরগাড়ি (দ্র) বা

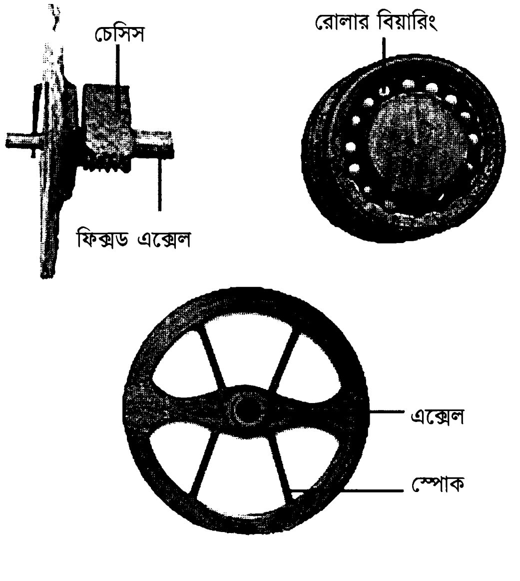

রেলগাড়িতে (দ্র) চাকা ব্যবহৃত হয়, এমনকি প্লেনও উড়তে পারত না রানওয়ের ওপর ছুটে যাওয়ার জন্য চাকা না থাকলে। চাকা মনুষ্যসভ্যতার একটি বড় ভিত্তি।

আ. আ.

চান্দা মাছ (pomfret)

বাংলাদেশের Oplicephalifermees বর্গের বেশ কয়েক প্রজাতির চান্দা মাছ পাওয়া যায়, এদের মধ্যে মাখন চান্দা, কমলা টাকা চান্দা, মোরা টাকা চান্দা, থুতনি টাকা চান্দা, রূপচান্দা, কলি চান্দা, মইশ্যা চান্দা ইত্যাদি প্রধান। এদের বৈজ্ঞানিক নাম *Ariomma* sp, *Leiognathus* sp, *Pampus* sp,

www.boighar.com

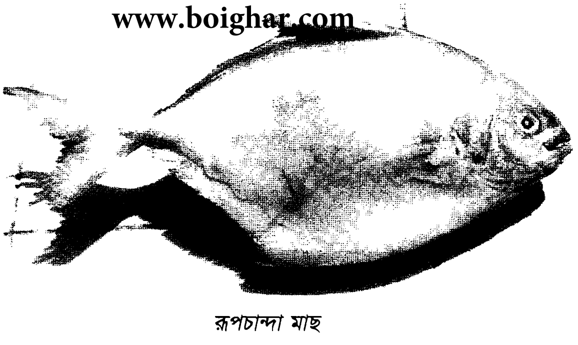

রূপচান্দা মাছ

Parastromateus sp। চান্দা মাছের দেহ রুপালি বর্ণের এবং চাপা ও চওড়া আকৃতির। মাথা মাঝারি আকারের। আঁইশ ছোট আকারের। চান্দা মাছ দৈর্ঘ্যে ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এদের পিঠে দু'টি পাখনা। প্রথমটি শক্ত কাঁটাযুক্ত। চান্দা মাছ মূলত সামুদ্রিক মাছ। এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। চান্দা মাছ প্লাঙ্কটন, ছোট আকারের মাছ এবং জলজ অসংখ্য প্রাণী খায়।

ত. চ.

চান্দ্র দিবস (lunar day)

চান্দ্র দিবস হল চাঁদের দিন বা চাঁদের পিঠে সূর্যালোকের সময়কাল। চাঁদ নিয়ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। চাঁদের এই আবর্তনকে বিজ্ঞানীরা দুইভাবে গণনা করেন। প্রথমটি নক্ষত্রসাপেক্ষ গণনা। একটি নক্ষত্র এবং পৃথিবীর সংযোগ রেখা বরাবর একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে ঠিক একই অবস্থানে ফিরে আসতে চাঁদের ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট (সংক্ষেপে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন) সময় লাগে। এই সময়কে বলা হয় নাক্ষত্রিক চান্দ্র মাস (Sideral month)। দ্বিতীয় গণনা সূর্যসাপেক্ষে। সূর্য এবং পৃথিবীর সংযোগ রেখা বরাবর একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে ঠিক অবস্থানে ফিরে আসতে চাঁদের ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট (সংক্ষেপে ২৯$\frac{১}{২}$ দিন) সময় লাগে। অর্থাৎ এক নতুন চাঁদের দিন থেকে পরবর্তী নতুন চাঁদের দিন পর্যন্ত সময় হল সৌরভিত্তিক চান্দ্র মাস বা শুধু চান্দ্র মাস (Syndic month)। এই এক সৌরভিত্তিক চান্দ্র মাসে চাঁদের একপিঠ সূর্যের দিকে থাকে, অর্থাৎ চাঁদের পিঠে ১ দিন হয়। এই সময়কে এক চান্দ্র দিবস (Lunar day) বলা হয়। সাধারণ হিসাবে এক চান্দ্র দিবস = ২৯$\frac{১}{২}$ দিন।

স. রা.

চালতা (elephant apple)

মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ ও ছায়াদানকারী এক প্রকার গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Dilenia indica* Linn। এ গাছ Dilleniaceae গোত্রভুক্ত। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালয়েশিয়াতে চালতা গাছ

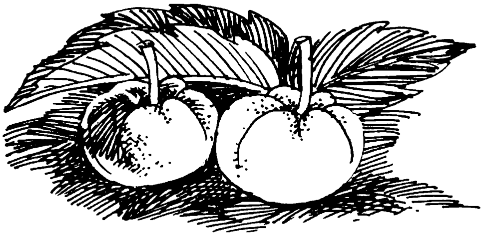

ভালো জন্মে। এ গাছের কাণ্ড নাতিদীর্ঘ এবং এর শাখা-প্রশাখা এলোমেলোভাবে প্রসারিত। চালতা গাছের পাতার আকৃতি ও বিন্যাস বেশ আকর্ষণীয়। চালতার কাঠ মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। তাই এ কাঠ নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বন্দুকের বাঁট তৈরিতে এবং জ্বালানি হিসাবেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চালতার ফুল একক, বৃহৎ, সাদা ও সুগন্ধযুক্ত। বর্ষার শুরুতে চালতা গাছে ফুল ফোটে। এর ফল টক। এ টক ফল চাটনি ও টক সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

চালতা ফলের রস চিনি ও পানির সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করলে গলাব্যথা কমে যায়।

মু. আ.

চিংড়ি (shrimp, shellfish)

চিংড়ি Arthropoda বর্গের অন্তর্ভুক্ত। চিংড়ি মাছ অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

দেহ মাথা, বুক এবং উদর নিয়ে গঠিত। তবে চিংড়ির মাথাকে বুক থেকে পৃথক করে বোঝা যায় না। এ জন্য চিংড়ির মাথা ও বুককে একত্রে শিরোবক্ষ (cephatothorax) বলে। চিংড়ির শিরোবক্ষ আকারে বেশ বড়। উদর ক্রমশ সরু হয়ে লেজের সাথে মিশে যায়। চিংড়ির পুরো দেহ এক ধরনের স্বচ্ছ খোলস দিয়ে ঢাকা থাকে। একে কাইটিন (chitin) বলা হয়। মাথা অর্থাৎ শিরোবক্ষের ঠিক সামনের দিকে এক জোড়া চোখ থাকে। এই চোখ কিন্তু একক ধরনের চোখ নয়। চিংড়ির চোখ অন্যান্য পোকা-মাকড়ের মতোই অসংখ্য ছোট ছোট চোখ সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই ধরনের চোখকে যৌগিক চোখ বা পুঞ্জাক্ষি (compound eye) বলা হয়। চিংড়ির দেহে সর্বমোট পাঁচ জোড়া পা থাকে। এই একাধিক খণ্ডকে

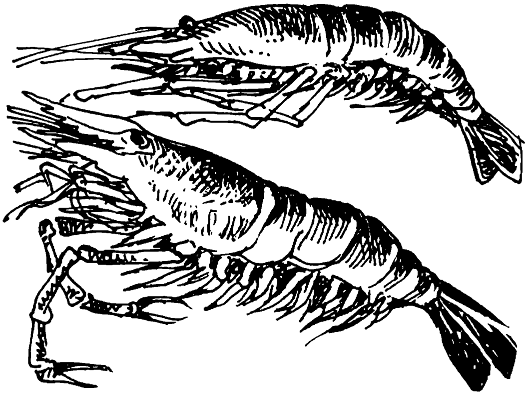

নিয়ে গঠিত পাগুলো চলনপদ (walking leg) নামে পরিচিত। এই পায়ের সাহায্যে এরা জলাশয়ের তলদেশে হেঁটে বেড়ায়। চলনপদ ছাড়াও সাঁতার কাটার জন্য চিংড়ির উদরে বৈঠার মতো অনেকগুলো পা থাকে। এদের সাঁতার-পা বা সন্তরণ পদ (swimming leg) বলা হয়।

চিংড়ি নিশাচর (nocturnal)। এরা দিনের বেলায় জলের গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলায় খাদ্যের সন্ধানে জলাশয়ের কিনারায় ঘুরে বেড়ায়। চিংড়ি দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে। তবে মাঝে মাঝে চিংড়ি একাও থাকে।

শ্যাওলা, উদ্ভিদ-কণা, গলিত জৈব পদার্থ, ছোট ছোট প্রাণীর দেহাংশ, মশার শূককীট, নানা জাতের শামুকের ডিম ইত্যাদি চিংড়ির প্রধান খাদ্য।

বর্ষাকালে, বিশেষত বর্ষার শুরুতে মেঘলা আবহাওয়ায় চিংড়ি প্রজনন করে। চিংড়ির বাচ্চাদের লার্ভা (larva) বলা হয়। এরা সাঁতারে খুবই পটু এবং সামান্য আলোকেই এরা আকৃষ্ট হয়।

চিংড়ির আশ্রয়স্থল এবং বিচরণক্ষেত্র বেশ ব্যাপক। স্বাদুজলের চিংড়ি বিভিন্ন জলাশয়, যেমন– পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, ধানক্ষেত, দিঘি ও নদীতে বসবাস করে। এ ছাড়া মোহনা অঞ্চলের ঈষৎ লবণাক্ত জলাশয়, যেমন– খড়ি ও ভেড়িতেও এরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। সারা বিশ্বে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি চিংড়ি হল বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, হরিনা চিংড়ি, কুঞ্চু চিংড়ি, বামনা চিংড়ি ইত্যাদি।

অ. ব.

চিকিৎসাবিজ্ঞান (medical science)

রোগের চিকিৎসা এবং দেহের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জ্ঞান ও কৌশল চিকিৎসাবিজ্ঞান নামে অভিহিত। বাংলায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শব্দটি ইংরেজি 'মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর অনূদিত রূপ হলেও ইংরেজি 'মেডিসিন' শব্দটিও সাধারণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবহারিক ত্রুটি এখনো চলছে। অর্থাৎ 'মেডিসিন' শব্দটির ব্যবহার দ্বিবিধ। এক, মেডিক্যাল সায়েন্স হিসাবে; দুই, শল্য-চিকিৎসার বাইরে মেডিসিন নামক চিকিৎসাশাখা হিসাবে।

মেডিক্যাল সায়েন্স অর্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত সকল বিভাগই বোঝায়। যেমন– মেডিসিন বিভাগ, যেখানে চিকিৎসার মাধ্যম প্রধানত ঔষধ। তেমনি সার্জারি বা শল্যবিদ্যা (দ্র) বিভাগের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রধানত অস্ত্রোপচার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, যদিও ঔষধ বাদ দিয়ে নয়। আবার প্রসূতিবিদ্যা ও স্ত্রীরোগবিদ্যায় (অবস্টেট্রিক্স ও গাইনিকোলজি) মেডিসিন ও সার্জারি দুয়েরই ব্যবহার রয়েছে। শিশুরোগবিদ্যার (পেডিয়াট্রিক্স) চিকিৎসা প্রধানত ঔষধভিত্তিক। আর রেডিওথেরাপির (দ্র) অবলম্বন বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

এ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধীনে রয়েছে মৌলিক ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিভাগ, যেমন– শারীরসংস্থান (এনাটমি), শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি), ভেষজবিদ্যা (ফার্মাকোলজি), অণুজীববিদ্যা (মাইক্রোবায়োলজি), রোগবিদ্যা (প্যাথোলজি), কমিউনিটি মেডিসিন, ফসেনসিক মেডিসিন, রেডিওলজি ইত্যাদি। ফিজিক্যাল মেডিসিন ও মনোরোগবিদ্যা (সাইকিয়্যাট্রি) আধুনিক সংযোজন হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসার স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ।

মেডিসিন বিভাগের মতো শল্যবিদ্যারও একাধিক উপবিভাগ রয়েছে, যেমন– অর্থোপেডিক্স, পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইত্যাদি। এ সবকিছু মিলেই মেডিক্যাল সায়েন্স। অন্যদিকে মেডিসিন শব্দের সীমাবদ্ধ প্রয়োগে রয়েছে

ঔষধ-চিকিৎসানির্ভর এবং একাধিক উপবিভাগসমৃদ্ধ মেডিসিন বিভাগ।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সূচনা সুপ্রাচীন কালে মানবসভ্যতার বিশেষ এক পর্যায়ে। প্রাগৈতিহাসিক কালের চিকিৎসার কথা বাদ দিলেও প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চীন, ভারতবর্ষ, গ্রিস ইত্যাদি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ভেষজ ও শল্য চিকিৎসা দুইই ধারণ করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যদের অনুসৃত চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ (অর্থ– আয়ু সম্পর্কিত জ্ঞান) ভেষজ ও শল্যচিকিৎসা দুই দিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র এখনো ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি। অন্য দিকে মধ্যযুগে ইরানে মূলত ভেষজজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) আয়ুর্বেদের মতোই প্রচলিত ছিল। তেমনি আঠারো শতকের শেষ দিকে প্রচলিত ছিল সামুয়েল হানেমান (দ্র) প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথি (দ্র) নামক চিকিৎসাপদ্ধতি।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যুগান্তকারী আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রকে তার নিজস্ব আবিষ্কার ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠেছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই অগ্রগতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে অণুজীববিদ্যা (দ্র) ও ভেষজবিদ্যার (দ্র) গবেষণা ও আবিষ্কার। এ ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞান গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শাখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রা এখন তাই বহুমুখী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক।

আ. র.

চিতল (chital fish)

Osteoylossiformes বর্গের মাছ। চিতল মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Notopterus chitala*। চিতল মাছ লম্বায় ১.২ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পিঠের দিক তামাটে বাদামি এবং পিঠের দিকে প্রতি পাশে ১৫টি করে রুপালি বর্ণের খাড়া ডোরা দাগ থাকে। লেজে অনিয়মিতভাবে ৫ থেকে ৮টি কালো ফোঁটা থাকে। দেহ চ্যাপটা এবং দেখতে ধনুকের মতো। মাথা ছোট।

খুবই ছোট। লম্বার চেয়ে প্রস্থে ছোট। দু'টি মাত্র পাখনা। বক্ষপাখনা সম্প্রসারিত হয়ে লেজের সাথে যুক্ত হয়। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়ে চিতল পাওয়া যায়। চিতল মাছ পরিষ্কার জল পছন্দ করে। মূলত গভীর জলের মাছ। রাক্ষুসে ও অত্যন্ত ক্ষিপ্র স্বভাবের। প্রধানত মাংসাশী। জলাশয়ের তলদেশের খাবার ছাড়াও এরা জলে ভাসমান জলজ পোকা-মাকড় এবং ছোট ছোট জলজ কীটপতঙ্গ, শামুক, চিংড়ি, ছোট ছোট মাছ খায়। প্রজনন জুন ও জুলাই মাসে। প্রজননকালে তলদেশের মাটি খুঁড়ে বাসা তৈরি করে। স্ত্রী-মাছ এই বাসায় ডিম পাড়ে। অনেক সময় আগাছায়ও ডিম পাড়ে। ডিম আকারে বেশ বড় এবং আঠালো। স্ত্রী ও পুরুষ পালা করে বাসায় ডিম পাহারা দেয়। এই সময় এরা খুব হিংস্র থাকে। অন্য কেউ বাসার কাছে গেলেই এরা তাকে আক্রমণ করে। ডিম ফুটে অচিরেই চিতলের পোনা বের হয়। চিতল মাছও খেতে খুব সুস্বাদু, তবে কাঁটাবহুল হওয়ার জন্য অনেকেই এই মাছ পছন্দ করে না।

অ. ব.

চিতা / চিতাবাঘ (cheetah)

চিতা বিড়াল জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন চিতা স্বল্প দূরত্বে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। এরা মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার ঘাসপূর্ণ সমতলভূমিতে বাস করে। এরা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

চিতা ও চিতাবাঘ এক নয়। শরীরের গঠন ও দেহাবরণের ছোপের ধরনে এদের অনেক পার্থক্য। চিতার মাথা ছোট, শরীর চিকন, পা সরু ও নাক লম্বা। ০.৯ মিটার উঁচু চিতার ওজন প্রায় ৪৫ কেজি। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ১.৮–২.১ মিটার লম্বা। দেহাবরণ বাদামি-হলদে, তাতে কালো বুটি বুটি ছোপ। গলার নিচ, বুক ও পেটের রঙ হালকা; সেখানে কোনো

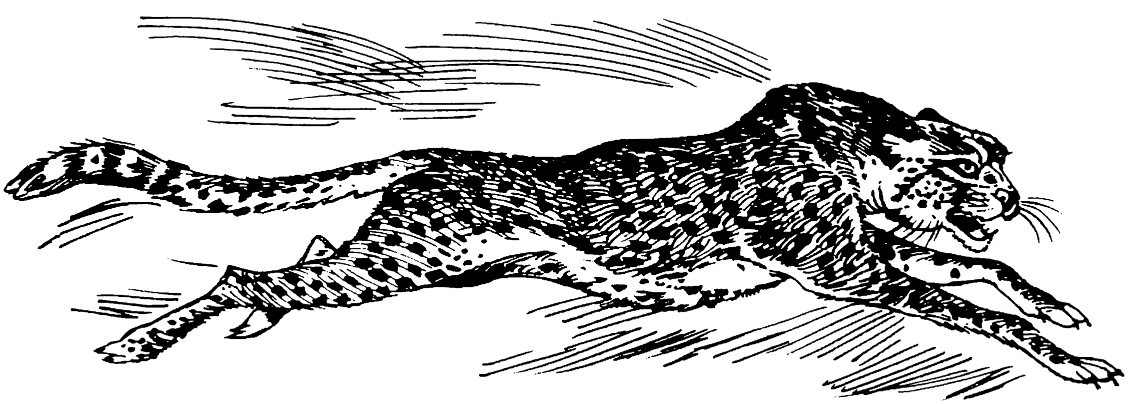

পশু-পাখিদের মধ্যে একমাত্র প্রাণী চিতাই সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে

বুটি নেই। লেজের ডগা সাদা, কানের গোড়া কালচিটে। অন্যান্য বিড়ালজাতীয় প্রাণীর মতো এরা পায়ের নখ সম্পূর্ণভাবে চামড়ার আড়ালে লুকাতে পারে না।

মাংসাশী চিতা সচরাচর দিনে শিকার করে। হরিণ বা অ্যান্টিলোপ এদের প্রিয় খাদ্য। এরা ঝোপের আড়ালে পেটে ভর দিয়ে চুপি চুপি শিকারের দিকে এগোয়। ১৪০-১৮০ মিটারের ভিতরে এসে গেলেই বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে কাবু করে।

নিজের নির্দিষ্ট এলাকায় চিতা একাকী থাকতে ভালোবাসে। তিন মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-চিতা দুই-চারটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রায় পনেরো মাস মায়ের সঙ্গে থাকে। চিতা বিশ-পঁচিশ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

চিনি (sugar)

কার্বোহাইড্রেট (দ্র) বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চিনি অন্যতম। এটি সাধারণত মিষ্টি স্বাদের হয় এবং খাদ্যকে মিষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোজ (দ্র) সরলতম কার্বোহাইড্রেট। রক্তের মধ্যে যাওয়া এই চিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রুকটোজ (দ্র) নানা ফল ও সবজির মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত চিনি প্রধানত আখ অথবা সুগারবীট থেকে তৈরি হয়। এটি মূলত সুক্রোজ (sucrose)। দুধের চিনি হল ল্যাকটোজ আর শস্য থেকে পাওয়া চিনি প্রধানত মল্টোজ। মৌমাছির চাক থেকে পাওয়া মধুতে গ্লুকোজ আর ফ্রুকটোজ প্রায় সমান অনুপাতে থাকে। খেজুর গাছের রসে এবং অনুরূপ মেপল্ সিরাপে থাকে প্রধানত সুক্রোজ। ভুট্টা থেকে পাওয়া কর্ন সিরাপে থাকে গ্লুকোজ এবং মল্টোজ।

আমাদের দেশসহ বেশ কিছু দেশে ব্যবহার্য চিনি বলতে আখ থেকে তৈরি চিনিই বোঝায়। চিনিকলে আখ মাড়াই করে এবং পানিতে ভিজিয়ে রস নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। রস উত্তপ্ত করে তার সঙ্গে চুন মেশালে অবাঞ্ছিত উপাদানগুলো নিচে থিতিয়ে পড়ে। উত্তাপে ঘন করা রসের সিরাপকে বায়ুশূন্য পাত্রে আরো উত্তপ্ত করে চললে সিরাপ থেকে চিনির কেলাস দানা বাঁধতে থাকে। বায়ুশূন্য করার কারণ হল রসের স্ফুটনাঙ্ককে নামিয়ে আনা যাতে সিরাপে বা চিনিতে পোড়া লাগার মতো উত্তাপে না গিয়েই পানি বাষ্পীভূত করা যায়। পরে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের তীব্র ঘূর্ণনে চিনির কেলাস থেকে সিরাপকে আলাদা করে ফেলা হয়। এভাবে তৈরি হলুদ-খয়েরি কাঁচা চিনি থেকে ধবধবে সাদা শোধিত চিনি পেতে হলে একে ধুয়ে, আবার দ্রবীভূত করে বিস্তারিত ছাঁকনব্যবস্থায় ছেঁকে আবার কেলাসিত করতে হয়। এভাবে সাদা চিনির জন্য কাজ আর ব্যয় অনেক বাড়লেও এতে চিনির পুষ্টি-উপাদান না বেড়ে বরং কমে যায়। কারণ যা বাদ দেওয়া হয় তার সঙ্গে চলে যায় বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ ও আঁশ। সরাসরি গুড় তৈরি করে খেলে পুষ্টি-উপাদানের দিক থেকে কাঁচা খয়েরি চিনির চেয়েও ভালো হয়। কিন্তু তবুও সাদা শোধিত চিনিরই কাটতি বেশি।

আখ থেকে চিনি তৈরির পদ্ধতির সর্বপ্রাচীন প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে, খ্রিস্টজন্মের বহু পূর্বে। আনুমানিক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের আগে ইউরোপে এ চিনি প্রচলিত হয় নি। সুগারবীট থেকে চিনি তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৯ সালে। মূলা জাতীয় এই স্ফীত মূল থেকে এখন দুনিয়ার ৪০ শতাংশ চিনি উৎপন্ন

হয় প্রধানত রাশিয়াতে। চিনি সর্বাধিক উৎপন্ন হয় ব্রাজিলে এবং আখ থেকে। সব মিলে প্রতি বছর দুনিয়াতে ন' কোটি টন চিনি উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের কিছু চিনি আমাদের দেশের চিনিকলগুলোতে উৎপন্ন হয়। চিনি শরীরের শক্তি-উৎপাদক খাদ্য-উপাদান। তবে সরাসরি চিনিই এ জন্য খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং দেহে দ্রুত মেদ সঞ্চয়, দাঁতের অবক্ষয় ইত্যাদি কারণে অধিক চিনি বর্জনীয়। এসব এড়াতে এবং বিশেষ করে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগে চিনি নিষিদ্ধ হলে অনেকে কৃত্রিম মিষ্টিকারক দ্রব্য চিনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করেন। তবে সে ক্ষেত্রে অন্য রকম কিছু ঝুঁকি থাকতে পারে।

মু. ই.

চিপ (chip)

চিপ হল সিলিকনের ছোট্ট পাতলা চিল্‌তে, যার ভিত্তিতে অনেকগুলো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ সমন্বিত করা হয়। কাগজের মতো পাতলা এই চিপ সাধারণত দৈর্ঘ্যে প্রায় চার মিলিমিটারের চেয়ে বড় হয় না। অথচ এর মধ্যেই রচিত হয় হাজার হাজার ট্রানজিস্টর, ডায়োড, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি। চিপের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খুবই ক্ষুদ্র হয়ে আসায় এর জন্য বস্তুর পরিমাণ, নির্মাণব্যয়, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি সবই অভাবনীয় রকম কমে গেছে। যেমন– একটি শক্তিশালী কম্পিউটারের (দ্র) মূল প্রসেসিং অংশ অথবা মেমোরি এখন একটিমাত্র চিপের অবয়বে চলে আসতে পেরেছে, যা কম্পিউটারকে ছোট করেছে, সরল করেছে এবং অতি সস্তা করেছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে কম্পিউটার প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে এই চিপ।

চিপ তৈরির কাজ শুরু হয় সিলিকনের পাতলা চাকতি নিয়ে। চিপের উপর রচিত হবার জন্য সমন্বিত বর্তনীর একটি নকশা বড় করে এঁকে ফটোগ্রাফির (দ্র) মাধ্যমে তার একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করা হয়। নকশার স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ অংশের মধ্য দিয়ে সংবেদী পাতের ওপর আলোকসম্পাত করা হয় এবং সেই অনুসারে তা ক্ষয় করিয়ে একটি ছাঁচ তৈরি করা হয়। এভাবে পূর্ণ নকশা অনুসারে বেশ কয়েকটি ছাঁচ তৈরি হয়। পর পর এসব ছাঁচের এককেটির মধ্য দিয়ে যথাযথ বিজাতীয় বস্তু সিলিকন পাত বিশেষ বিশেষ স্থানে ঢুকিয়ে এবং প্রয়োজন মতো অন্তরক বা ধাতব পাতলা পর্দা দিয়ে তা ঢেকে দিয়ে পরস্পরসংলগ্ন ট্রানজিস্টর ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। একবার ডিজাইন হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তভাবে উৎপাদন সম্ভব হয় বলে এবং খুবই কম বস্তু ব্যবহৃত হওয়ার ফলে চিপের নির্মাণব্যয় খুব কম।

এখন গবেষণা ও উন্নয়নের বড় প্রচেষ্টা হল ক্রমাগত আরো বেশি বেশি যন্ত্রাংশ একই চিপের উপর সমন্বিত করা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই একটি চিপের উপর একত্রিশ লক্ষ ট্রানজিস্টর সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মু. ই.

www.boighar.com

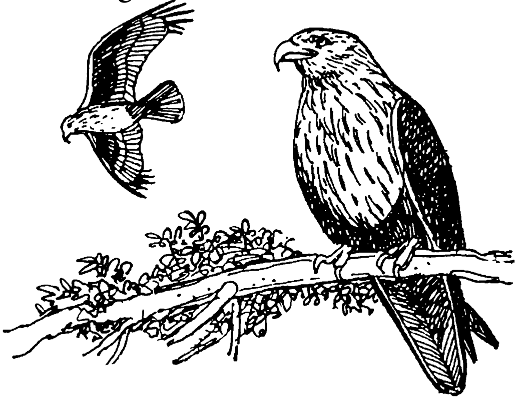

চিল (kite)

ফালকোনিফর্মেস (Falconiformes) বর্গের পর্যায়। এরা সাহসী ও শিকারি পাখি। এদের উপরের ঠোঁট ধারালো, বাঁকা এবং বেশ শক্ত। এদের পায়ের আঙুলের নখ খুব চোখা। এদের দৃষ্টিশক্তিও খুব প্রখর। বহুদূর থেকে এরা শিকার দেখতে পায়। এরা উচ্চ স্বরে চি-চি শব্দ করে ডাকে।

চিল কয়েক প্রকার গোদা চিল বা সাধারণ চিল, শঙ্খচিল ও কৃষ্ণচিল। গোদা চিলের বৈজ্ঞানিক নাম *Milvus migrans*। এরা লোকালয়ের কাছাকাছি থাকে। এদের দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার। মৃত প্রাণী, আবর্জনা, জীবিত পতঙ্গ, পাখি, ইঁদুর প্রভৃতি এরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। পরে গাছের ডালে বা অন্য কোথাও বসে শক্ত ঠোঁট দিয়ে শিকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

শঙ্খচিলের বৈজ্ঞানিক নাম *Haliastur indus*। এরা জলাশয়ের কাছাকাছি থাকে এবং মাছ শিকার করে খায়। ব্যাঙ (দ্র) এবং সরীসৃপও (দ্র) এরা খেয়ে থাকে। এদের মাথা ও বুকের রঙ সাদা এবং ডানার রঙ বাদামি হয়ে থাকে। এদের লেজের শেষাংশ গোলাকার। দৈর্ঘ্যে এরা ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কৃষ্ণচিলের বৈজ্ঞানিক নাম *Elanus caeruleus*। এরা হালকা বনাঞ্চল ও ক্ষেত-খামারের আশেপাশেই থাকে। এদের দেহ ও ডানা হালকা ধূসর রঙের। তবে কাঁধের কাছাকাছি ডানার রঙ কালো। এদের চোখের রঙ লাল এবং দৈর্ঘ্যে এরা ৪০ সেন্টিমিটার।

চিল সচরাচর দু'টি ডিম পাড়ে। উঁচু গাছের শীর্ষে বাসা বাঁধে। স্ত্রী-পাখি ডিমে তা দেয়। প্রায় এক মাস পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

মু. আ.

চুইংগাম (chewing gum)

প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক (synthetic) গাম, ক্ষার (base), রজন (resin), চিনি ও ভুট্টা সিরাপের (corn syrup) সাহায্যে তৈরি রাবারের মতো একজাতীয় লজেঞ্চুস, যা চুষতে হয় না, ক্রমাগত চিবাতে হয়। এতে রঙ আর সুগন্ধদ্রব্যও যুক্ত থাকে। এটি আমেরিকার একটি অভিনব উদ্ভাবন। ১৮৬০ সালে রাবারশিল্প নিয়ে গবেষণা চালানোর সময় এর সূত্র পাওয়া যায়। তবে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৮৬৯ সালে।

চিউইং (chewing) শব্দের অর্থ চর্বণ বা চিবানো। মানুষের চিবানোর অভ্যাস থেকে চুইংগামের (বাংলায় এভাবেই আমরা বলে থাকি, যদিও ইংরেজিতে-এর উচ্চারণ 'চিউইংগাম') সৃষ্টি। চুইংগাম আবিষ্কারের আগে মেক্সিকো ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোকদের মধ্যে 'চিকল্' (chicle) নামের এক রকম জিনিস চিবানোর অভ্যাস ছিল। চিকল্ মধ্য-আমেরিকার সেপোডিলা (sapodilla) নামের এক গাছের ছাল থেকে তৈরি গাম। এই চিকল্ চিবানো থেকেই কালক্রমে চুইংগাম তৈরি হয় এবং চিকল্ই এখন চুইংগামের প্রধান কাঁচামাল। চুইংগামে মোটামুটি এ ধরনের অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান থাকে ২২% থেকে ২৫% গাম বেস, ৫০% থেকে ৬০% পাউডার চিনি, ১২% থেকে ২০% ভুট্টা সিরাপ এবং ১% থেকে ২% রঙ ও সুগন্ধদ্রব্য।

প্রথমে গামকে ধুয়ে সিদ্ধ করে গলিয়ে ফিল্টারের সাহায্যে শোধন করা হয়। তার পর এর সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকলে ধীরে ধীরে তা শক্ত এবং চিবানোর উপযোগী হয়ে ওঠে। এ জন্য তাপমাত্রা দরকার হয় ৭৯.৪° সেলসিয়াস (১৭৫° ফারেনহাইট)। ছাঁচের মধ্যে গাম ভালোভাবে জমাট বাঁধলে ঠাণ্ডা করে তা কাটা হয় এবং প্যাকেট করা হয়।

পৃথিবীতে নেদারল্যান্ডের মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি চুইংগাম খেয়ে থাকে। সেখানে বছরে মাথাপিছু ০.৯ কেজি (২ পা.) চুইংগাম বিক্রি হয়।

সুজ. ব.

চুন / চুনাপাথর (lime / limestone)

ক্যালসিয়াম অক্সাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম চুন। চুনাপাথর, খড়িমাটি প্রভৃতি পদার্থ হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বাতাসে চুনাপাথর বা খড়িমাটিকে দগ্ধ করলে চুন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস উৎপন্ন হয়। চুনে অপদ্রব্য হিসাবে সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, বালি, ফেরিক অক্সাইড প্রভৃতি থাকে। আমাদের দেশে শামুকের খোলা, ঝিনুক, ঘুঁটে ইত্যাদি পুড়িয়েও চুন উৎপাদন করা হয়। চুনের ঢেলাতে পানি দিলে চুন উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তখন যে কাদার মতো চুন পাওয়া যায় তাকে বলে কলিচুন। সিমেন্ট ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপাদনে চুনের ব্যবহার আছে। গন্ধক (দ্র)-চূর্ণের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় চুন কীটনাশকের (দ্র) কাজ করে। বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে, খর-পানিকে মৃদু করতে এবং কাঁচা চামড়া থেকে লোম তুলে ফেলতে চুন ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথরের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট। শামুক, ঝিনুক, গুগলি ও ডিমের খোলস প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। ঝিনুকের ভেতরে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাও ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতি প্রাচীন কালের সূক্ষ্ম সামুদ্রিক জীবের কঠিন খোলস জমে চুনাপাথরের সৃষ্টি হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মাটির নিচে চাপা থাকার ফলে অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে খোলসগুলি ভেঙে ও

একত্রিত হয়ে কঠিন চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। চুনাপাথর উচ্চ চাপ ও তাপে শক্ত মার্বেলপাথরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মার্বেল দেখতে সাদা, কিন্তু ধূসর বা কালো রঙেরও হতে পারে। পালিশ করলে মার্বেলপাথর খুব মসৃণ হয়। তাজমহল মার্বেলপাথর দিয়ে তৈরি। নরম ও দীপ্তিহীন চক বা খড়িমাটিও চুনাপাথর। চুনাপাথর ও মার্বেলপাথর কেটে অতি সুন্দর দালানকোঠা তৈরি করা যায়। চুনাপাথর ছাড়া সিমেন্ট তৈরি করা যায় না। চক, দাঁতের মাজন তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র চুনাপাথর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সিলেটে চুনপাথরের খনি (দ্র) আছে।

আ. হ. খ.

চুম্বক (magnet) www.boighar.com

কোনো কোনো বস্তুর বিশেষ ধরনের একটি বলের মাধ্যমে অন্য বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এ রকম বস্তুকে চুম্বক এবং বলটিকে চৌম্বক বল বলা হয়। একটি চুম্বক প্রধানত তার দু'টি প্রান্ত বা মেরু থেকে এক ধরনের বলক্ষেত্র চারিদিকে বিস্তৃত করে, যার মধ্যে এলে অন্য চুম্বক বা বিশেষ বিশেষ কিছু চৌম্বক পদার্থ প্রভাবিত হয়। এটি চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) নামে পরিচিত। আমাদের পৃথিবীরও এ রকম চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, যার প্রভাবে যে কোনো শলাকা আকৃতির চুম্বক অবাধে ঘোরার সুযোগ পেলে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে থাকে। কম্পাস (দ্র) নামে পরিচিত এ রকম শলাকা বহু কাল ধরে দিগ্‌দর্শনের কাজে মানুষকে সহায়তা দিয়ে আসছে, বিশেষ করে সমুদ্রে নাবিকদেরকে।

যে কোনো পদার্থের পরমাণুই (দ্র) আসলে একটি ছোট্ট চুম্বকের মতো। চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থের সামগ্রিক চৌম্বক-গুণ এই পারমাণবিক চুম্বকগুলোরই কিছু সম্মিলিত ফল। লোহা (দ্র), নিকেল (দ্র), কোবাল্ট এবং আরো কিছু ধাতু ও ধাতু-সঙ্করে এ রকম চৌম্বক-গুণ দেখা যায়। কিছু কিছু ধাতু অক্সিজেনের (দ্র) সঙ্গে মিশে ধাতব না হয়ে বরং সিরামিকের (দ্র) মতো পদার্থরূপে চৌম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়। ফেরাইট নামে পরিচিত এ রকম পদার্থের বহু আধুনিক ব্যবহার রয়েছে। কোনো কোনো চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব কঠিন প্রকৃতির– এদেরকে একবার চুম্বকে পরিণত করলে সে গুণ স্থায়ীভাবে থেকে

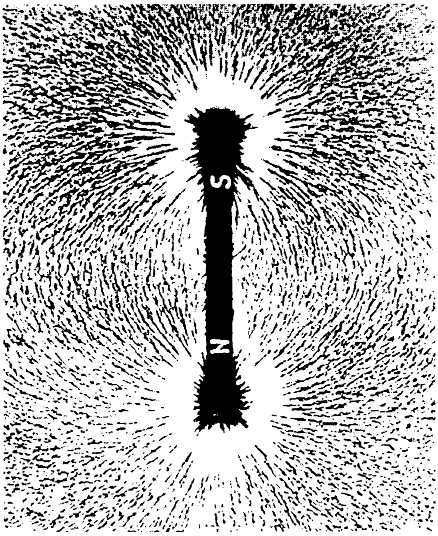

যায়। অন্য কোনো কোনোটির চুম্বকত্ব নরম প্রকৃতির– মূল উৎস সরিয়ে নিলে এটি চলে যায়। শক্তিশালী চুম্বকের কাছে এনে বা তার সঙ্গে ঘষে চুম্বক তৈরি করা যায়। একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটি চুম্বকের মতো আচরণ করে– এটি বিদ্যুৎচুম্বক। কুণ্ডলীর ভিতর কিছু নরম প্রকৃতির একটি চৌম্বক পদার্থ রাখলে বিদ্যুৎচুম্বক আরো প্রবল হয়। সব চুম্বকের দু'টি মেরু থাকে– উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। বিদ্যুৎপ্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে বিদ্যুৎচুম্বকেরও এই দু'টি মেরু থাকে।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব আসলে পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত– এরা পদার্থবিদ্যায় একই বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের দু'টি ভিন্ন প্রকাশ। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বর্তনীর তারের নড়াচড়া ঘটলে তাতে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। আবার চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তাতে নড়াচড়া বা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয়। এসব নিয়মের সুযোগে বিদ্যুৎ জেনারেটর, মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে, যা আধুনিক জীবনের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

চুম্বকের তীব্রতা মাপা হয় সাধারণত গাউস (gauss) এককে। একটি ছোট খেলনা-চুম্বকের তীব্রতা কয়েক গাউস হতে পারে। এ পর্যন্ত ১০০০ গাউসের মতো স্থায়ী চুম্বক ও ৩০,০০০ গাউসের মতো

বিদ্যুৎচুম্বক সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তবে ঝলকে ঝলকে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎচুম্বক আড়াই লক্ষ গাউস পর্যন্ত সৃষ্টি করা গেছে। সম্প্রতি আবিস্কৃত অপেক্ষাকৃত উচ্চ উত্তাপের বিদ্যুৎ অতিপরিবাহিতা ভবিষ্যতে শক্তিশালী চুম্বকের বড় বড় ব্যবহারের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। যেমন এর সাহায্যে অতি দ্রুত বেগে ভারী ট্রেন চালানো যেতে পারে।

মু. ই.

চুল (hair)

স্তন্যপায়ী প্রাণিদেহের ক্যারোটিনসমৃদ্ধ ত্বকের মধ্য থেকে সুতার মতো যেসব বস্তু বেরোয় সেগুলোকে লোম বলা হয়। সাধারণত মানুষের মাথায় গজানো লোম চুল হিসাবে পরিচিত। ক্যারোটিন ত্বকের উপরিপৃষ্ঠের অ্যালবুমেনসমৃদ্ধ পদার্থ। নখ, পালক ও লোম ইত্যাদিতে ক্যারোটিনের ভাগ বেশি থাকে। ক্যারোটিন আমিষ-দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে সালফার (দ্র) এবং সিটিন ও আরজিনিন নামের অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। চুলের রঙ কালো হয় ত্বকে মেলানিন নামক পদার্থ থাকার কারণে। চুলের গোড়া যা

ত্বকের মধ্যে থাকে তা-ই কেবল জীবন্ত। ত্বকের উপরের চুল মৃত। এর ফলে চুল বা লোম তাপ-অপরিবাহী। এ কারণে ঘন লোমশ প্রাণী শীতের আক্রমণ থেকে লোমের কারণে রক্ষা পায়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের দেহে ভ্রূণ অবস্থাতেই চুল গজাতে শুরু করে। কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তা ঝরে যায় এবং পরে ধীরে ধীরে গজাতে থাকে। পুরুষের মুখে দাড়ি গজায়। মহিলাদের সাধারণত দাড়ি গজায় না। দাড়ি এক প্রকার লোম। পুরুষের দেহে বিশেষ এক ধরনের হরমোন থাকে। এই হরমোনের কারণে দাড়ি গজায়। বৃদ্ধ বয়সে দেহের যাবতীয় চুল পেকে যায়। ত্বকে মেলানিন কমে যেতে থাকলে চুল সাদা হতে শুরু করে। অনেক সময় অল্প বয়সেও চুলের রঙ সাদা হয়ে যায়। এটি বংশগতির কারণে বা রোগের জন্য হতে পারে।

ত. চ.

চৌম্বক আবেশ (magnetic induction)

একটি চুম্বকের প্রভাবে (সান্নিধ্যে বা স্পর্শে) চৌম্বক পদার্থে সাময়িকভাবে চুম্বকত্বের সঞ্চার হওয়ার ঘটনাকে চৌম্বক আবেশ বলা হয়। যে চুম্বকের প্রভাবে চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্বের সঞ্চার হয় তাকে আবেশী চুম্বক এবং আবেশের ফলে যে চুম্বক তৈরি হয় তাকে আবিষ্ট চুম্বক বলে। চৌম্বক আবেশের ফলে আবেশী মেরুর নিকট প্রান্তে আবিষ্ট চুম্বকের বিপরীতমেরু এবং দূরতম প্রান্তে সমমেরু সৃষ্টি হয়। ভূ-চুম্বকের আবেশ দ্বারা কাঁচা লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে চৌম্বক মধ্যতলের সমান্তরালে কিছুদিন ফেলে রাখলে এতে চৌম্বকত্বের সঞ্চার হয়। দণ্ডের যে প্রান্ত ভৌগোলিক উত্তর দিকে থাকে সে প্রান্তে উত্তর মেরু, অপর যে প্রান্ত ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে থাকে সে প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সঞ্চার হয়।

শা. ত.

চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field)

চৌম্বক ক্ষেত্র বলতে সেই প্রভাববলয়কে বোঝায়, যেখানে কোনো চৌম্বক মেরু আকর্ষণ বা বিকর্ষণ অনুভব করে। চৌম্বক ক্ষেত্র বোঝাবার জন্য চৌম্বক বলরেখার ধারণা উদ্ভাবন করেন মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)। চৌম্বক বলরেখা চুম্বকের উভয় মেরু থেকে সূচিত হয়ে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছায় এবং চুম্বকের ভিতর দিয়ে উত্তর মেরুতে গিয়ে শেষ হয়। অর্থাৎ চৌম্বক বলরেখায় কোনো মুক্ত প্রান্ত নেই। এই বলরেখার দিক হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক এবং এই বলরেখার ঘনত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা নির্ধারণ করে।

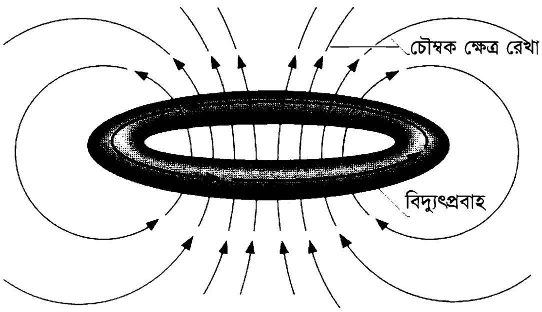

যে কোনো স্থায়ী চুম্বকের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এর তীব্রতা স্বভাবতই চৌম্বক মেরুর কাছে বেশি। কোনো তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ঘটিয়েও চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। এ ক্ষেত্রে চৌম্বক বলরেখাগুলো তড়িৎপ্রবাহের দিককে কেন্দ্র করে বৃত্ত সৃষ্টি করে। আমাদের পৃথিবী একটি চুম্বক বলে এর চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে।

আ. আ.

ছ

ছত্রাক (fungi)

ছত্রাক সমাঙ্গবর্গের এক প্রকার সরল দেহবিশিষ্ট উদ্ভিদ। এরা নানান ধরনের বহুবিধ জীবের একটি বড় দল। এদের আকারও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এদের কোনোটি অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, আবার কোনোটি অনেক বড় আকারের হয়ে থাকে। এরা বাস করে মাটিতে, পানিতে এবং জীবিত ও মৃত জৈব পদার্থ-সমৃদ্ধ পরিবেশে। এরা বাতাসেও বাস করে। এদের প্রজাতির সংখ্যা ১০,০০০।

ছত্রাকের প্রকৃত মূল, কাণ্ড এবং পাতা নেই। এদের দেহে ক্লোরোফিলও (দ্র) নেই। তাই এরা নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এরা পরজীবী (দ্র) এবং মৃতজীবী হিসাবে বাস করে। কোনো কোনো ছত্রাক এককোষী, কোনোটি আবার বহুকোষী। বেশির ভাগ ছত্রাকের দেহ চিকন সুতার মতো অংশ দিয়ে গঠিত। এগুলোকে 'হাইফা' (hypha) বলে। অনেকগুলো 'হাইফা' একত্রে সূক্ষ্ম নলের মতো দেখালে তাকে 'মাইসেলিয়াম' (mycelium) বলে। জীবিত বা মৃত দেহে যেখানেই ছত্রাক জন্মায় সেখানেই মাইসেলিয়াম ছড়িয়ে পড়ে এবং খাদ্য শোষণে সহায়তা করে। ছত্রাকের পরিবহণতন্ত্র নেই। দেহের গঠন অনুসারে ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ চার শ্রেণিতে বিভক্ত- ১. ফিকোমাইসিটিস, ২. অ্যাসকোমাইসিটিস, ৩. ব্যাসিডিওমাইসিটিস ও ৪. ফানজাই ইম্পারফেক্টি।

আণুবীক্ষণিক ছত্রাকদল 'ঈস্ট' এবং 'মোল্ড' বা ছাতা- এ দু' ভাগে বিভক্ত। পাউরুটি তৈরিতে ঈস্ট

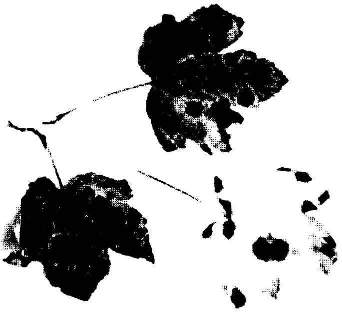

ব্যবহৃত হয়। মোল্ড তিন ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে মিলডিউ, স্মাট এবং রাস্ট। কোনো কোনো উদ্ভিদনাশক মিলডিউ কাপড়চোপড়, ভেজা জায়গা ও খাদ্যদ্রব্যের উপর জন্মে। স্মাট ও রাস্ট বেশ কিছু উঁচু স্তরের উদ্ভিদে রোগের কারণ ঘটায়। অপরাপর বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণের কারণে জীবদেহে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে পেনিসিলিয়াম (penicillium) জাতীয় ছত্রাক থেকে জীবন রক্ষাকারী পেনিসিলিন ঔষধও পাওয়া যায়।

কিছু কিছু ছত্রাক পুষ্টিকর আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে অ্যামানিটাসহ কয়েক প্রকার ব্যাঙের ছাতা (দ্র) ভয়ানক বিষাক্ত। বিশেষ করে যেসব ব্যাঙের ছাতায় দুধের মতো রস থাকে এবং যেগুলো খুব রঙিন হয় সেগুলো বিষাক্ত। এ ছাড়া যেসব ছত্রাক কাটলে কাটা অংশ দ্রুত নীল হয়ে যায় এবং যেগুলোর দেহে আঁশ থাকে সেগুলোও বিষাক্ত হয়ে থাকে।

মু. আ.

ছাতিম (devil's tree)

Apocyuaceae গোত্রভুক্ত। ছাতিম গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Atstonia scdholaris* (L.) R. Br। ছাতিম দীর্ঘাকৃতি চিরসবুজ বৃক্ষ যার সারা দেহে দুধসাদা কষ পাওয়া যায়। ছাতির মতো আকৃতিসম্পন্ন বলেই এর এই বাংলা নাম ছাতিম। ছাতিমের ডালপালা এমনভাবে ছড়ানো থাকে যাতে কয়েকটি ছাতা একের পর এক উপরে উপরে জোড়া দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। এর সরল উন্নত কাণ্ড কিছুদূর ওপরে উঠে হঠাৎ শাখা-উপশাখায় একটি ঘন আবরণ তৈরি করে যেন সেটি একটি ছাতা; আবার একলাফে মূল কাণ্ডটি কিছুদূর সোজা উঠে গিয়ে একই রকমে ডালপালা ছেড়ে ছাতার মতো হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি পত্রঘন চন্দ্রাতপ সৃষ্টি করে। পাতাও ঠিক একইভাবে শাখায় বিন্যস্ত। সাধারণত হেমন্তের শেষে এর ফুল ফোটে। ফুলগুলো সবুজ ও সাদা। দেখতে আহামরি কিছু না হলেও মঞ্জরি দেখতে সুন্দর। এর ফুলে মাদকতাময় সুগন্ধ রয়েছে। ফলগুলো সরু, লম্বা এবং ফুলের মতোই পুরো গাছে ধরে থাকে। ফুলের নিচের অংশ নলাকৃতি এবং নলমুখের পাঁচটি পাপড়ি ঈষৎ বাঁকানো। এর কাঠ তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও তা দিয়ে গৃহস্থালির বহু কাজ করা হয়, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ব্লাকবোর্ডের জন্য এ কাঠ উৎকৃষ্ট। এর ভেষজ মূল্য অনেক। ছাতিমের ছাল ও আঠা জ্বর, হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি, ক্ষত, আমাশয় ও কুষ্ঠে উপকারী। দাঁতের বেদনা নাশেও সক্ষম। ছাতিম ফুলের উপক্ষার 'পিক্রিনিন' মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

শা. আ.

ছায়াপথ (the milky way)

শীতের অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের বুকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক দীর্ঘ নক্ষত্রখচিত পথ দেখা যায়। অন্ধকার আকাশে দীপ্তিমান পথের মতো দেখায় বলে প্রাচীন কালে একে ছায়াপথ (the milky way) বলা হত। 'মিল্কি ওয়ে' শব্দটি অবশ্য গ্রিক গ্যালাক্সি (দ্র) শব্দের অর্থ। পরবর্তী কালে জানা যায়, ওই ছায়াপথ আসলে আমাদের গ্যালাক্সিরই অংশবিশেষ। এর পর আমাদের গ্যালাক্সিকে বোঝানোর জন্যও ছায়াপথ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ছায়াপথ মহাশূন্যকে একটি মহাবৃত্তের মতো বেষ্টন করে রেখেছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা এটিকে 'সুরগঙ্গা', 'আকাশগঙ্গা', 'স্বর্গগঙ্গা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেন।

আমাদের ছায়াপথ হল স্থানীয় গ্রুপ (local group) নামে একটি গ্যালাক্সি-ঝাঁকের সদস্য। এই ছায়াপথে রয়েছে প্রায় $১০^{১১}$ টি নক্ষত্র।

ছায়াপথের গঠন অনেকটা ডিসকাস থ্রো খেলার চাকতির মতো– মধ্যস্থলে স্ফীত এবং বাইরের দিকে পাতলা হতে হতে সর্পিল বাহুর আকৃতিতে শেষ হয়েছে। এই চাকতির সর্বমোট ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ (দ্র) এবং এর গড়পড়তা পুরুত্ব ১,৭০০ আলোকবর্ষ। তবে কেন্দ্রস্থলে এর ঘনত্ব অনেক বেশি, প্রায় ১৬,০০০ আলোকবর্ষ। ধারণা করা হয়, ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশাল কৃষ্ণবিবর (দ্র)। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে পরিধির দুই-তৃতীয়াংশ দূরে সৌরজগতের অবস্থান। এই স্থানে ছায়াপথের চাকতির পুরুত্ব প্রায় ২,৬০০ আলোকবর্ষ। সূর্য (দ্র) তার গ্রহপরিবারসহ প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ কিলোমিটার বেগে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে।

মু. হা.

জ

জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার [১৮৫৯-১৯৩৭]

একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী। ১৮৫৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে এবং পরে কলকাতার 'সেন্ট জেভিয়ার্স' স্কুল ও কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৮০ সালে বি.এ. পাশ করার পর ঐ বছরই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ইংল্যান্ডে তাঁর শিক্ষাকাল ছিল ১৮৮০-৮৪ সাল। ঐ সময়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. অনার্স পাশ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এসসি. উপাধি লাভ করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাকাল তিন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় ১৮৯৫-৯৯ সাল, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯০০-১৯০২ সাল এবং তৃতীয় পর্যায় ১৯০৩-৩২ সাল। তাঁর পর্যায়ভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, জৈব ও অজৈব পদার্থের উত্তেজনার প্রতি সাড়া প্রদানের ক্ষমতা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশির মধ্যে তুলনামূলক শারীরবৃত্ত। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার পর দু' বছরের মধ্যে (৩০শে নভেম্বর, ১৯১৭) তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম ভারতীয় যিনি ১৯০২ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে 'নাইট' উপাধিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.এসসি. উপাধিতে ভূষিত হন। জগদীশচন্দ্র বসু বেশ কিছু নতুন গবেষণাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এগুলোর মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য 'ক্রেস্কোগ্রাফ' আবিষ্কার এবং অতি সীমিত মাত্রায় নড়াচড়াকে এক কোটি গুণ বিবর্ধন

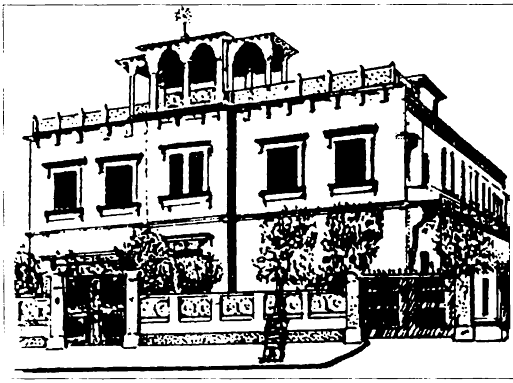

বসুমন্দির, কলকাতা

করে দেখানো উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি ঘুম, বাতাস, খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতির প্রভাব প্রদর্শনের জন্য যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু একজন সমাজকর্মী ছিলেন। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা রচনাবলি 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

মু. আ.

জড় / জড়তা (inertia)

বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা সেই অবস্থা বজায় রাখতে

চাওয়ার যে ধর্ম তাকে জড়তা বলে। জড়তা দু' রকমের– ক. স্থিতি জড়তা, খ. গতি জড়তা।

স্থিতিশীল বস্তুর চিরকাল স্থির থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা স্থিতি বজায় রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে স্থিতি জড়তা বলে। থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে স্থিতি জড়তার কারণে বাসযাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন। বাস যখন থেমে থাকে তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। সেই বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাস-সংলগ্ন অংশ গতিশীল হয়, কিন্তু শরীরের উপরের অংশ স্থিতি জড়তার জন্য স্থির অবস্থায় থাকতে চায়। তাই শরীরের নিচের অংশ উপরের অংশ থেকে পিছিয়ে পড়ে; ফলে যাত্রী পেছনের দিকে হেলে পড়েন।

গতিশীল বস্তুর চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা একই গতি অক্ষুণ্ন রাখতে চাওয়ার যে ধর্ম তাকে গতি জড়তা বলে। চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। চলন্ত অবস্থায় বাসের সাথে সাথে যাত্রীও একই গতি প্রাপ্ত হয়। সেই বাস হঠাৎ থেমে গেলে বাসের সাথে সাথে যাত্রীর শরীরের নিচের অংশও স্থির হয়, কিন্তু শরীরের উপরের অংশ গতি জড়তার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

শা. ত.

জন্ডিস (jaundice)

শরীরের জলীয় অংশে এবং রক্তে বিলিরুবিন (bilirubin) নামক পিত্ত-উপাদানের আধিক্যের কারণে শরীরের ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি (mucous membrane) হলুদ বর্ণ ধারণ করার ফলে সৃষ্ট রোগের নাম জন্ডিস। একে বাংলায় পাণ্ডুরোগ, কামলারোগ, ন্যাবা বলা হয়।

যে সকল কারণে শরীরে বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেগুলো হল রক্তে লোহিতকণিকা ভাঙনের ত্রুটি, বিভিন্ন ঔষধের প্রতিক্রিয়া, কোনো কোনো রোগসংক্রমণ (যেমন ম্যালেরিয়া), ভাইরাসঘটিত যকৃতপ্রদাহ, পিত্তনালিতে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি '। জন্ডিস রোগের ফলে ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লি হলুদ হয়ে যাওয়া ছাড়াও প্লীহার (দ্র) আকৃতি বৃদ্ধি, প্রস্রাবের গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ, রক্তাল্পতা, ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

জন্ডিস রোগীদের জন্য দরকার যথেষ্ট বিশ্রাম, প্রচুর পরিমাণে পানি পান, যথেষ্ট শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ আর চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন।

সি. না. হ.

জবা (chira-rose)

Malvaceae গোত্রভুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Hibiscus rosa-sinensis*। এর উচ্চতা সাধারণত ২-৩ মিটার হয়ে থাকে। জবা গাছে অনেক ডালপালা হয়। পাতা খানিকটা ডিম্বাকৃতি, তবে অগ্রভাগ কিছুটা সরু। পাতার দুই ধার করাতের মতো খাঁজ-কাটা। এ জবা চীন দেশ থেকে এ দেশে আনা হয়েছে।

H. Schizopetalus, Hooke 'ঝুমকো জবা' নামে পরিচিত। এ জবা আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছে। জবার আরো অনেক জাত আছে। দাবাকলম, চোখকলম, গুটিকলম ও কাটিং দ্বারা জবার বংশ বৃদ্ধি করা যায়। জবা ফুলের রঙ সচরাচর লাল হয়। তবে কিছু জবা হালকা বেগুনি, সাদা এবং হলুদ বর্ণেরও হয়ে থাকে। ফুলের বাগানে, পরে দুই ধারে এবং ঘেসো আঙিনার মধ্যে জবা গাছ লাগালে ভালো দেখায়।

মু. আ.

জলপাই (olive tree)

আমাদের জলপাই-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Elaeocarpaceae* যা Elaeocarpaceae গোত্রের

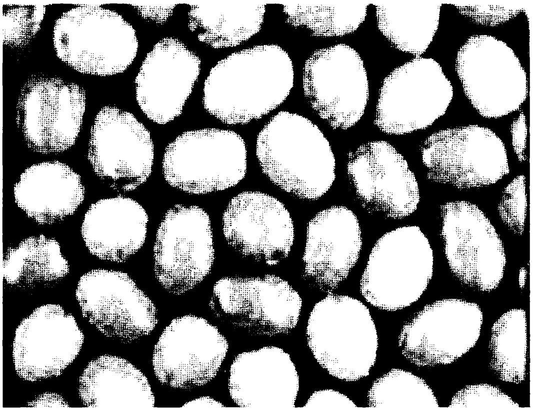

জলপাই ফল

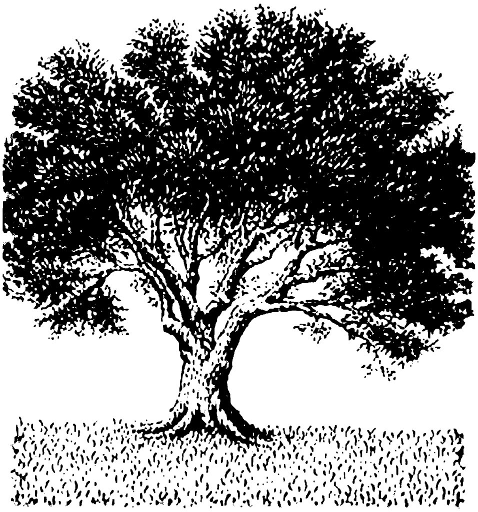

জলপাই গাছ

অন্তর্ভুক্ত। এর ফুল ছোট ছোট, গাছ মধ্যমাকৃতির। পাতা একক, ছোট, কিছুটা লিচু পাতার মতো। ফল মসৃণ, ডিম্বাকৃতি, সবুজ এবং অলিভের মতো দেখতে। সে জন্য এদেরকে ইন্ডিয়ান অলিভও বলা হয়। পাথরের মতো শক্ত বীজের পেটটি মোটা, দু'মাথা সরু, প্রায় সুচালো। বীজকে আবৃতকারী মাংসল ফলত্বক কিছুটা অম্ল স্বাদের। এর ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারির সঙ্গে বা ডালের সঙ্গে রান্না করা হয়। জলপাই ফল দিয়ে আচারও তৈরি করা হয়। জলপাই থেকে তেল পাওয়া যায়, তবে দেশি জলপাইতে তেলের পরিমাণ খুব কম। জলাবদ্ধ হয় না এমন উঁচু দোআঁশ বা এঁটেল-দোআঁশ মাটি জলপাই চাষের উপযোগী।

শা. আ.

জলবায়ু (climate)

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার বহুবিধ অবস্থার গড়পড়তা হিসাবকে জলবায়ু বলা হয়। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ু (দ্র) ও বায়ুচাপ (দ্র) প্রভৃতি জলবায়ু বিষয়ক নানা প্রকার অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে অক্ষাংশের গুরুত্বও যথেষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তাকারী অন্য প্রভাবকগুলো হচ্ছে– ক. এলাকাটির অবস্থান বা সমুদ্র থেকে এর দূরত্ব, খ. সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা, গ. ভূ-সংস্থান, ঘ. বায়ুপ্রবাহের দিক, ঙ. সামুদ্রিক স্রোত এবং ঘূর্ণিঝড়।

উক্ত প্রভাবকগুলোর কারণে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। অক্ষাংশ এবং অন্যান্য প্রকৃতি নির্ধারণী প্রভাবকের ভিত্তিতে জলবায়ু চার ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে– মহাদেশীয় জলবায়ু, সামুদ্রিক জলবায়ু, উপকূলীয় জলবায়ু এবং পর্বতমালা ও মালভূমির জলবায়ু।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও সব সময় সমান থাকে না। আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত হয়। বার্ষিক গতির ফলে ঋতু বদলায়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতু বদলায় একইভাবে। তবে উভয় গোলার্ধের ঋতুকাল বিপরীত, অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পর বিভিন্ন বায়ুস্তরে সূর্যের যে কিরণ প্রবেশ করে, জলবায়ুর উপর তার সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুস্তরের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কারণে সৌর তাপেরও পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবী যে তাপশক্তি বিকিরণ করে, তার বহুলাংশই মেঘ ও জলীয় বাষ্পে আটকা পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে তার অনেকাংশ অবশ্য আবারও পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট উচ্চমান বজায় থাকে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে কয়েক প্রকার বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু ও আকস্মিক বায়ু। আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুপ্রবাহ হচ্ছে নিয়ত বায়ুর আওতাভুক্ত। তেমনি সাময়িক বায়ু-

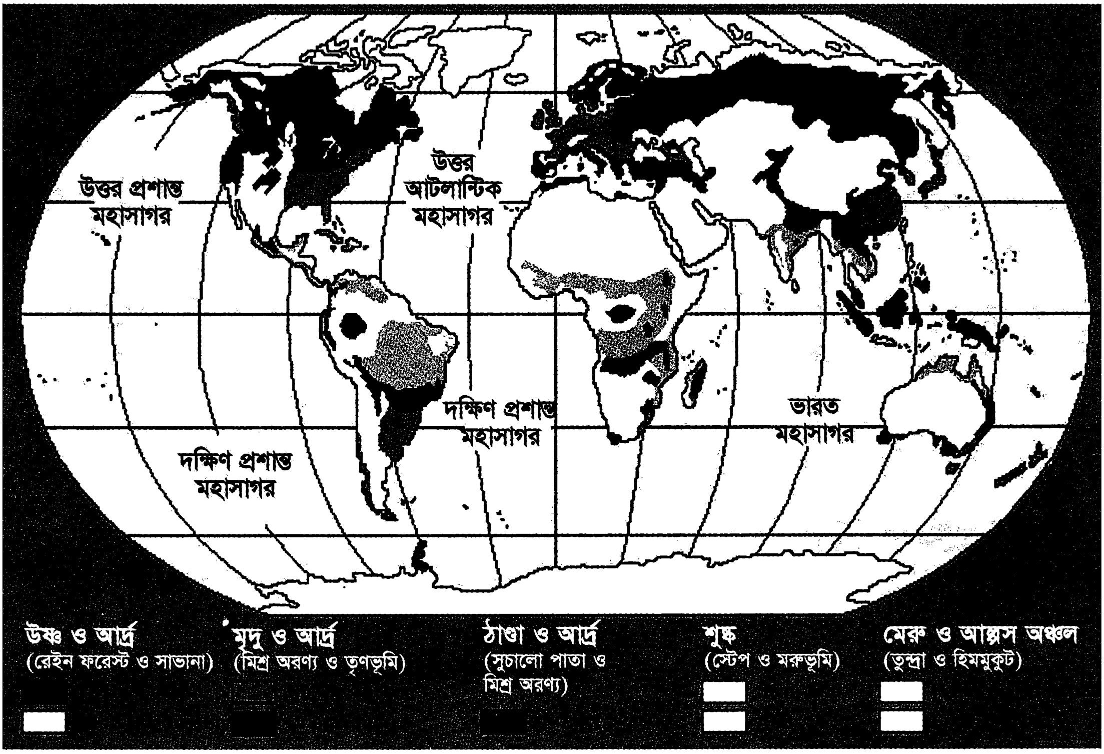

প্রবাহের আওতাভুক্ত হচ্ছে মৌসুমি বায়ু, স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু। আকস্মিক বায়ুপ্রবাহের আওতায় পড়ে কালবৈশাখী, আশ্বিনের ঝড়, হারিকেন, টাইফুন, টর্নেডো, ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত।

নিয়ত, সাময়িক ও আকস্মিক বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

মু. আ.

জলবায়ু-অঞ্চল (climate-zone)

পৃথিবীর জলবায়ু-অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তবে অঞ্চলের কোনোটিরই কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং তা নির্ধারণ করাও যায় না। কারণ যে কোনো একটি জলবায়ু-অঞ্চল ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন জলবায়ু-অঞ্চলকে রাজনৈতিকভাবেও কোনো সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না। যে কোনো একটি দেশের ভিতরে একের চেয়েও বেশি জলবায়ু-অঞ্চল থাকতে পারে। আবার যে কোনো জলবায়ু-অঞ্চলের ভিতরের জলবায়ুগত কিছুটা তারতম্যও থাকতে পারে। সাধারণভাবে পৃথিবীর জলবায়ু-অঞ্চলকে প্রধা ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. সমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল পৃথিবীর যেস অঞ্চলের জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মের তেমন কোনে প্রচণ্ডতা নেই, সেসব অঞ্চলকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

২. চরমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল যেসব অঞ্চলে জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়ে থাকে, সেসব অঞ্চলবে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু-অঞ্চল বলে। মহাদেশে মধ্যভাগে এ ধরনের জলবায়ু অনুভূত হয় বলে এর অপ নাম মহাদেশীয় জলবায়ু-অঞ্চল।

৩. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু-অঞ্চল যেসব অঞ্চলে জলবায়ু তেমন বেশি গরমও নয় আবার ঠাণ্ডাও নয় সেসব অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু-অঞ্চলে আওতাভুক্ত।

৪. আর্দ্র জলবায়ু-অঞ্চল যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেসব অঞ্চল আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের আওতাভুক্ত।

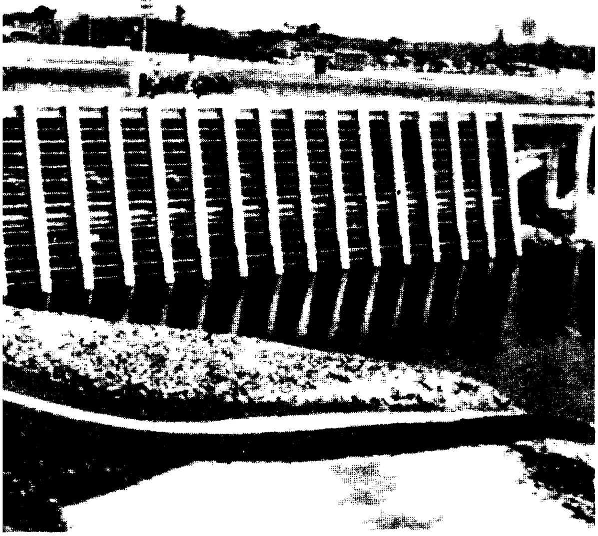

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলি বাঁধ

৫. শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের যে অঞ্চলগুলোতে মোটেও বৃষ্টিপাত হয় না, সেসব অঞ্চল শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৬. সামুদ্রিক জলবায়ু-অঞ্চল সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর অপর নাম সামুদ্রিক জলবায়ু-অঞ্চল।

মু. আ.

জলবিদ্যুৎ (hydroelectric power)

পানির প্রবাহের শক্তিকে ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলা হয়। জলবিদ্যুতের উৎস আসলে বলা যায় সূর্য (দ্র)। সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘ (দ্র) থেকে যে বৃষ্টি হয়, তার বেশির ভাগ সমুদ্রে পড়লেও কিছু মেঘ উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায় অথবা পর্বতচূড়ায় তুষারপাত ঘটায়। উচ্চভূমি থেকে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি, অথবা পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা বরফগলা পানি গতিশক্তি লাভ করে। টারবাইন (দ্র) ব্যবহার করে পানির গতিশক্তিকে ব্যবহার করা হয় জেনারেটরে লিফ্‌ট্‌ ঘোরাবার কাজে। এভাবেই পানির যান্ত্রিক শক্তি জেনারেটর দ্বারা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বলতে পারি, জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি হচ্ছে পানিচক্রের ফলে। অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তি সমুদ্রের পানিকে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ায় বা উচ্চভূমিতে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে। এখানে পানির মধ্যে যে যান্ত্রিক শক্তি জমা হচ্ছে তাকে জেনারেটর রূপান্তরিত করছে বিদ্যুৎশক্তিতে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কয়লা (দ্র) বা তেল পোড়াতে হচ্ছে না, এই শক্তির উৎস নিঃশেষ হবে না– অন্তত যত দিন সূর্য থাকবে এর প্রখরতা নিয়ে, সেই সঙ্গে আমাদের সমুদ্র ও পাহাড়। এ জন্য জলবিদ্যুতের শক্তিকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। জলবিদ্যুৎ শুধু সেখানেই উৎপন্ন করা যায়, যেখানে প্রাকৃতিক ভূ-বিন্যাস জলস্রোত সৃষ্টি করে। অনেক সময় পাহাড়ের পাশে জলাশয় থাকলে বা কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করলে তা জলবিদ্যুতের উৎসরূপে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে কাপ্তাইয়ে এমনি বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

আ. আ.

জলহস্তী (hippopotamus)

জলহস্তী স্থলভাগের বড় বড় স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্থলভাগের প্রাণী হলেও এরা জলাশয়ে থাকাই অধিক পছন্দ করে। আসলে এরা উভচর স্বভাবের। জলহস্তীর দেহ দেখতে অনেকটা বিশাল আকারের তেলের পিপার মতো। মাংসল দেহ। দেহের আকার অনুপাতে পা বেশ ছোট। পাগুলো অনেকটা দালানবাড়ির থামের মতো। লেজ খুবই ছোট। ওদের মাথা চার-কোনাকৃতির। ঠোঁট-জোড়া স্থূল ভোঁতা ধরনের। মুখের হাঁ বিশাল। নিচের ঠোঁটের দুই কোনায় দুটো বড় দাঁত দেখা যায়। কান আকারে ছোট এবং ত্রিকোনাকৃতির। জলহস্তী দেখতে প্রায় হাতির মতো, কিন্তু জলেতেই প্রায় সময় দেখা যায় বলে হয়তো বাংলায় এর নাম হয়েছে জলহস্তী। ওরা জলে ডুবে থাকে, কিন্তু নাক রাখে জলের বাইরে। দিনের প্রায় পুরো সময় জলহস্তী ডুবো জলে বিচরণ করে। কাদাযুক্ত জলাশয়ে থাকাও এদের খুব পছন্দ। ওরা উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। পানিতে জন্মানো উদ্ভিদেই রুচি বেশি। জলহস্তীর মুখের বিশ্রাম নেই। সারাদিনই চিবায়। দিন শেষে ডাঙায় ফেরে। মাদি জলহস্তী বছরে একটি বাচ্চা প্রসব করে। জলহস্তীর আদি নিবাস আফ্রিকায়। এদের গড় আয়ু ১৫ থেকে ২০ বছর।

ত. চ.

জলহস্তী, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হিপোপটেমাস

জলাতঙ্ক (rabies, hydrophobia)

এক প্রকার ভাইরাসের সংক্রমণে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। এই অসুখে রোগী জল দেখলেই ভয় পায়, পান করা তো দূরের কথা। জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণী মানুষকে কামড়ালে মানুষের শরীরে জলাতঙ্ক রোগের অণুবীজ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা না করানো হলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত। জলাতঙ্কে আক্রান্ত প্রাণী (বিশেষ করে পাগলা কুকুর) কাউকে কামড়ালে ক্ষতস্থান পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট অথবা ওষুধযুক্ত সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। উক্ত প্রাণীটিকে আটকে রেখে দশ দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রাণীটি যদি সত্যিকার অর্থেই রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে, তা হলে এর মধ্যে রোগের বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা দেয় এবং প্রাণীটি অবশেষে মারা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাণীটির কামড়ে আক্রান্ত মানুষকে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া শুরু করতে হবে। যে প্রাণীটি কামড়েছে তাকে আটক করা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আক্রান্তকে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া আবশ্যক। জলাতঙ্কের প্রতিষেধক হিসাবে 'অ্যান্টি-র্যাবিস ভ্যাকসিন' (Anti-Rabies Vaccine) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সি. না. হ.

জাইরোস্কোপ (gyroscope)

ঘূর্ণনশীল বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে গেলে আমরা বাধা অনুভব করি। অর্থাৎ বস্তুর রৈখিক গতির যেমন একটি জড়তা আছে, এর ঘূর্ণনগতিরও পৃথক একটি জড়তা আছে। ঘূর্ণনগতির এই জড়তাকে ভিত্তি করে জাইরোস্কোপ নির্মিত হয়।

জাইরোস্কোপ হচ্ছে একটি ভারী চাকা, যা এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে যে কোনো অক্ষের উপরে এটি পাক খেতে পারে। এই চাকা, ঘূর্ণনজড়তার কারণে যে দিকে প্রথমে একে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, সেই

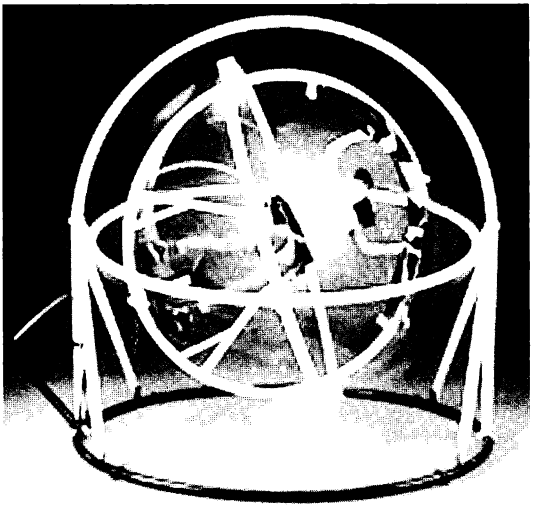

ঘূর্ণনগতি বজায় রাখবে। জাইরোস্কোপের এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে জাইরোকম্পাস নির্মিত হয়েছে, যা জাহাজ বা প্লেনে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিকভাবে একটি চাকাকে ঘূর্ণনশীল অবস্থায় রাখা হয়। ঘূর্ণনজড়তার কারণে এই জাইরোকম্পাস সব সময়ই সত্যিকার উত্তর দিকে মুখ করে থাকে এবং জাহাজের গতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

জাইরোস্কোপের আর একটি ব্যবহার হচ্ছে জাইরো-পাইলট দিয়ে কোনো জাহাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালনা করা। জাহাজ যদি চলার পথে দিক হারিয়ে ফেলে বা দিক বদলায়, জাইরো-পাইলট তা সংশোধন করতে পারে। কারণ জাইরোস্কোপটি ঘূর্ণনগতির জড়তার জন্য পূর্বের নির্দিষ্ট দিকেই থেকে যায়। ফলে জাহাজ কতটা দিকপরিবর্তন করেছে তা জানা যায়। জাইরো-পাইলট এই বিচ্যুতি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী মোটরকে সঙ্কেত দেয় এবং তা জাহাজের হালকে সেইভাবে ঘুরিয়ে দেয়।

আ. আ.

জাইলেম কলা (xylem tissue)

উদ্ভিদদেহের এক ধরনের জটিল কলা। এটি উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদানকারী অন্যতম প্রধান অংশ। খাদ্যদ্রব্যের উপাদানসমূহ মূল থেকে পাতায় পরিবহণ করাও এর কাজ। জাইলেম কলা চারটি উপাদানে গঠিত। এগুলো হচ্ছে : ট্রাকিড, ট্রাকিয়া বা ভেস্‌ল্‌, জাইলেম ফাইবার ও জাইলেম প্যারেনকাইমা।

ক. ট্রাকিড (tracheid) এক জাতীয় দীর্ঘ, মৃত ও বড় গহ্বরযুক্ত কোষ। পরিণত অবস্থায় এগুলোর প্রোটোপ্লাজম থাকে না। কোষগুলো পরস্পর প্রান্তে প্রান্তে যুক্ত হয়ে পরিবহণের পথ তৈরি করে। ট্রাকিডের কাজ উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা এবং পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ দ্রব্যসমূহ মূল থেকে পাতায় পরিবহণ করা।

www.boighar.com

খ. ট্রাকিয়া বা ভেসল্‌ ট্রাকিয়া আবৃতবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলার প্রধান উপাদান। সাধারণত এ

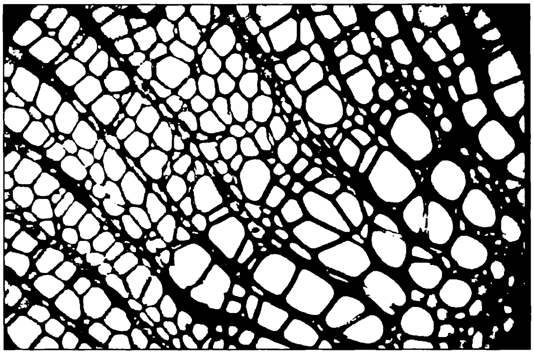

জাতীয় কোষগুলো মোটা ও খাটো এবং এগুলোর ভেতরটা ফাঁপা। এরা একটির সঙ্গে আরেকটি মাথায় মাথায় যুক্ত হয়ে লম্বা ফাঁপা নালিকা তৈরি করে। পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল থেকে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে পরিবহণ করাই এদের কাজ।

গ. জাইলেম ফাইবার (xylem fibre) : জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা জাতীয় কোষগুলো জাইলেম ফাইবার নামে পরিচিত। এদের প্রাচীর পুরু। এরা দীর্ঘ এবং এদের প্রান্ত চোখা। পরিণত অবস্থায় এদের প্রোটোপ্লাজম থাকে না। তাই এরা মৃত কোষ। এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত। এদের উড ফাইবারও বলা হয়।

ঘ. জাইলেম প্যারেনকাইমা (xylem parenchyma) জাইলেম কলায় বিদ্যমান প্যারেনকাইমা-কোষই জাইলেম প্যারেনকাইমা। জাইলেম কলার এ কোষগুলোই কেবল জীবিত। এদের উড প্যারেনকাইমাও বলা হয়।

ফাইবার ও প্যারেনকাইমা উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দান করে।

মু. আ.

জাতিতত্ত্ব (ethnology)

মানবকুলের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কেউ কেউ সকল মানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন, আর কেউ মনে করেন আলাদা আলাদা জীব থেকে উৎপত্তি। ফ্রেনজ ওয়েডেনরেখ মনে করেন আধুনিক জাতিগুলোর উৎপত্তি স্থানীয় নিয়ানডার্থাল মানুষ থেকে, যারা ইউরোপ, পূর্ব-এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় আলাদা আলাদাভাবে ছড়িয়ে ছিল। অপর মতে, ক্রোমাগনন ক্রোম্যানিয়ক মানুষের উদ্ভব হয়েছে কোনো নিয়ানডার্থাল-পূর্বপুরুষ থেকে, যারা আবার উদ্ভূত হয়েছিল প্রাচীন মানবসদৃশ কোনো জীব থেকে। সাধারণভাবে বর্তমানে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা ধরনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সকল মানুষ হোমো সেপিয়ান্স অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রজাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বাইরের আপাত কিছু বৈশিষ্ট্য ও ব্যতিক্রম ছাড়া মূল মানবিক বিষয়ে সব মানুষই এক রকম। প্রকৃতপক্ষে, এক দল মানুষ অন্য দল মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যই বিভাজিত তত্ত্বের উদ্ভাবন করে, যেমন করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের আগে জার্মানির নাৎসি নেতা হিটলার।

সৈ. আ. ই.

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান (দ্র) বিষয়ে বাস্তব ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্য থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত।

সাবেক পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৬৫ সালের ২৬শে এপ্রিল গৃহীত এক সিদ্ধান্ত বলে ঢাকা ও লাহোরে একটি করে বিজ্ঞান জাদুঘর স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে ১৯৬৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে এই জাদুঘরের কাজ শুরু হয় এবং ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর এই প্রকল্পের অফিসার-ইন-চার্জ নিযুক্ত হন।

১৯৭০ সালে এই জাদুঘর পাবলিক লাইব্রেরি ভবন থেকে প্রথমে ঢাকার শ্যামলীবাগে, সেখান থেকে

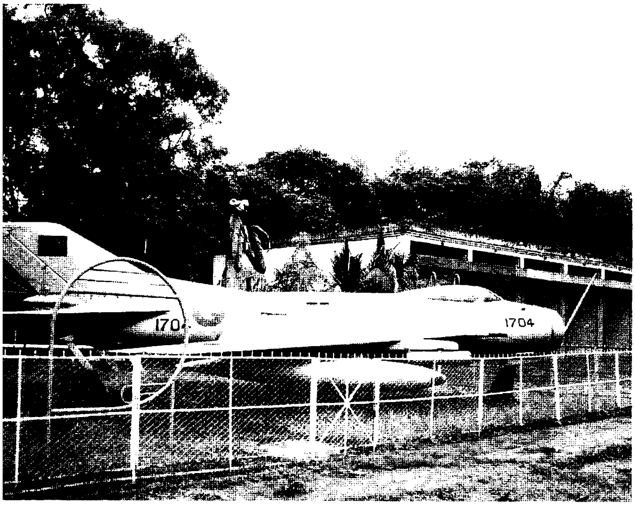

১৯৭১ সালের ১৬ই মে ধানমন্ডির ১ নম্বর সড়কে ও পরে ১৯৭৬ সালের ১লা আগস্ট ৬ নম্বর (ধানমন্ডি) সড়কে স্থানান্তরিত হবার পর অবশেষে শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ের বর্তমান স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং এর পূর্বতন নাম পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণ করে নতুন নাম 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' (National Museum on Science and Technology)। পাঁচ একর জমির ওপর নির্মিত এই জাদুঘরে চারটি গ্যালারি রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় নির্বাহ করা হয় প্রশাসনিক কাজকর্ম। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচি মূল্যায়ন কমিটি (পি ই সি) অনুমোদিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। একজন পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

এই জাদুঘরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয় তার পরিপূরক হিসাবে কাজ করা, সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে বিজ্ঞানের দান ও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা এবং শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানধর্মী ও উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া।

জাদুঘরটির উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে এর গ্যালারিগুলো একক বা দলগত পরিদর্শনের ব্যবস্থা, নিয়মিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা শোনানোর ব্যবস্থা ও শো'র প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার, আলোচনাসভা ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান, প্রতি বছর দেশব্যাপী জেলাভিত্তিক এবং পরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানসপ্তাহ পালনের কার্যক্রম, বিজ্ঞান-আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্ভাবক ও বিজ্ঞান ক্লাবকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, এর একটি প্রশস্ত কক্ষে স্থাপিত পাঠাগার ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষানুরাগীদের সুযোগ প্রদার্ন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে টেলিস্কোপের সাহায্যে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ ও প্ল্যানেটেরিয়াম (দ্র) শো'র ব্যবস্থা। এ ছাড়াও এই জাদুঘরের তরফ থেকে দু'টি সাময়িকী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সাময়িকী দু'টি হচ্ছে ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী'

ও 'উদ্ভাবন'। এর পাশাপাশি জাদুঘরের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে 'তরুণ বিজ্ঞানী প্রকল্প উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প। সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিভাবান উদ্ভাবক ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের আরো উন্নতি সাধনে তাদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য প্রদান করা এবং একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অধীনে তাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া।

এই জাদুঘরে প্রদর্শিত প্রায় এক হাজার নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েক জন বিজ্ঞানীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও দলিলপত্র, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তু ডাইনোসরের (দ্র) অবিকল মূর্তি, বহু পুরাতন বিমানের ইঞ্জিন, ঝুলন্ত সেতু, পাকশি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মডেল, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি।

আ. হু.

জাফরান (saffron)

পেঁয়াজের মতো পাতা ও কাণ্ডবিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী গুল্ম। মাটির নিচে মূলে কন্দ ও অনেক শেকড় থাকে। অন্য নাম কুমকুম বা কুঙ্কুম। বৈজ্ঞানিক নাম *Crocus sativus* Linn, গোত্র Iridaceae। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এই গুল্মের ৬০টি প্রজাতি বর্তমান।

জাফরান স্বাদে তেতো, ঝাঁঝালো, পিচ্ছিল ও সুগন্ধময়। দামি রান্নায় ও সুগন্ধের জন্য পরিমাণ মতো ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফুল হয়। ভালো জাফরান রক্তাভ-পীত রঙের ও পদ্মগন্ধযুক্ত। কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট জাফরান জন্মে। ইরান, ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনে এর ব্যাপক চাষ হয়। কাশ্মীরের মতো আর কোনো দেশে এটি এত রক্তাভ-পীত নয়। প্রাচীন কাল থেকে কাশ্মীরে জাফরান উৎপন্ন হচ্ছে।

খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও দামি প্রসাধনসামগ্রী হিসাবে জাফরান ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে জাফরান গায়ে মাখা হত শরীরের সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য। এ ছাড়া নানা রোগে জাফরানের ব্যবহার হয়।

বি. ব.

জাভা মানব (java man)

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। দশ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে এরা জীবিত ছিল। এরা খাড়া মানবদের অন্তর্গত মানুষ। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে এদের ফসিল পাওয়া গেছে। নদীর পুরানো খাত কিংবা আগ্নেয়গিরির (দ্র) জমাট লাভার স্তরে এদের চিহ্ন পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালে ওলন্দাজ চিকিৎসক ইউজ্যান ডুবোয়া (Eugene Dubois) ওদের প্রথম আবিষ্কার করেন। এদের নৃতাত্ত্বিক নাম পিথেক্যানথ্রোপাস (Pithecanthropus)।

জাভা মানুষদের ফসিল থেকে বোঝা যায় যে তাদের লম্বা মুখ, ছোট নিচু কপাল এবং চোখের ওপর প্রচুর ভাঁজ ছিল। এদের মাথার খুলি মোটা, দাঁত বড় বড় এবং চোয়াল ছিল বড়। আধুনিক মানুষের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক ছিল ছোট। এরা পাঁচ ফুটের (১৫০ সেন্টিমিটার) ওপর দীর্ঘ হত। মস্তিষ্কের আয়তন ৯০০ সিসি।

সৈ. আ. ই.

জাম (blackberry)

Myrtaceae গোত্রভুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এরা কালোজাম এবং গোলাপজাম এ দুই ভাগে বিভক্ত। কালোজামের বৈজ্ঞানিক নাম *Syzygium cumini*। জাম নিবিড় ছায়াদানকারী গাছ এবং এর কাঠ আর্দ্রতাসহিষ্ণু, দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশে এ গাছ ফলের জন্য লাগানো হয়। ফল পাকলে এর বাইরের অংশ ঘন ও কালো রঙের হয় এবং ভেতরের অংশ লাল রঙের রসে ভরে ওঠে। পাকা জাম বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পরিস্রুত জামের রস সিরকার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জামের রস রক্তবর্ধক ও রক্তপরিষ্কারক।

গোলাপজামের বৈজ্ঞানিক নাম *Syzygium jambos*, Alston। এরা মাঝারি আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। এদের উচ্চতা ১২-১৩ মিটার। পাতার রঙ সবুজ, আকার লম্বাটে ও বোঁটা ছোট। ফুল দূর থেকে দেখতে পেয়ারা ফুলের মতো। তিন মাসের মধ্যে ফল পেকে যায়। পাকা ফলের রঙ হালকা সবুজ।

মু. আ.

জামরুল

জামরুল Myrtaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Bl. Merr.* জামরুল গাছ মাঝারি থেকে বড় (৫-১৫ মিটার) বৃক্ষ, দুর্বল শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট। মূলকাণ্ড বেশ খাটো, আঁকাবাঁকা। গাছের উপরাংশ মুকুটের মতো ছড়ানো, পাতা বেশ বড়– চন্দ্রাকৃতি, পুরু, সুগন্ধিযুক্ত,

উপর দিক কিছুটা চকচকে সবুজ। ফুল হলুদে-সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফলের আকৃতি ঘণ্টার মতো এবং তা ঝুলে থাকে। ফল সাদা বা গোলাপি। ঘণ্টার মতো হলেও মাঝখানটা চাপা, বেশ রসালো, কোনো কোনো সময় বীজহীন। ফলের রঙের উপর নির্ভর করে আবাদি জাতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– আলবা (alba) যা সাদা, কৌণিক প্রায় আকৃতি, ফল বীজহীন এবং আমাদের দেশে সাধারণ ফলগুলো কিন্তু অপরিণত অবস্থায় সবুজে-সাদা। অপরটি প্রায় গোলাকৃতি গোলাপি ফল, ১-২টি বীজবিশিষ্ট। বীজ থেকে জামরুল বংশ বিস্তার করতে পারলেও প্রধানত কলম করেই বংশ বৃদ্ধি করা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুল হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফলে পরিণত হয়। ফলের শাঁস হালকা মিষ্টি স্পঞ্জজাতীয়, হালকা সুগন্ধিযুক্ত। জামরুল বেশ জনপ্রিয় ফল। জামরুল কাঠ অসম্পূর্ণ, তবে শক্ত। কাঠের রঙ লাল।

শা. আ.

জায়ফল (nutmeg tree)

Myristicaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত জায়ফল-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Myristica fragrans* Hault। চিরসবুজ সুগন্ধি ভিন্নবাসী (পুরুষ এবং স্ত্রী গাছ ভিন্ন) বৃক্ষ যা ৯-১২ মিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাকল ধূসরাভ কালো। পাতা চামড়ার মতো চন্দ্রাকৃতি বা ডিম্ব-বর্শাফলকাকৃতি। ফুল মাখন হলুদ, সুগন্ধি। ফল হলুদ চওড়া ঘণ্টাকৃতি বা গোলাকৃতি; রসালো। ফলত্বক ১-১.৫ সেন্টিমিটার পুরু মাংসল, পাকা অবস্থায় দু'ভাগ হয়ে থাকে। বীজ ছড়ানো, ডিম্বাকৃতি, বীজোপাঙ্গ বিশিষ্ট, শক্ত খোসার খয়েরি বীজবহিস্ত্বক। বীজোপাঙ্গ লাল, মাংসল। এক একটি গাছ ৭০-৮০ বছর ভালো ফল দেয়। পাকা ফল ফেটে গিয়ে আঁশীয় বীজোপাঙ্গ দ্বারা আবৃত শক্ত খোসার বীজত্বকসহ বীজ বিচ্ছিন্ন হয়। জায়ফল থেকে দু'টি বাণিজ্যিক দ্রব্য উৎপাদিত হয়– তা হল শুষ্ক শাঁস থেকে নাটমেঘ (nutmeg) উৎপন্ন হয় এবং বীজত্বক আবৃতকারী আঁশীয় বীজোপাঙ্গ থেকে মেস (mace) উৎপন্ন হয়। বীজোপাঙ্গ পৃথক করে শক্ত বোর্ডের মধ্যস্থলে চাপে রেখে রৌদ্রে শুকিয়ে মেস তৈরি করা হয়। পূর্ব-ভারতে নাটমেঘ এবং ইন্দোনেশিয়ায় মেস মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যকে সুস্বাদু করার মশলা হিসাবে নাটমেঘ এবং মেস

উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। নাটমেঘ উদ্দীপক, হজমি, ঢেকুর, বমি, ম্যালেরিয়া, বাত, সায়েটিকায় উপকারী।

শা. আ.

জারণ-বিজারণ (oxidation-reduction)

জারণ এবং বিজারণ দু'টি পরিপূরক রাসায়নিক বিক্রিয়া। জারণ ক্রিয়ার ফলে কোনো বিক্রিয়ক (reactant)

ইলেকট্রন (দ্র) হারায় এবং অন্য বিক্রিয়ক সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়। দু'টি বিক্রিয়া এ জন্য একই সময়ে ঘটে।

যে সকল পদার্থ জারণ-বিজারণের সময় ইলেকট্রন লাভ করে তাদের জারক পদার্থ বলে। বিক্রিয়ার এক পর্যায়ে জারক পদার্থও বিজারিত হয়। একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ বিক্রিয়া করে দুর্বল বিজারক পদার্থে পরিণত হয়। ইলেকট্রোনেগেটিভ পদার্থসমূহ জারক হিসাবে অংশগ্রহণ করে। ফ্লুরিন (দ্র) সবচেয়ে ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌল এবং এটা অত্যন্ত সক্রিয় জারক। এটা বিক্রিয়া করে ফ্লুরাইড তৈরি করে, যা বিজারক হিসাবে দুর্বল। অক্সিজেন (দ্র) খুব সক্রিয় জারক; তবে অক্সিজেনের অ্যালোট্রপ (allotrop) ওজোন (O_3) আরো বেশি সক্রিয় জারক। হ্যালোজেন জাতীয় সব মৌলই শক্তিশালী জারক।

যে সকল পদার্থ সহজেই পজিটিভ আয়ন (দ্র) সৃষ্টি করে, তারা সক্রিয় বিজারক। লিথিয়াম (দ্র) সবচেয়ে শক্তিশালী বিজারক।

কতকগুলি যৌগ যুগপৎ জারক এবং বিজারকরূপে বিক্রিয়া করতে পারে। যেমন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড।

অনেক জীবিত প্রাণী জারণক্ষমতার জন্য অক্সিজেনের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ঠিক সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটলেও কতকগুলি অন্তর্বর্তী যৌগের মধ্যে পারস্পরিক ইলেকট্রন বিনিময় ঘটে। অন্তর্বর্তী যৌগগুলি সহজেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং ছেড়ে দেয়। এটা ইলেকট্রন পরিবহণ বিক্রিয়া নামে পরিচিত। সকল জীবের ক্ষেত্রে এর ধরন প্রায় একই। এই বিক্রিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী জারক অক্সিজেন এবং সেটাই সর্বশেষ ইলেকট্রনগ্রাহক। জীবিত প্রাণীতে অক্সিজেনের প্রধান ভূমিকাই হচ্ছে ইলেকট্রন এপার-ওপার বা 'ডাম্প' করা। অনেক জীবাণু অবাতজীবী; বাঁচার জন্য এদের অক্সিজেন লাগে না। কারণ ইলেকট্রনগ্রাহক হিসাবে এরা অক্সিজেনের বদলে সালফার (দ্র) কিংবা অন্যান্য জারক পদার্থ ব্যবহার করে।

সা. এ.

জারুল (lilac)

Lythraceae গোত্রভুক্ত দ্বিবীজপত্রী এক প্রকার বড় গাছ। এর ইংরেজি নাম লাইলাক (Lilac) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Lagerstroemia flosreginae reta = L. speciosa pers)*। জারুলের আদি নিবাস চীন। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই জারুল গাছ জন্মে; তবে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে বেশি জন্মে। দীর্ঘ আকারের এ গাছের উচ্চতা প্রায় ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জারুল গাছের লালচে-সাদা রঙের কাঠ খুবই টেকসই ও মজবুত। এ কাঠ আর্দ্রতাসহিষ্ণু, তাই নৌকার বৈঠা ও মাস্তুলসহ বিভিন্ন অংশ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া গরুর গাড়ি ও চাষের যন্ত্রপাতি তৈরিতেও এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। এমনকি জারুল কাঠ দিয়ে রেলপথের স্লিপার এবং আসবাবপত্রও তৈরি হয়।

জারুলের পাতা সরল এবং এর বিন্যাস দ্বি-সারি ও অভিমুখী। ছায়া ও ফুলের সৌন্দর্যের জন্য রাজপথের দু'ধারে জারুল লাগানো হয়। এর পাতা ও ফলে শতকরা ১২ থেকে ১৮ ভাগ ট্যানিন থাকে। চামড়া 'ট্যান' করার কাজে তা ব্যবহার করা হয়। জারুল গাছের শিকড় উত্তেজক ও জ্বররোধী। এর পাতা ও বাকল রেচক এবং বীজ নিদ্রাকর্ষী।

মু. আ.

জাহাজ (ship)

মানুষের যাতায়াত ও পরিবহণের প্রাচীনতম একটি বাহন হল জাহাজ। অতীতে জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েই মানুষ দূর দূর অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। জাহাজের উন্নয়নের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কয়েকটি স্তম্ভ হল খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে মিশরীয় নাবিকদের দ্বারা পাল আবিষ্কার; খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরেই কাঠের তক্তা জুড়ে জাহাজ তৈরির উপায় উদ্ভাবন; ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইউরোপের নাবিকদের দ্বারা জাহাজের পিছনে হাল সংযোজন; ১৪৫০ সালে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকদের দ্বারা বর্গাকৃতি সম্মুখপাল আর ত্রিভুজাকৃতি তেরচা পালের সমন্বয়সাধন; ১৮০৭ সালে আমেরিকার রবার্ট ফুলটন কর্তৃক প্রথম ব্যবসায়িকভাবে সফল বাষ্পচালিত জাহাজ প্রবর্তন; ১৮১৮ সালে প্রথম পুরাপুরি লৌহনির্মিত জাহাজ 'ভালকান' তৈরি; ১৮৩৬ সালে জাহাজ চালনার জন্য প্রথম প্রপেলার ব্যবহার; ১৮৯৭ সালে প্রথম বাষ্পীয় টারবাইনচালিত জাহাজ 'তুর্বিনিয়া'

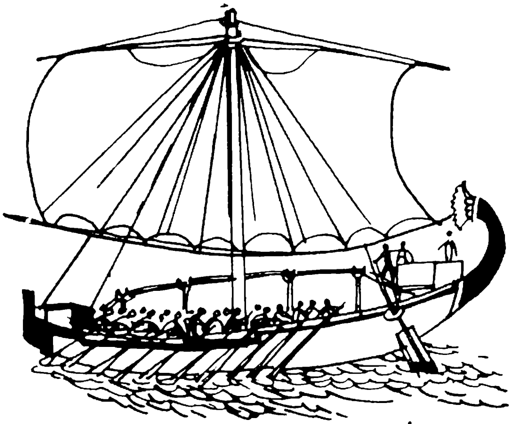

১

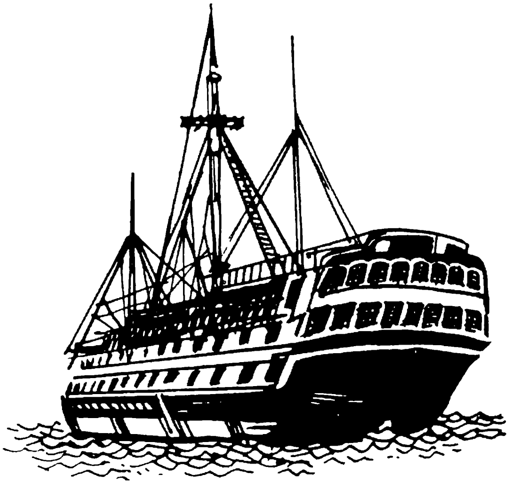

৩

২

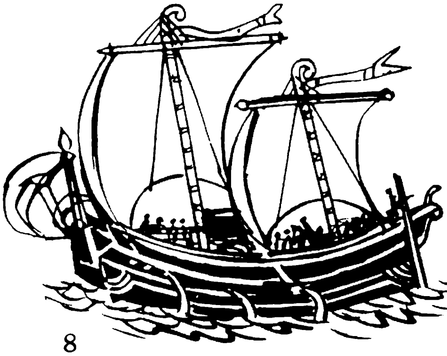

৪

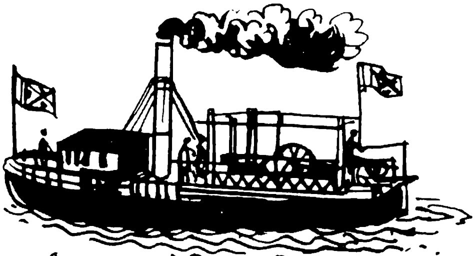

৫

১. মিশরীয় পালতোলা আদি জাহাজ, ২. ভাইকিং জাহাজ, ৩. মধ্যযুগের সামুদ্রিক জাহাজ, ৪. ভারতের প্রাচীন জাহাজ, ৫. ১৭৮৩ সালে এই নৌকায় বাষ্পীয় শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালানো হয়, ৬. নদীতে চলাচলের জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যাত্রীবাহী স্টিমার, বাংলাদেশের 'গাজী' স্টিমার এই ধরনেরই জাহাজ যা প্রায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে

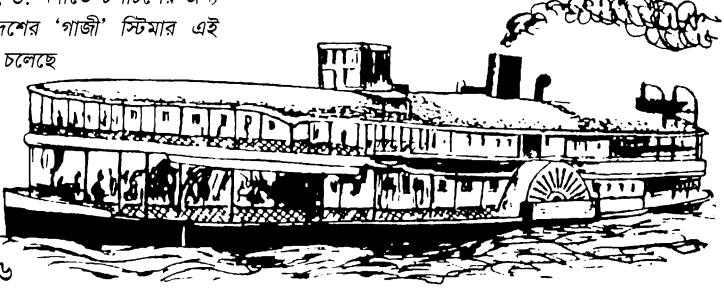

৬

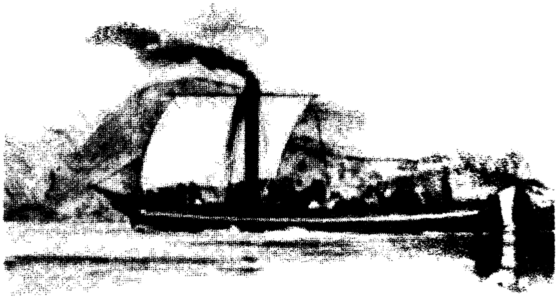

১

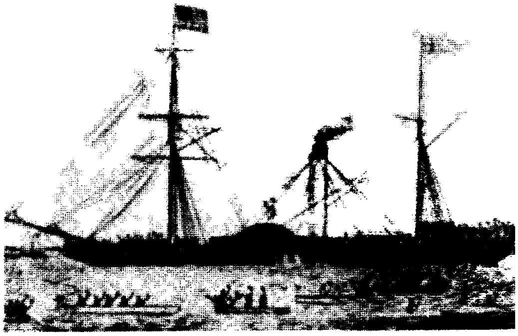

২

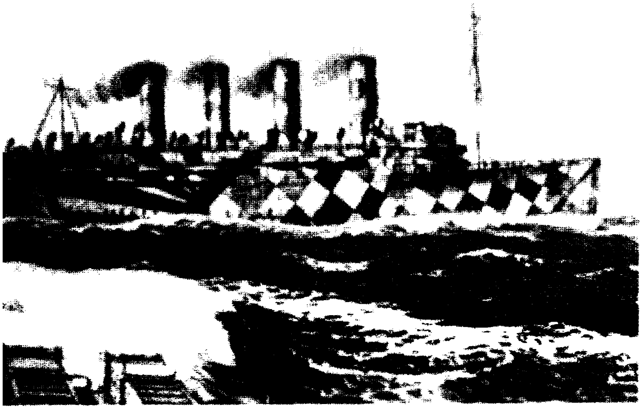

৩

১. বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ 'কমেট' (স্কটল্যান্ড), ২. 'সাইরিয়াস' : বাষ্পশক্তিতে চালিত হয়ে যে জাহাজ সর্বপ্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেয়, ৩. 'মোরিতানিয়া' নামে এই জাহাজ দীর্ঘ ২২ বছর ধরে আটলান্টিকে চলাচল করে। যুদ্ধের সময় ক্যামোফ্লেজ করে চলতে হয়েছে, ৪. দ্বিতীয় বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ 'কুইন মেরি' লম্বায় ১০২০ ফুট এবং জাহাজের টনেজ হচ্ছে ৮০৭৭৩

www.boighar.com

৪

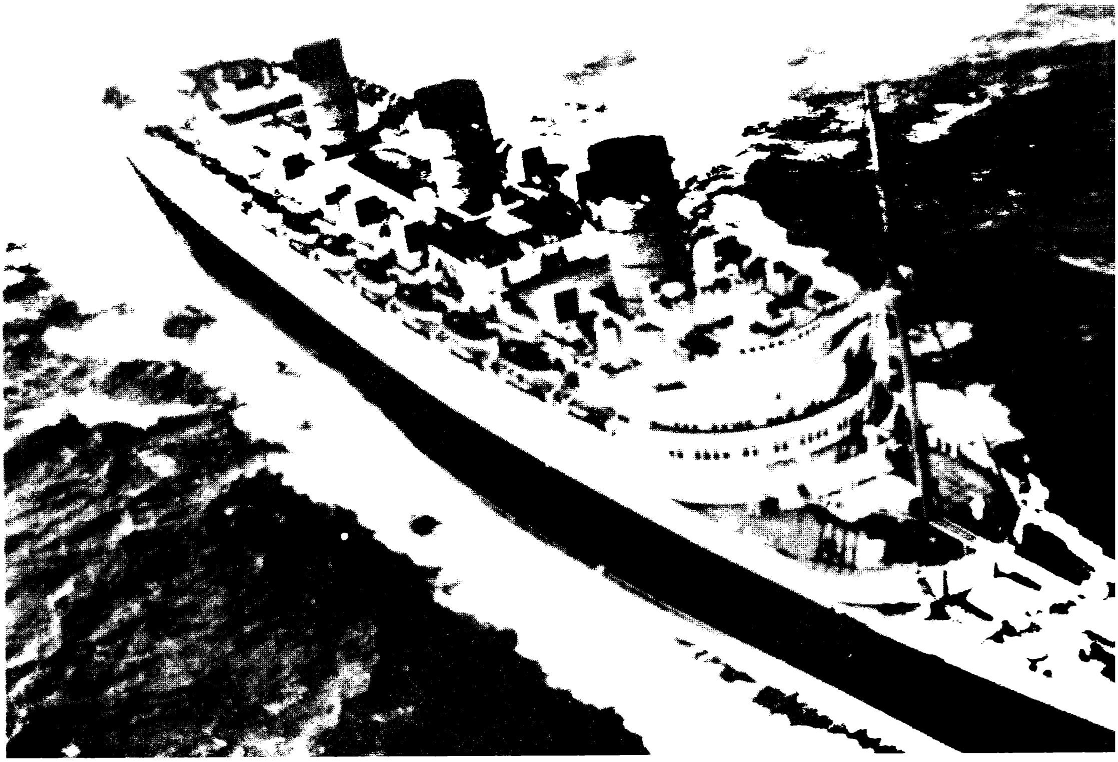

ও ১৯১০ সালে প্রথম ডিজেল ইঞ্জিনচালিত জাহাজ তৈরি এবং ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পরমাণুশক্তিচালিত জাহাজ 'সাভানা' (savannah) নির্মাণ। জাহাজের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে আবিষ্কৃত হয়েছে নৌ-চালনার নানা কৌশল, দিঙ্‌নির্দেশক কম্পাস, জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় ও পথ নির্দেশনা, সমুদ্রচার্ট, রেডার (দ্র) ও বেতার সিগন্যালের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা, বেতার যোগাযোগ ইত্যাদি।

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করার আগে পর্যন্ত জাহাজ ছিল দূরদেশে যাত্রী ও মাল পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। এর পর থেকে জাহাজে দূরপাল্লার যাত্রীদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে শুধু বিলাসবহুল ভ্রমণের মধ্যে। বর্তমানে তাও খুব কমে গেছে। এখন যুদ্ধজাহাজ বাদ দিলে জাহাজ হল দুনিয়ার মাল বহনের প্রধান মাধ্যম ও নিকটপাল্লায় ফেরি ইত্যাদিতে যাত্রী, গাড়ি এবং ক্ষেত্রবিশেষে ট্রেন বহনের যান। মালবাহী জাহাজ চার রকমের সাধারণ মালবাহী, ট্যাঙ্কার, স্তূপমালবাহী ও বহুমুখী। সনাতন ধরনের সাধারণ মালবাহী জাহাজ হরেক রকমের মাল জাহাজের খোলের নানা জায়গায় রাখে। এগুলো নানা ছিদ্রপথে ঢোকানো ও বের করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। এসব জাহাজ কমে গিয়ে এখন বাড়ছে একই কাজের জন্য কন্টেইনার জাহাজ। মিটারের মাপে ৬x২.৪x২.৪ অথবা ১২x২.৪x২.৪ সাইজের ধাতুনির্মিত বাক্সকেই বলে কন্টেইনার। এতে মাল আগে থেকেই ভরে রাখা হয়। কন্টেইনার জাহাজ এসব বাক্সকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখার একটি গুদামের মতো। এতে মাল ওঠানো-নামানো খুব সহজ। বিশালকায় সব ট্যাঙ্কার পেট্রোলিয়াম (দ্র) আনা-নেওয়ার কাজ করে। এদের খোলের প্রায় পুরোটাই বিভক্ত থাকে বিরাট বিরাট কয়েকটি ট্যাঙ্কের আকৃতিতে। স্তূপমালবাহী জাহাজে শস্য, সার, লবণ, চিনি, আকরিক পাথর ইত্যাদি স্তূপ করে নেওয়ার মতো বিশাল বাক্স থাকে। আর বহুমুখী জাহাজে বর্ণিত সব রকমের ব্যবস্থার সমন্বয় থাকে। তা ছাড়া বিশেষ ধরনের জাহাজও আছে, যেমন পচনশীল খাদ্য পরিবহণের জন্য দ্রুতগতির রিফ্রিজারেটর জাহাজ।

যে কোনো জাহাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হল এর খোল, ইঞ্জিন (দ্র), প্রপেলার এবং হাল। বাটির মতো আকৃতির খোলের জন্যই এত ভারী হয়েও জাহাজ ভেসে থাকে। খোলের ভেতরটা ডেক নামে পরিচিত। ডেকের ওপর আরো কতকগুলো পাটাতনে বিভক্ত থাকে, যার মধ্যে সবার উপরেরটি হল প্রধান ডেক। প্রধান ডেকের উপরে যা থাকে তা জাহাজের উপরিকাঠামো। খোলের ভেতরটা আবার আগাগোড়া কয়েকটি দেওয়াল দিয়ে বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত থাকে, যাতে একটি কক্ষে পানি ঢুকলেও অন্যগুলোতে না যেতে পারে। চলার সুবিধার জন্য খোলের সম্মুখভাগ সরু এবং পশ্চাৎভাগ গোলাকার হয়। উত্তাল সমুদ্রে বেশি না দোলার জন্য খালি থাকার সময় খোলের মধ্যে পানি ভরে একে ভারী করা হয়। দু'পাশে দু'টি ডানার মতো আরো কিছু ব্যবস্থা খোলের সঙ্গে থাকে একে স্থির রাখার জন্য। আজকাল অধিকাংশ জাহাজ বাষ্প টারবাইন (দ্র), গ্যাস টারবাইন অথবা ডিজেল ইঞ্জিনচালিত। টারবাইনের জন্য বাষ্প বা গ্যাস তৈরি হয় পেট্রোলের দহনে। টারবাইন অথবা ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে জাহাজের প্রপেলার বা স্ক্রু। তার আকার অনুসারে জাহাজের পিছনে একটি, দু'টি অথবা চারটি প্রপেলার থাকে। জাহাজের হাল হল বড় একটি ধাতব পাত, যা পিছনে খাড়াভাবে আটকানো থাকে এবং কব্জার কারণে দরজার পাল্লার মতো এপাশ ওপাশ নাড়া যায়। সামনের দিকে থাকা চালনা-হুইল ঘুরিয়ে এই নাড়াচাড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দুনিয়ার দেশে দেশে বাণিজ্য ও সার্বিক অর্থনীতি জাহাজশিল্পের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রতি বছর নতুন করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন মোট ওজনের জাহাজ দুনিয়ার জাহাজের বহরে যোগ হচ্ছে। এ শিল্পে অগ্রণী হচ্ছে জাপান, জাহাজের মালিকানাতেও। তবে বন্দরে বন্দরে লাইবেরিয়া, পানামা ইত্যাদি কয়েকটি দেশের পতাকাবাহী জাহাজ বেশি দেখা যায়। এসব দেশে জাহাজ রেজিস্ট্রেশনের কিছু সুবিধা রয়েছে বলে নানা দেশের জাহাজ এদের নামেই চলে।

মু. ই.

জিপ (jeep)

ইংরেজি Jeep শব্দ বা বস্তু আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। বাংলায় একে আমরা জিপ/জীপ অথবা জিপগাড়ি/জীপগাড়ি বলি বা লিখি। চার চাকার

ছোট্ট, ছাদ-খোলা, শক্তসমর্থ এই যানবাহনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছিল। এর নাম ছিল General Purpose Vehicle অর্থাৎ সব রকম কাজের উপযোগী গাড়ি। General Purpose শব্দ দুটোর প্রথম অক্ষর G ও P মিলিয়ে শব্দটি প্রথমে লোকের মুখে মুখে জিপ হয়েছে, পরে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখতে গিয়ে Jeep লেখা চালু হয়েছে।

১৯৪১ সালে জিপ সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই গাড়িটির নানা রকম উন্নতি সাধন করা হয়েছে আকারে, আয়তনে, শক্তিতে, কর্মক্ষমতায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জিপ তার General Purpose-এর চরিত্র হারায় নি।

হা. মা.

জিপসাম (gypsum)

অধাতব খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক নাম আর্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4.2H_2O$)। সাধারণত জিপসাম দেখতে প্রিজমাকৃতি, বক্রতল অথবা মোচড়ানো একাক্ষি কেলাস-বিশিষ্ট কাচের মতো চকচকে পদার্থ। বিভিন্ন ধরনের জিপসামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিলিনাইট (selenite), অ্যালবাস্টার (alabaster), স্যাটিন স্পার (satin spar)। সিলিনাইট স্বচ্ছকেলাস, বর্ণহীন। অ্যালবাস্টার প্রায় স্বচ্ছ, মসৃণ, দানাদার ঈষৎ রঙিন আভাযুক্ত। স্যাটিন স্পার মুক্তার মতো দেখতে, সামান্য আঁশযুক্ত। জিপসামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৩, অত্যন্ত নরম। প্রকৃতিতে হেলাইট ও অন্যান্য খনিজের মধ্যে, চুনাপাথরের মধ্যে পানিতে সামান্য পরিমাণ জিপসাম বিদ্যমান। যে কোনো পানি সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করলে পাত্রের তলায় যে সাদা গুঁড়ো পাওয়া যায় তা জিপসাম।

জিপসামকে উত্তপ্ত করলে এর তিন-চতুর্থাংশ পানি উড়ে যায় এবং সাদা মসৃণ পাউডারে পরিণত হয়। একে বলা হয় প্লাস্টার-অব-প্যারিস। প্লাস্টার-অব-প্যারিসের সঙ্গে পানি মিশালে বাতাসে দ্রুত জমাট বাঁধে। অধিক তাপে জিপসামের সব পানি উড়ে যায়। এভাবে প্রাপ্ত প্লাস্টার ইমারত ও সিমেন্ট (দ্র) প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও ক্যালসিয়াম সার হিসাবে, গহনার পাথর হিসাবে এবং আলোকযন্ত্রে জিপসাম ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

জিরা (cuminseed)

জিরার বৈজ্ঞানিক নাম যা *Umbelliferae* গোত্রভুক্ত। এক ফুটের মতো উঁচু বর্ষজীবী উদ্ভিদ জিরার কাণ্ড কৌণিক বা শিরযুক্ত। প্রচুর শাখা হয়। পাতা ২ বা ৩ খণ্ডিত সরু, নীলচে সবুজ রঙের। ফুল সাদা বা গোলাপি ছাতার মতো পুষ্পমঞ্জরিতে সাজানো। ফল নস্যি রঙ থেকে হালকা খয়েরি রঙের, দু'মাথা চাপানো; ফলে দেখতে অনেকটা ঢোলের মতো। জিরার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধ রয়েছে, কিন্তু ফল তিতা। জিরা উদ্দীপক, হজমিকারক, রক্তবন্ধকারক এবং ডায়রিয়া ও অগ্নিমান্দ্যে উপকারী। পশু চিকিৎসায় জিরা ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে তৈল পাওয়া যায়। এ তৈলের গন্ধ ভালো না হলেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অ্যালকোহলের চিহ্নিত গন্ধ আনার জন্য তা ব্যবহার করা হয়।

শা. আ.

জিরাফ (giraffe)

পৃথিবীর জীবন্ত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে জিরাফ সবচেয়ে উঁচু।

সাধারণ জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম *Giraffa camelopardalis*-এ উক্ত ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। পুরুষ জিরাফের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় মিটার এবং স্ত্রী জিরাফের উচ্চতা সাড়ে চার থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের সামনের পা দু'টি পিছনের পায়ের চেয়ে লম্বা- এ কারণে এদের গলা

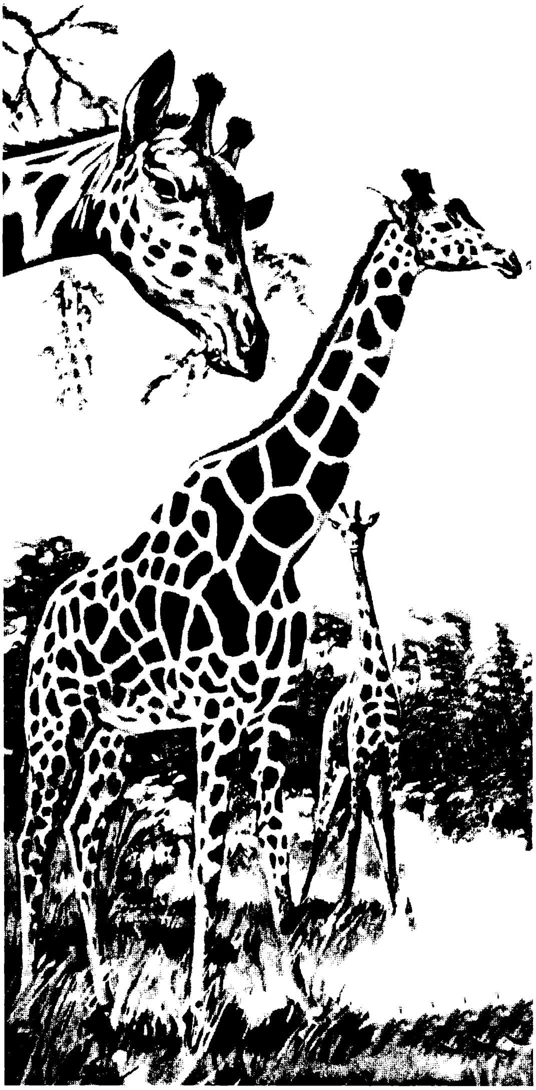

সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। দেহের ওজন ১৪০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গায়ে ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।

শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো বেশ কষ্টদায়ক বলে এরা সাধারণত দাঁড়িয়েই ঘুমায়। দীর্ঘ ঘাড় থেকে মগজ পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজনে এদের হৃৎপিণ্ড প্রকাণ্ড আকারের হয়ে থাকে। এদের অধিক উচ্চতার বড় সুবিধা এই যে গাছের উঁচু ডালের পাতা খাওয়ার জন্য এদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

মু. আ.

জিলেটিন (gelatin)

প্রাচীন চামড়া, টেন্ডন, হাড় ইত্যাদির অন্যতম প্রধান উপাদান কোলাজেন (collagen) থেকে পাওয়া প্রোটিন-বিশেষ। এটি অনেক অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমার (দ্র)। চামড়া কিংবা হাড়ের সঙ্গে চুন কিংবা অ্যাসিড (দ্র) মিশয়ে তা ফুটিয়ে ছেঁকে ঘন করা হয়; এর পর শুকিয়ে গুঁড়ো করে জিলেটিন বানানো হয়। জিলেটিন স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গুঁড়ো। গরম পানিতে গলে যায়।

জিলেটিন একটি অসম্পূর্ণ প্রোটিন। কারণ এতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (essential amino acid) ট্রিপটোফান (tryptophan) থাকে না। কিন্তু গম, বার্লি কিংবা ওট (oat)-এর সঙ্গে মেশালে এরা পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। এরা সাধারণত কোনো অ্যালার্জি সৃষ্টি করে না।

জেলি, ক্যান্ডি, আইসক্রিম (দ্র) ইত্যাদি তৈরির জন্য জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। ফটোগ্রাফির (দ্র) কাজে প্রচুর জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। ফটোগ্রাফির ফিল্ম (দ্র) এবং কাগজের (দ্র) এটি একটি মূল উপাদান। সার এবং প্রাণীর খাবার হিসাবেও জিলেটিন ব্যবহৃত হয়। ক্যাপসুল, ট্যাবলেটের আবরণী, ইমালশন (emulsion) ইত্যাদি তৈরি করার জন্য ঔষধশিল্পে জিলেটিন ব্যবহার করা হয়। প্রসাধনী এবং প্লাস্টিকসামগ্রী প্রস্তুত করার জন্যও এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে।

সা. এ.

জিহ্বা (tongue)

জিহ্বা নরম মাংসপেশি দিয়ে তৈরি, পরিপাকতন্ত্রের একটি অঙ্গ। জিহ্বা মুখগহ্বরে অবস্থিত। জিহ্বার প্রধান কাজ চর্বণ, গলাধঃকরণ, স্বাদ গ্রহণ, শ্লেষ্মা ও তরল নিঃসরণ এবং কথা বলায় সাহায্য করা।

জিহ্বার উপরের অংশ সাধারণত গোলাপি থাকে। মুখগহ্বরের নিঃসরণ জিহ্বা ভেজা রাখতে সাহায্য করে। জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের স্বাদ (যেমন–মিষ্টি, টক, নোনতা, তেতো ইত্যাদি) গ্রহণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোষ রয়েছে। জিহ্বার মূল পিছনের দু'টি অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। জিহ্বা খুবই চলনশীল অঙ্গ।

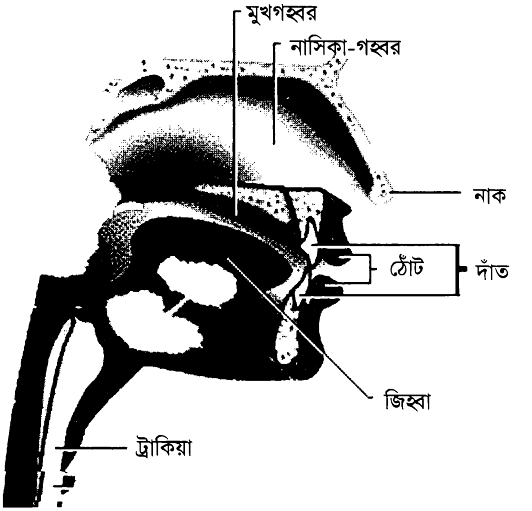

জিহ্বা অপরিষ্কার রাখলে ছত্রাক সংক্রমণ এবং ক্ষত দেখা দিতে পারে। দেহে লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা, পুষ্টির অভাব, সংক্রমণজনিত প্রদাহ ইত্যাদি কারণে জিহ্বার রোগ দেখা দেয়। জিহ্বা চারটি কেন্দ্রীয় স্নায়ু- ফেসিয়াল, গ্লোসোফেরিনজিয়াল, ট্রাইজেমিনাল ও হাইপোগ্লোসাল থেকে প্রচুর স্নায়ু সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং এদের মাধ্যমে স্বাদ, তাপ, শৈত্য, ব্যথা, চাপ ইত্যাদি অনুভূতি গ্রহণ এবং সঞ্চরণশীলতা সম্পন্ন করে থাকে।

আ. আ. হা.

জীন (gene)

জীবকোষের ক্রোমোজোমে (দ্র) অবস্থিত বংশগত বৈশিষ্ট্যের একক (unit)-গুলোর নাম জীন। জীন ক্রোমোজোমে সারিবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে বিন্যস্ত থাকে। তা জীবদেহস্থ প্রোটিনের গঠনও নিয়ন্ত্রণ করে। গঠনগত দিক থেকে জীন ডিএনএ অণুর অংশবিশেষ।

ভৌত-রাসায়নিক বা অন্য কোনো কারণের প্রভাবে জীনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এর ফলে উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের বৈশিষ্ট্যগত যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে বলে পরিব্যক্তি (mutation)। পরিব্যক্তি প্রজাতির পরিবর্তনের একটি কারণ।

জীনের কার্যকলাপ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার ফলে জীনতত্ত্ব (genetics)-এর উদ্ভব। বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে জীন পুনর্গঠন ও জীন পুনর্বিন্যাস নিয়ে গবেষণায় যে উচ্চতর প্রযুক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তার নাম 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' (genetic engineering)। এই পথে জীনক্রটিজনিত রোগের প্রতিকার এবং জীন পরিবর্তনের চেষ্টাও চলছে। রোগজীবাণুর জীন বর্তমান গবেষণার প্রধান মাধ্যম।

আ. র.

জীব / জীবজগৎ (organism)

এই পৃথিবীর সকল জীবিত বস্তুকে এক কথায় জীব (organism) বলা হয়। জীবদের আবার দু' ভাগে ভাগ করা হয়- উদ্ভিদ (plant) ও প্রাণী (animal)।

যেসব জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে, কিন্তু চলাচল করতে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না, সারাজীবন বৃদ্ধি পায়, তাদের উদ্ভিদ বলা হয়।

অন্য দিকে যেসব জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, কিন্তু চলাচল করতে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে, জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাদের প্রাণী বলা হয়। মানুষ, বানর, পাখি, ব্যাঙ, মাছ, শামুক ইত্যাদি সবই প্রাণী। ফার্ন, আম গাছ, জাম গাছ ইত্যাদি উদ্ভিদ।

জীব যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রায় সব জীবেরই একটি বিষয়ে বেশ মিল আছে। সব জীবই জন্ম নেয় এবং এক সময় মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া জীবেরা সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এসব সন্তান-সন্ততি সার্বিকভাবে পিতা-মাতার অনুরূপ হয় না। তবে প্রাণীর ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার অনুরূপ হয়। সব জীব অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলে যে জগৎ তৈরি হয়েছে, তাকেই জীবজগৎ (Biological king-dom) বলা হয়। জীবজগতের সব সদস্যকেই জীবের এসব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনোটি ধারণ করতে হয়। এই পৃথিবীর যত সৌন্দর্য, যত রূপ, যত বৈচিত্র্য সবই সম্ভব হয়েছে এই মনোহর জীবজগতের জন্যই। জীবজগৎ স্বাভাবিকভাবেই জড়জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

অ. ব.

জীববৈচিত্র্য (biodiversity)

জীবজগৎ (দ্র) বড়ই বিচিত্র। এটি দু' ভাগে বিভক্ত– উদ্ভিদ (দ্র)-জগৎ ও প্রাণিজগৎ (দ্র)। কোনো কোনো উদ্ভিদ আকারে অতি ক্ষুদ্র। খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, যেমন– ডায়াটম (দ্র)। কোনো কোনো উদ্ভিদ আকারে বেশ বড়। বহুদূর থেকেও তাদের চোখে পড়ে, যেমন– বট গাছ, খেজুর গাছ ও নারিকেল গাছ। সবুজ উদ্ভিদ নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে। ছত্রাক (দ্র) জাতীয় উদ্ভিদে ক্লোরোফিল (দ্র) না থাকায় তারা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। কোনো কোনো উদ্ভিদের ফুল হয়, কোনোটির হয় না। কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজাবরণ থাকে, আবার কোনোটির তা থাকে না। কোনো কোনো উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হয় বীজ দ্বারা, কোনোটির তা হয় অঙ্গের সাহায্যে।

ধান জাতীয় গাছ বেশি দিন বাঁচে না। তবে সেকোইয়া গাছ বাঁচে চার হাজার বছর পর্যন্ত। কোনো উদ্ভিদ জন্মায় পানিতে (দ্র), কোনোটি জন্মায় মাটিতে (দ্র)। কোনো উদ্ভিদ জন্মে মরু অঞ্চলে, আবার কোনোটি জন্মে লোনা মাটিতে।

উদ্ভিদজগৎ যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্র প্রাণিজগৎ। কোনো প্রাণীর দেহে একটিমাত্র জীবকোষ থাকে, যেমন অ্যামিবা। কোনো কোনো প্রাণী বিরাটাকার, যেমন হাতি (দ্র) ও তিমি (দ্র)। স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, যেমন সায়কন। এদের দেহ কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকে। এ কারণে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। এদের দেহে শাখা-প্রশাখা থাকে। হাইড্রা জাতীয় প্রাণীর দেহ নলের মতো। এদের দেহের ভেতরে একটিমাত্র ফাঁপা নল থাকে। টেনিয়া ও ফ্যাশিওলা জাতীয় কিছু প্রাণীর দেহ বেশ নরম ও চ্যাপটা। এদের অধিকাংশই পরজীবী (দ্র)। সুতার মতো লম্বা কৃমি জাতীয় প্রাণীর দেহের মধ্যভাগ কিছুটা মোটা, তবে দুই প্রান্ত কিছুটা সরু। এরাও বেশির ভাগ পরজীবী।

কেঁচো (দ্র) বা জোঁক জাতীয় প্রাণীর দেহে আংটির মতো সারিবদ্ধ অনেকগুলো খণ্ড থাকে। এরা মাটি ও পানি উভয় স্থানেই বাস করে। চিংড়ি (দ্র), তেলাপোকা (দ্র) ও মৌমাছি (দ্র) জাতীয় প্রাণীর দেহ খণ্ডায়িত। খণ্ডগুলো মাথা, বুক ও পেট– এই তিন ভাগে বিভক্ত। শামুক ও ঝিনুক (দ্র) জাতীয় প্রাণীর দেহ শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত। তারামাছ (দ্র) জাতীয় প্রাণীর ত্বকে সজারুর কাঁটার মতো উপাঙ্গ থাকে। এদের দেহে নলাকার পা আছে। এরা সকলেই সামুদ্রিক। রুই মাছ, বাঘ (দ্র), সিংহ (দ্র) ও মানুষের পিঠে ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু ও লম্বালম্বি নটকর্ড থাকে। এদের কোনোটি বাস করে পানিতে আবার কোনোটি বাস করে ডাঙায়।

মু. আ.

জীবাণু (bacteria)

জীবাণু ছোট এককোষী জীব, যা অণুবীক্ষণযন্ত্র (দ্র) ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। আকারে ছোট হলেও জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ক্রিয়া, যেমন– বৃদ্ধি, বিপাক, বংশ বিস্তার ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষমতা জীবাণুর রয়েছে। দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে জীবাণু বংশ বিস্তার করে। ওলন্দাজ অণুবীক্ষণবিদ লেভুনহুক (দ্র) ১৬৭৪ সালে প্রথম স্ব-উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

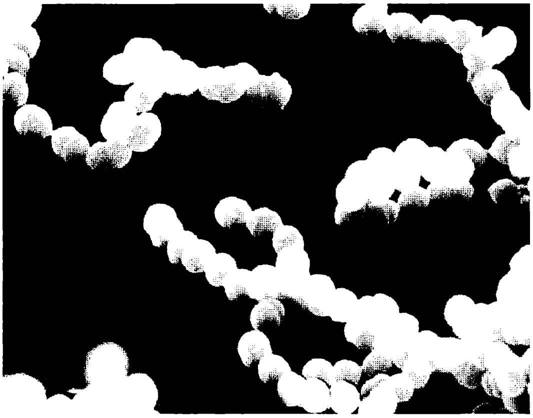

জীবাণু আকারে এক থেকে দশ মাইক্রন দীর্ঘ হতে পারে। মাইক্রন এক মিলিমিটারের হাজার ভাগ ($১০^{-৩}$ মিমি)। সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত জীবাণুকোষের প্রধান উপাদান সাইটোপ্লাজম, কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস), রিবোসোম, গ্রানিউল, মেসোসোম ইত্যাদি। জীবাণু প্রধানত কক্কাস, ব্যাসিলাস, ভিব্রিয়ো, স্পাইরাল্যাম, স্পাইরোকিট ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত।

দেহে প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে জীবাণু মানুষ বা প্রাণিদেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সজীব

কোষে জীবাণুর আক্রমণ ও বংশ বিস্তারের নাম সংক্রমণ (দ্র) বা ইনফেকশন (infection)। সংক্রমণ নানা পথে সংঘটিত হয়ে থাকে। বায়ু (দ্র), পানি (দ্র) বা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে, রোগাক্রান্ত মানুষ বা প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, কীটপতঙ্গের (দ্র) দংশন ইত্যাদি নানা উপায়ে দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ ঘটে।

তাপ (দ্র), তেজস্ক্রিয় রশ্মি, বা রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করার পদ্ধতির নাম নির্বীজন (দ্র) বা ডিসইনফেকশান (disinfection)। ভেষজ বা রাসায়নিক উপাদান, বিশেষ করে আধুনিক কালে আবিষ্কৃত কেমোথেরাপিউটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক্স্ (দ্র) জাতীয় ঔষধ জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে খুবই কার্যকর। কোনো কোনো জীবাণুঘটিত রোগের (দ্র) বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক টিকাও (দ্র) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন– বসন্ত রোগ, পোলিওমায়েলাইটিস, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, ডিফথেরিয়া (দ্র) ইত্যাদি।

সি. না. হ.

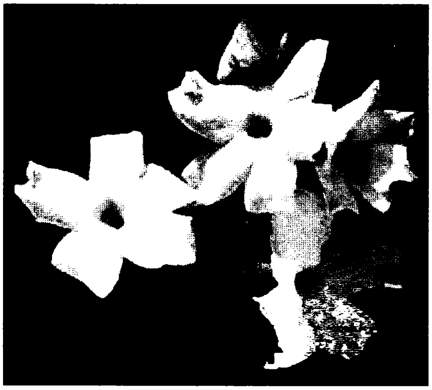

জুঁই (italian jasmine)

Oleaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত জুঁই-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Jasminum humile* L.। লতানো, দীর্ঘ গুল্ম জুঁই লতিয়ে লতিয়ে প্রাচীর, গেটের কাঠামোকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পাতা ছোট ছোট এবং একান্ত ভাবে সজ্জিত। পুষ্প অসংখ্য, ছোট ছোট, সাদা, খুব সুগন্ধি, গাঢ় সবুজ পাতা এবং কাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে মঞ্জরিতে ফোটা জুঁই ফুল খুবই মনোহর। এ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র সব ধরন রয়েছে, যাদেরকে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অনেক গবেষণার মাধ্যমে এখন সবগুলো ধরনকে একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জুঁই ফুল আকারে বেল ফুলের চেয়ে বড় কিন্তু গন্ধ গাঢ়। জুঁই ফুলের এক ধরনের পাপড়ি এক দলীয় বা স্তরীয় এবং অন্য ধরনের পাপড়ি বহু দলীয় বা একাধিক স্তরীয়। গাছ কলম করে বা বীজের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করা যায়। ফুল আকর্ষণীয়। অনেক সময় বাগানে লতানো গাছ দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জুঁই বপন করা হয়। ফুল থেকে নিষ্কাশিত সুগন্ধ পারফিউম তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়। শিকড় থেকে হলুদ রঞ্জন উৎপাদন করা হয়। জুঁই-এর শিকড় কৃমি বিনাশে উপকারী। এর বাকল থেকে দুধের মতো যে রস পাওয়া যায় তা ক্রনিক সাইনাস এবং ভগন্দরের অস্বাস্থ্যকর আবরণ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে খুব কার্যকর।

শা. আ.

জুল (joule)

জুল হচ্ছে S.I. পরিমাপ-ব্যবস্থায় শক্তির একক। এক নিউটন বলের (দ্র) বিরুদ্ধে এক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তা হচ্ছে এক জুল। বৈদ্যুতিকভাবে পরিমাপ করতে হলে এক জুল হচ্ছে এক ওহম (ohm) রোধের ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পেয়ার (দ্র) তড়িৎপ্রবাহের ফলে এক সেকেন্ডে সম্পাদিত কাজ। C.G.S. পরিমাপ-ব্যবস্থায় শক্তির একক হচ্ছে আর্গ (erg)। এক জুল এক আর্গের এক কোটি গুণ বড়। তাপের একক ক্যালরির (দ্র) ৪.২ গুণ হচ্ছে এক জুল। আয়ারল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী জন জুলের (John Joule) নামানুসারে এই শক্তির এককের নামকরণ হয়েছে।

আ. আ.

জেট ইঞ্জিন (jet engine)

বিমানকে গতিশীল করার জন্য আধুনিকতম যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তা জেট ইঞ্জিন। এর ফলে অনেক উচ্চ গতির বিমানে ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে, এমনকি শব্দের গতিবেগকেও অতিক্রম করতে পেরেছে বিমান। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে– নিউটনের (দ্র) এই তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারেই জেট ইঞ্জিন কাজ করে। এতে জ্বালানি (দ্র) দহনের ফলে সৃষ্ট

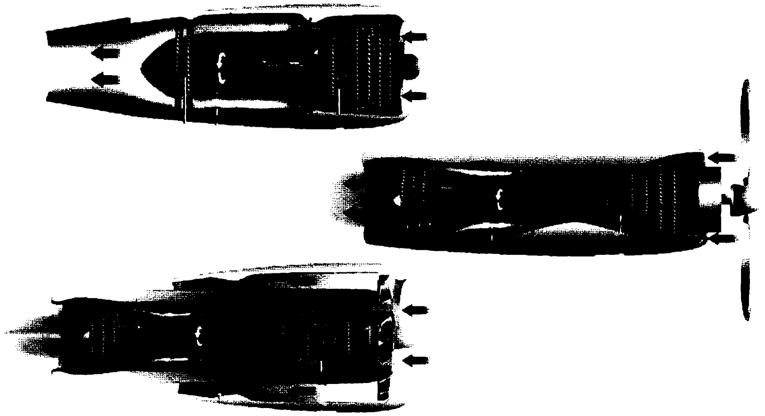

উচ্চ চাপের গ্যাস যখন এর পেছনের দিকে সজোরে বেরিয়ে আসে, তার প্রতিক্রিয়ায় ইঞ্জিনটি এবং সেই সঙ্গে বিমান সামনের দিকে ছুটে যায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই নিয়ম বায়ুশূন্য স্থানেও কাজ করতে পারে। তবে জ্বালানি দহনের জন্য জেট ইঞ্জিন বাইরের বাতাস টেনে নেয়। জেট ইঞ্জিনে বাতাস টেনে আনা হয় প্রপেলার ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে, অথচ সে বাতাসের চাপ ও গতিবেগ সৃষ্টি করা হয় অনেক বেশি। জেট ইঞ্জিন দক্ষ হয় অপেক্ষাকৃত উচ্চ গতিবেগে।

আধুনিক যাত্রীবাহী বিমানে যে রকম জেট ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তা সাধারণ টারবোফ্যান প্রকৃতির। এতে ইঞ্জিনের প্রশস্ত সম্মুখভাগে বড় একটি পাখা প্রচুর বাতাস টেনে নেয়। এ বাতাস পর পর ঘূর্ণায়মান কয়েকটি পাখাসদৃশ চাকতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে অনেক সঙ্কুচিত হয় যার সঙ্গে মিশ্রণে জ্বালানির দহন ঘটে দহন প্রকোষ্ঠের মধ্যে। দহনের ফলে সৃষ্ট উচ্চ চাপের গ্যাস বাতাস-টানা পাখা, সঙ্কোচনকারী পাখা ইত্যাদিকে টারবাইনের (দ্র) সাহায্যে ঘুরিয়ে সচল রাখে এবং তার পর সজোরে পেছন দিয়ে নির্গত হয়ে বিমানকে গতিশীল করে।

আধুনিক জেট ইঞ্জিন বিমান চালনায় ব্যবহৃত হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় থেকে। এটি যাত্রীবাহী বিমানে প্রথম চালু হয় ১৯৫২ সালে। রকেট ও জেট ইঞ্জিনের নীতি একই। তবে রকেট (দ্র) বাইরে থেকে বাতাস টেনে নেয় না, বরং জ্বালানি দহনের জন্য নিজেই অক্সিজেন (দ্র) বহন করে। তাই রকেট মহাশূন্যেও চলতে সক্ষম হয়।

মু. ই.

এডওয়ার্ড জেনার

জেনার, এডওয়ার্ড [১৭৪৯-১৮২৩]

গুটিবসন্তের টিকা (দ্র) আবিষ্কার করে আধুনিক প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার দিঙ্‌নির্দেশ করে গেছেন এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner)।

তাঁর জন্ম ব্রিটেনের বার্কলে নামক ছোট শহরে, ১৭৪৯ সালে। তেরো বছর বয়সে জেনার স্কুল ত্যাগ করেন এবং ব্রিস্টলের সন্নিকটস্থ একজন ডাক্তারের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করতে থাকেন। এর পর তিনি লন্ডনের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে দু'বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নিরলস চেষ্টার সাফল্য হিসাবে জেনার আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন গুটিবসন্তরোগের (দ্র) টিকা। জেনার

এডওয়ার্ড জেনার গো-বসন্তের টিকা দিচ্ছেন

অনেক দিন ধরে শুনে আসছিলেন যে গো-বসন্তে (cow pox) আক্রান্ত ব্যক্তি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয় না। বিষয়টা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। একটানা পাঁচ বছর বিভিন্ন প্রকার গো-রোগ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখতে পান যে বিভিন্ন ধরনের গো-বসন্তের মধ্যে শুধু মাত্র এক ধরনের ক্ষেত্রেই শরীরে গুটিবসন্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তিনি এই বিশেষ ধরনের রোগের নাম দেন 'আসল গো-বসন্ত'।

জেনার ১৭৯৫ সালের ১৪ই মে জেমস্ ফিলিপ নামে এক কিশোরের শরীরে আসল গো-বসন্তের জীবাণু ঢুকিয়ে দেন। ছেলেটি গো-বসন্তে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসাতেই ভালো হয়ে গেল। এর পর জেনার গুটিবসন্তের গুটি থেকে পুঁজরস নিয়ে ঐ ছেলের শরীরে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটি বসন্তে আক্রান্ত হল না। এমনিভাবেই জেনার আবিষ্কার করেন গুটিবসন্তের প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

জেনারের আবিষ্কার গুটি বসন্তরোগের ভয়াবহতা থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দিয়েছে। আর তাঁর নাম হয়ে রয়েছে স্মরণীয়। তিনি ১৮২৩ সালে পরলোকগমন করেন।

সি. না. হ

জেব্রা (zebra)

জেব্রা খুরযুক্ত স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। এদের দেহ পরিষ্কার ডোরাকাটা। দু'টি জেব্রার দেহের ডোরাকাটা দাগ কখনোই এক রকম হয় না। এর গোত্রের নাম ইকুইডি (Equidae), জেনারিক নাম ইকুয়াস (Equus)। এর মাথাসহ দেহ ২.৩ মিটার (৭.৫ ফুট) লম্বা। জেব্রার উচ্চতা ১.২ থেকে ১.৫ মিটার। এর ওজন ৩৪৬.৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আফ্রিকার পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ঘাসভরা প্রান্তরে জেব্রা বসবাস করে। পুরুষ ও স্ত্রী-জেব্রা নিজেদের নিরাপত্তার তাগিদে বড় পালে চলাফেরা করে। শান্ত স্বভাবের অন্যান্য চরে-খাওয়া পশু, যেমন– অ্যান্টিলোপ ও উটপাখির (দ্র) সঙ্গে মিলেমিশেও এরা চলাফেরা করে। পুরুষ-জেব্রা স্ত্রী-জেব্রা ও শাবকের সঙ্গে একত্রে থাকে। এদের চিরশত্রু সিংহ (দ্র) কিংবা চিতাবাঘ (দ্র) অলক্ষ্যে কাছাকাছি এলে জেব্রা ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে দৌড়ে পালাতে থাকে। জেব্রা তৃণভোজী। ঘাস খেয়ে এবং ঝোপ-ঝাড়ের পাতা টেনে ছিঁড়ে খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। স্ত্রী-জেব্রা বসন্তকালে একবারে একটি শাবকের জন্ম দেয়। চামড়ার জন্য অতিরিক্ত জেব্রা শিকার করা হয় বলে জেব্রার সংখ্যা কমে গেছে। গৃহপালিত পশু হিসাবে জেব্রাকে পোষ মানানোর চেষ্টা সফল হয় নি। তেমনি একে আরোহণের জন্য বা অন্যান্য কাজে লাগানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। ঘোড়া (দ্র) জাতীয় পশুর সঙ্গে এর সঙ্করায়নের চেষ্টাও সফল হয় নি।

মু. আ.

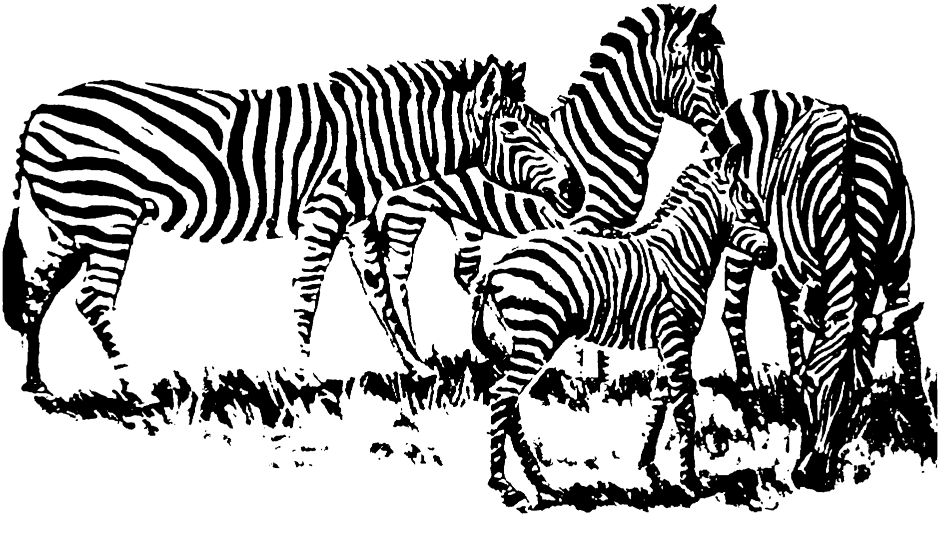

জেল (gel)

অধিক পরিমাণ তরলের মধ্যে কঠিন পদার্থ ছড়ানো থাকলে যে অর্ধ-কঠিন পদার্থ জেলির সঙ্গে পাওয়া যায় তাকে জেল বলে। যেমন জিলাটিন, অ্যাগার প্রভৃতির সল্‌কে ঠাণ্ডা করলে জেলির মতো আঠালো ও স্বচ্ছ অর্ধ-কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়।

জেল দুই প্রকার স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক। জিলাটিন ও অ্যাগার স্থিতিস্থাপক জেল। এ জাতীয় দ্রাবক-আসক্ত বস্তুকে পানিতে গরম করে যে দ্রাবক সল্ পাওয়া যায় সেটি ঠাণ্ডা করলে স্থিতিস্থাপক জেল উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক

ফুলে ওঠে।

সিলিসিক অ্যাসিড জেল ও অধিকাংশ অজৈব অধঃক্ষেপ অস্থিতিস্থাপক জেলের উদাহরণ। মাঝারি মাত্রার সোডিয়াম সিলিকেট দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করে মিশ্রণ হতে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ ডায়ালিসিস দ্বারা দূরীভূত করে ঠাণ্ডা করলে সিলিসিক জেল পাওয়া যায়।

অস্থিতিস্থাপক জেল পানি শোষণ করলেও ফুলে ওঠে না। জেল কর্তৃক তরল শোষণের প্রক্রিয়াকে অন্তঃশোষণ বা ইসবিলন বলে। গৃহীত তরলকে শোষণ করে জেল স্ফীত হলে একে ফুলন (swelling) বলে। কখনো কখনো লঘু জেলকে অনেক সময় ঘরে রেখে দিলে এর সঙ্কোচন ঘটে; ফলে তরল বিস্তার মাধ্যমটির কিছু অংশ পৃথক হয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে সিনারিসিস বলে।

বিশুদ্ধ জেলকে খোলা বাতাসে রেখে দিলে সাধারণ তাপমাত্রায় যথেষ্ট পানি উড়ে যায় এবং জেল শুকিয়ে কাচের মতো শুষ্ক স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়।

সৈ. তা. আ.

জেলিফিশ (jellyfish)

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে খুব ভোরে গেলে বালির উপর এক থালা জেলির মতো কিছু একটা পড়ে আছে দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এদের 'নুন্যা' বলা হয়। নেড়েচেড়ে দেখলে বোঝা যায় এটি একটি প্রাণীর মৃতদেহ–জেলিফিশ বা জেলি মাছের মৃতদেহ। মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। জেলি মাছ নাম হলেও এটি সিলেনটারেটা (coelenterata) পর্বের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। জেলিফিশ বহু ধরনের আছে। সচরাচর যেটি পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রোপকূলে দেখা যায় তার নাম অরেলিয়া। অরেলিয়া দেখতে ছাতার মতো। এর পরিধি ৩-৪ সেন্টিমিটার।

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অনেক বড় জেলি মাছ দেখা যায়। বড় জেলি মাছের আরেক নাম সূর্যজেলি মাছ। কক্সবাজারে যেটি দেখা যায় এটির নাম চন্দ্রজেলি মাছ। এর ছাতার মতো উত্তল তলকে বহিঃছত্রক তল এবং নিচের অবতল তলকে অধঃছত্রক তল বলা হয়। ছত্রকের কিনারায় সমান দূরত্বে আটটি গর্ত থাকে। প্রতি গর্তে থাকে একটি টেন্টাকুমোসিস্ট

নামের ইন্দ্রিয়। ছাতার পুরো কিনারা জুড়ে থাকে ছোট ছোট কর্ষিকা। স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। কর্ষিকা দিয়ে ওরা চারপাশের অবস্থা অনুভব করে। অবতলের কেন্দ্রে স্যানুব্রিয়াম নামক খাটো অঙ্গ থাকে। এর পুরোভাগে থাকে মুখ। মুখের চার কোণ থেকে চারটি দীর্ঘ বাহুর মতো গজায়। কর্ষিকা ও বাহুর সাহায্যে ওরা ডিম, মাছ, ছোট ছোট শূককীট এবং প্রাণীদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ধরে খায়। স্ত্রী ও পুরুষ জেলিফিশের ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলনে শিশু জেলিফিশের জন্ম হয়।

ত. চ.

জৈবজ্বালানি (biomass)

প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহনিঃসৃত কোনো পদার্থকে জ্বালানি (দ্র) হিসাবে ব্যবহার করা হলে সেই জ্বালানিকে জৈবজ্বালানি বলা হয়। বর্তমানে পশুর মল থেকে বায়োগ্যাস তৈরি হচ্ছে যা জ্বালানি হিসাবে অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হাওয়াই ও কাউয়াই দ্বীপে আখের ছোবড়া থেকে মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল

অ্যালকোহল ও ভূ-তাপীয় শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। আখকে প্রথমে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। তার পর লম্বা গোলাকৃতির ধাতব দণ্ড দিয়ে তা মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় আখের রস বের হয়। রসকে জ্বাল দিয়ে গুড় বা চিনিতে পরিণত করা হয়। রস নিংড়ানো ছোবড়া এবং আখের পাতা বড় পাত্রে নিয়ে জলসহ জ্বাল দেওয়া হয়। এতে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্প টারবাইনের (দ্র) মাধ্যমে প্রবাহিত করে জেনারেটর চালানো হয়। জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। টারবাইন থেকে বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত এগজস্ট বাষ্প অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি করে। একই সময়ে ঘনীভূত বাষ্প পানি ফোটানোর পাত্রে পানি হিসাবে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়া চালাতে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। হাওয়াই ও কাউয়াই দ্বীপে প্রায় প্রতি খামারে এই প্রকল্প চালানো হচ্ছে। গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেলের বিকল্প হিসাবে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার সফল হয়েছে ভারতে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতে ১০০ ভাগ মিথাইল অ্যালকোহল দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব। তবে এর জন্য একটি ভিন্ন ধাঁচের কার্বুরেটর (দ্র) বানাতে হবে। কেবল আখের ছোবড়া নয়, ধানের খোসা, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদিকেও এ কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশে ব্যাপক আখের চাষ হয়। আখের ছোবড়াকে এ দেশেও জৈবজ্বালানি হিসাবে ব্যবহার লাভজনক বিবেচিত হতে পারে। বায়োগ্যাস (দ্র) যে লাভজনক তা প্রমাণিত হয়েছে।

ত. চ.

জৈবদ্যুতি (bioluminescence)

জীবের দেহ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আলো নিঃসৃত হয় সে আলো বা দ্যুতিকে জৈবদ্যুতি বলা হয়। ইংরেজিতে এই আলোর নাম বায়োলুমিনিসেন্স (bioluminescence)– bio অর্থ জীব, luminescence অর্থ আলো বা দ্যুতি।

অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে অতিকায় মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এ রকমের জৈবদ্যুতি দেখা যায়। স্থলজ ও জলজ উভয় প্রকার প্রাণীতে জৈবদ্যুতি আছে। স্থলজ অর্থাৎ স্থলভাগে জন্মায় এমন প্রাণীদের মধ্যে ফায়ার ফ্লাই, গ্লো ওয়ার্ম এবং আমাদের সকলের পরিচিত জোনাকি (দ্র) পোকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। যেসব জলজ বা জলে জন্মানো প্রাণীতে জৈবদ্যুতি লক্ষ করা যায় তাদের প্রায় সবগুলোই সমুদ্রের বাসিন্দা। এদের মধ্যে অতি ছোট নক্টিলুকা (Noctiluca) যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক মাছ। এরা সমুদ্রের তলায় যেন আলোর মালা সাজিয়ে রাখে। এই আলোর মালা দেখে এক সময় বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে সমুদ্র দিনভর সূর্যের যে আলো শোষণ করে তা রাতে ছেড়ে দেয়। এই আলো যে জীবদেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়, তখন তাঁরা তা জানতেন না। পরে বিজ্ঞানীরা জীবদেহ থেকে যে আলো নির্গত হয় তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন এবং এর কারণও ব্যাখ্যা করেন।

বিজ্ঞানীদের মতে, এ সকল প্রাণীর দেহে লুসিফারেজ ও লুসিফেরিন নামে দু' ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। লুসিফেরিনের সঙ্গে অক্সিজেনের (দ্র) উপস্থিতিতে লুসিফারেজ সংযুক্ত হলেই এই আলো উৎপন্ন হয়।

অনেক সময় কয়েক ধরনের ব্যাকটেরিয়াও এই আলো সৃষ্টি করে থাকে। খোলস ছাড়ানোর পর অনেক চিংড়িতে (দ্র) এবং অনেক সামুদ্রিক মাছে এসব ব্যাকটেরিয়া যুক্ত থেকে জৈবদ্যুতি সৃষ্টি করে।

ত. চ.

জৈবসার (compost)

সংঘবদ্ধ চাষাবাদ শুরু হওয়ার পর থেকে অনবরত চাষের ফলে জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পায় এবং ফসলের উৎপাদন হার কমে আসে। এ অবস্থা নিরসনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সার দু' ধরনের হতে পারে– রাসায়নিক সার এবং জৈবসার। জৈবসার হল সে ধরনের সার যার মধ্যে প্রচুর বাছাইকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব থাকে, যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। ঐ অণুজীবগুলো বিভিন্নভাবে গাছের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে গাছকে সতেজ রাখে। ফলে ফলন বেড়ে যায় অথচ জমির ক্ষতি হয় না। জৈবসার তিন প্রকার– নাইট্রোজেন ধৃতিকারী, ফসফরাস দ্রবীভূতকারী এবং আবর্জনা/কমপোস্ট থেকে গাছের খাদ্য সরবরাহকারী। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন মিথোজীবী এবং অমিথোজীবী প্রক্রিয়ায় মাটিতে ধৃত হয়। মিথোজীবী অণুজীবগুলো সাধারণত শিম্বী জাতীয় বা অন্য উদ্ভিদের সাথে

মিলেমিশে বাস করে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন স্থিত করে। এ কাজে মূলত কিছু ব্যাকটেরিয়া, যেমন মিথোজীবীদের মধ্যে বাইজোবিয়াম-এর বিভিন্ন প্রজাতি এবং অমিথোজীবীদের মধ্যে এজোটোক্যাবস্টর-এর প্রজাতি এবং কিছু নীল-সবুজ শৈবাল প্রধান দায়িত্ব পালন করে। এজোলো নামক এক প্রকার জলজ ফার্ন জৈবসার হিসাবে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং চীনে ধানক্ষেতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এজোলার (Anabaene azolla) গায়ে এনাকেনা এজোলো নামক এক প্রকার নীল-সবুজ শৈবাল থাকে যা নাইট্রোজেন ধৃত করে।

শা. আ.

জোনাকি (firefly, glow worm)

Arttiqpeda নামক এই পোকার দেহ থেকে এক ধরনের উজ্জ্বল নীলাভ আলো মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়। কখনো কখনো একাকী আবার কখনো দল বেঁধে ঘোরে। জোনাকি পোকার দৈহিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পোকার মতোই। জোনাকি পোকার উত্তাপ নেই। জোনাকি পোকা লম্বায় ৫ থেকে ৭.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর তাপমাত্রা মাত্র ০.০০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিজ্ঞানীদের মতে জোনাকি পোকার দেহকোষে বিশেষ ধরনের দু'টি রাসায়নিক পদার্থ আছে। এগুলি হচ্ছে– লুসিফেরিন (luciferin) ও লুসিফারেজ (luciferase)। লুসিফেরিন আমিষজাতীয় পদার্থ। এটি স্থিরতাপীয় পদার্থও (heat stable substance) বটে। লুসিফারেজ সম্পূর্ণভাবে আমিষজাতীয় পদার্থ না হলেও আমিষের অনেক গুণাগুণই এর রয়েছে। এটি মূলত এক ধরনের উৎসেচক (leazyme)। এটি স্থিরতাপীয় নয়। এই লুসিফেরিন অক্সিজেনের উপস্থিতিতে লুসিফারেজের সাথে মিলিত হলেই সৃষ্টি হয় তাপহীন আলো। জোনাকি পোকা যখন শ্বাস নেয়, তখন বায়ুর অক্সিজেন দেহের ভেতর প্রবেশ করে কোষে সঞ্চালিত হয়। এ সময় অক্সিজেন জোনাকি পোকার দেহের আলোকপ্রদানকারী কোষে চলে যায়। সেখানে লুসিফারেজের সাথে মিলিত হয়ে লুসিফেরিনের জাগরণ ঘটে। ফলে আলো জ্বলে। জোনাকি পোকা যখন নিশ্বাস ফেলে তখন কোষে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে আলো নিভে যায়। এভাবেই জোনাকি পোকা মিটমিট করে জ্বলে আর নেভে।

অ. ব.

জোয়ার (millet)

জোয়ার এক ধরনের বর্ষজীবী খাদ্যশস্য। এর ইংরেজি নাম মিলেট (millet), বৈজ্ঞানিক নাম *সর্ঘাম ভালগেয়ার (Sorghum Vulgare*, (h.) Pers.)। এর গাছগুলো ১ মিটার থেকে ৪.৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বেশির ভাগ জোয়ারেই পাশকাঠি হয় না। এরা অনাবৃষ্টি সহ্য করতে পারে। জোয়ারের দানায় ভুট্টার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে প্রোটিন থাকে। বহুবর্ষজীবী জনসন ঘাস এর অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জোয়ারের ব্যাপক চাষ হয়। শ্রেণিভেদে এর দানার রঙ লাল, সাদা, কালো ও হলুদ হয়। সাধারণ জোয়ার বা প্যানিকাম মিলিসিয়াম (Panicum miliceum h.) প্রাচীন কাল থেকে মানুষ ও পশুর খাদ্য। উত্তর আমেরিকায় শিয়ালের লেজের মতো জোয়ার (Indian millet), সেটারিয়া গ্লাওকা বোভ (Setaria glauca beauv) পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে গমের আটার পরেই জোয়ারের আটার স্থান। জোয়ার বাংলাদেশে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ফসল নয়।

মু. আ.

জোয়ার-ভাটা (ebb and flow)

চাঁদ (দ্র) ও সূর্যের (দ্র) মহাকর্ষণজনিত আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠের পানি যখন কোথাও ফুলে ওঠে, তখন সেখানে জোয়ার; আর অন্য জায়গায় পানি নেমে যায়, তখন সেখানে ভাটা। এটি সব জলাশয়ে ঘটলেও সমুদ্র-উপকূলের সংলগ্ন নদী-খাল ইত্যাদিতে সমুদ্রের ফুলে ওঠা বিপুল পানি প্রবেশ করতে পারে বলে সেখানেই পানির ওঠা-নামাটি স্পষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, এ রকম স্থানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আসা জোয়ার আর ভাটা মানুষের কোনো কোনো কাজ-কর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন জোয়ারের সময় পানি বাড়লে জাহাজ সহজে বন্দরে ভিড়তে পারে, ভাটার সময় অচল হয়ে থাকা নৌকার মাঝি জোয়ারের স্রোতে নৌকা ছাড়েন, ভাটায় পানি সরলে বেলাভূমিতে ঝিনুক

কুড়োবার সুযোগ হয় ইত্যাদি। জোয়ার-ভাটার টান থাকলে পানি আবদ্ধ থাকে না, ময়লা আবর্জনা ধুয়ে যেতে পারে।

চাঁদের চেয়ে সূর্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ গুণ বেশি ভারী। ভরের (দ্র) সঙ্গে আকর্ষণ সমানুপাতিকভাবে বাড়ে, কিন্তু দূরত্বের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে তা কমে। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চেয়ে সূর্যের দূরত্ব ৩৯০ গুণ বেশি। তাই শেষ অবধি জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণটাই বেশি কার্যকর। চাঁদ ভূপৃষ্ঠের যে জায়গায় ঠিক উপরে থাকবে সেখানকার পানি ফুলে উঠবে। একই সঙ্গে পৃথিবীর কঠিন অংশও সেদিকে কিছুটা সরে আসবে বলে ভূ-গোলকে এর ঠিক বিপরীত জায়গায় পানিও ফুলে উঠবে। এই দুই জায়গায় এ সময় জোয়ার। এখানে আবার জোয়ার আসবে নিজ অক্ষের (দ্র) উপর পৃথিবীর আবর্তনে চাঁদ যখন আবার এই দুই জায়গায় রেখা বরাবর আসবে তখন, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা পর। অবশ্য একই সময়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে চাঁদেরও কিছু পরিক্রমা ঘটবে বলে আরো ২৫ মিনিট বেশি সময় কাটবে দুই জোয়ারের মাঝে। এই দুই জোয়ারের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি ভাটার অবস্থা– তখন চাঁদের টান অন্যত্র সরে গেছে বলে পানি সমুদ্রের দিকে সরে গিয়ে নেমে যাবে। সব জোয়ার অবশ্য একই রকম তীব্র হয় না। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চাঁদ ও সূর্য উভয়ে পৃথিবীর সঙ্গে একই সরলরেখায় থাকে বলে জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণটুকুও যোগ হয়। তাই তখন ভরা জোয়ার। আবার পূর্ণিমা ও অমাবস্যার মাঝামাঝি চাঁদ থাকে পৃথিবীর যেদিকে সূর্য থাকে তার সমকোণে। জোয়ারের তীব্রতা তখন তাই সবচেয়ে কম হয়– এটি মরা জোয়ার।

জোয়ারের তীব্রতা উপকূলের ও নদী-মোহনার আকৃতির ওপরও কিছুটা নির্ভর করে। ফানেল আকৃতির নদী-মোহনায় জোয়ারের পানি প্রচুর ঢুকে অনেক উচ্চতা পর্যন্ত ফুঁসে ওঠে। ভাটার সময় বাইরে পানি নেমে গেলে এই পানিকে নিচে পড়তে দিয়ে জলবিদ্যুৎ (দ্র) তৈরি করা হয়। জোয়ার-ভাটা এভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির চমৎকার উৎস হতে পারে।

মু. ই.

জোলিও-কুরি, জঁ [১৯০০-১৯৫৮]

জন্ম ১৯শে মার্চ ১৯০০, প্যারিসে। পিতা নাম রাখেন জঁ ফ্রেদেরিক জোলিও (Jean Frédéric)। প্যারিস ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি থেকে স্নাতক (১৯২২) ডিগ্রি লাভ করে প্যারিসের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে গবেষণা-সহকারী হিসাবে যোগ দেন।

বিজ্ঞানী মাদাম কুরির বড় মেয়ে ইর‍্যান কুরি (Iréne Curie জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, প্যারিস) ইতোমধ্যে মায়ের সহকারী হিসাবে রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন। জোলিও এবং ইর‍্যান দু'জনেই সমমনা জুটি খুঁজছিলেন। ফলে ১৯২৬ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহ সূত্রে তাঁরা দু'জনেই জোলিও-কুরি (Joliot-Curie) পারিবারিক নাম গ্রহণ করেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা ১৯৩২ সালে নিউট্রন (দ্র) এবং ১৯৩৩ সালে (দ্র) পজিট্রন কণিকার সন্ধান পান। কিন্তু সামান্য কয়েক দিনের ব্যবধানের জন্য দু'টি আবিষ্কারের গৌরবই পান যথাক্রমে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক এবং অ্যান্ডারসন। তাঁরাও আলাদাভাবে এই গবেষণা করছিলেন। জোলিও-কুরি দম্পতি ১৯৩৪ সালে বোরন থেকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন আইসোটোপ উৎপাদন করে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপাদনের সূচনা করেন। এ জন্য ১৯৩৫ সালে তাঁরা রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

তাঁরা উভয়েই জার্মান-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের স্বাধীনতার পর ফ্রেদেরিক

ফরাসি পরমাণুশক্তি কমিশনের প্রধান এবং ইর‍্যান অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ১৯৪৮ সালে প্রথম পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করে।

ফ্রেদেরিক এবং ইর‍্যান দু'জনেই ফ্রান্সের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০-এর পর থেকে তাঁরা উভয়েই কেবল গবেষণা, শিক্ষাদান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। মায়ের মতো দীর্ঘদিন লিউকিমিয়ায় (দ্র) ভুগে ইর‍্যান জোলিও-কুরি ১৯৫৬ সালে এবং হেপাটাইটিস রোগে ভুগে ফ্রেদেরিক জোলিও-কুরি ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

স. রা.

জ্বর (fever, pyrexia)

কোনো কোনো রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকে জ্বর বলা হয়। কারণ যাই হোক, দেহে তাপ উৎপাদন ও তাপ নির্গমনের ভারসাম্য নষ্ট হলে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশে তাপনিয়ন্ত্রণকেন্দ্র অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রে তাপ-উৎপাদক পাইরোজেন জাতীয় উপাদানের প্রভাবে জ্বর দেখা দেয়। জীবাণু (দ্র) বা দেহকলা থেকে পাইরোজেন তৈরি হতে পারে।

জ্বর কোনো রোগ নয়, দেহস্থ রোগের লক্ষণ বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। জ্বরের প্রত্যক্ষ কারণ সংক্রমণ (দ্র), দেহতন্ত্রের বিশেষ ধরনের রোগ কিংবা উত্তাপের সরাসরি প্রভাব (যেমন তীব্র সূর্যকিরণে সানস্ট্রোক)। জীবাণু ভাইরাস (দ্র), রিকেটসিয়া, পরজীবী (দ্র) বা ছত্রাক (দ্র) সংক্রমণের কারণ হতে পারে। আবার এলার্জি (দ্র), ঔষধের প্রতিক্রিয়া, আঘাত বা রাসায়নিক বিষক্রিয়ায়ও দেহতাপ বেড়ে যেতে পারে।

সুস্থ মানুষের দেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা মুখে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা ৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু দেশ, পরিবেশ, জাতি ইত্যাদি ভেদে এই মাত্রায় কিছুটা হেরফের ঘটে। আবার একই ব্যক্তির বগলের তাপমাত্রা মুখপথ থেকে কিছুটা কম এবং পায়ুপথের তাপ মুখপথ থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

জ্বরের প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, অবিরাম জ্বর (continuous fever) কখনো স্বাভাবিক মাত্রা স্পর্শ করে না। অন্য দিকে রেমিটেন্ট জ্বরে তাপমাত্রা নেমে আসতে পারে, তবে স্বাভাবিক মাত্রায় নামে না। কিন্তু সবিরাম জ্বর পুরোপুরি ছেড়ে গিয়ে আবার ওঠে। জ্বরের মাত্রা সংক্রমণের তীব্রতার উপরও নির্ভর করে।

জ্বর উপশমের উপায় সংশ্লিষ্ট রোগের নিরাময়। তবে জ্বর খুব বেশি হলে যন্ত্রণা লাঘব করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে জ্বরনাশক (অ্যান্টিপাইরেটিক) প্যারাসিটামল বা এসপিরিন খাওয়া যেতে পারে। এতে সাময়িক আরাম মেলে। আবার অত্যধিক জ্বরে অনেক সময় বরফ-পানি দিয়ে শরীর মুছে দিলে (স্পঞ্জিং) বা মাথায় আইসব্যাগ চাপালে জ্বর কিছুটা নেমে আসে অথবা স্বস্তি মেলে।

আ. র.

জ্বালানি (fuel)

যা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায় তাকে জ্বালানি বলে। জ্বালানি তিন প্রকার– কঠিন, তরল ও বায়বীয়। অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিন কয়লা, লিগনাইট, পীট, কাঠকয়লা প্রভৃতি কঠিন জ্বালানির আওতাভুক্ত। তেমনি কাঠসহ উদ্ভিদদেহের অন্যান্য অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে বিটুমিন ও অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কয়লার তাপশক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিগনাইট পুড়িয়েও তাপ পাওয়া যায়। জলাভূমির মসবর্গের উদ্ভিদজাত এক প্রকার পদার্থের নাম পীট। এগুলোও অনেক সময় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর তাপশক্তি বেশি নয়। কাঠ গ্রামাঞ্চলের প্রধান জ্বালানি। কাঠে প্রায় শতকরা ৪৮.৬৬ ভাগ কার্বন (দ্র) ও শতকরা ৫.৭৪ ভাগ হাইড্রোজেন (দ্র) থাকে।

তরল জ্বালানির মধ্যে পেট্রোল ও কেরোসিন (দ্র) প্রধান। তরল জ্বালানিতে ধোঁয়ার পরিমাণ কম। পেট্রোলিয়ামে (দ্র) গড়ে শতকরা ৮৫ ভাগ কার্বন ও ১৩ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে। এগুলো দহন করা হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাস ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে থাকে। উড়োজাহাজ চালানোর জন্য গ্যাসোলিন জাতীয় জ্বালানির চাহিদা বেশি। প্রায় সকল প্রকার তরল জ্বালানির উৎপত্তি পেট্রোলিয়াম খনিজ থেকে। খনিতে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে নানা প্রকার দাহ্য গ্যাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। গ্যাস জাতীয় কিছু জ্বালানির নাম নিচে

উল্লেখ করা হল মিথেন (দ্র), ইথেন, ইথিলিন (দ্র), বিউটেন, বিউটিলিন, প্রপেন, প্রপিলিন, অ্যাসিটাইলিন (দ্র), বেনজিন, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড (দ্র)।

LP গ্যাস বা তরলিত পেট্রোলিয়াম (liquified petroleum) গ্যাসও সীমিতভাবে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ গ্যাসের তাপশক্তির পরিমাণ যথেষ্ট। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিভাজনের কারণে অত্যধিক পরিমাণে তাপ নির্গত হয়ে থাকে। এক পাউন্ড কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ বিভাজনের ফলে তার চেয়ে ২৬ লক্ষ গুণ বেশি তাপ বের হয়। সেই প্রচণ্ড তাপ গ্যাস (দ্র) বা পানিতে (দ্র) শোষণ করিয়ে তার সাহায্যে স্টিম বয়লার বা টারবাইনে (দ্র) প্রয়োগ করা হয়। ফলে তা থেকে তড়িৎ-শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়।

মু. আ.

জ্যামিতি (geometry)

জ্যামিতি একটি গাণিতিক পদ্ধতি বা গণিতের একটি শাখা, যা সাধারণত বিন্দু, রেখা, তল এবং কঠিন বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। গাণিতিক পদ্ধতির ভিত্তি কিছু অসংজ্ঞায়িত উপাদান, অনুমিত সম্পর্ক, অপ্রমাণিত বর্ণনা বা স্বীকার্য (Postalates), স্বতঃসিদ্ধ (Axioms) এবং প্রমাণিত বর্ণনা বা তত্ত্ব ইত্যাদির সমন্বয়ে বিভিন্ন শ্রেণির জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ব্যবহারিক ও সৌন্দর্যবিকাশের কাজে আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণে জ্যামিতি চর্চার নিদর্শন সুস্পষ্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে জ্যামিতি চর্চার ইতিহাস ১৫,০০০ বছরের পুরাতন। 'জ্যা' শব্দের অর্থ 'ভূমি' এবং 'মিতি' শব্দের অর্থ 'পরিমাণ'। ভূমির পরিমাপ থেকে জ্যামিতি শব্দের উৎপত্তি। অনেকের মতে মিশর দেশে জমির সীমানা ও পরিমাণ নির্দেশের জন্য সর্বপ্রথম জ্যামিতির প্রচলন শুরু হয়। বিখ্যাত গ্রিক পণ্ডিত থেলিস (খ্রি.পূ. ৬০০ প্রায়), পিথাগোরাস (খ্রি.পূ. ৫৪০ প্রায়), প্লেটো (খ্রি.পূ. ৪০০ প্রায়), এরিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৫০ প্রায়) জ্যামিতির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত জ্যামিতি শাস্ত্রের সূত্রগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। খ্রি.পূ. ৩০০ অব্দে পণ্ডিত ইউক্লিড সর্বপ্রথম বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলো বিধিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করে একটি বই রচনা করেন। বইটির নাম ইউক্লিডস এলিমেন্ট (Euclid's Elements)। এটি জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রথম পুস্তক। এই পুস্তকের উপর ভিত্তি করে যে জ্যামিতি গড়ে উঠেছে তা ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি। মানুষের বিশ্বজগৎ নিয়ে এই জ্যামিতিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে এর গুরুত্ব ব্যাপক।

বর্তমানে জ্যামিতি চর্চার প্রকৃতি ও পরিধি বহু বিস্তৃত হয়েছে। জ্যামিতিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। প্রধান চারটি ভাগ হল (১) ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি, (২) নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি (অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত), (৩) গোলকীয় জ্যামিতি (Spherical geometry) ও (৪) ফ্র্যাকটাল জ্যামিতি (Fractal geometry)।

স. রা.

www.boighar.com

জ্যামিতিক প্রগাসন (geometric progression)

যদি কতকগুলো সংখ্যা বা রাশিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়......এভাবে ক্রমানুসারে সাজানো যায় তাহলে একটি ধারাবাহিক অনুক্রম পাওয়া যায়। এভাবে গঠিত অনুক্রমের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়......ইত্যাদি সংখ্যা বা রাশিকে যথাক্রমে প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ, তৃতীয় পদ......ইত্যাদি বলা হয়।

যদি কোনো অনুক্রমের প্রতিটি পদ পরবর্তী পদের সাথে একই গাণিতিক নিয়মে সংশ্লিষ্ট হয় তবে সেই অনুক্রমকে বলা হয় প্রগাসন। যেমন

2, 7, 12, 31..................প্রগাসনের পদগুলোর যোগফলকে বলা হয় ধারা, যেমন 2+7+12+31.............এটি একটি ধারা।

যে প্রগাসনে কোনো পদের সাথে পরবর্তী পদের অনুপাত সব সময় সমান থাকে, ঐ প্রগাসনকে বা ধারাকে জ্যামিতিক প্রগাসন বলে। একে গুণোত্তর প্রগাসনও বলা হয়। যেমন

3, 6, 12, 24, 48........ সাধারণ অনুপাত 2
8, 4, 2, 1, ½............ সাধারণ অনুপাত ½
2, 10, 50, 250.......... সাধারণ অনুপাত 5
a, ar, ar^2, ar^3.......... সাধারণ অনুপাত r

এখানে দেখা যায় যে, প্রগাসন বা ধারাটির প্রথম

পদকে সাধারণ অনুপাত দ্বারা গুণ করলে দ্বিতীয় পদটি পাওয়া যাবে।

সা. রা.

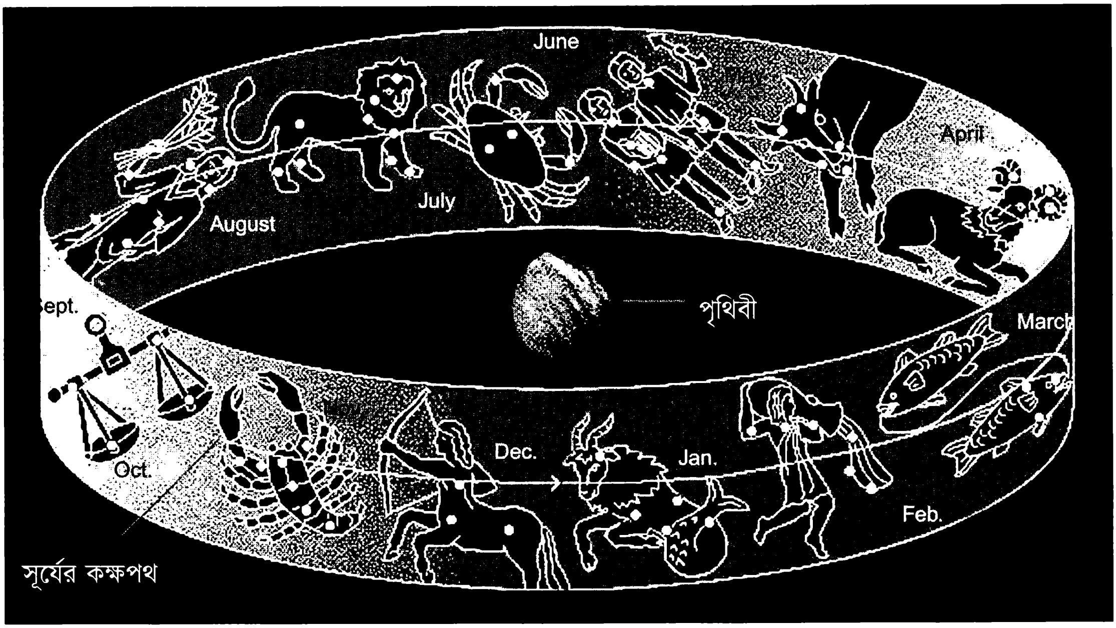

জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy)

মহাবিশ্ব (দ্র) যা কিছু নিয়ে গঠিত সেসবের পর্যবেক্ষণ এবং সেসব নিয়ে যে বিজ্ঞান তাই জ্যোতির্বিদ্যা। এটি বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাসমূহের একটি। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদগণ মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের চার্ট তৈরি করে তা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই সময় রাখা, পঞ্জিকা তৈরি, সমুদ্রে জাহাজ (দ্র) চালনা ইত্যাদি কাজে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মহাবিশ্বের একেকটি বৈজ্ঞানিক ছবিও জ্যোতির্বিদগণ খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। ১০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি যে বিশ্বচিত্রের বিস্তারিত জটিল জ্যামিতিক রূপ খাড়া করেন তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আমাদের পৃথিবী (দ্র)। পরবর্তী দেড় হাজার বছর একেই নিখুঁত বিশ্বছবি মনে করা হয়েছে। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে কোপার্নিকাসের (দ্র) সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা, একই শতাব্দীর শেষের দিকে দিনেমার জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের (Tycho Brahe) অসংখ্য নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, তাঁর সহকারী কেপলার (দ্র) কর্তৃক গ্রহের উপবৃত্তাকার পথের গাণিতিক নীতি আবিষ্কার, পরবর্তী শতকে গালিলেওর (দ্র) দূরবীক্ষণভিত্তিক আকাশ পর্যবেক্ষণ, নিউটনের (দ্র) মহাকর্ষ তত্ত্ব ও গতিসূত্র আবিষ্কার অবশেষে জ্যোতির্বিদ্যাকে তার আধুনিক রূপে এনে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

জ্যোতির্বিদ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানত দূরবীক্ষণযন্ত্রের (দ্র) সাহায্যে। লেন্সভিত্তিক প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ এবং বক্র আয়নাভিত্তিক প্রতিফলন দূরবীক্ষণ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। মানমন্দির (দ্র) হল জ্যোতির্বিদের পর্যবেক্ষণের স্থল। দৃশ্য আলোয় গড়া জ্যোতিষ্ক দেখার যে সনাতন দূরবীক্ষণ, তা ছাড়াও এখন ব্যবহৃত হয় মহাকাশ থেকে আসা দুর্বল রেডিও-তরঙ্গকে অনুধাবন করার জন্য রেডিও-দূরবীক্ষণ। একইভাবে আলট্রাভায়োলেট, ইনফ্রারেড, এক্স-রে ইত্যাদি ভিত্তিক দূরবীক্ষণও রয়েছে। এদের সঙ্গে যুক্ত আধুনিক ফটোগ্রাফি (দ্র), ইলেকট্রনিক্স (দ্র) ও কম্পিউটার (দ্র) প্রযুক্তির সুবিধা। স্পেকস্ট্রোস্কোপি বা বর্ণালিবীক্ষণের মাধ্যমে নক্ষত্রের বস্তুর গঠন, এমনকি তার গতিবিধি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব পরিমাপের মাধ্যমে দূরতম জ্যোতিষ্কেরও দূরত্ব, গঠন, গতি, বয়স, আচরণ

ইত্যাদি বহু তথ্য জানা এবং আন্দাজ করা সম্ভব হচ্ছে। মহাশূন্য অভিযানও এ ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহ (দ্র) থেকে স্কাইল্যাবের মতো মহাশূন্য-মানমন্দির থেকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে আরো স্বচ্ছন্দ ও দক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস টেলিস্কোপ (দ্র) আগের তুলনায় সাত ভাগের এক ভাগ ক্ষীণ আলোযুক্ত জ্যোতিষ্কও উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে।

আজ জ্যোতির্বিদদের সামনে রয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অতি বিস্তৃত ও বিচিত্র বিশ্ব। এতে রয়েছে গ্রহ (দ্র), নক্ষত্র (দ্র), গ্যালাক্সি (দ্র) বা নক্ষত্রপুঞ্জ, অতি দূরের শক্তিশালী বিকিরণশীল কোয়াসার, ক্ষণস্থায়ী উল্কা (দ্র), বিরল আগন্তুক ধূমকেতু (দ্র), হঠাৎ বিস্ফোরণে বিলয়প্রাপ্ত সুপার নোভা ইত্যাদি অসংখ্য সদস্য। পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে আরো নিখুঁত করে চলেছে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনস্টাইনের (দ্র) আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিল আজ তা একটি পূর্ণাঙ্গ কসমোলজি বা বিশ্বতত্ত্বে রূপ পেয়েছে। বিগ ব্যাং তত্ত্বে (দ্র) বিশ্বাসী অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ এখন মনে করেন, এক হাজার থেকে দু' হাজার কোটি বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। এর ফলে সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জগুলো ক্রমে ক্রমে পরস্পর থেকে সরে গিয়ে বিশ্বকে ক্রমপ্রসরমান করে রেখেছে।

জ্যোতির্বিদ্যার একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। তা হল এই বিজ্ঞানে শৌখিন চর্চাকারীদের অবদান। সাধারণ একটি দূরবীক্ষণ দিয়ে, এমনকি খালি চোখেও তাঁরা রাতের পর রাত নিজেদের উদ্যোগে পর্যবেক্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে ভাগ্যগণনা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি সম্পর্ক অনেকে কল্পনা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে ধারণা একেবারেই দূরীভূত হয়েছে। তখন থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে পরিগণিত করা হয়, যার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যাকে গুলিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

মু. ই.

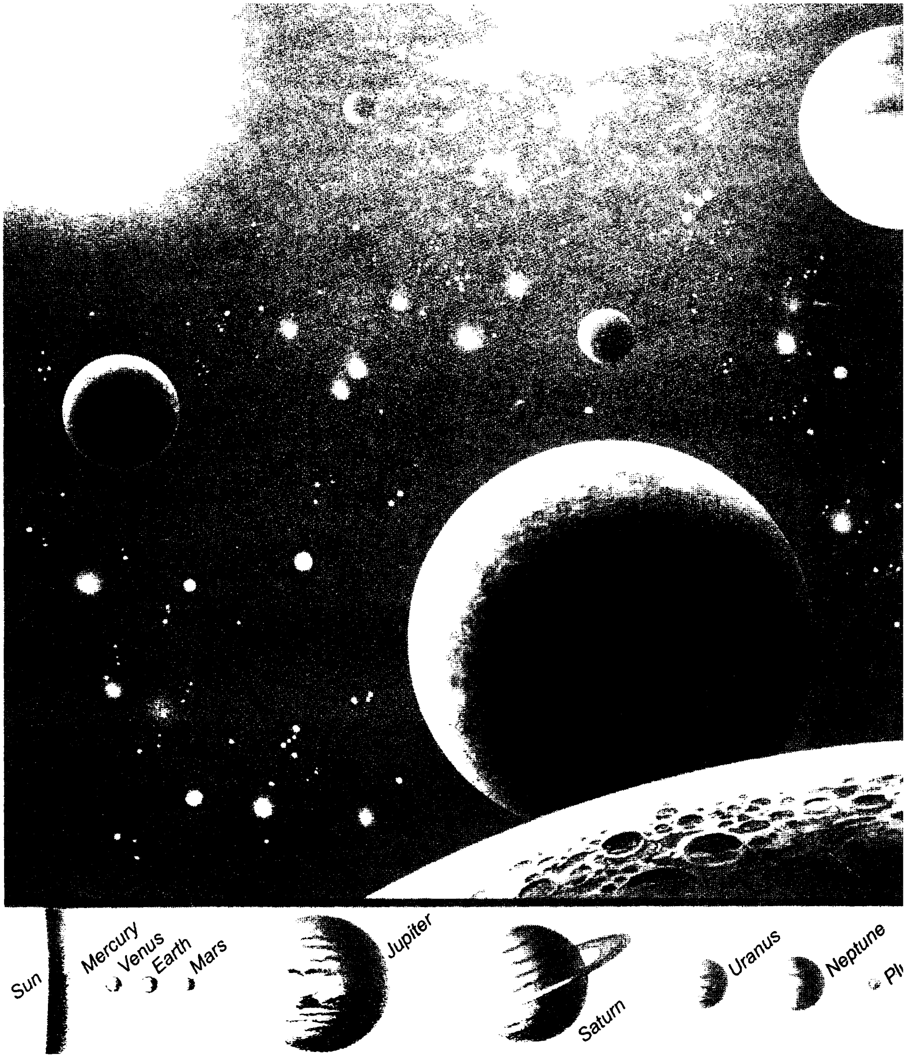

মহাবিশ্বে আমাদের সৌরজগৎ

ঝ

ঝড় (storm)

ঝড় বলতে সাধারণভাবে প্রবল বায়ুপ্রবাহকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা পরিমাপের আন্তর্জাতিক স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে আবহাওয়া-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। বিউফোর্ট স্কেলে (Beaufort scale) ঝড় হচ্ছে সেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বা বাত্যা, যার গতি ঘণ্টায় ১০৬ থেকে ১২০ কিলোমিটার। বাতাসের গতি যেখানে ঘণ্টায় ১০৬ কিলোমিটারের নিচে– যেমন ঘণ্টায় ৯১ থেকে ১০৫ কিলোমিটার, তাকে বলা হয় সার্বিক বাত্যা। ঘণ্টায় ৭৬ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় তীব্র বাত্যা। ঝড়ের বেগকে অতিক্রম করে যে বায়ুপ্রবাহ তাকে বলা হয় হারিকেন (hurricane)।

আমাদের পৃথিবী (দ্র), এর বায়ুমণ্ডল (দ্র) ও সূর্য (দ্র) একত্রে একটি তাপীয় ইঞ্জিনের মতো কাজ করে। সূর্যের বিকিরণ (দ্র) বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে উত্তপ্ত করে। গ্রীষ্মমণ্ডলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যায়। কারণ উত্তপ্ত হয়ে বায়ু হালকা হয়ে যায়। এর ফলে সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায়। বায়ুচাপের এই পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বায়ু গ্রীষ্ম এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় আয়ন বায়ু। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির জন্য এই বায়ুপ্রবাহ পাক খেতে খেতে চলে। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে হারিকেন বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন। এদের উদ্ভব ঘটে বিশেষ করে পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের (দ্র) ক্যারিবিয়ান ও মেক্সিকো অঞ্চলে এবং ভারত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে।

হারিকেন বা সাইক্লোন গ্রীষ্মমণ্ডলের মহাসমুদ্রে সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত হয়ে গরম বাতাস ও জলীয় বাষ্প উপরে উঠতে থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি বাতাসের এই স্তম্ভকেও একটি ঘূর্ণনগতি দেয়। এর ফলে এই স্তম্ভের কেন্দ্রের দিকে বায়ুচাপ কমতে থাকে। পুরো ব্যাপারটাই একটি পাক-খাওয়া লাটিমের মতন কাজ করে। বাইরে থেকে

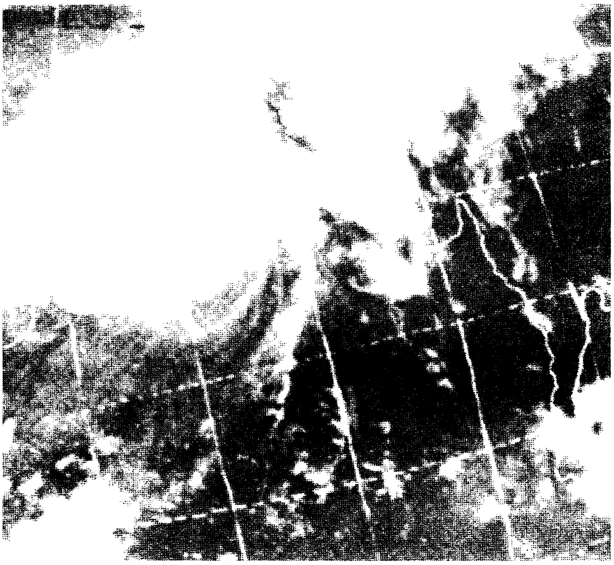

১৯৭০ সালে ১২ই নভেম্বর সকালে আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে পাওয়া বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনের ছবি। ঝড়ের কেন্দ্র ঢাকা থেকে ২৫০ মাইল দক্ষিণে রয়েছে

বাতাস যখন ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে তখন এই পাকের মধ্যে পড়ে যায় এবং ঘূর্ণনগতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এখানে লক্ষণীয় যে, কেউ যদি প্রসারিত দুই বাহুতে ভারী বস্তু ধরে পাক খেতে থাকে এবং এর পর বাহু দুটো ভাঁজ করে দেহের দিকে নিয়ে আসে তার ঘূর্ণনগতি বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ঘূর্ণনভরবেগ অপরিবর্তিত রাখতে এটা প্রয়োজন। প্রচণ্ড শব্দ করে এই ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে থাকে। যখন এই হারিকেন উপকূলে এসে আঘাত করে তখন বিপুল ধ্বংসলীলা ঘটায়। ভূমির উপর দিয়ে চলার সময় এই ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

হারিকেনেরই যমজ ভাই হল টাইফুন। দুটোই মূলত ভয়াবহ ঘূর্ণিবাত্যা, তবে একেক স্থানে একেক নাম। হারিকেন শব্দের উৎস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি শব্দ– 'হারাকান' (huracan), যার অর্থ হল 'বড় হাওয়া'। আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঝড়কে বলা হয় 'হারিকেন'। আর সেই একই ঝড় যদি হয় পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, তখন তাকে বলে টাইফুন (typhoon)। শব্দটা আসলে চৈনিক, 'তাইফুন'– এর মানে হল 'বিশাল হাওয়া'।

আ. আ.

ঝিনুক (shell)

Mellusen পর্বভুক্ত ঝিনুক জলচর প্রাণী। ঝিনুকের দেহ বেশ নরম ও পিচ্ছিল। ঝিনুকের দেহ শক্ত খোলসের মধ্যে থাকে। ঝিনুকে খোলস দু'টি। খোলস দু'টির একটি কিছুটা বড়। খোলসদ্বয় কব্জা দিয়ে আটকানো থাকে। এ জন্য এদের কবচী প্রাণীও বলা হয়। খোলস চুনগঠিত। চলাচল, খাদ্য গ্রহণ, বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কাজ করার সময় ঝিনুক খোলসের বাইরে আসে।

চলাচলের জন্য ঝিনুকের একটি মাংসল পা (foot) রয়েছে। এই পা দিয়ে ঝিনুক জলাশয়ের তলদেশের কোনো বস্তুর ওপর দিয়ে ঘষে ঘষে চলাচল করে।

প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী-ঝিনুক জলাশয়ের উদ্ভিদের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ছোট, হালকা হলুদ রঙের। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ঝিনুক স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে সাত থেকে আট বছর পর্যন্ত বাঁচে।

বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির ঝিনুক পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত Lamellidens প্রজাতির ঝিনুক।

ঝিনুক থেকে চুন পাওয়া যায়। চুন ছাড়াও ঝিনুক থেকে আরো অনেক মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়। তবে ঝিনুক থেকে সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটি পাওয়া যায়, সেটি মুক্তা। বাংলাদেশে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজাতিও কম নেই। বাংলাদেশের গোলাপি মুক্তার খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

অ. ব.

ট

টগর (wax flower)

টগরের বৈজ্ঞানিক নাম *Tabemaemontana divaricata* (L) Br., গোত্র Apocynaceae এবং ইংরেজি নাম ওয়াক্স ফ্লাওয়ার বা ইস্ট ইন্ডিয়া রোজবেরী (Wax Flower or East India Roseberry)। প্রায় ৫ ফুট উঁচু অতি সুন্দর বর্শাকৃতি সুচিক্কন পাতাবিশিষ্ট চিরসবুজ গাছ। জোড়ায় জোড়ায় এর শাখা বিভক্ত হয়। বাকল ধূসর। ফুল শাখা ভাগ হওয়ার স্থানে ক্ষুদ্র সাইস হিসাবে জন্মে। বড় আকারের সাদা আকর্ষণীয় গন্ধযুক্ত ফুল রাতেই ফোটে। ফুলের সুগন্ধ ছাড়াও পাতা এবং গাছের সৌন্দর্যের জন্যও টগর যে কোনো বাগানের ঐশ্বর্য। ফল ফলিকল-শিরায়িত ৩-৬ বীজী। শাখা কলম এবং দাবা কলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি হয়। কাঠ বেশ শক্ত

এবং সাদা ধোঁয়া হিসাবে জ্বালানো হয়। পারফিউমারিতে একে শীতক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলের লাল শাঁস এক প্রকার লাল রঞ্জক উৎপন্ন করে যা দিয়ে কাপড় লাল করা যায়। বিচ্ছুর কামড়ে টগরের শিকড় প্রতিষেধকের কাজ করে। কাণ্ড পোড়ানো কয়লা ভেষজ হিসাবে মূল্যবান। শীতের শেষে ফুল ফুটতে শুরু করে। টগর ফুল অনেক দিন ধরে ফুটতে থাকে।

শা. আ.

টনসিল / টনসিল প্রদাহ (tonsil / tonsillitis)

জিহ্বার গোড়ার দিকে আলজিভ (urula) থাকে। এই আলজিভের দু' পাশের স্থানকে টনসিল বলে। এই

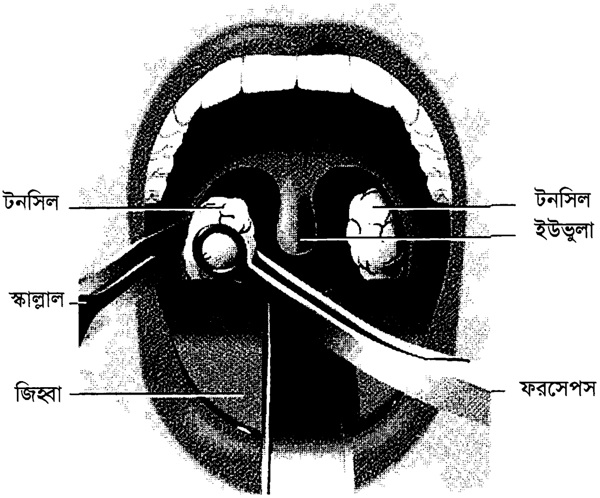

টনসিলের প্রদাহকে টনসিলাইটিস বলে। সাধারণত ঠাণ্ডা লেগে এই রোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া ঋতু পরিবর্তন, রক্তাধিক্য, ঘাম হবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সেই ঘাম বন্ধ হয়ে এই রোগের সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর ভোগান্তিকাল এই রোগে ৭ থেকে প্রায় ৩০ দিন। প্রথমে দু' পাশের টনসিল অথবা একদিকের একটি টনসিল ফুলে যায় এবং বড় হতে হতে প্রায় সুপারির মতো আকার ধারণ করে। খুব বেদনা হয়। আলজিভটি ফুলে লাল বর্ণ হয়, আহার এবং পানীয় গ্রহণের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বেদনা কান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে, জ্বর হয়। জ্বরের তাপমাত্রা প্রায় ১০৩°-১০৪° ফা. পর্যন্ত ওঠে। মুখের চোয়ালে বেদনা হয়। গলা ফুলে যায়। রোগী হাঁ করতে পারে না। টনসিল অনেক সময় পাকে এবং ফেটে যায়। পাকার আগে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। কম্পন দিয়ে জ্বর আসে। টনসিল ফেটে গেলে যন্ত্রণার উপশম হয়। রোগীর অনেক সময় স্বরভঙ্গ দেখা দেয় এবং নাকি-সুরে কথা বলে। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ মনে করেন যে রোগশূন্য টনসিল স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কারণ শক্তিশালী টনসিল অনেক সময় শরীরে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশে বাধা দেয়। কিন্তু রোগাক্রান্ত টনসিল বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অতএব টনসিল যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ রাখা উচিত।

গৌ. র.

টমেটো (tomato)

Solanaceae গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Lycopersicon lycopersicum* Mill; বাংলায় একে বিলেতি বেগুন বলা হয়। এটি ফল, সবজি, জেলি, চাটনি এবং সালাদ হিসাবে খাওয়া হয়। এতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকে।

উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য টমেটো এ দেশের খুব প্রিয় সবজি। কাঁচা ও পাকা অবস্থায় এটি সালাদ করে ও রান্না করে খাওয়া যায়। টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। রুমা, মারগ্লোব, অক্সহার্ট, সান সার্জানো, পুশা রবী ও ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশে টমেটোর কয়েকটি পরিচিত জাত। এ ছাড়া রতন ও মানিক নামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (দ্র) দু'টি উন্নত জাত বের করেছে।

জমি তৈরি করার পর বিকেলে টমেটোর চারা লাগানো ভালো। চারা লাগানোর পর এর গোড়ায় মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হয়। এ ছাড়া হালকা পানি সরবরাহ ও ছায়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। জমি তৈরি করার সময় গোবর ও ফসফেট সার ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর থেকে তিন-চার কিস্তিতে পটাশ ও ইউরিয়া (দ্র) সার উপরি প্রয়োগ করা হলে ফলন বাড়ে।

টমেটো গাছের গোড়ায় ডালপালা বেশি হলে সেগুলো ছেঁটে দিয়ে মূল গাছটি কাঠি দিয়ে সোজা রাখা দরকার। অন্যথায় গাছ মাটিতে গড়িয়ে গেলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়। আগাছা দমন করে মাটি নরম রাখলে ফলন ভালো হয়। চারা লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে কাঁচা এবং আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়।

মু. আ.

টাইফয়েড জ্বর (typhoid fever)

'সালমোনেলা টাইফি' (Salmonella typhi) নামক জীবাণু সংক্রমণে টাইফয়েড জ্বর দেখা দেয়। জীবাণুদূষিত খাবার, দুধ, পানি ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে।

এ রোগের প্রধান লক্ষণ অবিরাম জ্বর। তা ছাড়া রোগীর গায়ে পীড়কা বা র‍্যাশ (rash) সৃষ্টি হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, প্লীহার আকৃতি বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণও দেখা দিতে পারে। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র) ও কেমোথেরাপিউটিক ঔষধ আবিষ্কারের পর থেকে এ রোগে মৃত্যুর হার কমে গেছে। টিকায় (দ্র) এ রোগের প্রতিরোধ সুনিশ্চিত নয়।

সি. না. হ.

টাইপরাইটার (typewriter)

এক প্রকার লিখন-যন্ত্র যার সাহায্যে মুদ্রণাক্ষরের অনুরূপ অক্ষর সাজিয়ে লেখা যায়। এই যন্ত্রে বর্ণ, সংখ্যা, দাঁড়ি ও কমা চিহ্ন ইত্যাদি বিন্যাস করা একটি কি-বোর্ড (key-board) থাকে। সরু সরু লোহার অগ্রভাগে চিহ্নগুলো বসানো থাকে। লেখার জন্য এতে বেলনাকারের সমান্তরাল একটি বস্তুর সঙ্গে কাগজ এঁটে দিতে হয়। সমান্তরাল বস্তুটির সামনে কালিমাখা একটি কাপড়ের ফিতা আলগাভাবে বসানো থাকে। প্রয়োজনীয় অক্ষরের কি-এর ওপর চাপ দিলে অক্ষরটি ফিতার ওপর গিয়ে আঘাত করে এবং এর ছাপ মুদ্রিত হয়।

টাইপরাইটারের কি-বোর্ডে অক্ষরগুলো বর্ণক্রম অনুসারে সাজানো থাকে না, ভাষায় ব্যবহারের

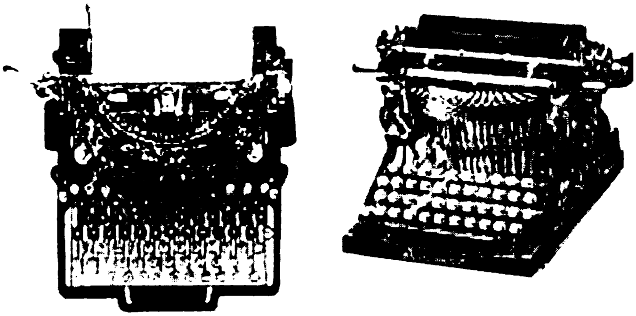

আধিক্যের ভিত্তিতে অক্ষরগুলো সাজানো হয়। টাইপরাইটারে লেখার জন্য দু' হাতের দশ আঙুলই ব্যবহার করতে হয়।

আঠারো শতকের শুরুতে চেষ্টা চললেও ১৮৬৮ সালে ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলস্ (Christopher Latham Sholes)-এর হাতে টাইপরাইটার তৈরির পরিকল্পনা উন্নত রূপ লাভ করে। এর ছ' বছর পর

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

ইলিফেলেট রেমিংটন অ্যান্ড সন্স (Eliphalet Remington and Sons) নামে বন্দুক নির্মাতা-প্রতিষ্ঠান প্রথম টাইপরাইটার বাজারজাত করতে সক্ষম হয়। প্রথম মডেলটির নাম ছিল রেমিংটন। এটি কেবল বড় হাতের অক্ষর (capital letters) সম্বলিত ছিল। ১৮৭৮ সালে পরিবর্তনশীল চাবিযুক্ত টাইপরাইটার চালু হয়। ১৯০৪ সালে টেলি-টাইপরাইটার, যা টেলিফোন বা অন্য কোনো বিদ্যুৎপ্রবাহের ভিতর দিয়ে টাইপ আদান-প্রদান করতে পারে এবং ১৯২০ সালে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার প্রবর্তিত হয়।

টাইরাইটারের জন্য নতুন নতুন অক্ষরছাঁদ (letter faces) উদ্ভাবনের চেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বাংলা টাইপরাইটারের অক্ষরছাঁদ উদ্ভাবন করেন শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। তাঁর স্মরণে জার্মান অপটিমা কোম্পানি নির্মিত বাংলা টাইপরাইটারের নাম রাখা হয়েছে 'অপটিমা মুনীর'।

প্রথম দিকে টাইপরাইটার প্রধানত দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য তৈরি হত। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার এত ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় যে এটি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে এর নানাবিধ প্রযুক্তিগত উত্তরণ ঘটে। আগে এক টাইপরাইটারে এক ভাষায় মাত্র লেখা যেত; এখন একাধিক ভাষায় লেখার উপযোগী টাইপরাইটারও চালু হয়েছে।

সুজ. ব.

টাংস্টেন (tungsten)

এটি একটি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ যা ক্রোমিয়াম (দ্র), মলিবডেনাম ও ইউরেনিয়াম শ্রেণিভুক্ত। সাঙ্কেতিক চিহ্ন W, পারমাণবিক সংখ্যা ৭৪ এবং পারমাণবিক ওজন ১৮৩.৮৫। সঙ্কর ধাতু তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দরকার হয় এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাত (দ্র) তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিজলিবাতিতে ফিলামেন্ট তৈরি করার কাজে ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

টাংস্টেন ধাতু উলফ্রাম (Wolfram) নামক আকরিক পিণ্ড থেকে নিষ্কাশিত হয়। এই মৌলিক

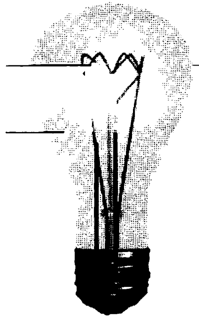

ধাতুটির রাসায়নিক প্রতীক W (উলফ্রাম থেকে)। ধাতুটির অত্যধিক তাপসহ গলনাঙ্ক প্রায় ৩৩৭০° সে.। কোনো কোনো শ্রেণির ইস্পাত, বিশেষত হাইস্পিড স্টিল উৎপাদনে ধাতুটির ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন অনুপাতে টাংস্টেন ও কার্বনের (দ্র) মিলনে উৎপন্ন যৌগিকগুলো টাংস্টেন কার্বাইড নামে পরিচিত। এর সঙ্গে আবার সামান্য কোবাল্ট ধাতুর সংযোগ ঘটালে যে উৎকৃষ্ট ধাতুসঙ্কর উৎপন্ন হয় তার বিশেষ নাম কার্ব্যালয়। এই শ্রেণির ধাতুসঙ্কর হীরকের মতো কঠিন হয় এবং ধাতু কাটার করাত তৈরি করতে যে হাইস্পিড টাংস্টেন স্টিল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার চেয়েও এই কার্ব্যালয় অধিকতর উপযোগী এবং অত্যুচ্চ তাপেও বেশ কর্মক্ষম থাকে।

আ. হ. খ.

টাকি

Chanifermes বর্গের টাকি মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Channa punctatus*। নদী, খাল, বিল, হাওড়,

বাঁওড়, পুকুর, ডোবা, দিঘিতে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টাকি মাছের পিঠ অনেকটা বাদামি বর্ণের। তবে বিল এলাকায় যেসব টাকি মাছ পাওয়া যায়, সেগুলো আকারে বড় এবং গাঢ় বর্ণের হয়ে থাকে। এদের পিঠ থেকে পেটের দিকে রঙ ক্রমশ হালকা হয়ে থাকে। টাকি মাছের মাথা দেখতে অনেকটা সাপের মতো। এই ধরনের মাথার জন্য টাকি মাছকে সর্পমাথা (snakehead) মাছও বলা হয়। এদের আঁইশ বেশ বড়। লম্বায় টাকি মাছ প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার। পিঠের পাখনা ছোট আকারের হলেও বেশ প্রসারিত। টাকি মাছ প্রধানত আগাছাযুক্ত ও কাদাপূর্ণ তলদেশে বাস করতে পছন্দ করে। এদের মুখ সরাসরি সামনের দিকে খোলে। এই ধরনের মুখের সাহায্যে টাকি মাছ খুব সহজেই আমিষজাতীয় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

টাকি মাছ মাংসাশী। জলে ভাসমান জলজ পোকা-মাকড় এবং প্লাঙ্কটন নামের ছোট ছোট জলজ কীট, ইত্যাদি টাকি মাছ খুব পছন্দ করে। এ ছাড়াও ছোট ছোট মাছ, মোলাস্কা, কীটপতঙ্গও টাকি মাছ খেয়ে থাকে। অনেক সময় এরা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চাও খেয়ে ফেলে। জলজ উদ্ভিদের সাহায্যে বানানো বাসায় স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়ে। বাসা বানায় পুরুষ-মাছ। স্ত্রী-পুরুষ পাখনা নেড়ে বাসায় অক্সিজেন সরবরাহ করে। উভয়ে বাচ্চাকে সাঁতার ও খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখায়।

ত. চ.

www.boighar.com

টারবাইন (turbine)

জলচক্র ও বাতচক্র ব্যবহার করে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের কাজ মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে করে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জলপ্রবাহের দ্বারা চালিত টারবাইন উদ্ভাবিত হয়। জলচক্র ও বাতচক্র ব্যবহারের কৌশল এখানে প্রয়োগ করা হয়। এই টারবাইনের চক্রের প্যাডেলগুলো বালতির আকৃতির করা হত। উপর থেকে পড়া পানির দ্বারা এই বালতি একটি করে পূর্ণ হয়ে এদের ওজনে চাকাকে ঘোরাত। কোনো বালতি যখন নিচে নেমে আসত তখন এর পানি উপচে পড়ত এর আকৃতির জন্য।

বিদ্যুৎ (দ্র) আবিষ্কৃত হওয়ার পর জলচালিত এই টারবাইন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। টারবাইনের

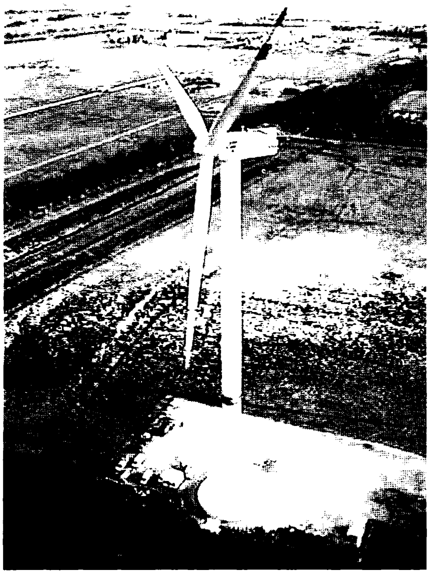

ঘূর্ণন-শক্তি এখানে জেনারেটরকে ঘোরায় এবং যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফ্যারাডের (দ্র) সূত্র এখানে কাজ করে। একে বলে টারবোজেনারেটর (turbogenerator)।

তাপশক্তির ব্যবহারে উচ্চ চাপের জলীয় বাষ্প তৈরি করে এর দ্বারা টারবাইন চালনা করা সম্ভব। উচ্চ

চাপের গ্যাস দ্বারা চালিত টারবাইনকে গ্যাসটারবাইন বলা হয়। টারবোজেট ইঞ্জিনে টারবাইন ব্যবহার করে কম্প্রেসারকে শক্তিশালী করা হয়। এরোপ্লেনে বায়ুস্ক্রুর সঙ্গে টারবাইন যুক্ত করে টারবোইঞ্জিন চালনা করা হয়।

আ. আ.

টিউমার (tumour)

দেহস্থ কোষকলার (দ্র) অস্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধিকে টিউমার বলা হয়। সাধারণত এপিথেলীয় ও সংযোজক কলা থেকে টিউমারের উদ্ভব। টিউমার-কোষের চরিত্র, অবয়ব ও ক্রিয়া দেহের স্বাভাবিক কোষ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। টিউমারের উপস্থিতি তাই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

টিউমার সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। বিনাইন (benign) বা নির্দোষ টিউমার এবং ম্যালিগন্যান্ট (malignant) বা ক্ষতিকর টিউমার। এপিথেলীয় কোষ থেকে উদ্ভূত ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে বলা হয় ক্যান্সার (দ্র) বা কার্সিনোমা (carcinoma), আর সংযোজক কলার ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের নাম সার্কোমা (sarcoma)। এই দুই ধরনের টিউমারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। এদের বৃদ্ধি খুব দ্রুত।

ক্যান্সার সর্বাধিক সংঘটিত টিউমার। তুলনায় সার্কোমার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত কম। অস্থি, তন্তুকলা এবং কখনো স্নায়ুকোষে সার্কোমা দেখা যায়, যেমন– অস্টিয়োসার্কোমা, ফাইব্রোসার্কোমা, নিউরোসার্কোমা ইত্যাদি। সার্কোমার বৃদ্ধি যেমন দ্রুত তেমনি দ্রুত রক্তপথে দেহের অন্যত্র এর বিস্তার।

বিনাইন টিউমার এপিথেলীয় ও সংযোজক উভয় কোষকলা থেকেই জন্ম নিতে পারে। এদের বৃদ্ধি খুব ধীরগতির এবং বিস্তারও স্থানিক। রক্ত (দ্র) বা লসিকাবাহিত হয়ে এদের দূরবিস্তার (metastasis) ঘটে না। তাই এরা জীবনের প্রতি ঝুঁকিও সৃষ্টি করে না। সচরাচর দৃষ্ট বিনাইন টিউমারের মধ্যে রয়েছে এপিথেলীয় কোষজাত প্যাপিলোমা, এডেনোমা এবং সংযোজক কলা থেকে উদ্ভূত ফাইব্রোমা, অস্টিয়োমা, লাইপোমা ইত্যাদি। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বিনাইন টিউমারের অপসারণই সফল চিকিৎসাব্যবস্থা।

রু. হা.

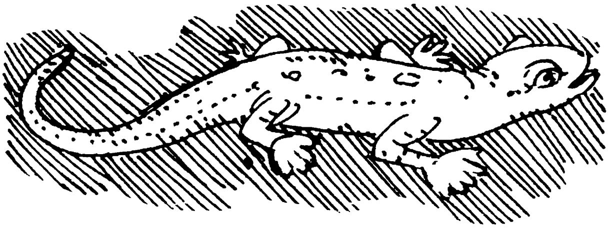

টিকটিকি (house-lizard)

টিকটিকির বেশ কয়েকটি প্রজাতি আছে। আমাদের ঘরে যে টিকটিকি আছে তা দেখতে মসৃণ। সকল টিকটিকির প্রসারণশীল জিহ্বা মোটা এবং খাটো। উপরে সরু, উঁচু উঁচু পীকড়া (villore papilla), চামড়া নরম। টিকটিকির লেজ খসে যেতে পারে। তবে দ্বিতীয়বারে যে লেজ গজাবে তাতে কোনো মেরুদণ্ড থাকবে না। তা হবে একটি মাংসল লেজ। সব আঙুলের গোড়া প্রশস্ত, সোজা এবং নখরযুক্ত। আমাদের বসতবাড়িতে যে টিকটিকি পাওয়া যায় তাদের একটি হল খসখসে টিকটিকি (Hemidactylus frooki) এদের পিঠের উপরের গুটিকা বেশ উঁচু উঁচু ও বড়, পিঠের আঁইশের গুটিকা ছোট এবং ১৮ থেকে ২০ সারিতে সাজানো। পিঠে কালো ফোঁটা থাকে। এই ধরনের টিকটিকি বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। টিকটিকির ডিম মটরদানার মতো সাদা। মশা, মাছি, তেলাপোকাসহ অন্য যেসব পোকা-মাকড় আলোর আকর্ষণে ঘরে ঢোকে তার অধিকাংশই টিকটিকির আহার হয়ে থাকে। অন্য কয়েকটি টিকটিকির প্রজাতি হচ্ছে মসৃণ টিকটিকি (Hemidactylus frenatus), গোদা টিকটিকি, ছোট টিকটিকি ইত্যাদি।

রা. জা.

টিকা (vaccine)

দেহে কোনো রোগের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য টিকা দেওয়া হয়। টিকা দেহে প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন 'অ্যান্টিবডি' তৈরি করে, যার ফলে যে কোনো রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো সংশ্লিষ্ট উপাদান দেহের মধ্যে তৈরি করে।

টিকা তৈরি করা হয় বিভিন্নভাবে। যেমন– যক্ষ্মা (দ্র) রোগের জন্য 'বিসিজি' টিকা তৈরি হয় সজীব জীবাণু তনুকরণ (attenuation) করার মাধ্যমে। মৃত জীবাণু থেকে তৈরি হয় কলেরা (দ্র) টিকা, টাইফয়েড (দ্র) ও

প্যারাটাইফয়েড রোগ প্রতিরোধকারী 'টিএবি' টিকা ইত্যাদি। তনুকৃত জীবন্ত গো-ভাইরাস থেকে গুটিবসন্তের টিকা তৈরি হয়। জলাতঙ্ক (দ্র) রোগের টিকা তৈরি হয় মৃত ভাইরাস থেকে। অধিবিষ (toxin) নিঃসরণকারী অণুজীব থেকে সংগৃহীত অধিবিষ প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমেও টিকা তৈরি হয়। এ জাতীয় টিকাকে বলা হয় টক্সয়েড (toxoid)। ডিফথেরিয়া বিরোধী 'ডিফথেরিয়া টক্সয়েড' এবং ধনুষ্টংকার (দ্র) বিরোধী 'টিটেনাস টক্সয়েড' এ জাতীয় টিকার উদাহরণ।

অধিকাংশ টিকাই গায়ের চামড়ার ভিতর দিয়ে শরীরে ঢোকানো হয়। ব্যতিক্রম কেবল পোলিও (দ্র) রোগের টিকা। এ টিকা মুখ দিয়ে খেতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় টিকা দেওয়ার পর শরীরের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা অধিকতর জোরালো করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে কোনো কোনো টিকা আবার নিতে হয়। এ অবস্থাকে বুস্টার (booster) বলা হয়।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় এ দেশের শিশুদের যেসব টিকা দেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে– যক্ষ্মা প্রতিরোধে 'বিসিজি' টিকা, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টংকারের জন্য 'ডিপিটি' টিকা, পোলিও রোগবিরোধী 'পোলিও' টিকা এবং হাম (দ্র) রোগের প্রতিরোধক 'মিজেল্‌স্' টিকা।

এ ছাড়াও যে সকল রোগের বিরুদ্ধে টিকা কার্যকর, সেগুলো হল– গুটিবসন্ত, টাইফয়েড, জলাতঙ্ক, কলেরা, হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসজনিত জন্ডিস (দ্র) এবং মাম্পস্ (দ্র)। টিকা দেওয়ার মাধ্যমে গুটিবসন্তের মতো ভয়াবহ রোগটিকে বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

সি. না. হ.

টিয়াপাখি (parakeet)

টিয়াপাখির সঙ্গে এ দেশের সকলেই পরিচিত। এরা তোতা পরিবারের ছোট ও মাঝারি আকারের সদস্য। লেজ লম্বা ও চোখা। তবে কোনো কোনো প্রজাতির লেজ ছোট ও চৌকোনা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সব দেশেই বাস করে। বিশ্বে প্রায় ১১৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে চারটি। চট্টগ্রাম-সিলেটের পাহাড়-টিলা, সুন্দরবনসহ সারা দেশে টিয়া রয়েছে।

প্রজাতিভেদে টিয়ার আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। 'ভারতীয় ধূসর টিয়া' বৃহত্তম প্রজাতি। 'ক্ষুদ্র

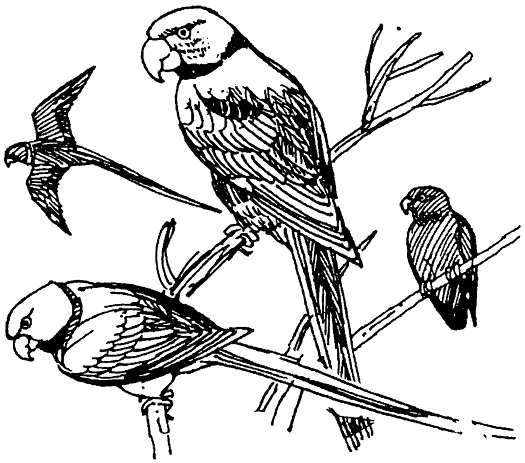

ঝুলন্ত টিয়া' গাছের ডালে পা আটকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুমায়। টিয়াপাখির নিচের ঠোঁট ছোট। ওপরের ঠোঁট বড়শির মতো নিচের দিকে বাঁকানো, অত্যন্ত ধারালো ও শক্ত– মানুষ ও পশুর চামড়াও ফুটো করে ফেলতে পারে।

টিয়াপাখি সুন্দর। প্রধানত সবুজ রঙের। তবে সবুজের সঙ্গে লাল, নীল, হলুদ, সাদার ছোঁয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার টিয়াগুলো সুন্দরতম।

এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় পোষা পাখি। বেশ বুদ্ধিমান। ঠোঁট ও পায়ের সাহায্যে নানা ধরনের খেলা দেখায়। মানুষের কথাও নকল করে। তবে ময়নার মতো স্পষ্ট হয় না।

এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওড়ে। শস্যদানা, ফলফলাদি খায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে। টিয়া গাছের খোঁড়লে বাস করে। এরা দুঃসাহসী। অন্য পাখিদের হটিয়ে বাসা দখল করতেও এরা ওস্তাদ। মৌসুমে স্ত্রী-পাখি ৪–৮টি সাদা ডিম পাড়ে। প্রজাতিভেদে ১৮–২০ দিনে বাচ্চা ফোটে। টিয়া ১০–২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

টেপ রেকর্ডার ক্যাসেট দ্র

টেরিডোফাইট (pteridophyte)

গ্রিক শব্দ 'টেরিস' (pteris) অর্থ ফার্ন (দ্র) এবং 'ফাইটন' (phyton) অর্থ উদ্ভিদ। এক ধরনের উদ্ভিদ জলজ পরিবেশ ছেড়ে কালক্রমে স্থলভাগে স্থানান্তরিত

হতে থাকে। স্থানান্তরকালে এদের কিছু সদস্য জলজ পরিবেশ থেকে স্থলজ পরিবেশের অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে রয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের বহিরঙ্গের পরিবর্তনের ফলে মূল, কাণ্ড ও পাতার উৎপত্তি হয়। ফার্ন জাতীয় এ সকল উদ্ভিদ টেরিডোফাইট নামে পরিচিত। টেরিস, আইসোইটিস, মার্সোলিয়া, লাইকোপোডিয়াম ও ইকুইসিটাম প্রভৃতি এদের উদাহরণ।

এরা মূলত স্থলজ উদ্ভিদ হলেও বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে এদের পানির প্রয়োজন হয়। ডিম্বকের সঙ্গে নিষেকক্রিয়ার জন্য এদের পরিণত শুক্রকোষকে পানিতে সাঁতার কেটেই দেহের একাংশ থেকে অন্যাংশে যেতে হয়।

টেরিডোফাইট উদ্ভিদের জীবনচক্র গ্যামেটোফাইট (লিঙ্গধর উদ্ভিদ) ও স্পোরোফাইট (রেণুধর উদ্ভিদ)– এ দুই জনুতে বিভক্ত। পরিণত অবস্থায় এরা উভয়েই স্বাবলম্বী। অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে টেরিডোফাইটই হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত।

মু. আ.

টেলিগ্রাফ (telegraph)

আধুনিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হবার মূলে অনেক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের অবদান রয়েছে। চার্লস মরিসন ১৭৫৩ সালে প্রথম এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করে দ্রুত এবং দূরে সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব। মরিসনের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ভিন্ন বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করতে হত। বৈদ্যুতিক তারের উপরে আস্তরক দেওয়ার কৌশল উদ্ভাবিত হবার ফলে বিদ্যুতের ক্ষরণ না ঘটিয়ে উচ্চ তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ সম্ভব হল। বিদ্যুতের শক্তিশালী উৎসের উদ্ভাবন ছিল আরেকটি সহায়ক অগ্রগতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ কয়েক জন উদ্ভাবক মাত্র দু'টি তার ব্যবহার করে টেলিগ্রাম পাঠাবার ধারণা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল টেলিগ্রামের ক্ষেত্রে আরেকটি অগ্রগতি। ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী উর্সটিড (দ্র) তড়িৎ-চুম্বক আবিষ্কার করেন ১৮২০ সালে। উর্সটিড দেখালেন যে, একটি তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং এর প্রভাবে একটি চুম্বক-শলাকা নড়ে উঠতে পারে। ফরাসি

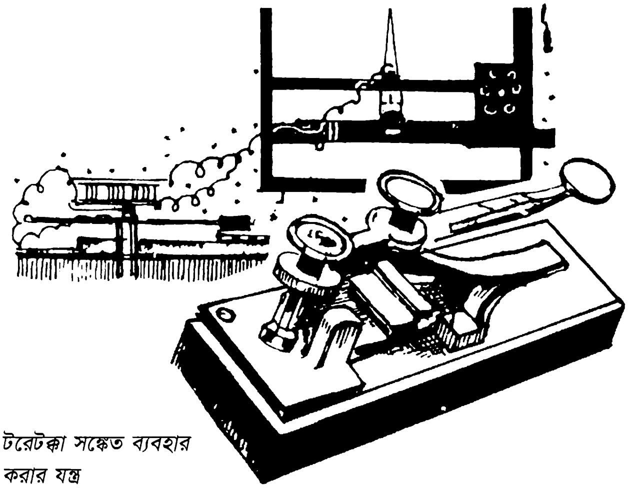

টরেটক্কা সঙ্কেত ব্যবহার করার যন্ত্র

গণিতবেত্তা ও পদার্থবিজ্ঞানী অঁপ্যার ধারণা দিলেন যে, চুম্বক-শলাকা ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা বাস্তবে রূপলাভ করে ১৮৩৭ সালে, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী হুইটস্টোন (Charles Wheatstone) ও কুকের (William F. Cooke) অবদানের ভিতর দিয়ে। একই বছরে স্যামুয়েল এফ. বি. মোর্স (Samuel Finley Breese Morse) আধুনিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, যেখানে যে কোনো তথ্যকে টরেটক্কা সঙ্কেত ব্যবহার করে সহজেই বহু দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। মোর্স অবশ্য ডক্টর চার্লস টি. জ্যাকসনের সঙ্গে একই জাহাজে ভ্রমণের সময় তাঁর সংলাপ থেকে ১৮৩২ সালে বৈদ্যুতিক

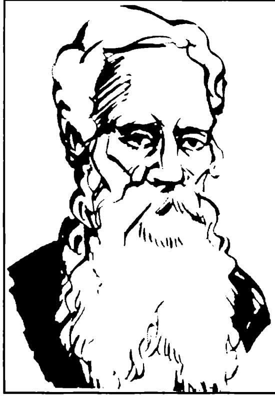

A · -	F	K - · -	P · - - ·	U · · -
B - · · ·	G - - ·	L · - · ·	Q - - · -	V
C - · - ·	H	M - -	R · - ·	W
D - · ·	I ·	N - ·	S · · ·	X - · · -
E ·	J	O - - -	T -	Y - · - -
				Z - - · ·

টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা এফ. বি. মোর্স ও তাঁর কোড

টেলিগ্রাফের ধারণাটি লাভ করেন বলে মনে করা হয়। মোর্সের মূলনীতিটি দীর্ঘদিন ধরে সব টেলিগ্রাফেই ব্যবহার করা হয়।

মূলনীতিটি হচ্ছে– প্রেরণ স্টেশনে একটি চাবিতে চাপ দিলে গ্রাহক-প্রান্তে একটি তড়িৎ-চুম্বক সক্রিয় হয়। স্প্রিংয়ের সাহায্যে কিছুটা দূরে ধরে রাখা একটি লোহার পাত এই তড়িৎ-চুম্বকের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রেরণ-প্রান্তের চাবিটি ছেড়ে দিলে স্প্রিংয়ের টানে লোহার পাত্রটি তড়িৎ-চুম্বক থেকে আবার সরে যায়। মোর্সের প্রথম টেলিগ্রামে একটি কলম লোহার পাতটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। পাতটি যখন তড়িৎ-চুম্বকটির দিকে যেত এবং ফিরে আসত তখন কলমটি একটি চলন্ত কাগজের ফিতার উপরে দাগ কাটত। প্রেরণ-প্রান্তে চাবিটি কতক্ষণ চেপে রাখা হল, তার উপরে এই দাগের দৈর্ঘ্য নির্ভর করত। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘতর রেখা মোর্সের টরেটক্কা সঙ্কেত রূপে কাজ করত। পরবর্তী কালে সঙ্কেত-প্রেরক ও গ্রাহক এত দক্ষ হয়ে ওঠে যে টরেটক্কা সঙ্কেতের বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে প্রেরিত অক্ষর তারা শব্দ শুনেই বুঝে ফেলতে পারত। ১৮৬৬ সালে যে সকল টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে লর্ড কেলভিনের (William Thomson Kelvin) উদ্ভাবিত মিরর গ্যালভ্যানোমিটার ও সাইফোন রেকর্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে অ্যাংলো-আমেরিকান টেলিফোন কোম্পানির অবদানও কম ছিল না। ১৯১৫ সালে প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ ও ১৯৩০ সালে ফ্যাকসিমিল টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে মানুষের ত্রুটি দূর করতে সক্ষম হয়।

আ. আ.

টেলিফোন (telephone)

দূরে কারো সঙ্গে কথোপকথনের যন্ত্র হল টেলিফোন। এখন টেলিফোন এমন উন্নত হয়েছে যে পথ চলতে চলতে যেমন যে কাউকে টেলিফোন করা যায়, তেমনি মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার নানা দেশে যে কারো সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। টেলিফোনে কথা বলার সময় মুখের কাছে থাকে বলার যন্ত্র, কানে থাকে শোনার যন্ত্র। বলার যন্ত্রে শব্দের কাঁপুনি একটি বিদ্যুৎবর্তনীতে বৈদ্যুতিক রোধের ওঠানামা ঘটিয়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহে নিজের রূপটি আরোপ করে। টেলিযোগাযোগে এই প্রবাহের প্যাটার্নটি অন্য টেলিফোনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে শোনার যন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহিত একটি বিদ্যুৎ-চুম্বকের (দ্র) কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঐ চুম্বকের স্থান অনুরূপভাবে বাড়ায়-কমায়। সেই অনুসারে সামনে রাখা একটি ধাতব পাত কাঁপতে থাকে ও মূল শব্দটি সৃষ্টি করে।

এককেটি এলাকায় বিভিন্ন টেলিফোন থেকে আসা সব তার সাধারণত কয়েক হাজার করে একটি গুচ্ছে এলাকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয় মাটির তলা দিয়ে। এক্সচেঞ্জগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সুইচিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেকগুলো টেলিফোনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। স্বয়ংক্রিয় ডায়ালিং ব্যবস্থায় ডায়াল ঘোরালে প্রত্যেক বার ঘোরাবার নম্বর অনুযায়ী একটি বিদ্যুৎসুইচ তত বার অন-অফ হয় এবং ততগুলো বিদ্যুৎসঙ্কেত এক্সচেঞ্জে সুইচিং-এর নিজের অংশে যায়। চাবি টিপে ডায়াল করলেও একই রকম হয়। এক্সচেঞ্জে

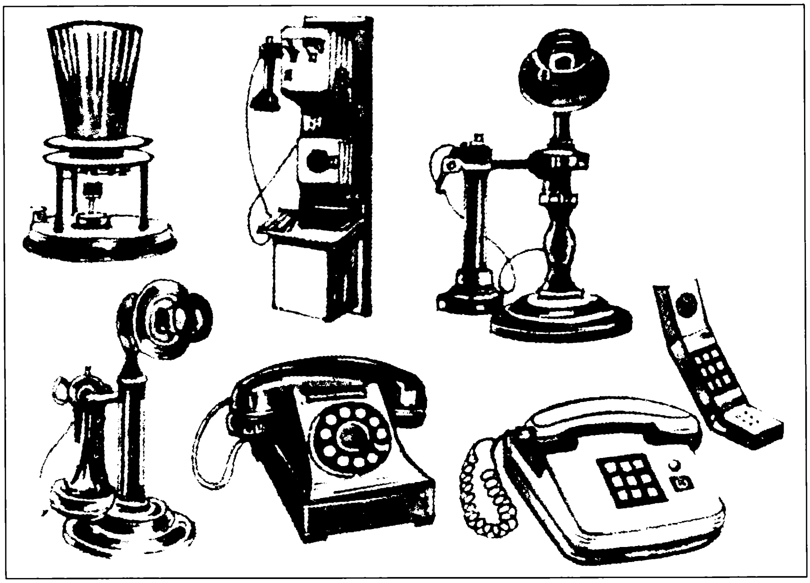

গ্রাহাম বেল

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারের টেলিফোন সেট ।

নিচে উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা

সুইচিং ব্যবস্থা দু' রকমের হতে পারে। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা এখনো অধিক চালু সেটি ইলেকট্রোমেক্যানিক্যাল বা বিদ্যুৎযান্ত্রিক। ডায়ালিং থেকে আসা সঙ্কেত অনুযায়ী একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক কিছু আড়াআড়ি দণ্ড ও কিছু খাড়া দণ্ডকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুরিয়ে কাঙ্ক্ষিত টেলিফোনের সুইচিং অংশের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করে। আজকাল উন্নততর ইলেকট্রনিক সুইচিং ব্যবস্থাও আমাদের দেশে চালু হচ্ছে। এতে কোনো যান্ত্রিক নড়াচড়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ অনেকটা কম্পিউটারের (দ্র) ভঙ্গিতে কাজ করে। এই ব্যবস্থা অনেক বেশি দ্রুত, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য। আজকাল যে বিশ্বের নানা স্থানের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে তার মূলে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ-এ রেডিও-তরঙ্গের ব্যবহার এবং ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে আদান-প্রদান করার সুযোগ।

টেলিফোন উদ্ভাবন করেন যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (দ্র) ১৮৭৫ সালে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত টেলিফোনব্যবস্থা নানাভাবে উন্নত হয়েছে। এর একটি সর্বাধুনিক উন্নয়ন হল সাধারণ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎসঙ্কেতের বদলে দু'টি মাত্র নির্দিষ্ট

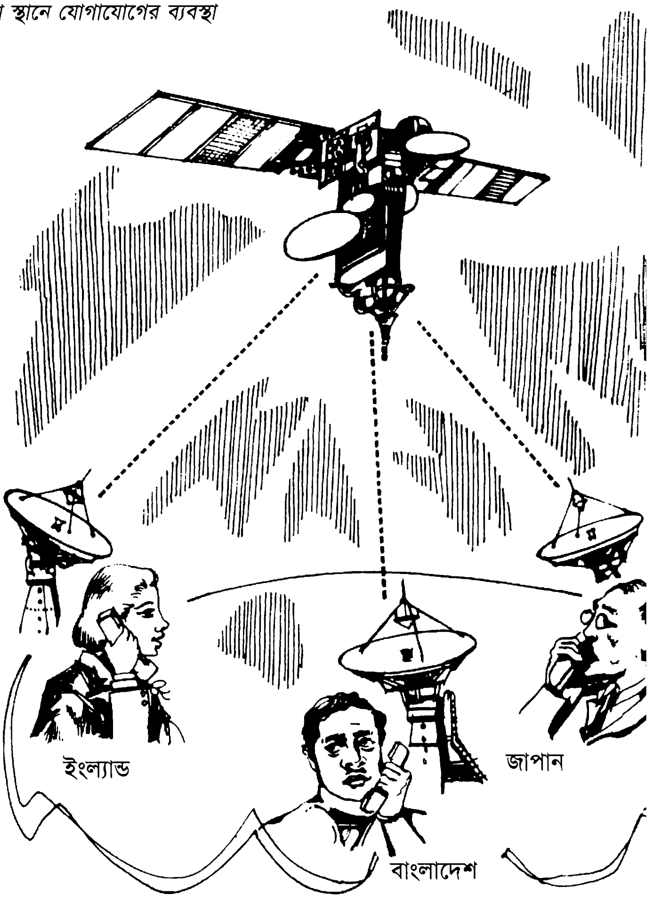

সঙ্কেতের বিচ্ছিন্ন পরম্পরায় প্রবাহের ওঠা-নামাকে সূচিত করা, যাকে বলা হয় ডিজিটাল (digital) ব্যবস্থা। এতে আরো নিখুঁতভাবে কণ্ঠস্বর বা অন্য বার্তা চলে যেতে পারে। এখন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের আকারে না গিয়ে কাচতন্তুর মধ্য দিয়ে আলোকের আকারেও সঙ্কেত প্রেরণ করা হচ্ছে। একে ফাইবার অপটিক্স (fibre optics) সিস্টেম বলা হয়। বহনযোগ্য বেতার টেলিফোন এখন সেলুলার (cellular) প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক উন্নত হয়েছে। এতে পুরো শহরকে কতকগুলো সেল বা কক্ষে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে রেডিও (দ্র) প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র বসানো হয়।

মু. ই.

টেলিভিশন (television)

টেলিভিশন হল এমন একটি যন্ত্র যা থেকে একই সঙ্গে ছবি দেখা যায় এবং শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশন কথাটি গ্রিক শব্দ tele (যার অর্থ দূর) এবং ইংরেজি শব্দ vision (যার অর্থ দর্শন) মিলে তৈরি হয়েছে। টেলিভিশনকে বাংলায় 'দূরদর্শন' বলা যেতে পারে। টেলিভিশন বলতে আমরা বুঝি আমাদের ঘরের টেলিভিশন সেটটি যা আসলে একটি টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড (দ্র) প্রথম টেলিভিশন-ছবি দূরে পাঠাতে সক্ষম হন। ১৯৪০ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেলিভিশন চালু হয়।

টেলিভিশন সম্প্রচারকেন্দ্র থেকে দু'টি প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে পৃথক পৃথকভাবে শব্দ ও ছবির সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়। টেলিভিশন সেটেও দু'টি গ্রাহকযন্ত্র থাকে। এরা শব্দ ও ছবির সঙ্কেত পৃথকভাবে গ্রহণ করে।

টেলিভিশনে আমরা চলমান ছবি দেখলেও প্রকৃতপক্ষে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় স্থিরচিত্র। স্থিরচিত্রগুলোকে এত দ্রুত (প্রতি সেকেন্ডে ৩০টি) দেখানো হয় যে ছবিগুলো আমাদের চোখে চলমান মনে হয়।

প্রতিটি ছবি অনেকগুলো (বর্তমান সেটগুলোতে ৬২৫টি) রেখায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি রেখা লক্ষাধিক অতি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বিন্দুর সমষ্টি। উত্তম চিত্রের ক্ষেত্রে বিন্দুর সংখ্যা হয় প্রায় ২ লক্ষ। টেলিভিশন ক্যামেরায় আলোকসংবেদী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর প্রলেপ দেওয়া একটি সিগন্যাল প্লেট থাকে। এর প্রতিটি ক্ষুদ্র বিন্দু পূর্বের ২ লক্ষ ক্ষুদ্র বিন্দুর একেকটির আনুষঙ্গিক।

ইলেকট্রন (দ্র) বীম প্লেটকে একটি একটি রেখা ধরে অতিক্রম করে এবং ক্ষুদ্র বিন্দুর সংগ্রহ করা সিগন্যাল বা সঙ্কেত প্রেরণ করে। প্রেরণের পূর্বে এই সঙ্কেতকে বিবর্ধিত করা হয়।

আমাদের ঘরের টেলিভিশন সেটটি দিয়ে সঙ্কেত গৃহীত ও বিবর্ধিত হয় এবং টিউব বা পিকচার টিউবে প্রদর্শিত হয়। ক্যাথোড-রে টিউবে (cathode-ray tube) অন্য একটি ইলেকট্রন বীম তৈরি হয়। এই বীম টেলিভিশনের পর্দাকে ৬২৫ বার অতিক্রম করে ৬২৫টি রেখা তৈরি করে। প্রত্যেক রেখার শেষ প্রান্ত অতিক্রম করে বীমটি পরবর্তী রেখার শুরুতে ফিরে আসে। এই ৬২৫টি রেখা $^{১}/_{৩০}$ সেকেন্ডে তৈরি হয়। ৬২৫টি রেখার একটি সেটকে বলা হয় ফ্রেম (frame)। বীমটি যখন ছবির পর্দায় ভিতরের দিকটি অতিক্রম করে তখন এটি প্রেরিত সঙ্কেত অনুসারে দুর্বল ও সবল/প্রবল হয় (ক্যামেরায় আলোকসংবেদী ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে যেমন দুর্বল বা সবল হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঠিক সে অনুসারে ক্যাথোড-রে টিউবের ভিতরের গায়ে প্রতিপ্রভ পদার্থের যে প্রলেপ থাকে তা ইলেকট্রন বীমের আঘাতে আলোকছটা বিকিরণ করে)। বীম যত সবল হয় আলো তত উজ্জ্বল হয়। শব্দ উৎপাদনের জন্য টেলিভিশন সেটে একটি লাউডস্পিকার থাকে এবং শব্দ ও ছবিকে সমন্বিত করার জন্য থাকে একটি সিনক্রোনাইজার বা সমন্বয়ক।

রঙিন টেলিভিশনের কার্যপ্রণালী আরো জটিল। এতে তিনটি প্রধান রঙ লাল, নীল ও সবুজের জন্য তিনটি পৃথক ইলেকট্রন বীম থাকে। পিকচার টিউবের পর্দায় থাকে ফসফর বা প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রায় সোয়া মিলিয়ন ক্ষুদ্র বিন্দু (dot)। এই ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো থাকে তিনটি রঙের এক একটি দল হিসাবে। এই ফসফরের ওপর ইলেকট্রন বীম এসে পড়লে তা থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়। যে ফসফরে যে রঙের সঙ্কেতের ইলেকট্রন বীম পড়ে ফসফর থেকে সে রঙের আলো

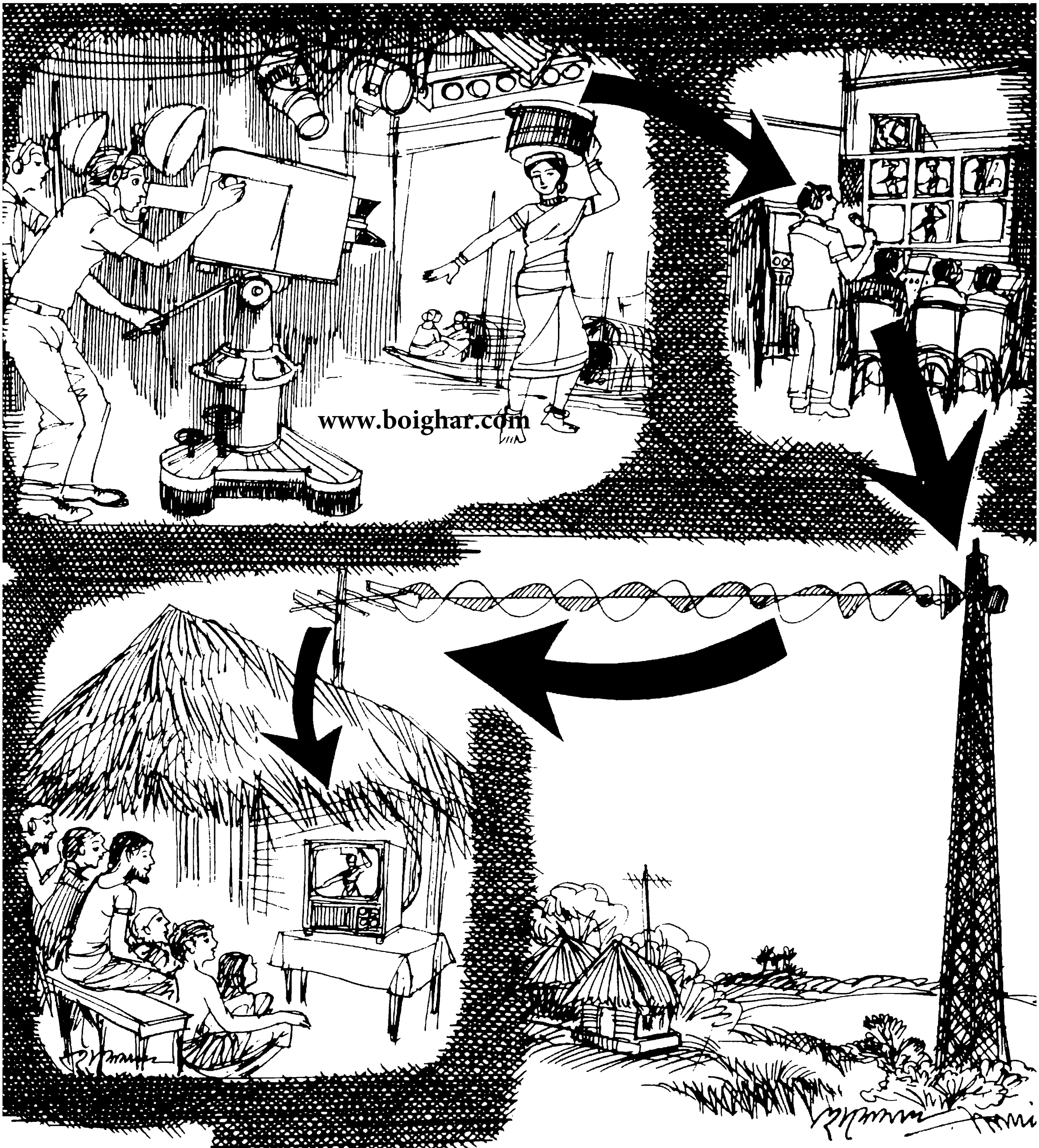

বেতারের সাহায্যে টিভি যোগাযোগ। প্রেরণ-কেন্দ্রে ছবি আর কথা পরিণত হয় বিদ্যুৎ-তরঙ্গে। তার পর বেতার-তরঙ্গে। গ্রাহক টিভি সেট বেতার-তরঙ্গ ধরে তাকে প্রথমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে, তার পর আলো আর শব্দ-তরঙ্গে পরিণত করে

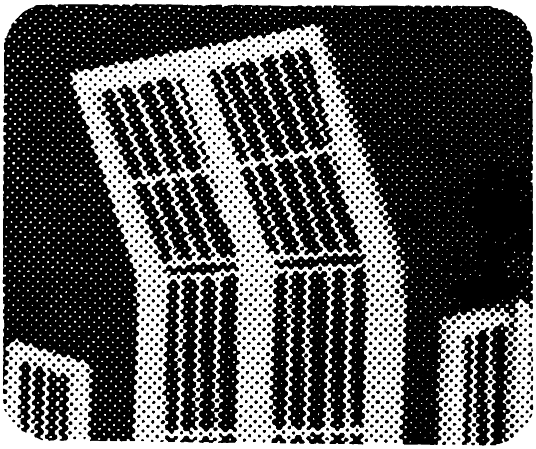

টেলিভিশনে প্রতিটি ছবি অসংখ্য রেখায় বিভক্ত। রেখাগুলো হল লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বিন্দুর সমষ্টি

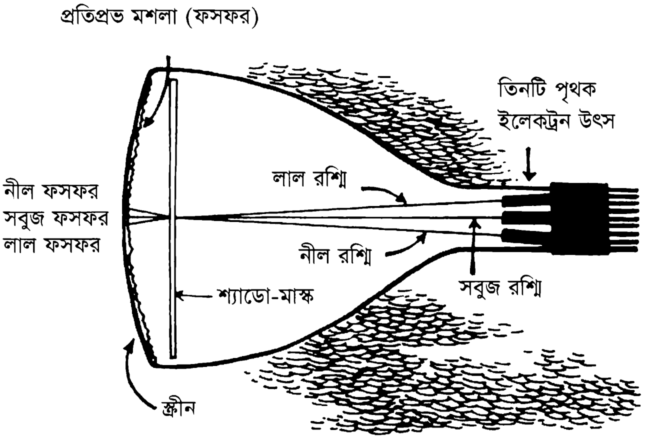

রঙিন টেলিভিশনের টিউবে আসলে রয়েছে তিন রঙের জন্য তিনটি ইলেকট্রন উৎস। তা থেকে সূক্ষ্ম ফুটোওয়ালা 'শ্যাডো-মাস্ক'-এর ভেতর দিয়ে তিনটি রশ্মি পড়ে পর্দার ওপর। তিনটি রশ্মি মিলেই হয় রঙিন ছবি

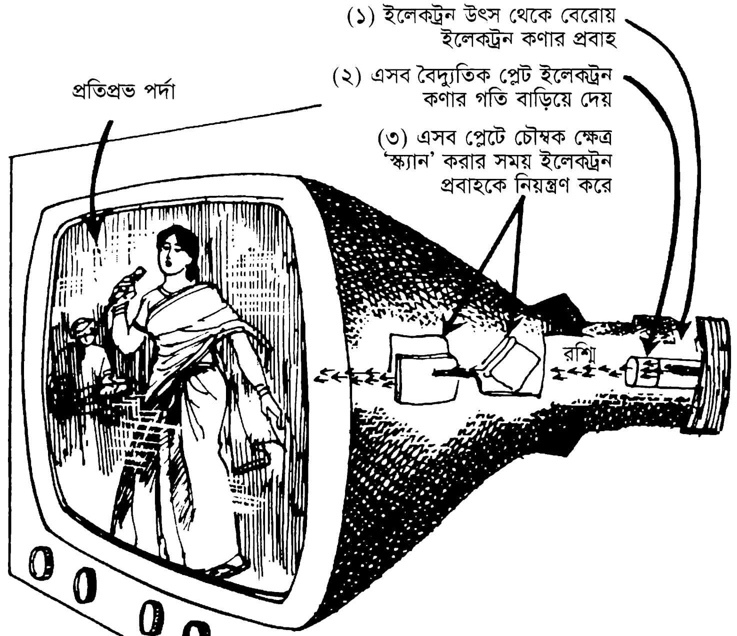

টিভি সেটের ক্যাথোড-রশ্মি টিউব। এর সরু প্রান্তে রয়েছে ইলেকট্রন রশ্মি সৃষ্টির ক্যাথোড। চওড়া প্রান্তটি টিভির ছবি দেখার পর্দা

বেরোয়। এভাবে তিন রকমের রঙের বিভিন্ন সমন্বয়ে টেলিভিশন পর্দায় রঙিন চিত্র ফুটে ওঠে। টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যেতে পারে অথবা তারের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরিত হলে ঐ টেলিভিশনকে বলা হয় ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন।

বর্তমানে প্রিন্টারসহ টেলিভিশন, পকেট টেলিভিশন, ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো পাতলা 'ফ্ল্যাট স্ক্রিন টেলিভিশন'ও তৈরি হয়েছে।

শা. ত.

টেলিস্কোপ দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্র

টোটেম (totem)

টোটেম আদিম মানবসমাজে প্রচলিত পবিত্র প্রতীক। সাধারণত গাছপালা, প্রাণী অথবা অনুরূপ কিছুকে পূর্বপুরুষের প্রতীক বলে বিশ্বাস করার প্রথা আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, রক্তের সম্বন্ধযুক্ত নির্দিষ্ট গোত্রের উদ্ভব ঘটেছে নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে। এরাই সেই গোত্রের রক্ষাকর্তা বা দেবতা। তাই এদেরকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখার বিধান চালু হয়।

অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে এখনো টোটেম-বিশ্বাসের পরিচয় মেলে। এমনকি আধুনিক সমাজের প্রচলিত কোনো কোনো অনুষ্ঠান বা অনুশাসনে টোটেম-বিশ্বাসের প্রতীকী রূপ লক্ষ করা যায়।

আ. র.

ট্রপোস্ফিয়ার (troposphere)

আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডলকে (দ্র) ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে কয়েক শ' কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত মোটামুটি পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের যে স্তর তাকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তর হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যা দশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। মেজোস্ফিয়ার চল্লিশ থেকে সত্তর কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। থার্মোস্ফিয়ার সত্তর থেকে চার শ' কিলোমিটার পর্যন্ত। চার শ' কিলোমিটারের উপরে হল এক্সোস্ফিয়ার।

উচ্চতার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত এই স্তরগুলোর বিস্তার অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থান ও ঋতুর উপর নির্ভর করে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ট্রপোস্ফিয়ার স্বভাবতই বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। আমাদের জলবায়ু (দ্র) ও আবহাওয়া (দ্র) ট্রপোস্ফিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রপোস্ফিয়ারের পুরুত্ব যদিও বেশি নয়, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সমগ্র বাতাসের প্রায় শতকরা আশি ভাগ এবং জলীয় বাষ্পের প্রায় সবটাই রয়েছে এই স্তরে। বায়ুমণ্ডল এই এলাকায় সবচেয়ে ঘন। এই ঘনত্ব উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) থাকে বলে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ও এখানে জীবনের বিকাশে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয় বাষ্প সূর্যের (দ্র) অবলাল রশ্মি শোষণে বেশি দক্ষ। ট্রপোস্ফিয়ারের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত অবলোহিত রশ্মির অনেকটা শোষণ করে নেয়। এর ট্রপোস্ফিয়ার দুইভাবে উত্তপ্ত হয়। সূর্যের বিকিরণ (দ্র) ও পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ থেকে।

ট্রপোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে কমতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের কাছে তাপমাত্রা যেখানে ২৫° সেলসিয়াস, প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য এই তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে কমে; দশ বা এগারো কিলোমিটার উচ্চতায় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকেও প্রায় ষাট ডিগ্রি নিচে নেমে যায়। বিষুবরেখা (দ্র) থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও তাপমাত্রা কমতে থাকে ট্রপোস্ফিয়ারে। মানুষসহ অন্যসব প্রাণী ও জীবের জন্য ট্রপোস্ফিয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ এতে ধারণকৃত অক্সিজেন (দ্র), জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য।

আ. আ.

ট্রানজিস্টর (transistor)

আধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হল ট্রানজিস্টর। এক সময় বৈদ্যুতিক ভাল্‌ভ সদৃশ ভ্যাকুয়াম টিউব ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সিগন্যাল বিবর্ধন ও সুইচিং-এর কাজ করত। এখন ট্রানজিস্টর

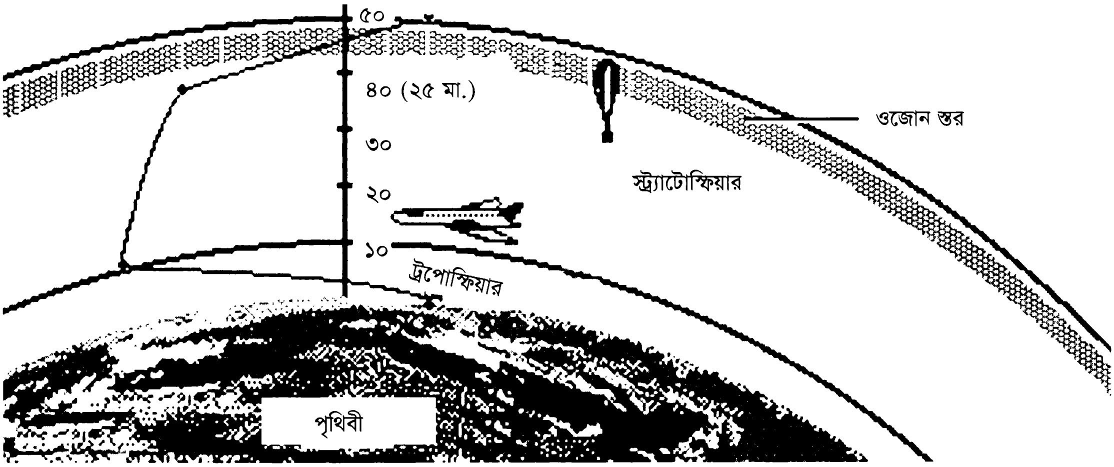

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইত্যাদি পাঁচটি স্তর

তার স্থানে একই কাজ করছে। অথচ ট্রানজিস্টর তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, অভঙ্গুর, স্থায়ী, সস্তা এবং কম বিদ্যুৎ খরচ করে। আরো বড় কথা, সাম্প্রতিক কালে কড়ে আঙুলের নখের চেয়েও ছোট একটুখানি সিলিকনের (দ্র) চিলতের ওপর হাজার হাজার ট্রানজিস্টরকে সমন্বিত করে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রকে অনেক বেশি খুদে আর সস্তা করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক এবং কম্পিউটার (দ্র) বিপ্লবের মূলে রয়েছে ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার ও তার এ রকম বিকাশ।

ট্রানজিস্টর তৈরি হয় সেমিকন্ডাক্টর বা আধা-পরিবাহী বস্তু ব্যবহার করে। এর মধ্যে সিলিকনই সর্বাধিক প্রচলিত। বিশুদ্ধ কেলাসিত সিলিকনে সামান্য পরিমাণ সুনির্ধারিত বিজাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে একে পি-টাইপ অথবা এন-টাইপ নামে অভিহিত ভিন্ন প্রকৃতির সিলিকনে রূপ দেওয়া যায়। পর পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত পি-এন এবং পি অথবা এন-পি এবং এন– এ রকম পরম্পরায় সিলিকন টুকরা ট্রানজিস্টরের কাজ করতে পারে। যথাক্রমে এমিটার, বেইস এবং কানেক্টার নামে পরিচিত এই তিনটি অংশ থেকে তিনটি সংযোগ নেওয়া হয়। এ রকম ট্রানজিস্টরকে বলা হয় জাংশন ট্রানজিস্টর– যা সমন্বিত বর্তনীতে অধিকতর ব্যবহৃত। উভয় ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর কাজ করে পি-সিলিকন এবং এন-সিলিকনের সংযোগস্থলের বিশেষ কিছু বৈদ্যুতিক গুণের কারণে। মাত্র দু'-এক ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রয়োগেই এই গুণের সুযোগ আমরা নিতে পারি। অথচ ভ্যাকুয়াম টিউবের অনুরূপ কাজের জন্য শ'খানেক ভোল্টের প্রয়োজন হত।

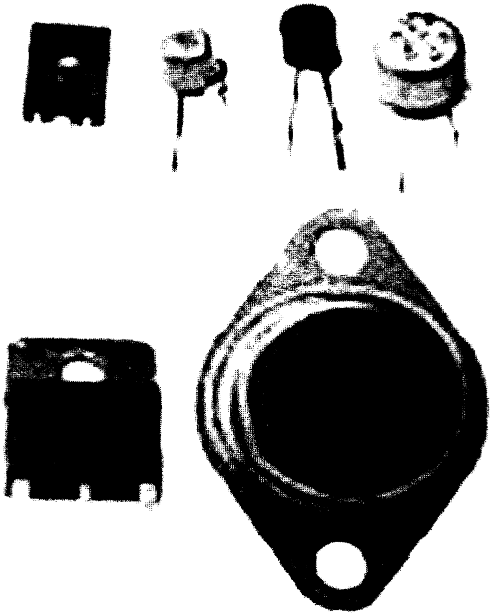

বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিস্টর

আজকের ট্রানজিস্টর রেডিওর সঙ্গে আগেকার টিউবভিত্তিক রেডিওর আকার, ওজন, দাম, স্থায়িত্ব, জটিলতা ইত্যাদি তুলনা করলেই বোঝা যায় ট্রানজিস্টর আমাদের নিত্যকার জীবনে কতখানি পরিবর্তন এনেছে। ১৯৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিদ জন বার্ডিন (John Bardeen), ওয়াল্টার ব্র্যাটেইন (Walter Brattain) ও উইলিয়াম শক্‌লি (William Bradford Shockley) ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন এবং এর জন্য তাঁরা পরে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মু. ই.

ট্রান্সফর্মার (transformer)

সচরাচর সরবরাহকৃত পরিবর্তী বা এ.সি. বিদ্যুতের ভোল্টেজ বাড়ানো অথবা কমানোর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র হল ট্রান্সফর্মার। এর সাহায্যে সহজে ও কম শক্তি অপচয় করে ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানোর কাজটি করা যায়।

বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপাদিত হবার পর তাকে দূরে সরবরাহ করতে হলে উচ্চ ভোল্টেজে তা করতে হয়, অন্যথায় পথে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয়ে শক্তির ব্যাপক অপচয় হবে। ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎকে এ জন্য উচ্চ ভোল্টেজে নিয়ে যায়। আবার ঘরে বা কারখানায় কর্মস্থলে পৌঁছানোর পর বিদ্যুৎকে ২২০ বা ৪৪০ ভোল্টের মতো সাধারণ ভোল্টেজে ব্যবহার করতে হয়। তাই সে পর্যায়ে গিয়ে আবার ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেই ভোল্টেজ কমিয়ে আনা হয়। বাড়ির বিদ্যুৎ দিয়ে ছোট রেডিও চালাবার জন্য যে অ্যাডাপ্টার সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি ট্রান্সফর্মার ২২০ ভোল্টকে ৬ বা ৯ ভোল্টে নামিয়ে আনে।

ট্রান্সফর্মারের মৌলিক গঠন হল পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানকারী অন্তরিত তারের দু'টি কুণ্ডলী নিয়ে। এদের একটিকে বলা হয় প্রাইমারি, যার মধ্য দিয়ে মূল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয়। অন্যটিকে বলা হয় সেকেন্ডারি, যার মধ্যে ভোল্টেজ-পরিবর্তিত বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সাধারণত উভয় কুণ্ডলীকে জড়ানো হয় স্তরায়িত লোহার পাতে তৈরি একটি বর্গাকার রিং-এর দুই বিপরীত বাহুকে ঘিরে, তাকে বলা হয় 'কোর'। কুণ্ডলী দু'টির পরস্পরের মধ্যে বা এদের সঙ্গে লোহার রিং-এর কোনো রকম সরাসরি বিদ্যুৎসংযোগ থাকে না। তবুও প্রাইমারির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ সেকেন্ডারিতে একই রকম পরিবর্তী প্রবাহ আবিষ্ট করে। এবং লোহার 'কোর'-এ সঞ্চারিত চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) এ কাজে সহায়তা করে। প্রাইমারির তুলনায় সেকেন্ডারিতে তারের প্যাঁচের সংখ্যা বেশি হলে, সে সংখ্যা যতগুণ বেশি সেকেন্ডারির ভোল্টেজও হবে তত গুণ বেশি। এ রকম ট্রান্সফর্মারকে বলা হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার। আবার প্রাইমারির তুলনায় সেকেন্ডারিতে প্যাঁচের সংখ্যা কম হলে তা যত গুণ কম সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজও হবে প্রাইমারির তত গুণ কম। এ রকম ট্রান্সফর্মারকে বলা হয় স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।

মু. ই.

ড

ডপলার প্রক্রিয়া (doppler effect)

উৎস এবং গ্রাহকের আপেক্ষিক গতির কারণে শব্দ, আলো বা বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের আপাত পরিবর্তনকে ডপলার প্রভাব বা ডপলার প্রক্রিয়া বলা হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জোহান ক্রিশ্চিয়ান ডপলার সর্বপ্রথম শ্রোতা ও শব্দের উৎসের

জোহান ক্রিশ্চিয়ান ডপলার

মধ্যে আপেক্ষিক গতির ফলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত পরিবর্তন লক্ষ করেন। পরে ১৮৪৫ সালে হল্যান্ডের বিজ্ঞানী বাইস ব্যালোট পরীক্ষার সাহায্যে এই প্রভাব প্রমাণ করেন। ডপলারের নামানুসারে তাই এই প্রভাবকে ডপলার প্রভাব বা ডপলার প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রোতার কাছে দূর থেকে আগত ট্রেনের হুইসেলের শব্দের কম্পাঙ্ক থেকে দূরে চলে যেতে থাকা ট্রেনের হুইসেলের শব্দের কম্পাঙ্ক কম মনে হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে হুইসেলের প্রকৃত কম্পাঙ্ক অপরিবর্তিত।

নভোবিজ্ঞানীরা (জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা) আলোক তরঙ্গের আপাত পরিবর্তন পরিমাপ করে নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করেন।

স. রা.

ডলফিন (dolphin)

সিটেসিয়া (Cetacea) বর্গের স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী। এটি দেখতে অনেকটা তিমির মতো, তবে আকারে

তিমির চেয়ে বেশ ছোট। তাই ডলফিনকে অনেকেই ছোট জাতের তিমি বলে থাকেন। দাঁতাল শ্রেণির তিমির মতো এটিরও ধারালো পরিপাটি দাঁত আছে। এর মাথার ওপর আড়াআড়ি যে ছিদ্র আছে, তার সাহায্যে এটি যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়, তেমনি হুইসেল বা শিস দেওয়ার মতো শব্দও করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে এভাবে শব্দ করে ডলফিনেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে।

www.boighar.com

ডলফিনের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর, তবে পেটের দিকের রঙ হালকা। সবচেয়ে বড় জাতের ডলফিনের নাম বোতল-নাসা ডলফিন (Bottle-Nosed Dolphin)। এটি ৯ ফুট বা ৩ মিটারেরও বেশি লম্বা এবং ২০০ কিলোগ্রামেরও বেশি ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। এদের অ্যাকোয়ারিয়ামে (দ্র) পোষ মানাতে দেখা যায়। প্রশিক্ষণ দিলে বিভিন্ন কলাকৌশল ও খেলা শিখে এরা দর্শকদের দেখাতে পারে। এরা অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। পৃথিবীর সকল মহাসাগর, সাগর ও কোনো কোনো বড় নদীতে ডলফিন পাওয়া যায়। এরা দল বেঁধে বাস করতে ভালোবাসে। সাগরে মানুষের বন্ধু হিসাবে এদের সুনাম আছে। এদের প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মাছ।

সমুদ্র-উপকূলে প্রায় ৫০ প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়। এর মধ্যে ছোট আকারের অনেকগুলোকে শুশুক (Porpoise) বলা হয়। এরা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট বা ১.৫০ মিটার এবং ওজনে ৪৫ কিলোগ্রামেরও বেশি হয়ে থাকে। এদের মুখমণ্ডল চামচের মতো বাঁকানো। ঠোঁট ডলফিনের মতো ধারালো হয় না। এরা পানির নিচে ৬-৭ মিনিটের বেশি সময় থাকতে পারে না। তাই এরা গভীর জলে ডুব দেয় না। কখনো কখনো ছোট নদীতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের নদীতে শুশুক প্রায়ই দেখা যায়।

সুজ. ব.

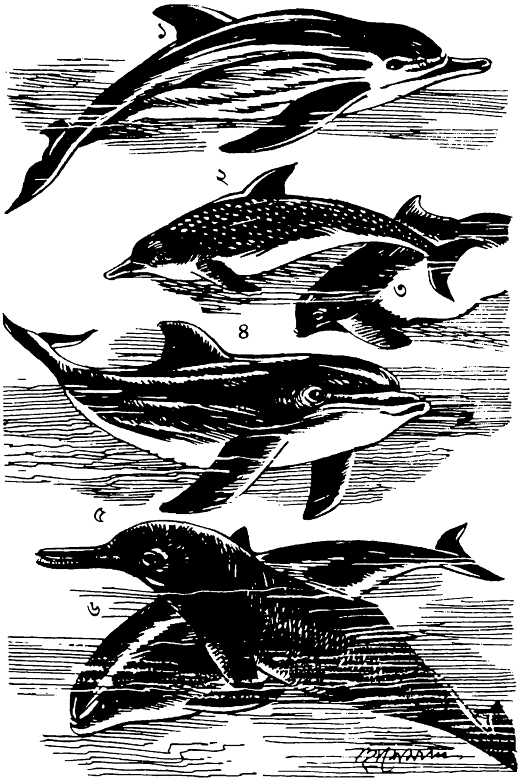

নানা রকম ডলফিন
১. সাধারণ ডলফিন, ২. দাগযুক্ত ডলফিন, ৩. ডালস শুশুক, ৪. বোতলনাকু ডলফিন, ৫. পদ্মার শুশুক, ৬. সাধারণ শুশুক

ডস (dos)

ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেমকে (Disk Operating System) সংক্ষেপে বলা হয় (DOS)। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কোম্পানি আইবিএম (IBM) পার্সোনাল কম্পিউটার (PC)-এর জন্য এই অপারেটিং সিস্টেমের বিকাশ ঘটায়। ডস-এর বিভিন্ন ভার্সন বা প্রতিরূপ প্রচলিত আছে। এদের একটি হল এমএস-ডস (MS-DOS)। এটি আইবিএম সুসঙ্গত বা সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য তৈরি। এটি বাজারজাত করছে মাইক্রোসফট কোম্পানি। অপরটি পিসি-ডস (PC-DOS)। এটি শুধু আইবিএম কোম্পানির তৈরি কম্পিউটারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেক রকম ডস বাজারে পাওয়া যায়। এর নাম ডিআর-ডস (DR-DOS)। এটি তৈরি করেছে ডিজিটাল রিসার্চ কোম্পানি। বর্তমানে এর মালিকানা গিয়েছে নভেল কোম্পানির নিকট। আর একে বলা হচ্ছে নভেল-ডস (Novell-DOS)। এমএস-ডস ও পিসি-ডস-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এরা এক ও অভিন্ন।

ডস দরকার কেন? ডস দরকার হয় প্রধানত স্মৃতি, ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে ব্যবহারিক সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে। ১৯৮১ সালে ডস-এর যে প্রতিরূপ তৈরি হয়, তা হল

DOS 2.0, DOS 2.0-এর উন্নততর প্রতিরূপ হল DOS 2.1, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে চালু হয়েছে যথাক্রমে DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2 এবং DOS 4.0 ।

শা. ত.

ডসিমিটার (dosimeter)

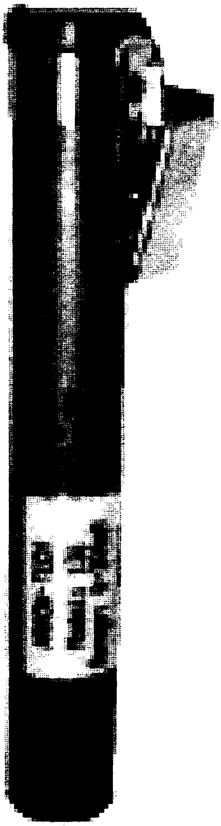

যে যন্ত্রের সাহায্যে বিকিরণ ডোজ মাপা হয় তাকে ডসিমিটার বলে। ডোজ পরিমাপের জন্য আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার, সাধারণ আয়োনাইজেশন চেম্বার ও ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ব্যবহৃত হয়।

বিকিরণ ডোজ পরিমাপের একটি অতি পরিচিত উপকরণের নাম ফিল্ম ব্যাজ ডসিমিটার (Film Badge Dosimeter)। বিকিরণ মাত্রা নিরূপণে ফটোগ্রাফিক ইমালশনের ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় ফিল্ম ব্যাজ ডসিমিটার। ছোট্ট এক টুকরা ফটোগ্রাফিক ফিল্মকে আলোনিরোধী মোড়কে আবদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফিল্মের টুকরোটি অনেকটা ডেন্টাল রেডিওগ্রাফিতে ব্যবহৃত ফিল্মের সমান আকারের হয়ে থাকে যা একটি ধারক বা ব্যাজে বসানো থাকে। ব্যাজের গায়ে একটি ক্লিপ লাগানো থাকে এবং তা দ্বারা ব্যাজটি ব্যবহারকারীর পোশাকে আটকে রাখা হয়। ব্যবহার শেষে ফিল্মটিকে প্রক্রিয়াজাত (processing) করে এর কালো হওয়ার গাঢ়ত্ব (density of blackness) ডেন্সিমিটার (densimeter) দিয়ে পরিমাপ করা হয় এবং তা থেকে ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রাপ্ত ডোজ নিরূপিত হয়। যারা বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করে বা এক্স-রে মেশিন চালান তাঁদের পকেটে এ ধরনের ডসিমিটার ঝুলানো থাকে।

শা. ত.

ডাইনোসর (dinosaur)

ডাইনোসর এক প্রকারের সরীসৃপ (দ্র)। যেসব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সরীসৃপ বলা হয়। পৃথিবীর ট্রায়াসিক যুগে অর্থাৎ এখন থেকে সাড়ে বাইশ কোটি বছর আগে ডাইনোসরেরা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করত। ১৮৪১ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ স্যার রিচার্ড ওয়েন (Sir Richard Owen) গ্রিক শব্দ ‘দেইনোস’ ও ‘সাউরস’ মিলিয়ে ডাইনোসর শব্দটি তৈরি করেন। দেইনোস অর্থ ভয়ঙ্কর, সাউরস্ অর্থ গিরগিটি– পুরো অর্থ দাঁড়ায় ভয়ঙ্কর গিরগিটি। ১৮৪১ সালের কয়েক দশক আগে বিশাল কিছু হাড়ের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানী ওয়েন ওসবের ওপর ভিত্তি করে এই সরীসৃপের চরিত্র ও জাতি নিরূপণ করেন।

ডাইনোসর সম্পর্কে সর্বজনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক এইচ. জি. ওয়েল্স্ তাঁর ‘দ্য এজ অব রেপটাইলস’ গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজও খারিজ হয়ে যায় নি। তিনি লিখেছেন কিছু এমন জন্তু (জীব বলেন নি) পৃথিবীর সর্বকালের সব ভূমিবাসী জন্তুদের অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আকারে। তারা ছিল তিমি মাছের সমান। যেমন– ডিপ্লোডোকাস কার্নেগি ঠোঁট থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ছিল ২১ মিটার লম্বা, জায়গান্টোসরাসরা ছিল লম্বায় প্রায় ৩২ মিটার। এরা ছিল উদ্ভিদভোজী। এদের মেরে খেয়ে বাঁচত টির্যানোসরাস্রে মতো ভয়ঙ্কর গিরগিটি। এদের সময়ে পৃথিবীতে একটিই মাত্র ভূ-খণ্ড ছিল। বিজ্ঞানীরা একে বলেছেন প্যাঞ্জিয়া (Pangea)। ডাইনোসরেরা জল, স্থল, বায়ু সর্বত্রই বিচরণ করত। এরা পৃথিবীতে টিকে ছিল প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর। পৃথিবী থেকে ওদের

বিলুপ্তির সঠিক কারণ এখানো জানা যায় নি। টিরানোসরাস, ডিপ্লোডোকাস, ব্রন্টোসরাস ইত্যাদি স্থলচর সরীসৃপ। জলচরদের মধ্যে রয়েছে প্লেসিওসর, ইকথাইওসর এবং টেরোড্যাক্টাইল, টেরোডন ইত্যাদি ছিল আকাশচারী।

ত. চ.

জাপানের ডাইনো পার্ক যেখানে রয়েছে ৭০টি ডাইনোসরের মডেল।
ডাইনোসরের আরো ছবি পরের পৃষ্ঠায়

ডায়রিয়া
(diarrhoea)

ডায়রিয়া বা উদরাময়ে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। ফলে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি (দ্র) ও খনিজ (দ্র) বেরিয়ে গিয়ে শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের অসমতা সৃষ্টি করে। গুরুতর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে চোখ বসে যাওয়া, জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, মূত্র নির্গমন হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি ঘটে, রক্তচাপ ও শরীরের ওজন কমে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ডায়রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। সাধারণত খাদ্যগ্রহণজনিত ত্রুটি, পরিপাক-নালির সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে স্বল্পস্থায়ী ডায়রিয়া ঘটে। দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার জন্য যে সকল কারণ দায়ী, সেগুলো হল– ভাইরাস (দ্র), জীবাণু (দ্র) এবং পরজীবী (দ্র) সংক্রমণ, ভারী ধাতবপদার্থের বিষক্রিয়া, অ্যান্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধের প্রতিক্রিয়া, যকৃতের প্রদাহ, পিত্তনালির প্রতিবন্ধকতা, অপুষ্টিজনিত অসুখ, যেমন– ম্যারাসমাস (marasmus), কোয়াশিওরকর (kwashiorkor) (দ্র), খাদ্যের প্রতি এলার্জি (দ্র) ইত্যাদি।

শরীরে প্রয়োজনীয় পানি এবং খনিজ লবণ সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়াজনিত শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর মাধ্যমে ডায়রিয়াগ্রস্ত রোগীর শরীরে পানি ও খনিজ লবণের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি খাবার স্যালাইন পাওয়া যায়। অবশ্য তিন আঙুলের এক চিমটি লবণ, এক মুঠো গুড়, আধা সের বিশুদ্ধ পানিতে মিশিয়েও ঘরে স্যালাইন তৈরি করে রোগীকে খাওয়ানো যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে শিরাপথে স্যালাইন পরিভরণের (infusion) প্রয়োজন হয়।

সি. না. হ.

ডায়াটম (diatom)

ডায়াটম এককোষী অ্যালজি (algae) বা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ। মিঠা পানি ও লোনা পানিতে এদের সর্বত্র সচরাচর দেখা যায়। এর দেহপ্রাচীর সিলিকা (silica) বা বালিমিশ্রিত রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। এই প্রাচীর দুই অর্ধে বিভক্ত এবং একটির উপর অপরটি যেন

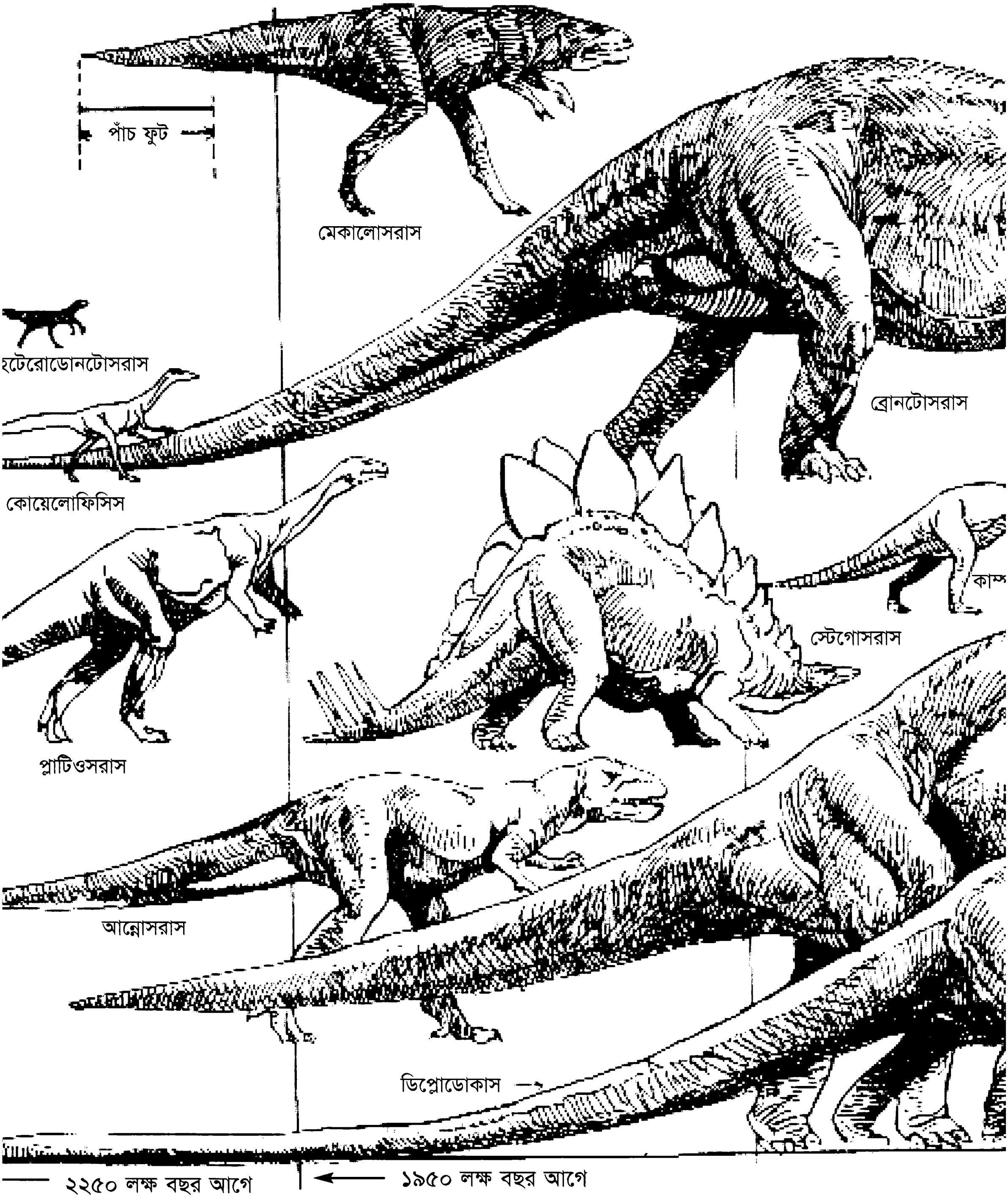

লক্ষ লক্ষ বছর আগের সরীসৃপ-ডাইনোসর। ডিম, হাড়গোড় ও ফসিল থেকে পাওয়া প্রমাণাদি দিয়ে, গবেষণা করে তৈরি ডাইনোসরের বিভিন্ন আকার ও আকৃতি

হিপসিলোপোডন
আনাতোসরাস
আইক্যুয়ানোডন
ট্রাইসেরাটপস
ভেলোসিরাপটোর
প্রোটোসেরাটপস
টাইরান্নোসরাস
ব্রাকিওসরাস
কম্পসোকনাথাস
দেইনোনাইচাস
কোরিথোসরাস
টারবোসরাস
স্ট্রুথিওন্নিমাস
টেরোসরাস
১৩৬০ লক্ষ বছর আগে
৬৫০ লক্ষ বছর আগে

বাষ্পের ঢাকনার মতো আটকে থাকে। আবার এই প্রাচীর সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকাজমণ্ডিত।

ডায়াটম বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য। ডায়াটমের দেহনিঃসৃত ক্ষরণ মাটিতে মিশে এক ধরনের খনিজ রূপ পায়। একে ডায়াটোমাইট বা ডায়াটোম্যাসিয়াস মাটি (diatomaceous earth) বলা হয়। এর অন্য নাম কিজেলগুর (kieselguhr)। নাইট্রোগ্লিসারিন নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে কিজেলগুরের সংমিশ্রণ ঘটালে ডিনামাইট তৈরি হয়।

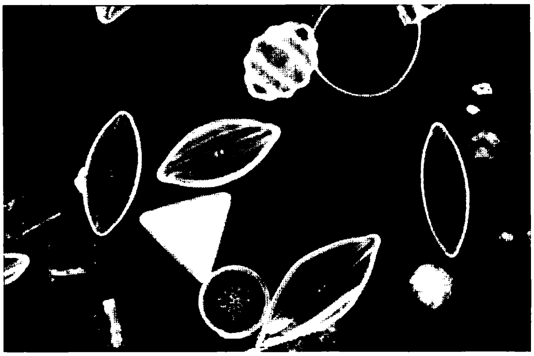

অণুবীক্ষণযন্ত্রে ডায়াটম

ডায়াটমকে ন্যাসা-প্লাঙ্কটনও বলা হয়। পানিতে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্লাঙ্কটন (দ্র) বলা হয়। প্লাঙ্কটনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বা ৬০ মাইক্রনের চেয়ে ক্ষুদ্র যারা তাদেরকে ন্যানো-প্লাঙ্কটন বলে।

ত. চ.

ডায়াফ্রাম / মধ্যচ্ছদা (diaphram)

ডায়াফ্রাম একটি মাংসপেশি যা বক্ষপিঞ্জর ও উদরগঙ্গার মধ্যে বিভাজক পর্দার মতো অবস্থান করে। এ কারণে একে মধ্যচ্ছদা বলা হয়। ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা মূলত শ্বাসতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি মাংসপেশি। গম্বুজাকৃতির এই মাংসপেশির বাইরের দিকটি মাংসল ফিতার মতো। এই মাংসপেশি বক্ষপিঞ্জরের সামনের দিকে উরঃফলক (sternum) নামক অস্থি এবং পিছনে কশেরুকা তথা মেরুদণ্ডের অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত। বক্ষদেশ থেকে ছোট বড় ধমনি ও প্রত্যঙ্গাদি ডায়াফ্রাম ভেদ করে উদর-গহ্বরে এবং শিরা-মহাশিরা

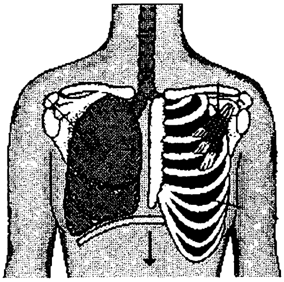

নিশ্বাস নেয়া অবস্থায় মধ্যচ্ছদা

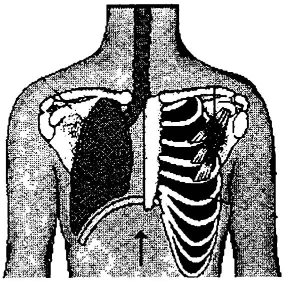

নিশ্বাস ছাড়া অবস্থায় মধ্যচ্ছদা

বক্ষ-গহ্বরে প্রবেশ করেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকালে মধ্যচ্ছদার পেশি যথারীতি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ এবং ফুসফুস থেকে বায়ু নির্গত হতে সাহায্য করে। শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা ছাড়াও মলত্যাগ ও ভারোত্তলনেও এই পেশির সহায়তা প্রয়োজন হয়।

মা. র.

ডায়াবেটিস (diabetes)

শরীরে ইনসুলিন (দ্র) নামক হরমোনের (দ্র) অভাবে কিংবা শরীরে ইনসুলিনের যথার্থ সদ্ব্যবহার না হলে রক্তে শর্করার মাত্রাবৃদ্ধিজনিত কারণে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়। ডায়াবেটিস রোগ বহুমূত্র বা মধুমেহ নামে পরিচিত। ইনসুলিন অগ্ন্যাশয়ের (দ্র) 'বিটাকোষ' থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগে দৈহিক দুর্বলতা, মূত্রের সঙ্গে শর্করা নির্গমন, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা পাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ না করা হলে তা থেকে গুরুতর উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– শরীরে কোনো ঘা শুকোতে দেরি হওয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের বা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ইত্যাদি।

ডায়াবেটিস নিরাময়যোগ্য নয়। তবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়; এবং তখন দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব। ডায়াবেটিসগ্রস্ত রোগীর জন্য দরকার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনবোধে ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসবিরোধী ঔষধ গ্রহণ। মাঝে মাঝে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। রোগীর দাঁত ও মুখের যত্নে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া,

ডায়াবেটিসের নানান শারীরিক জটিলতার বিষয়ে অবগত থাকা এবং নিজে নিজেই মূত্রে শর্করার মাত্রা নির্ণয় করতে জানা উচিত। তবে প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

সি. না. হ.

ডায়োড (diode)

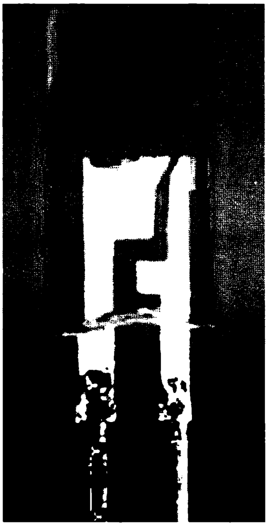

ডায়োড এমন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা সংযুক্তি যাতে দু'টি ইলেকট্রোড (তড়িৎদ্বার) থাকে। দু'টি ইলেকট্রোড থাকে বলে এর নাম ডায়োড। ডায়োড দুই রকমের– ভ্যাকুয়াম ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োড। ভ্যাকুয়াম ডায়োডে ইলেকট্রোড দু'টিকে কোনো বায়ুশূন্য কাচপাত্র অথবা ধাতবপাত্র বা সিরামিক পাত্রে স্থাপন করা হয়। ১৯০৪ সালে ভ্যাকুয়াম ডায়োড আবিষ্কার করেন স্যার জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং। ভ্যাকুয়াম ডায়োডের একটি ইলেকট্রোডকে উত্তপ্ত করলে তা ইলেকট্রন ত্যাগ করে। একে বলা হয় ক্যাথোড (দ্র) ফিলামেন্ট। এটি নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ইলেকট্রোড। অপর ইলেকট্রোডটিকে বলা হয় অ্যানোড (দ্র) বা প্লেট। এটি পজিটিভ বা ধনাত্মক ইলেকট্রোড। একে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অ্যানোডকে ক্যাথোডের সাপেক্ষে ধনাত্মক রাখা হলে ক্যাথোড যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তা অ্যানোড আকর্ষণ করে। ফলে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে ইলেকট্রনের প্রবাহ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। কিন্তু অ্যানোডকে ঋণাত্মক রাখা হলে এটি ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেকট্রনকে বিকর্ষণ করে। ফলে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে কোনো তড়িৎপ্রবাহ চলে না। সুতরাং দেখা যায়, ইলেকট্রনের শুধু একমুখী প্রবাহ ঘটে। এই জন্যই একে বলা হয় ভাল্‌ভ। প্লেট ও ফিলামেন্টকে যদি ব্যাটারি দ্বারা যুক্ত না করে কোনো এ.সি. ভোল্টেজে জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে এ.সি. থেকে ডি.সি. ভোল্টেজ পাওয়া যায়। অর্ধপরিবাহী ডায়োড একটিমাত্র p-n জংশন দ্বারা গঠিত।

শা. ত.

ডারউইন, চার্লস [১৮০৯–১৮৮২]

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) মতবাদের প্রবক্তা। ১৮৩১ সালে এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্ (H.M.S. Beagle) নামক জাহাজে চড়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ-দ্বীপাঞ্চল ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং অভিনিবেশ সহকারে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা ও তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি এই পথ পরিভ্রমণ করেন। পরবর্তী কালে সংগৃহীত এসব নমুনার বৈশিষ্ট্য দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাংলায় একে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে' নামে অভিহিত করা যায়। সংক্ষেপে তাঁর এই তত্ত্বকে 'প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব' বলা হয়। বইটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জীবজগতের বিবর্তন এবং নতুন একটি প্রজাতির উদ্ভব কীভাবে ঘটে বা ঘটতে পারে সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন ও তার সপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ সময় থেকেই তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিবর্তনবাদের জনক হিসাবে তিনি পরিচিতি পান। চার্লস ডারউইন ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি লন্ডনের শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ সালে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।

ত. চ.

ডাল (pulse)

কৃষিজাত সব রকম ডাল শিম-গোত্রের অন্তর্গত। গোত্র লেগুমিনোসি (Leguminoseae)। সব রকম ডাল

মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ডাল প্রোটিনপ্রধান খাদ্য। প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১৭ থেকে ২৮ ভাগ। এতে গমের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ও চালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ প্রোটিন আছে।

আমাদের দেশের প্রধান প্রধান কয়েক ধরনের ডাল হল

খেসারি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Lathyrus sativas*। ল্যাথারিজম রোগে নিম্নাঙ্গ অবশ হওয়ার জন্য খেসারির ডালের দুর্নাম আছে। এখন জানা যায়, খেসারির সঙ্গে একত্রে বেড়ে ওঠা Vicia sativa নামক আগাছার বিষাক্ত উপক্ষার এই রোগের কারণ।

মটর : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। মটর দু' রকম– ছোট বা পায়রা মটর, বড় বা কাবুলি মটর। ছোট মটরের ফুল নীলাভ-বেগুনি, বীজের রঙ প্রায় ধূসর। সবুজ অবস্থায় পুষ্ট দানা মটরশুঁটি বা কলাইশুঁটি হিসাবে খুব উপাদেয়। রবিশস্য হিসাবে মটরের চাষ হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে পাকা ফসল তোলা হয়।

মসুর বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Lens culinaris*। বড় দানা ও ছোট দানা দু' রকম মসুর আছে। শীতকালে রবিশস্য হিসাবে সেচ ছাড়া এর চাষ হয়। সম্পূর্ণ পাকার আগে গাছ তুলে এক সপ্তাহ শুকিয়ে মাড়াই করা হয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে মুগের পরে মসুরের স্থান। বাংলাদেশের সর্বত্র এটি জন্মে।

মাসকলাই বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Phaseolus mungo var radiatus*। এর খোসার রঙ কালো, কখনো কখনো সবুজাভ। বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এর প্রকৃতি মুগের মতো। চাষের জন্য জমি তৈরি করা, ফসল তোলা একই রকম। তিন মাসে ফসল পাকে।

মুগ বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *Phaseolus aureus*। সবুজ খোসাওয়ালা কলাইকে মুগকলাই এবং যে জাতের খোসা সোনালি সবুজ হয় তাকে সোনামুগ বলা হয়। স্বাদে সোনামুগ উৎকৃষ্ট এবং ডালের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। ৬০ দিনে ফুল আসে এবং ৩০ দিনের মধ্যেই পেকে যায়। ফসল কেটে এক সপ্তাহ শুকিয়ে মাড়াই করা হয়। এর দানা ও খড়ের উৎপাদন প্রায় সমান সমান।

শিম-গোত্রের সব ডালের গাছ থেকে সবুজ সার হয়।

বি. ব.

ডাল্টন, জন [১৭৬৬-১৮৪৪]

ব্রিটিশ রসায়নবিদ। কৃতী বিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভাবের পূর্বে তিনি একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন। পরমাণুবাদ প্রবর্তন করার পর ডাল্টন (John Dalton) বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির পদক লাভ করেন। গ্যাসের আংশিক চাপসূত্র রসায়নের ক্ষেত্রে ডাল্টনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ডাল্টন পারমাণবিক ওজনের তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুনির্দিষ্ট।

সৈ. তা. আ.

www.boighar.com

ডিজেল (diesel)

১৮৯২ সালে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার রুডোলফ ডিজেল (Rudolf Diesel) একটি অভিনব ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। এই ইঞ্জিনে স্পার্কপ্লাগ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। এটি একটি অন্তরিন্ধক ইঞ্জিন, যেখানে তেলকে ইন্ধন রূপে ফোঁটা ফোঁটা করে ছিটিয়ে দেওয়া হয় প্রচণ্ড চাপে উত্তপ্ত ও সিলিন্ডারে আবদ্ধ বাতাসের মধ্যে। স্পার্কের পরিবর্তে এই উত্তপ্ত বাতাসই তেলকে দগ্ধ করে। এর ফলে সৃষ্ট চাপ পিস্টনকে চালনা করে। যে ধাপগুলো ডিজেল ইঞ্জিনে কাজ করে তা হল–

১. বাতাস ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে টেনে নেওয়া।

২. এই বাতাসকে সিলিন্ডারে চেপে সঙ্কুচিত ও উত্তপ্ত করা এবং সেখানে তেল ছড়িয়ে দেওয়া।

৩. বিস্ফোরণ ঘটাবার ভিতর দিয়ে শক্তি প্রয়োগকারী ধাক্কা সৃষ্টি করা।

৪. দগ্ধ গ্যাস নিঃসরণ করা।

ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ পাউন্ড।

অনেক বাস, ট্রাক, লঞ্চ বা জাহাজ (দ্র) ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা হয়। অনেক সেমি-ডিজেল ইঞ্জিনে উত্তপ্ত বাল্ব ব্যবহার করা হয় যাতে সিলিন্ডারে এত বেশি চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

আ. আ.

ডিডিটি কীটনাশক দ্র

ডিটারজেন্ট (detergent)

আজকাল পরিষ্কারক বা ডিটারজেন্ট অথবা তল-সক্রিয় এজেন্ট (surface active agent) বলতে বর্তমানে সাবান, ডিটারজেন্ট, ইমালসিফায়ার ওয়েটিং এজেন্ট ইত্যাদি বুঝায়। এটি পাউডার, পেস্ট, কঠিন বা তরল আকারের এক ধরনের বস্তু যা পানির সঙ্গে মিশালে এর পরিষ্কারক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পানি যদিও একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক তথাপি এটি গ্রিজ বা তেলজাতীয় পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে না। ডিটারজেন্ট পানির সঙ্গে মিশালে গ্রিজ বা তেলজাতীয় পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কাপড় বা থালা-বাসন থেকে তেলজাতীয় ময়লা পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। পরিষ্কারক পদার্থের অণুর এক প্রান্তে থাকে পানি-আকর্ষণকারী বা হাইড্রোফিলিক (hydrophilic) গ্রুপ এবং অন্য প্রান্তে থাকে পানি-বিকর্ষণকারী বা হাইড্রোফোবিক (hydrophobic) গ্রুপ। পরিষ্কারক দ্রব্য বা ডিটারজেন্ট যখন পানিতে মেশানো হয় তখন ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক দ্রব্যের পানি-বিকর্ষণকারী বা হাইড্রোফোবিক গ্রুপ তেলজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়ে পৃথক হয়ে আসে।

সৈ. তা. আ.

ডিনামাইট (dynamite)

একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ। কোনো কিছু ধ্বংস করতে বা স্বর্ণ খনির খনন কাজে সহজে ও নিরাপদে ব্যবহারের জন্য ডিনামাইট উদ্ভাবন করা হয়। ১৮৬৭

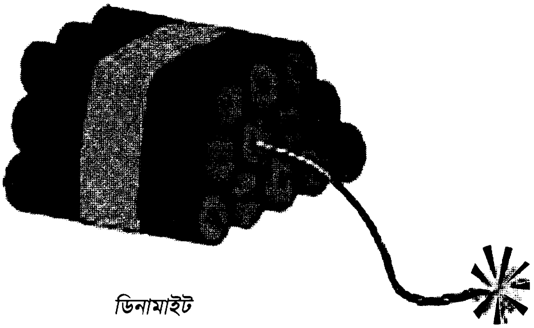

ডিনামাইট

খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট উদ্ভাবন করেন। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিনের বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রোগ্লিসারিন নামক এক প্রকার ভারী ও তেলজাতীয় পদার্থ (আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫৯২) উৎপন্ন হয়। আঘাতের ফলে নাইট্রোগ্লিসারিন প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবং এর সহজ ও নিরাপদ ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল ৭৫% নাইট্রোগ্লিসারিন এবং ২৫% কিজেলগুর (kieselguhr) (পুকুর বা হ্রদে উৎপন্ন ছিদ্রযুক্ত এক ধরনের নরম শোষকজাতীয় পদার্থ যা সিলিকাজাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত) মিশ্রিত করে ডিনামাইটের উদ্ভাবন করেন। আধুনিক কালে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অথবা সোডিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত করে মণ্ড তৈরি করা হয়। এটি শোষক বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শোষক মণ্ড নাইট্রোগ্লিসারিন শোষণ করে নেয়। এটি নিরাপদে ও সহজে যে কোনো ধরনের বিস্ফোরণ কাজে ব্যবহার করা হয়।

আলফ্রেড নোবেল

আরেক ধরনের ডিনামাইট আছে যা জেলিজাতীয় পদার্থের ন্যায়। ৭-৮% নাইট্রোসেলুলোজ এবং ৯২-৯৩% নাইট্রোগ্লিসারিন মিশ্রিত করে এই ডিনামাইট প্রস্তুত করা হয়। এ ধরনের ডিনামাইটকে জিলাটিন ডিনামাইট বলা হয়। একটি ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে এটিও নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

সৈ. তা. আ.

ডিপ্রেশান / বিষণ্নতা (depression)

মানুষের ভাবানুভূতির গোলযোগের ফলে বিষণ্নতার প্রকাশ ঘটে। সহজভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করলে বিষণ্নতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ বিষণ্নতা (endogenous depression) এবং প্রতিক্রিয়াজনিত বিষণ্নতা (reactive depression)।

অভ্যন্তরীণ বিষণ্নতায় রোগের তীব্রতা এবং স্থায়িত্বকাল বেশি; এর ফলে অতি ভোরে ঘুম ভেঙে যায় এবং সে সময়েই মন সবচেয়ে বিষণ্ন থাকে। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অনীহা, কাজকর্মে উদাসীনতা, মনোসংযোগের অভাব, হীনম্মন্যতাবোধ, চিন্তার শৈথিল্য এবং অসঙ্গতি অভ্যন্তরীণ বিষণ্নতার প্রধান লক্ষণ। এদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়, কিংবা কেউ আত্মহত্যা করেও। এ ধরনের বিষণ্নতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াজনিত বিষণ্নতা সাধারণত স্বল্পকাল স্থায়ী, মনের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রোগী অসহায়তা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ ধরনের বিষণ্নতার নির্দিষ্ট কারণ থাকে; যেমন– নিকটজনের মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা কিংবা বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি ইত্যাদি।

দুঃখবোধ ও বিষণ্নতার মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতিদিনের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব না মেলার কারণে অনেকের মধ্যেই কম-বেশি দুঃখবোধ জন্ম নেয়। বিষণ্নতা রোগের বিষাদ, হতাশা, ভীতি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের এবং তা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে।

বিষণ্নতা রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি আজকাল অনেক উন্নত হয়েছে। বিষণ্নতা রোগের অনেক ঔষধ রয়েছে। কম গুরুতর বিষণ্নতার চিকিৎসার জন্য সাইকোথেরাপি কিংবা আচরণগত চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। তবে এ রোগের চিকিৎসা মূলত বিশেষজ্ঞের এখতিয়ারে।

সা. এ.

ডিফথেরিয়া (diphtheria)

ডিফথেরিয়া রোগের কারণ 'করনিব্যাকটেরিয়াম ডিফথেরি' (corynebacterium diphtheriae) নামক জীবাণুর সংক্রমণ। রোগীর গলা (ফ্যারিংস), টনসিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গই প্রধানত ডিফথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। ফলে রোগীর শ্বাসকষ্ট, কাশি, স্বরবিকৃতি, মাঝে মাঝে বমি হওয়া ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা না করা হলে রোগীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে। গলা, টনসিল, স্বরযন্ত্র ছাড়াও রোগীর নাক (দ্র) এবং চোখ ডিফথেরিয়া জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

ডিফথেরিয়া সাধারণত শিশুদের হয়ে থাকে। তবে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের বেলায় ডিফথেরিয়ার প্রকোপ বিরল। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও ডিফথেরিয়া কদাচিৎ দেখা যায়।

ডিফথেরিয়ার চিকিৎসা হাসপাতালে করাই শ্রেয়। সাধারণত ডিফথেরিয়া-বিরোধী সেরাম (antitoxin serum) ও অ্যান্টিবায়োটিকের (দ্র) সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। ডিফথেরিয়া-প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। শিশুদের ডিপিটি টিকা দিলে এক সঙ্গে ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টঙ্কার (দ্র)– এই তিনটি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

সি. না. হ.

ডিম (egg)

প্রাণিজগতের প্রায় সকল স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর দেহে ডিমের সঞ্চার হয়। এই ডিম পুরুষ জাতীয় প্রাণীর দেহে সৃষ্ট শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে পরবর্তী বংশধর জন্মায়। আমরা সচরাচর মুরগি ও হাঁসের ডিমের সঙ্গে পরিচিত। কীটপতঙ্গ (দ্র), মাছ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), টিকটিকি (দ্র), সাপ (দ্র), কচ্ছপ (দ্র) ইত্যাদির ডিমও

মাঝে মাঝে দেখতে পাই। স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) সাধারণত ডিম পাড়ে না। ব্যতিক্রম কেবল প্ল্যাটিপাস নামক স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে। যারা ডিম পাড়ে তারা বাচ্চাও বাইরে ফোটায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের মধ্যেই বাচ্চা বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে বাচ্চা প্রসূত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) ছাড়া অন্য প্রাণীদের ডিম নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে। যেহেতু আমরা মুরগি-হাঁসের ডিম প্রায় নাড়াচাড়া করি, সেহেতু মনে কৌতূহল জাগে এগুলো সম্পর্কে। মুরগির ডিমের কথা বিবেচনা করা যাক। মুরগির দেহের ভিতরে মোরগের শুক্রকীটদ্বারা ডিম্ব নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্বের চারপাশে অর্থাৎ কুসুমের চারপাশে অ্যালবুমেন, খোলক-ঝিল্লি ও খোলক সৃষ্টি হয় দেহের ভিতরেই। ডিমের কুসুম ডিম্বাশয়ের মধ্যেই তৈরি হয়। কুসুমের চারপাশে একটি পাতলা আবরণ থাকে। এর নাম ভিটেলাইন ঝিল্লি। ডিম্বাশয়ের ঠিক পরেই ডিম্বনালিতে অ্যালবুমেন বা ডিমের সাদা অংশ তৈরি হয়। অ্যালবুমেন আঁশের মতো। অ্যালবুমেন ভিটেলাইন ঝিল্লির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং কুসুমসহ গড়িয়ে ডিম্বনালির অবসারণীর (cloaca) দিকে এগুতে থাকে। এর পর অ্যালবুমেনের চারপাশে খোলক-ঝিল্লির আবরণ তৈরি হয়। আবরণ তৈরি হয় ডিম্বনালিতে। জৈব সূত্রসমূহ পরস্পর জোড়বদ্ধ হওয়ায় এই ঝিল্লির সৃষ্টি হয়। ডিম্বনালির খোলক-গ্রন্থি অঞ্চল দিয়ে ডিম গড়িয়ে যাবার সময় খোলক-গ্রন্থি খোলক-ঝিল্লির উপরে খোলক নিঃসরণ করে। সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ হতে ২৫/২৬ ঘণ্টা সময় লাগে। ডিম বাইরে এসে বাতাসের সংস্পর্শে এলে খোলক শক্ত হয়ে যায়।

ত. চ.

ডিহাইড্রেশন (dehydration)

কোনো পদার্থ হতে পানির অপসারণকে অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ হতে ২ ঃ ১ অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অপসারিত হলে তাকে ডিহাইড্রেশন বলে।

সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) পানির প্রতি আসক্তি খুব বেশি। পানির সাথে যুক্ত হয়ে এটি হাইড্রেট উৎপন্ন করে ($H_2SO_4.H_2O$; $H_2SO_4.2H_2O$; $H_2SO_4.3H_2O$) ইত্যাদি)। পানির সাথে H_2SO_4 এর প্রবল আসক্তি থাকায় এটি অনেক জৈব পদার্থের অণু থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পানিরূপে শোষণ করে যৌগকে ভিন্ন পদার্থে পরিণত করে।

যেমন– গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিথায়নিক অ্যাসিড থেকে পানি অপসারণ করে কার্বন-মনোক্সাইড উৎপন্ন করে।

$HCOOH-H_2O-CO$

$H-COOH+H_2SO_4 = CO+H_2O+H_2SO_4$

একইভাবে অ্যালকোহল থেকে ইথাইল ১ অণু পানি অপসারণ করে ইথিলিন উৎপন্ন করে।

$CH_3CH_2OH+H_2SO_4=C_2H_4+H_2O+H_2SO_4$

www.boighar.com

সৈ. তা. আ.

ডুবোজাহাজ সাবমেরিন দ্র

ডেঙ্গুরোগ (dengue)

ডেঙ্গু মশাবাহিত ভাইরাস রোগ। ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ডেঙ্গু ভাইরাসের অধিবাস। সম্প্রতি বাংলাদেশেও ডেঙ্গু ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়াতেও এ সময় ডেঙ্গুরোগের আক্রমণ দেখা গিয়েছে।

এডিস ইজিপ্টি (Aedes aegypti) প্রজাতির মশা ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে। এ ছাড়া এডিস অ্যালবোপিকটা মশাও কোনো কোনো অঞ্চলে ঐ ভাইরাস বহন করে থাকে। এ. ইজিপ্টি ঘরোয়া জাতের মশা, দ্বিতীয়টি থাকে ঝোপে-জঙ্গলে। বর্ষাকাল এদের প্রজননের সবচেয়ে ভালো সময়। এ. ইজিপ্টি মশা কৃত্রিম

আবদ্ধ পানিতে, যেমন– ছোট ছোট পাত্রে, গাছের গায়ের গর্তে জমা পানিতে বংশবৃদ্ধি করে।

এ. ইজিপ্টি মশা ডেঙ্গুরোগে আক্রান্ত মানুষের রক্তপান করার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে থাকে। রক্তপানের ৮-১৪ দিনের মধ্যে মশা সংক্রামক হয়ে ওঠে এবং একবার সংক্রামক মশা সারাজীবনই সংক্রামক থাকে। সংক্রামক মশা কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ানোর পর ২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির দেহে ডেঙ্গুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ডেঙ্গু ভাইরাস অন্তত চার ধরনের। ডেঙ্গুরোগের প্রধান লক্ষণ জ্বর, সারাদেহে প্রচণ্ড ব্যথা (পেশি, অস্থিসন্ধি, এমনকি চোখেও), বমি, ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি, অবসাদ, নিদ্রাহীনতা ও ত্বকে ছোট ফুসকুড়ি (র‍্যাশ)। এ ছাড়া গ্রন্থিপ্রদাহও দেখা দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে জ্বর ৭-৮ দিন পর্যন্ত থাকে। ডেঙ্গুর বিশেষ গুরুতর রূপ 'হেমোরেজিক টাইপ', সাধারণত শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এ ধরনের ডেঙ্গুতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে, যেমন– নাসাপথে, পায়ুপথে, মাড়িতে বা চোখে রক্তক্ষরণ ঘটে। তা ছাড়া কখনো কখনো দেহতন্ত্রীতে 'শক'-এর লক্ষণও দেখা দেয়। শেষ দুই ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক। রক্ত পরীক্ষায় প্রোটিন ও অণুচক্রিকা স্বল্পতা এবং রক্তপাতকাল (ব্লিডিং টাইম) ও প্রোথ্রম্বিন সময় বিলম্বিত হতে দেখা যায়।

ডেঙ্গুজ্বরের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। সাধারণ লক্ষণ উপশমের জন্য বেদনানাশক ঔষধ দেওয়া হয়। শক মোকাবিলার জন্য কর্টিসোন জাতীয় ঔষধ এবং রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে রক্তভরণের প্রয়োজন হয়। রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম ব্যবস্থা মশা ধ্বংসের ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণ। সম্প্রতি বিদেশে চেষ্টা চলছে ডেঙ্গুর প্রতিষেধক ভ্যাকসিন তৈরির। ডেঙ্গুর গুরুতর পর্যায়ে রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোই শ্রেয়।

আ. র.

ডেভি, স্যার হামফ্রি [১৭৭৮–১৮২৯]

প্রতিভাধর ইংরেজ রসায়নবিদ স্যার হামফ্রি ডেভির (Sir Humphry Davy) জন্ম ১৭৭৮ সালে ইংল্যান্ডের পেনজ্যান্সে (Penzance)। বালক হামফ্রি অসাধারণ

স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। হামফ্রি এক সার্জেনের সঙ্গে শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। ঔষধ ও পিল তৈরির কাজের সময় হামফ্রি রসায়ন-বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একুশ বছর বয়সে হামফ্রি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস (যা লাফিং গ্যাস নামে পরিচিত) নিয়ে গবেষণা করেন। এটি পরবর্তী কালে দাঁত তোলার সময় মানুষকে ঘুম পাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হত। হামফ্রি ডেভি কাজের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করতেন না। লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড (Count Rumford) হামফ্রি ডেভির মেধা ও কাজের কথা শুনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। হামফ্রি সেখানে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বক্তা হিসাবে হামফ্রি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। জনগণ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে এসে ভিড় জমাত। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে চাকুরির মাত্র এক বছর পর চব্বিশ বছর বয়সে হামফ্রি রসায়নবিজ্ঞানের প্রফেসর পদ লাভ করেন।

হামফ্রি যৌগের ওপর বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে কাজ করেন। ১৮০৭ সালে তিনি গলিত পটাস (molten potash)-এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করে একটি ধাতব পদার্থ আলাদা করেন এবং এর নাম দেন পটাসিয়াম (দ্র)। সোডা থেকে তিনি আরেকটি ধাতু উৎপন্ন করেন এবং তার নাম দেন সোডিয়াম। একই সময়ে তিনি একটি বিদ্যুৎ-রাসায়নিক তত্ত্বের (electro-chemical theory) ওপর কাজ করেন। এই তত্ত্বে তিনি যৌগের ওপর বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাসায়নিক মৌল আবিষ্কারের জন্যে হামফ্রি বিজ্ঞানীদের কাছে স্মরণীয়। তবে তিনি খনিতে কাজের জন্য নিরাপদ বাতির (safety lamp) আবিষ্কারক হিসাবেই বেশি পরিচিত। ১৮১৩ সালে নিউক্যাস্‌লে এক

ভয়াবহ গ্যাস-দুর্ঘটনায় ৯০ জন খনিশ্রমিক প্রাণ হারায়। তৎকালীন সরকারের অনুরোধক্রমে ১৮১৫ সালে ডেভি এই বাতি আবিষ্কার করেন, যা 'ডেভির নিরাপদ বাতি' নামে পরিচিত।

তাঁর বেশির ভাগ কাজের উন্নয়ন সাধন করে তাঁর মেধাবী তরুণ প্রধান সহকর্মী মাইকেল ফ্যারাডে (দ্র)। তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্ত্বেও তিনি বলতেন, তাঁর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার তরুণ মাইকেল ফ্যারাডে। মাইকেল ফ্যারাডে পরবর্তী কালে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন।

ডেভি ১৮২৯ সালে ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হো. আ.

ডেমোক্রিটাস [খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। পদার্থবিদ্যা, গণিত, মনোবিদ্যা, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে এই দার্শনিক-বিজ্ঞানী অন্তত ২৯০টি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর জন্ম ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

তাঁর উপস্থাপিত অণুতত্ত্বে সৃষ্টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্ভবত সেই প্রথম। তাঁর মতে, সৃষ্টির মূলশক্তি অণু (দ্র)। অণুর পারস্পরিক সংযোগ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি। বস্তুসৃষ্টির পিছনে অন্য কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুজগৎ কারণনির্ভর। মানুষের অজ্ঞানতার জন্য কারণহীনতার বিশ্বাস তৈরি হয়ে থাকে।

ডেমোক্রিটাসের (Democritus) মতে, আত্মাও বস্তুসদৃশ এবং অণুর সংযোজন থেকে উদ্ভূত। তাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস রাখা যায় না। বস্তুজগতের বাইরে দেবতা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি মানবমনে ভীতির সঞ্চার করে দেবতার অস্তিত্ব তৈরি হতে সাহায্য করেছে।

ডেমোক্রিটাসের এই সব বস্তুবাদী তত্ত্ব পরবর্তী সময়ের একাধিক দার্শনিকের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁদের মধ্যে এপিকিউরাস (দ্র) অন্যতম। ডেমোক্রিটাসের মৃত্যু ৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আ. র.

ডেসিবেল (decibel)

শব্দের তীব্রতা (intensity) পরিমাপের একক। টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নামানুসারে বেল একক নামকরণ হয়েছে। বেলের এক-দশমাংশ হল এক ডেসিবেল। প্রাবল্য, শব্দোচ্চতা (loudness) এবং তীব্রতা এক নয়। তাই শব্দোচ্চতা পরিমাপের একক ফন (phon) তীব্রতা ও কম্পাঙ্ক দু'টি রাশির উপর নির্ভরশীল।

শব্দের তীব্রতা নির্ভর করে উৎপন্ন শক্তির উপর। শব্দশক্তির পরিমাপ হল ওয়াট প্রতি বর্গসেন্টিমিটার। শূন্য ডেসিবেল সবচেয়ে কম তীব্রতার শব্দ যা স্বাভাবিক সুস্থ কানে শোনা যায়। শূন্য ডেসিবেল শব্দ কানের প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০-১৬ ওয়াট শক্তি সঞ্চালন করে। ১০ ডেসিবেল বা ১ বেল শূন্য ডেসিবেলের ১০ গুণ শক্তি সঞ্চালন করে। ২০ ডেসিবেল শব্দ শূন্য ডেসিবেল থেকে ১০০ গুণ এবং ১০ ডেসিবেল থেকে ১০ গুণ শব্দ সঞ্চালন করে। সাধারণ বক্তৃতা হল মোটামুটি ৬০ ডেসিবেল।

স. রা.

ডেসিমেল দশমিক দ্র

ডোমাগ, গেরহার্ড [১৮৯৫-১৯৬৪]

জার্মান রসায়নবিদ ও জীবাণুবিদ। গেরহার্ডের (Gerhard Domagk) জন্ম ১৮৯৫ সালের ৩০শে অক্টোবর জার্মানির ব্রান্ডেনবার্গের লাগোভ (Lagow) শহরে। গ্রাইফসহ্বাল্ড (Greifswald) ও মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি 'আই. জি.

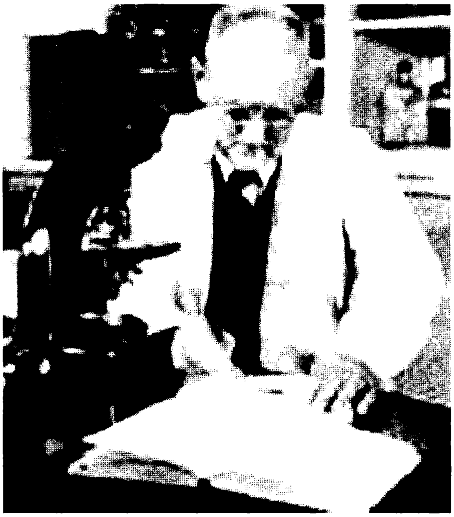

ফারবেন ইন্ডাস্ট্রি ফর এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজি অ্যান্ড ব্যাকটেরিওলজি' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। এ প্রতিষ্ঠানে রঙ ও ঔষধ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি 'প্রন্টোসিল রুব্রাম' (prontosil rubram) নামক রঞ্জক পদার্থের মধ্যে জীবাণু-প্রতিরোধী ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। এই উপাদানকে ভিত্তি করেই কেমোথেরাপিউটিক ঔষধের উদ্ভব। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ডোমাগ ক্যান্সার (দ্র) ও যক্ষা (দ্র) নিরাময়ের বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

সি. না. হ.

ড্রসোফিলা (drosophilla)

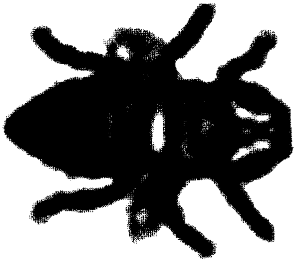

Arthropado পর্বভুক্ত ড্রসোফিলা এক ধরনের মাছি। একে অনেক সময় ফলের মাছিও বলা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Drosophilla melanogaster*। এই মাছিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এখনো এই মাছিটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। বিশেষ করে জীন, ক্রোমোজোম ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণায় এই মাছির ব্যবহার খুবই বেশি।

ড্রসোফিলা দেখতে অনেকটা নীলচে বর্ণের। চোখ দুটো লাল, পিঠের ওপর দুই জোড়া পাখা আছে। এর বৈশিষ্ট্য অনেকটা অন্যান্য মাছি বা পতঙ্গের মতো। দেহ মাথা, বুক ও উদর নিয়ে গঠিত। তবে আকারের দিক দিয়ে ড্রসোফিলা অন্যান্য মাছির চেয়ে অনেক বড়। এদের পাখনা অনেক বেশি শক্তিশালী। ড্রসোফিলার গুচ্ছ চোখকে পুঞ্জাক্ষি বলা হয়।

ড্রসোফিলার খাদ্য নানা ধরনের পচা বা বর্জ্য পদার্থ হলেও এটি অনেক ক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় পদার্থ বেশি পছন্দ করে। ফলের মৌসুমে বিশেষত আম-কাঁঠালের দিনে বাংলাদেশে এই মাছি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এক প্রকার লম্বা নলের মতো শুঙ্গ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য থেকে মিষ্টি জাতীয় বা নিজের পছন্দনীয় খাদ্যবস্তু খুঁজে নিয়ে শোষণ করে।

অ. ব.

ড্রাই আইস (dry ice)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাসের কঠিন রূপকে বলা হয় ড্রাই আইস। অত্যধিক চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে তা তরলে পরিণত হয়। এই তরলকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম ধারায় নির্গত করলে এর চাপ আরো কমে যায়। ফলে এটি তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ড্রাই আইস বলা হয়। ড্রাই আইসের বিশেষত্ব হল এটি কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তরল হয় না। কোল্ড স্টোরেজ, রিফ্রিজারেটর (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্রে ড্রাই আইস ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

ড্রাই সেল (dry cell)

ড্রাই সেল হল সেই সব বিদ্যুৎকোষ বা ব্যাটারি (দ্র) যার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো পেস্ট বা জেলির আকারে এমনভাবে থাকে যেন গড়াতে বা ছিটকে যেতে না পারে। তাই তরল মশলাযুক্ত অংশ থাকলেও কার্যত এরা শুষ্ক এবং আটপৌরে ব্যবহারের উপযুক্ত। আমাদের বহুল ব্যবহৃত টর্চের ব্যাটারি, খেলনা, ঘড়ি (দ্র),

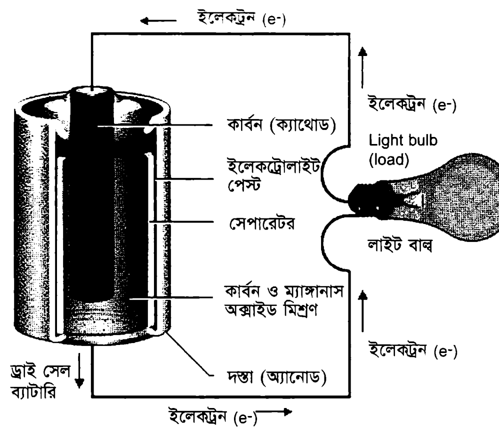

ক্যালকুলেটর (দ্র) ইত্যাদিতে ব্যবহৃত অধিকাংশ ব্যাটারি এই দলে পড়ে। সব ড্রাই সেলেই ক্যাথোড (দ্র) ও অ্যানোড (দ্র) নামে দু'টি ইলেকট্রোডের মাঝখানে ইলেকট্রোলাইট নামে পরিচিত বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। ইলেকট্রোলাইটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যানোড ঋণাত্মক বিদ্যুতে এবং ক্যাথোড ধনাত্মক বিদ্যুতে আহিত বা চার্জযুক্ত হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি ভোল্টেজ দেখা দেয় এবং কোনো পরিবাহকের মাধ্যমে উভয়ের সংযোগ ঘটানো হলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। অধিকাংশ ড্রাই সেলে এই ভোল্টেজের পরিমাণ দেড় ভোল্ট, অন্যগুলোতেও তার কাছাকাছি।

আমাদের সবচেয়ে অধিক পরিচিত ড্রাই সেল হল কার্বন-জিঙ্ক সেল। বড়, মাঝারি বা পেন্সিল সাইজের টর্চব্যাটারি হিসাবেই এদের প্রধানত দেখা যায়। পুরো ড্রাই সেলটি থাকে একটি দস্তার (জিঙ্ক) কৌটার মধ্যে, যা নিজে অ্যানোড হিসাবে কাজ করে। এর তলাতেই আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ সংযোগ দিই। ক্যাথোডের কেন্দ্রীয় অংশ হল একটি কার্বন-দণ্ড। কৌটার মাঝামাঝি খাড়া করা এই দণ্ডের প্রান্তে লাগানো তামার টুপির সঙ্গে আমরা ব্যাটারির পজিটিভ সংযোগ দিই। অবশ্য কার্বন-দণ্ডের চারিদিকে ঠাসা কার্বনগুঁড়ো আর ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণই হল আসল ক্যাথোড। দস্তার কৌটা আর এই ক্যাথোড মিশ্রণের মাঝখানে থাকে কাগজ, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি কোনো সচ্ছিদ্র শোষকস্তর, যার ভেতরের দিকটায় ইলেকট্রোলাইট মাখানো থাকে। এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রোলাইট হল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড আর পানির একটি পেস্টরূপী মিশ্রণ। ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যাথোডে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কার্যকারিতা ফুরিয়ে যায় বলে এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ আর পাওয়া যায় না। এমনিতে রেখে দিলেও কার্যকারিতা কমে আসে। কার্বন-জিঙ্ক সেলের একটি বিশেষ রূপ হল অ্যালক্যালাইন সেল। এর ইলেকট্রোলাইটে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড নামে একটি কড়া অ্যালক্যালি থাকে। বেশি সময় ধরে অধিক কারেন্ট প্রয়োজন হলে এটি সুবিধাজনক– যেমন খেলনার মোটর চালাতে।

অন্যান্য ড্রাই সেলের মধ্যে মার্কারি সেল আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই সেলে জিঙ্কের অ্যানোড আর মার্কুরিক অক্সাইডের ক্যাথোডের মাঝখানে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ইলেকট্রোলাইট ব্যবহৃত হয়। এর একটি সুবিধা হল কার্বন-জিঙ্ক সেলের মতো এতে ভোল্টেজ ধীরে ধীরে হ্রাস পায় না, শেষ অবধি একই থাকে। এ জন্য ছোট বোতামের আকারে মার্কারি সেল হাতঘড়ি, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি সংবেদী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভোল্টেজ সমান থাকা জরুরি।

মু. ই.

ড্রিল (drill)

কাঠ, ধাতু, মাটি কিংবা পাথরে সিলিন্ডার আকৃতির ছিদ্র করাকে বলা হয় ড্রিলিং। ড্রিলিং করার কাজে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা-ই ড্রিলিং মেশিন বা ড্রিল।

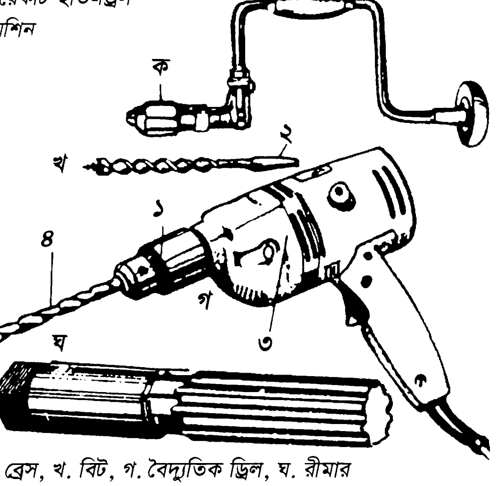

ক. ব্রেস, খ. বিট, গ. বৈদ্যুতিক ড্রিল, ঘ. রীমার
১. চাক, ২. ফ্যাঙ্গ, ৩. মোটর, ৪. টুইস্ট বিট

কাঠ ও ধাতু ড্রিলিংয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় টুইস্ট ড্রিল; তাতে দুটো বাঁকানো খাঁজ কাটা থাকে। বৃত্তাকারে ঘুরে খাঁজ দুটো ড্রিলের মাথায় গিয়ে চোখা প্রান্ত হিসাবে শেষ হয়েছে। চোখা প্রান্তদ্বয় ধাতু বা কাঠে ছিদ্র করে। এই ধরনের ড্রিল হাতে বা মেশিনের সাহায্যে চালানো যায়।

মাটি বা পাথর খোঁড়ার যে ড্রিল সেগুলো ধারের চাইতে ভারে কাজ করে বেশি। ড্রিলটিকে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে মাটি বা পাথরে চেপে ধরা হয়। ঘূর্ণায়মান ড্রিলটি মাটি বা পাথর কেটে কেটে ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করে। এই সময় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে খননকৃত মাটি ও পাথর ওপরে নিয়ে আসা হয়। এই ঘর্ষণে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। তাপে যাতে ড্রিলের কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য যন্ত্রটিতে লুব্রিক্যান্ট বা পিচ্ছিলক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

খনিতে এবং তেল-গ্যাস কূপ খননে এই ধরনের ড্রিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

মু. হা.

ত

তড়িৎপ্রলেপন ইলেকট্রোপ্লেটিং দ্র

তমাল (gambos tree)

তমালের বৈজ্ঞানিক নাম *Diospyros cordifolia* Roxb, গোত্র Ebenaceae। এর ইংরেজি নাম গ্যাম্বোস ট্রি (Gambos Tree)। আজকাল মন্দির, আখড়া এবং মঠ ছাড়া এ গাছ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দেহ-বৈচিত্র্যে তমালের অনন্যতা অবশ্যই স্বীকার করার মতো। কাণ্ড খাটো, ঘনকালো গাঁটযুক্ত। ডালপালা আঁকাবাঁকা, ছড়ানো, ছত্রাকৃতি, চিরসবুজ। পাতা গাছের শীর্ষে বেশ ঘন। স্ত্রী এবং পুরুষ গাছ স্বতন্ত্র। পুরুষ ফুলগুলো গুচ্ছাকারে অজস্র জন্মে, কিন্তু আকারে ছোট, সাদাটে পাপড়ি। স্ত্রী ফুল একক, আকারে বেশ বড়, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। তমালের ফল গোলাকৃতি, হলুদ রঙের গাবের মতো বৃতিযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত। এর কাঠ লালচে হলুদ, বেশ শক্ত। বীজ থেকে চারা হয়, কিন্তু বৃদ্ধি খুব ধীরগতিসম্পন্ন। এ গাছ থেকে আঠা-রঞ্জন পাওয়া যায়, যা হলুদ সিল্ক কাপড় রঙ করতে, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের কাপড় রঙ করতে, ব্যবহার করা হয়। কপালে 'তিলক' পরতে হিন্দুরা এটি ব্যবহার করে। ফলের শাঁস চামড়া পাকা করার কাজে ট্যান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শা. আ.

তরঙ্গ (wave)

নদী বা সমুদ্রে যখন বাতাস হয়, তখন পানি ওপরে-নিচে ওঠানামা করার ফলে তরঙ্গ বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে এই তরঙ্গ নদী বা সমুদ্রের তীরের দিকে

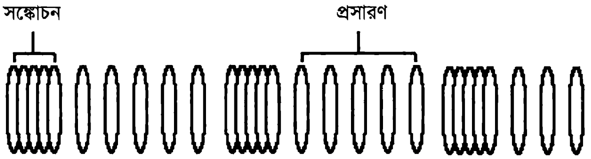

Longitudinal wave (দীঘলতরঙ্গ)

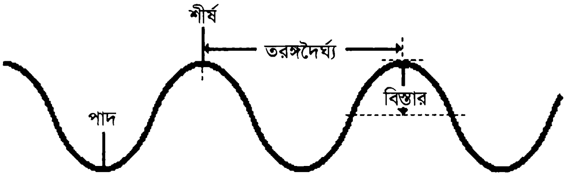

Transverse wave (আড়তরঙ্গ)

অগ্রসর হয়। পুকুরের কোনো একটি স্থানে এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে দিলে সে স্থান থেকে বাইরের দিকে বৃত্তের মতো তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। দেখে মনে হয় যেন ছোট ছোট বৃত্তগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ধান গাছের ওপর দিয়ে যখন জোরে বাতাস বয়ে যায়, ধান গাছগুলো দোল খেয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

কম্পন থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। একে শব্দতরঙ্গ বলে। কোনো কোনো তরঙ্গ তার সৃষ্টিকারী কম্পনের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে যায়। একে আড়তরঙ্গ (transverse wave) বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি তরঙ্গের একটি করে শীর্ষ তৈরি হয়। এরূপ পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি আড়তরঙ্গের শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) বলে। পানির তরঙ্গ

আড়তরঙ্গ। আবার কোনো কোনো তরঙ্গ উৎপত্তিস্থান থেকে কম্পনের বরাবর এগিয়ে চলে। একে দীঘলতরঙ্গ (longitudinal wave) বলে। শব্দের তরঙ্গ দীঘলতরঙ্গ। শব্দের তরঙ্গ যথাক্রমে বাতাসকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে এগিয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে পাশাপাশি দু'টি সঙ্কোচনের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। যে তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান থাকে তাকে পিরিয়ডিক বা পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ (periodic wave) বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিটারে মাপা হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলো তরঙ্গ অতিক্রম করে তার সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক (দ্র) বা ফ্রিকোয়েন্সি বলে। উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম আর নিম্ন কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। শব্দের মতো আলো, বেতার এবং অন্যান্য শক্তিও তরঙ্গের আকারে চলে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগেরও কম। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে আমরা রেডিও শুনতে পাই।

হো. আ.

www.boighar.com

তরমুজ (water-melon)

রসালো ফল তরমুজের বৈজ্ঞানিক নাম *Citrullws lanatus* (Thumb.) Manst এবং গোত্র Cucurbitaceae। লতানে, আরোহী, বর্ষজীবী তরমুজের পাতা খণ্ডিত। রূপ, গন্ধ ও বর্ণে বহু রকমের তরমুজ এ দেশে পাওয়া যায়। তবে ফলনের দিকে বিচার করে এ দেশে জাপানি জাতের সাদাটে সবুজ ফলত্বক বিশিষ্ট ঢোলকাকৃতির তরমুজ অধিক চাষ করা হয়। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে একটি জাতের তরমুজ আবাদ হয়ে আসছে। সে তরমুজগুলো প্রায় গোলাকৃতি, ঠিক প্রমাণ সাইজের ফুটবলের মতো। ফলত্বক গাঢ় সবুজ। ভিতরে শাঁস টকটকে লাল, খুব সুস্বাদু, ঘন বীজবিশিষ্ট। এর ফলন কম বলে আবাদ কমে আসছে। জাপানি জাতের তরমুজের ফলন বেশি, বীজ কম, ছোট কালো থেকে খয়েরি। সম্পূর্ণ ফলের প্রায় ৬০% খাওয়া যায় এবং পানির পরিমাণ ৯৫.৭ ভাগ। তরমুজের বীজ 'ইউরিয়েজ' নামক এনজাইমের ভালো উৎস। বীজ পিষে আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি বানিয়ে খাওয়া যায়। বীজ ঠাণ্ডাকারক এবং মূত্রবৃদ্ধিকারক।

শা. আ.

তরল বায়ু (liquid air)

প্রত্যেক গ্যাসের একটি সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আছে, যে তাপমাত্রায় এবং তার নিচে সামান্য চাপ প্রয়োগ করে গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করা হয়। এই সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপরে রেখে গ্যাসটির উপর যতই চাপ প্রয়োগ করা হোক না কেন এ অবস্থায় গ্যাসটিকে তরলে পরিণত করা সম্ভব হয় না। গ্যাসের এই সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে ক্রান্তি তাপমাত্রা বা সন্ধি তাপমাত্রা (critical temperature) বলা হয়। সন্ধি তাপমাত্রা এমন একটি তাপমাত্রা যার ঊর্ধ্বে গ্যাসীয় অণুসমূহের গতিশক্তি এত বেশি হয় যে, চাপ প্রয়োগে অণুগুলোকে যতই কাছে আনা হোক না কেন, গ্যাসটিকে তরল করার জন্য এর আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল যথোপযুক্ত হয় না। যেমন– কার্বন ডাই-অক্সাইডের সন্ধি তাপমাত্রা ৩১.১° সে.। কোনো গ্যাসকে এর সন্ধি তাপমাত্রায় তরলে রূপান্তরিত করতে সর্বনিম্ন যে চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তাকে গ্যাসটির ক্রান্তিচাপ বা সন্ধিচাপ (critical pressure) বলা হয়। সন্ধিচাপ হল সর্বোচ্চ বাষ্পচাপ যা গ্যাসটির তরল অবস্থায় থাকতে পারে। ৩১.১° সে. তাপমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ৭২.৯ বায়ুচাপ প্রয়োগ করে তরলীভূত করা যায়। অতএব কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্রান্তিচাপ ৭২.৯ বায়ুচাপ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ক্রান্তি তাপমাত্রা যথাক্রমে −২৪০° সে. ও −১১৮° সে.। এগুলোর ক্রান্তিচাপ যথাক্রমে ১২.৮ ও ৪৯.৭ বায়ুচাপ।

তরল বায়ুকে নানা রকম কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন– তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয় রকেটের জ্বালানি হিসাবে। তরল অক্সিজেন সিলিন্ডারে ভর্তি করে মুমূর্ষু রোগীকে অক্সিজেন সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হয়। বায়ুমণ্ডলের বায়ু হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা পৃথক করার পর আংশিক পাতনের মাধ্যমে তরল নাইট্রোজেন ও তরল অক্সিজেন পৃথক করা হয়।

সৈ. তা. আ.

তাপমানযন্ত্র / থার্মোমিটার (thermometer)

উত্তাপ নির্ণয় করতে পারে এমন যন্ত্র হল থার্মোমিটার বা তাপমানযন্ত্র। উত্তাপের সঙ্গে পরিমাপযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় পদার্থের এমন যে কোনো গুণের ভিত্তিতে তাপমানযন্ত্র তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত তরলভর্তি সরু কাচ-নলের থার্মোমিটার; এটি কাজ করে উত্তাপে তরলের আয়তন প্রসারণের ভিত্তিতে। তরল হিসাবে ব্যবহৃত পারদ বা অ্যালকোহল (দ্র) কম উত্তাপে জমে কঠিন না হওয়া পর্যন্ত বা বেশি উত্তাপে বাষ্পীভূত না হওয়া পর্যন্ত এ রকম তাপমানযন্ত্র কার্যকর। সেটি গলন্ত বরফের (দ্র) উত্তাপের উপরে-নিচে কয়েক শ' ডিগ্রির বেশি যায় না।

ছোট, শক্তসমর্থ এক রকম তাপমানযন্ত্র তৈরি হয় দু'টি ধাতব পাত আগাগোড়া একে অপরের উপর সেঁটে দিয়ে। এদের একটির ধাতুর উত্তাপে প্রসারণক্ষমতা অন্যটির চেয়ে বেশি। ফলে উত্তাপে ভিন্ন রকম বাড়ার টানাপোড়েনে এটি বেঁকে যায়। বাঁকার পরিমাণটি কাঁটার সাহায্যে সহজে একটি ডয়ালের উপর দেখানো যায়।

খুব সূক্ষ্মভাবে এবং অনেক নিম্ন থেকে অনেক উচ্চে বিস্তৃত তাপমাত্রা মাপতে হলে বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারের প্রয়োজন হয়। এর একটি বাড়তি সুবিধা হল, সরু তারের মাধ্যমে জটিল যন্ত্রপাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভিন্ন বিন্দুর নিজস্ব উত্তাপ এতে নির্ণয় করা সম্ভব। এক রকম বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা হল রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার। উত্তাপের ফলে উপযুক্ত বিদ্যুৎ-পরিবাহী বস্তুর বৈদ্যুতিক রোধকতায় যে পরিবর্তন ঘটে সেটি এতে পরিমাপ করা হয়। আর একটি ব্যবস্থা হল থার্মোকাপল বা তাপযুগল। এতে দু'টি ভিন্ন ধাতুর (অথবা ধাতুসঙ্করের) তৈরি তারকে দুই প্রান্তে পরস্পর জুড়ে দু'টি জংশনের সৃষ্টি করা হয়। জংশন দু'টিকে যদি ভিন্ন উত্তাপে রাখা হয়, তবে দুইয়ের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজটি যদিও খুব কম, তবু একে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। একটি জংশনকে গলন্ত বরফের মতো সুনির্দিষ্ট উত্তাপে রাখা হলে সৃষ্ট ভোল্টেজ থেকে অন্য জংশনের উত্তাপ নির্ণয় সম্ভব। এসব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নিম্নতম সম্ভাব্য তাপমাত্রা (দ্র) পরমশূন্যের কিছু উপরে থেকে শুরু করে উর্ধ্বে ২৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তাপ মাপা সম্ভব। এরও উপরের তাপমাত্রার জন্য, যেমন গলিত ধাতু, চুল্লি ইত্যাদিতে উত্তপ্ত বস্তু থেকে বিকীর্ণ আলোর রঙ, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি দূর থেকে পরিমাপ করে উত্তাপ জানা যায়। এ রকম তাপমানযন্ত্রকে পাইরোমিটার (pyrometer) বলা হয়।

উল্লিখিত সব রকম থার্মোমিটারে নিশ্চিতভাবে জানা কয়েকটি উত্তাপে যন্ত্রের পাঠ নিয়ে তারই বর্ধিত হিসাবে অন্য পাঠ থেকে উত্তাপ উদ্ঘাটন করা হয়। অর্থাৎ জানা উত্তাপ থেকে এগুলোকে মানকৃত করে নিতে হয়। কিন্তু গ্যাস (দ্র) থার্মোমিটার নামে পরিচিত তাপমানযন্ত্র পদার্থবিদ্যার গ্যাসের নিয়ম অনুযায়ী উত্তাপ জানিয়ে দিতে সক্ষম। আধুনিক ডিজিট্যাল থার্মোমিটারে পরিমাপ করা তথ্য বৈদ্যুতিক সিগন্যাল রূপে ইলেকট্রনিক বর্তনীতে যায় এবং তার সাহায্যে সরাসরি সংখ্যার আকারে তাপমাত্রা প্রদর্শন-পর্দায় ফুটিয়ে তোলে।

মু. ই.

তামা (copper)

হলুদাভ কমলা রঙের ধাতু। এর লাতিন নাম *কিউপ্রাম (Cuprum)*। রাসায়নিক সঙ্কেত-চিহ্ন Cu। পারমাণবিক ওজন ৬৩.৫৫। পারমাণবিক সংখ্যা ২৯। গলনাঙ্ক ১০৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্ফুটনাঙ্ক ২৫৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানবজাতি পাঁচ হাজার

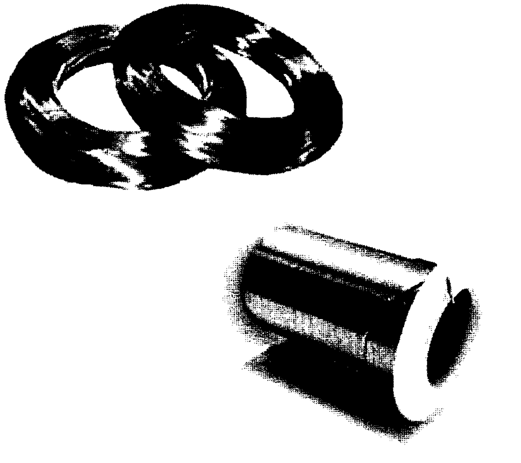

তামার তৈরি তার

বছরেরও আগে থেকেই তামার ব্যবহার শুরু করেছিল সম্ভবত ধাতুর মধ্যে তামার সঙ্গেই মানুষের পরিচয় ঘটেছিল সবার আগে। তামা বেশ নমনীয় ধাতু। হাতুড়ি বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে পিটিয়ে একে ইচ্ছেমতো আকার দেওয়া যায়। বিদ্যুৎ (দ্র) এবং তাপের (দ্র) জন্য এটি একটি সুপরিবাহী ধাতু। ব্যবহারের পরিমাণের দিক থেকে বর্তমানে লোহার (দ্র) পরেই তামার স্থান। অর্থাৎ ধাতু হিসাবে সারা বিশ্বে তামার ব্যবহারের স্থান দ্বিতীয়।

প্রকৃতিতে তামার দু'টি আইসোটোপ (দ্র) পাওয়া যায়– ^{63}Cu এবং ^{67}Cu। এ ছাড়াও আছে সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

তামা এবং টিনের মিশ্রণে সঙ্করধাতু ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহার অনেক প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। ব্রোঞ্জ বা দস্তার ব্যাপক ব্যবহার ছিল বলেই ইতিহাসে মানবজাতির একটি যুগকে 'ব্রোঞ্জ-যুগ' বলা হয়। ব্রোঞ্জ ছাড়াও তামার আরেকটি সঙ্করধাতু হচ্ছে পিতল (দ্র)। তামার সঙ্গে দস্তার আকরিক গলিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয়, আসিরীয়, রোমান ও গ্রিকেরা তামা, দস্তা ও পিতলের ব্যবহার জানত। অস্ত্র তৈরির জন্য তামা ও ব্রোঞ্জ– এই দু'টি ধাতুই ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ তৈরি করা হত।

সু. ব.

তামাক (tobacco)

সোলানেসি (Solanaceae) গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Nicotiana tabacum,* L। উচ্চতায় সাধারণত এক থেকে দুই মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেসব এলাকার গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো সেসব অঞ্চলে এ গাছ ভালো জন্মে। তামাকের চাষ প্রায় সব ধরনের জমিতেই করা চলে। তবে সিগারেটের জন্য যে তামাক ব্যবহার করা হয় তা সব জমিতে চাষ করা যায় না। বেলে জমি এ ধরনের তামাক চাষের উপযোগী। বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও রংপুর অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে তামাকের চাষ করা হয়। রংপুরে মতিহারি ও জাতি এ দুই ধরনের তামাক বেশি পরিমাণে

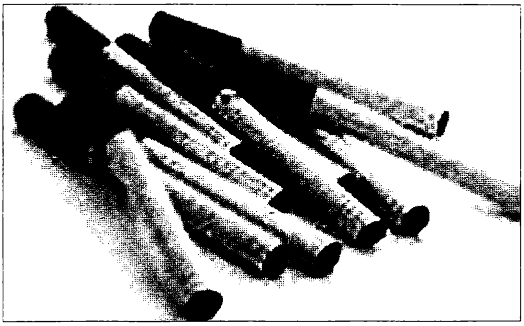

তামাক দিয়ে তৈরি সিগারেট

চাষ করা হয়। হুঁকায় সাধারণত মতিহারি তামাকের ব্যবহার করা হয়। চুরুট তৈরির কাজে জাতি তামাক বেশি উপযোগী।

তামাক পাতায় নিকোটিন নামক এক প্রকার উপক্ষার (alkaloid) থাকে। ইংরেজিতে এ পদার্থকে অ্যালকালয়েড বলা হয়। তামাকের ধূমপান মানুষকে কিছুটা আনন্দ দিলেও প্রকৃতপক্ষে নিকোটিন বিষাক্ত পদার্থ। তাই তামাকের ধোঁয়া মোটেও ভালো নয়। এর প্রভাবে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার (দ্র) অন্যতম।

মু. আ.

তারামাছ (starfish)

তারামাছ সামুদ্রিক প্রাণী। নাম তারামাছ হলেও মাছের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। তারামাছ অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এটি একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) বা কণ্টকত্বকী পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী। বৈজ্ঞানিক নাম *Asterias*

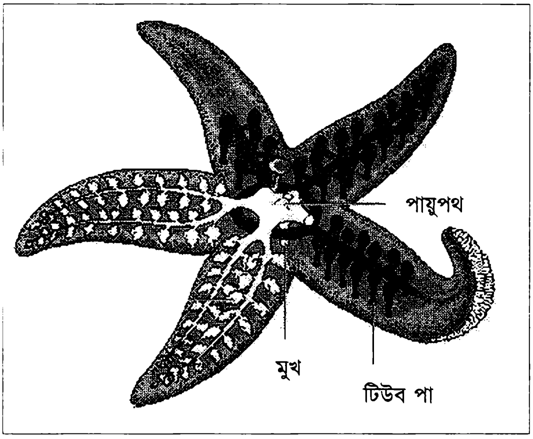

rubens। দেখতে তারার মতো। এর পাঁচটি বাহু রয়েছে। বাহু বলতে মানুষের বাহু মনে করা ঠিক নয়। আসলে এর পাঁচ কোণে তারার মতো পাঁচটি অঙ্গ বিস্তৃত থাকে। পাঁচ বাহুর মধ্যে পৌষ্টিক নালি বা খাদ্যনালি থাকে এবং বাহুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি গভীর লম্বা নলের মতো খাদ থাকে। খাদের দু' পাশে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউব পা। বাহুর পৃষ্ঠভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত আবরণ রয়েছে, যা ত্বক নামে পরিচিত। ত্বকের নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল অস্থির প্লেট থাকে। ফলে এর দেহ খুব মজবুত হয়। খাদের দু' পাশেও হাড়ের মালা থাকে। পেশির সাহায্যে তারামাছ এই হাড় নাড়ায়। পাঁচটি বাহু যেখানে মেশে সেখানে কেন্দ্রে রয়েছে মুখ-গহ্বর। তারামাছ আকারে ৪-৬ সেমি হতে পারে। ওরা যে কোনো ধরনের ছোট প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। টিউব পায়ের সাহায্যে ওরা সমুদ্রের ভেজা বালুচরে সরাসরি মাটির নিচে ঢুকে যেতে পারে। ভাটা শেষে জোয়ারের শুরুতে তারামাছ পানির সঙ্গে সমুদ্রের কূলের দিকে উঠে আসতে থাকে। অনেকে একে পানির মধ্যে পাতা বলে ভুল করে। এ সময় তারামাছ সংগ্রহ করা সহজ। এরা খুবই ধীর গতির প্রাণী। তারামাছ মানুষ বা পশুর খাদ্য হিসাবে উপাদেয় নয়। তারামাছ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। দেখতে সুন্দর বলে অনেকে এদেরকে ঘরে সাজিয়ে রাখে। গবেষণাগারে ফর্মালিনে ভিজিয়ে রেখেও এটি সংরক্ষণ করা হয়। তা করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য।

ত. চ.

তালগাছ (palmyra tree)

Palmae গোত্রভুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Borassus flabellifer*, Linn। সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে এ গাছ প্রচুর জন্মে। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই এ গাছ দেখা যায়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই তালগাছ জন্মে। অল্পকালীন পানিবদ্ধতা সহ্য করার ক্ষমতা এ গাছের আছে। তালগাছ খুব ধীরে বাড়ে অথচ খুব বড় হয়। এ গাছের কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এর কাণ্ড সোজা, গোলাকৃতির এবং কালো রঙের হয়ে থাকে। তালগাছের কাণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ পাতা থাকে। ডাঁটাসহ এ পাতা দেখতে অনেকটা বড়

তালগাছ ও বাবুই পাখির বাসা

হাতপাখার মতো। অধিকাংশ পাতার বৃন্ত নিম্নমুখী ও পত্রফলক ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় থাকে।

তালগাছ পুরুষ-গাছ ও স্ত্রী-গাছ– এ দুই ভাগে বিভক্ত। গাছে ফুল আসার আগে অবশ্য এ পার্থক্য বোঝা যায় না। তালগাছ দীর্ঘজীবী। এ গাছ মাটির ক্ষয়রোধ করে। তালগাছের কাণ্ড থেকে ঘরের খুঁটি

তৈরি করা যায়। এ ছাড়া তালকাঠ দিয়ে কড়ি-বরগা, লাঠি ও খেলনা তৈরি হয়। তালপাতা থেকে হাতপাখা তৈরি করা হয়। এ ছাড়া টুপি, ঝুড়ি, চাটাই, মাদুর ও ছাতা তৈরির কাজেও তালপাতা ব্যবহৃত হয়। পত্রফলকের দণ্ড বা রশ্মি থেকে বিশেষ ধরনের ঝাড়ু তৈরি করা যায়।

তালগাছের ফল গ্রীষ্মকালে পাকে। পাকা ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন আছে। এ ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তালগাছের রস ঘন ও উন্নত পানীয়। এ রস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তালরস গাঁজিয়ে মদ তৈরি করা হয়। এ রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা যায়। এ ছাড়া তালের রসের চিনি থেকে তালমিছরি প্রস্তুত করা হয়। তালমিছরি কাশির জন্য উপকারী।

বীজের সাহায্যে তালগাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপণ করা খুব সহজ কাজ নয়। তাই জায়গা ঠিক করে একবারেই বীজ লাগানো হয়। তালগাছ বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এদের তেমন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে চারাগাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখা দরকার। সার ও পানি সরবরাহ করা হলে তালগাছ অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে এবং ফলন দেয়। বীজ বপনের পর থেকে ১০-১২ বছরের মধ্যে গাছে ফল আসে। প্রতি গাছে বছরে ২০০-২৫০ লিটার রস এবং গড়ে ২০০-৩০০টি ফল পাওয়া যায়।

মু. আ.

www.boighar.com

তিমি (whale)

অতিকায় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। দেখতে মাছের মতো হলেও তিমি কিন্তু মাছ নয়। এরা ডিম পাড়ে না, স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণীর মতোই বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা তিমি মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়।

তিমি উষ্ণ-শোণিত প্রাণী এবং এদের হৃৎপিণ্ডে চার প্রকোষ্ঠ বা দুই অলিন্দ ও দুই নিলয় আছে। ডাঙার স্তন্যপায়ীর মতোই তিমি ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। এদের কানকো নেই। মাথার সামনের দিকে নাসারন্ধ্র আছে। জলের নিচে গেলে এর নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তিমি ৫ থেকে ১০ মিনিট পর পর মাথা জলের ওপর তোলে। শ্বাসগ্রহণ না করে তিমি একটানা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত জলের নিচে থাকতে পারে। এরা খুব ভালো সাঁতারুও বটে। তিমির দেহে লোম নেই। ত্বকের নিচের পুরু চর্বির স্তর (bublce) দেহের তাপ-সমতা রক্ষায় সহায়তা করে।

তিমি সিটেসিয়া (Cetacea) বর্গের প্রাণী। এদের এক শতেরও অধিক প্রজাতি আছে। তবে মোটামুটিভাবে তিমিকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়– দাঁতাল তিমি আর দন্তহীন তিমি। দাঁতাল তিমি আকারে একটু ছোট হয়, কিন্তু স্বভাবে ভারি হিংস্র ও উগ্র। বিভিন্ন রকম মাছ, সীল (দ্র) ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে ওরা জীবনধারণ করে। ওদের কারো কারো শুধু নিচের চোয়ালেই দাঁত থাকে, যেমন– স্পার্ম হোয়েল।

দন্তহীন তিমিদের মধ্যে নীল তিমির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত অর্থে দাঁত না থাকলেও এদের চোয়ালেও বেলীন (baleen) নামক ফস্টলপূর্ণ প্লেট থাকে যা ছাঁকনির মতো কাজ করে। তিমি হাঁ-এর ভিতরে পানিসহ যেসব জীব ঢোকায় তা ছাঁকুনিতে আটকা পড়ে। এটি সবচেয়ে বড় জাতের তিমি। শুধু তাই নয়, জলে-স্থলে সকল প্রাণীর মধ্যেও নীল তিমি সবচেয়ে বড়। পূর্ণবয়স্ক একটি নীল তিমির দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট এবং ওজন ১২৫ টন পর্যন্ত হতে পারে। এই ওজন ২৩টি হাতির সমান। নীল তিমির জিহ্বার ওজনই কেবল আড়াই টন। এরা গভীর সমুদ্রে বাস করে। নীল তিমিসহ দন্তহীন শ্রেণির তিমিরা সমুদ্রের নানা জাতের ছোট ছোট প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে।

তিমি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু প্রাণী। ২০০ থেকে ৩০০ বছর তো বাঁচেই, কারো কারো মতে ওদের পক্ষে হাজার বছর বেঁচে থাকাও অসম্ভব নয়।

তিমির তেল থেকে সাবান ও মার্জারিন নামের উন্নত মানের এক জাতীয় মাখন, হাড় থেকে সার, শিরা থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য শক্ত মজবুত সুতো তৈরি হয়। আর এর জিলেটিন (দ্র) লাগে ফটোগ্রাফি (দ্র) শিল্পের কাজে। এসব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নির্দ্বিধায় তিমি শিকার করে আসছে। ফলে সমুদ্রের এই মূল্যবান প্রাণীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই তিমি শিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

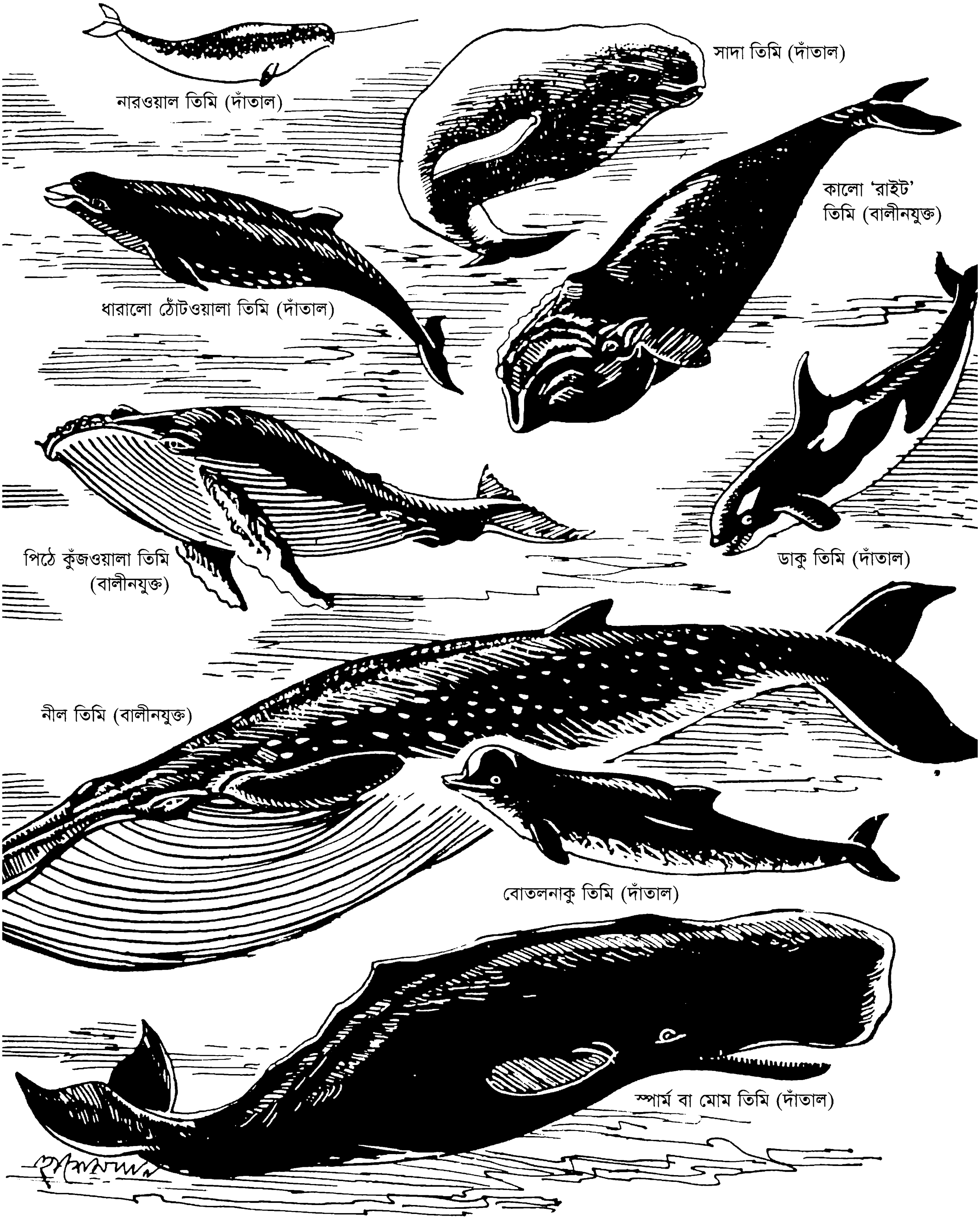

ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ও নামের তিমি

অনেক দেশেই দানা বেঁধে উঠেছে তিমি শিকার নিষিদ্ধ করে আইনও প্রণীত হয়েছে।

সুজ. ব.

তুঁত *(copper sulphate)*

ইংরেজিতে একে কপার সালফেট বা ব্লু ভিট্রিয়ল (Blue Vitriol) বলা হয়। এর আণবিক সঙ্কেত $CuSO_4.5H_2O$।

প্রস্তুতি (১) গাঢ় H_2SO_4-এর সঙ্গে ধাতব কপারকে উত্তপ্ত করলে এটি উৎপন্ন হয়।

$$Cu+2H_2SO_4 = CuSO_4+SO_2+2H_2O$$

(২) লঘু H_2SO_4-এর সঙ্গে CuO, $Cu(OH)_2$ বা $CuCO_3$-কে উত্তপ্ত করলেও এটি উৎপন্ন হয়।

উৎপাদিত কপার সালফেটের দ্রবণকে গাঢ় করে ঠাণ্ডা করলে নীল রঙের সোদক কপার সালফেট কেলাসিত হয়।

শিল্পোৎপাদন (Commercial Preparation) (১) তামার বর্জ্য থেকে তামার বর্জ্যকে একটি চুল্লিতে উত্তপ্ত করে লোহিত তপ্ত ধাতুর ওপর গন্ধকের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে কপার সালফাইড তৈরি হয়। এর পর চুল্লিতে অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহ বা অক্সিজেন (দ্র) চালিত করলে কপার সালফাইড জারিত হয়ে কপার সালফেট তৈরি হয়।

$$Cu+S = CuS, CuS+2O_2 = CuSO_4$$

উৎপাদিত $CuSO_4$-কে ঠাণ্ডা করার পর পানিতে দ্রবীভূত করে ছেঁকে নেওয়ার পর যে পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া যায়, তাকে বাষ্পায়িত করে গাঢ় করার পর ঠাণ্ডা করলে স্ফটিকাকার কপার সালফেট $CuSO_4.5H_2O$ কেলাসিত হয়।

(২) কপার পিরাইট থেকে প্রথমে কপার পিরাইটকে কম তাপমাত্রায় ও অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহে তাপজারিত (roasted) করলে কপার পিরাইটের কপার জারিত হয়ে কপার সালফেটে এবং আয়রন সালফাইড আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়। এর পর এগুলিকে পানিতে ফুটালে কপার সালফেট পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং অন্যান্য পদার্থ অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর পর অদ্রবীভূত অংশ ছেঁকে পৃথক করে পরিষ্কার পরিস্রুতকে গাঢ় করে ঠাণ্ডা করলে সোদক কপার সালফেট কেলাসিত হয়।

ধর্ম কপার সালফেট একটি নীল রঙের নিয়তাকার কঠিন পদার্থ। এটি পানিতে দ্রবণীয় এবং এতে ৫ অণু কেলাস পানি থাকে।

$CuSO_4.5H_2O$-কে ৩০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ২ অণু কেলাস পানি, ১০০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ৪ অণু কেলাস পানি এবং ২৭০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বাকি পানিটুকুও চলে গিয়ে এটি অনার্দ্র হয়ে যায়, যার বর্ণটি হল সাদা। এই অনার্দ্র কপার সালফেটকে আরো বেশি তাপে উত্তপ্ত করলে এটি বিয়োজিত হয়ে কিউপ্রিক অক্সাইড, সালফার ট্রাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনে পরিণত হয়।

$$CuSO_4 = CuO+SO_3, 2SO_3 = SO_2+O_2$$

অনার্দ্র কপার সালফেটে পানি প্রয়োগ করলে এটি নীল রঙের সোদক কপার সালফেটে পরিণত হয়।

কপার সালফেটের দ্রবণে ক্ষার যোগ করলে নীলাভ সবুজ রঙের কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$CuSO_4+2NaOH = Na_2SO_4+Cu(OH)_2$$

কপার সালফেটের দ্রবণে অ্যামোনিয়া (দ্র) চালনা করলে প্রথমে ক্ষারীয় কিউপ্রিক সালফেটের নীলাভ সবুজ অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ায় এই অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল রঙের টেট্রা-অ্যামাইনো কিউপ্রিক দ্রবণ সৃষ্টি করে।

ব্যবহার ইলেকট্রোপ্লেটিং ও ইলেকট্রোটাইপিং এবং কপারের ইলেকট্রোরিফাইনিং এবং কিছু কিছু তড়িৎ-কোষে এটি ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক শিল্পে এবং কালিকো প্রিন্টিং-এ এর ব্যবহার রয়েছে। জীবাণু (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) ঔষধ হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে গোল আলুর গাছের ফাঙ্গাস দমনের জন্য যে বোর্দো মিশ্রণ (Bordeaux mixture) ব্যবহার করা হয়, তাতে ১১ ভাগ চুন (দ্র), ১৬ ভাগ কপার সালফেট ও ১০০০ ভাগ পানি থাকে। জৈব তরলে সামান্যতম পানির অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য অনার্দ্র কপার সালফেট ব্যবহৃত হয়। কেননা অনার্দ্র কপার সালফেটে পানি পড়লেই তার সাদা রঙ নীল রঙে পরিণত হয়।

আ. হ. খ.

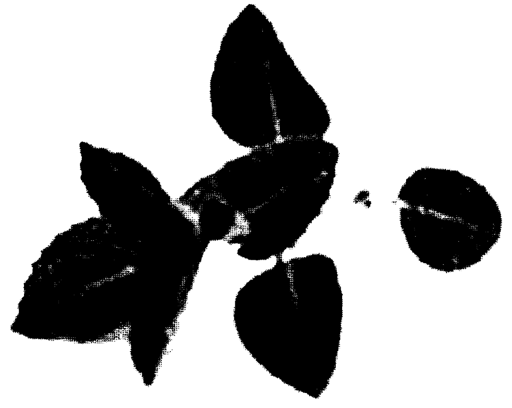

তুলসী পাতা

তুলসী (holy basil)

Labiatae গোত্রভুক্ত বৃহৎ বীরুৎ বা ছোট গুল্ম জাতীয় সুগন্ধি উদ্ভিদ। ইংরেজি নাম Holy basil এবং বৈজ্ঞানিক নাম ওসিমাম স্যাংটাম, লিন (*Ocimum sanctum,* Linn)। অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে বাবুই তুলসী (*O. basilicum,* Linn), রাম তুলসী (*O. grassimum,* Linn), বন তুলসী (*O. americanum,* Linn) ও কর্পূর তুলসী (*O. kilmandscharicum,* Guerk) উল্লেখযোগ্য।

তুলসীর অন্যান্য প্রচলিত নাম– তুলসী ও সুরমা (সংস্কৃত), তুলসী (হিন্দি), তুলসী (তামিল), উলসী বদরুজ (আরবি)। তুলসী গাছের উচ্চতা অর্ধ মিটার থেকে প্রায় দেড় মিটার পর্যন্ত। এর কাণ্ড শক্ত এবং চতুষ্কোনাকার। তুলসী গাছের পাতা সরল এবং এর কিনারা সাধারণত খাঁজকাটা। মঞ্জরি বড় ও অনিয়ত। ফুল প্রতি পর্বে আবর্ত আকারে সজ্জিত। শীতকালে এ গাছে ফুল ফোটে ও ফল হয়। সাধারণভাবে তুলসী সর্দি-কাশি, কৃমিনাশক, বায়ুনাশক, হজমকারক ও রুচিবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে এ দেশে ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দি-কাশিতে আদার রস ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি তাজা পাতার রস সেবন করানো হয়। ঘামাচি বা চুলকানি হলে তুলসী পাতা দূর্বা ঘাসের ডগার সঙ্গে বেটে মাখলে ভালো হয়ে যায়। অজীর্ণজনিত পেটের ব্যথায় তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী।

হোমিওপ্যাথি (দ্র)-তেও তুলসী ব্যবহার করা হয়। এর হোমিও নাম *ওসিমাম স্যাংটাম*। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই তুলসী গাছ জন্মে। তাই এ গাছ অনেক বাড়িতেই লাগানো হয়। টবে এ গাছ লাগানো যায়। কীটপতঙ্গ (দ্র) তুলসী গাছের কাছেও আসে না।

ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) মতে এক তোলা গোলমরিচের সঙ্গে দুই তোলা কাঁচা তুলসী পাতা বেটে মটর দানার পরিমাণ বড়ি তৈরি করা যায়। এ বড়ি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কুইনিনের (দ্র) মতো ফলদায়ক।

মু. আ.

তুলা (cotton)

বহু প্রাচীন কাল থেকেই চীন, ভারত ও মিশরে তুলার ব্যবহার চলে আসছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ তুলা বস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি ২৫ শতাংশ তুলা কার্পেট, পর্দা, গৃহস্থালির রকমারি জিনিস তৈরির জন্য এবং অবশিষ্ট তুলা শিল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তুলার বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়।

তুলা সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভালো জন্মে। ৪০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত অঞ্চলে তুলার চাষ বেশি হয়। তুলা চাষের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত উভয়ই প্রয়োজন হয়। তুলার গুটি বের হলে শীতল ও

তুলা গাছের ফুল

শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। সামুদ্রিক আবহাওয়া তুলা চাষের সহায়ক।

সমতল বা তরঙ্গায়িত ঢালু জমি তুলা চাষের উপযোগী। তবে সমতল কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তুলা চাষ করা সহজ হয়। তুলা চাষের জন্য চুন-মিশ্রিত উর্বর দোআঁশ মাটি প্রয়োজন। কালো মাটি তুলা চাষের পক্ষে খুবই উত্তম। ভারতের কালো মাটি তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকা চাই। তুলার জমিতে সার (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) উভয়ই ব্যবহার করতে হয়। www.boighar.com

তুলা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলায় মোটা ও কর্কশ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। চীন ও ভারতে এই জাতীয় তুলা বেশি উৎপন্ন হয়। মাঝারি আঁশযুক্ত তুলাকে আমেরিকান আপল্যান্ড তুলা বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ তুলা এই শ্রেণিভুক্ত। তৃতীয় ধরনের তুলা দীর্ঘ আঁশযুক্ত। সূক্ষ্ম পশমের মতো এই তুলা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং এর অধিকাংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ব্রাজিল ও মিশর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলা উৎপাদনে চীন পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী (৩৪.১৫%)। চীনের তুলা তেমন উঁচুমানের নয়। ম্যার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলা উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ (১৬.২৬%)। যুক্তরাষ্ট্রের তুলা খুবই উঁচুমানের। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়া তৃতীয় (১৩.৪৯%), ভারত চতুর্থ (৭.৩%), পাকিস্তান পঞ্চম (৫.৫৬%) এবং ব্রাজিল ষষ্ঠ (৩.৪৭%) স্থান অধিকার করে আছে।

মিশরের নীল নদের অববাহিকায় প্রচুর দীর্ঘ আঁশযুক্ত উচ্চমানের তুলার চাষ হয়ে থাকে। অন্যান্য তুলা বা কার্পাস উৎপাদক দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক, বলকান দেশসমূহ, উগান্ডা, সুদান, উত্তর নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইদানীং বাংলাদেশেও তুলা চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

মু. এ.

তুষার (snow)

আকাশের মেঘ (দ্র) থেকে জলকণা বৃষ্টির আকারে না পড়ে বরফের আঁশ হয়ে যদি পড়তে থাকে, তাকে বলা হয় তুষার। অনেক উপরের মেঘে জলবিন্দুর সঙ্গে কিছু বরফবিন্দুও থাকে। কাছাকাছি জলবিন্দুর পানি এসব বরফবিন্দুর গায়ে জমে উঠে অনেক সময় একে অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী বরফ কেলাসে পরিণত করে। নিজ ওজনে নিচের দিকে পড়ার এক পর্যায়ে গরম বাতাসের সংস্পর্শে গলে গিয়ে এগুলো বৃষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু আবহাওয়া (দ্র) যদি নিচে ভূমি পর্যন্ত শীতল থাকে তা হলে বরফ কেলাস আর গলবার অবকাশ পায় না, চিলতে বরফ রূপেই পড়ে তুষারপাতে। বরফ কেলাসে অণুর (দ্র) বিন্যাস ষড়ভুজ আকৃতির বলে তার প্রভাবে তুষারচিলতের মধ্যেও ষড়ভুজ প্রতিসাম্যের নানা ফুলেল আকৃতি দেখা যায়। তুষার যদি শুকনো থাকে, ভেজা ও আধগলা না হয় তা হলে এই আকৃতিগুলো সুন্দর অবিকৃতভাবে দেখা যায়।

মেরু (দ্র) অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই তুষারপাত হয়। অন্যান্য বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় শীতকালে প্রচুর তুষার পড়ে। পর্বতের উপরকার তুষারগলা পানি অনেক নদীর প্রাথমিক উৎস। মজার ব্যাপার হল– শীত-প্রধান অঞ্চলে তুষার ঢাকা বাড়িঘর মানুষকে এবং তুষার-ঢাকা গাছপালা ও গুহা জীবজন্তুকে অতিরিক্ত শীত থেকে রক্ষা করে। বরফ যেহেতু তাপের ভালো

অন্তরক, তাই এর ভেতরে তাপ বজায় রাখার সুবিধা হয়। তবে তুষারপাতের বিড়ম্বনাও কম নয়। পর্বতের বৃক্ষহীন ঢালে অতিরিক্ত জমা তুষারের ধস নেমে অনেক সময় বিপজ্জনক আভালাঁশ (avalanche) বা হিমানী সম্প্রপাতের সৃষ্টি হয়। তুষারপাতে রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়, হাঁটা ও যানবাহন চলাচলের জন্য অসুবিধা ও দুর্ঘটনা ঘটায়। রাস্তায় লবণ (দ্র) আর বালি ছিটিয়ে তুষার গলানো, তুষার সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি শীত-প্রধান অঞ্চলের কিছু বাড়তি কাজ। তুষারের উপর গাড়ি চালাতে বিশেষ ধরনের টায়ার বা টায়ারের ওপর বিশেষ চেইন লাগানো হয়।

তুষারপাত অবশ্য কখনো কখনো আনন্দ করার সুযোগ এনে দেয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য। পরস্পরের গায়ে পেঁজা বরফের বড় অথচ হালকা বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করে অথবা বরফ দিয়ে মজার মজার মূর্তি তৈরি করে ওরা খুব মজা পায়।

মু. ই.

তেঁতুল (tamarind tree)

Caesalpinieae গোত্রভুক্ত উষ্ণমণ্ডলীয় বৃহদাকার চিরহরিৎ বৃক্ষ। বৈজ্ঞানিক নাম *Tamarindus indica,* Linn। এই গাছ ২৩-২৭ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। এর কাণ্ড সরল ও বহু শাখাযুক্ত। বাকল অমসৃণ, স্থূল ও প্রায় গোলাকৃতির। বাংলাদেশে তেঁতুল গাছ প্রচুর হয়। এর সংস্কৃত নাম 'তিন্তিড়ি'।

তেঁতুল গাছের কাঠ খুব শক্ত, ভারী এবং বেশ টেকসই। এতে সহজে পোকা ধরে না। গরুর গাড়ির চাকা, ঘানি, ঢেঁকি ও বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল কাঠ জ্বালানি হিসাবেও উত্তম। এ কাঠের কয়লা বারুদ তৈরিতে কাজে লাগে। তেঁতুল গাছের বাকলে ট্যানিন থাকায় তা দিয়ে মোটা কাপড় ট্যান করা চলে। এ ছাড়া তেঁতুল পাতা থেকে প্রাপ্ত হলুদ রঙ দিয়ে পশমি কাপড় রঙ করা যায়।

গ্রীষ্মকালে তেঁতুল গাছে ফুল ফোটে। ফুল হলুদ অথবা প্রায় সাদা রঙের হয়ে থাকে। প্রায় ১০-১৫টি ফুল গুচ্ছাকারে একত্রে থাকে। তেঁতুল ফল শাঁসাল। এ ফল প্রায় ৭-২০ সেমি লম্বা। চাটনি, ঔষধ এবং তরকারি হিসাবে তেঁতুল ফলের টক শাঁস ব্যবহৃত হয়। শরবত তৈরিতেও এর ব্যবহার ব্যাপক। পেয়ারার জেলির স্বাদ

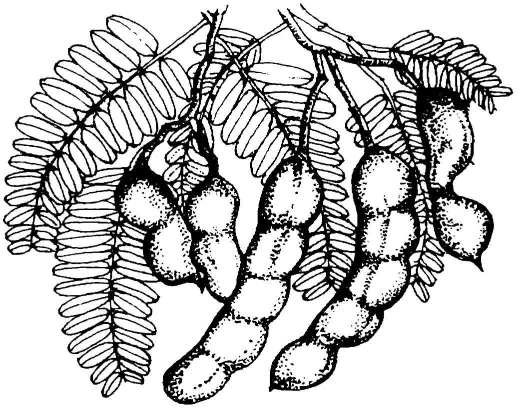

বাড়ানোর কাজেও তেঁতুল ব্যবহার করা হয়। পাকা তেঁতুল দিয়ে রুপার পাত্রসহ অন্যান্য ধাতব পাত্র পরিষ্কার করা চলে। তেঁতুলের বীচিতে বিদ্যমান পেক্টিন জ্যাম ও জেলি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুলের বীচি পানিতে ভিজিয়ে রেখে খোসা ছড়ানোর পর তা ভেজে খাওয়া যায়।

মু. আ.

তেজস্ক্রিয়া (radioactivity)

বিকিরণ (দ্র) নিঃসরণের দরুন কোনো কোনো অস্থায়ী পদার্থের নিউক্লিয়াসে ভাঙন দেখা দেয়; তাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। এদের বলা হয় নিউক্লিয়ন বা নিউক্লীয় কণা। নিউক্লিয়াসের ভিতর নিউক্লীয় কণাগুলি সব সময় নিরবচ্ছিন্ন গতিতে নড়াচড়া করতে থাকে। এই গতির জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যেসব নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল সেসব নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়নগুলি ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যায়। নিউক্লিয়াসটির ভাঙনের সময় তা থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বের হয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গমন প্রক্রিয়াকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। এসব তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হল আলফা (দ্র), বিটা ও গামা-রশ্মি। আলফা-রশ্মি হল হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের স্রোত যা ধনাত্মক চার্জযুক্ত। বিটা-রশ্মি হল ইলেকট্রনের (দ্র) স্রোত এবং ঋণাত্মক চার্জযুক্ত। গামা রশ্মির কোনো চার্জ নেই।

ফরাসি বিজ্ঞানী অঁতোয়ান অঁরি বেকেরেল (Antoine Henri Becquerel 1852-1908)

তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। দেখা যায় যেসব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ৮২-র বেশি সেগুলো সাধারণত তেজস্ক্রিয় হয়। তেজস্ক্রিয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত নিউক্লীয় ঘটনা। এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে এক মৌল অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয়। তাপ, চাপ, বিদ্যুৎ (দ্র) বা চৌম্বক ক্ষেত্রের (দ্র) মতো বাইরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা তেজস্ক্রিয়া প্রভাবিত হয় না। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জীবের জন্য ক্ষতিকর। তবে এর কল্যাণকর দিকও রয়েছে। ক্যান্সার (দ্র)-সহ কিছু রোগের চিকিৎসায় এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কোনো বস্তুর বয়স নির্ণয়েও রেডিওঅ্যাকটিভ ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

তেল-চর্বি (oil and fat)

আমাদের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদানের অন্যতম হল স্নেহজাতীয় উপাদান তেল-চর্বি। সাধারণ উত্তাপে তরল অবস্থায় থাকলে একে তেল এবং অন্যথায় চর্বি বলে অভিহিত করা হয়। এটি শরীরে শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে ঘন ও দক্ষ উৎস। প্রতি গ্রাম চর্বি ৯ ক্যালরি শক্তি উৎপাদন করতে পারে, অথচ প্রতি গ্রাম শর্করা অথবা আমিষ পারে ৪ ক্যালরি। খাদ্যের উপাদান শর্করা, আমিষ বা তেল-চর্বি শরীরে অব্যবহৃত থেকে গেলে তা সবই শেষ পর্যন্ত চর্বি রূপে শরীরে জমা হয়। এ রকম জমা চর্বির অধিকাংশ থাকে চামড়ার ঠিক নিচে। কখনো খাদ্যে যথেষ্ট শক্তি-উৎসের অভাব হলে তখন এই সঞ্চিত চর্বি ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া অন্তরক হিসাবে চর্বির এই আবরণ শরীরের তাপক্ষয় রোধ করে এবং চর্বির গদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। তেল-চর্বির প্রধান উপাদান ফ্যাটি অ্যাসিড। কোনো কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড শরীর গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ভালো পাওয়া যায় তেল-চর্বির কিছু উৎসের মধ্যে যেখানে তা স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকে না– যেমন দুধ, ডিম, মাছ, বাদাম ইত্যাদি থেকে।

সাধারণত গ্লিসারিনের (দ্র) একটি অণু (দ্র) এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের তিনটি অণুর সমন্বয়ে তেল-চর্বির একটি অণু গঠিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুতে কার্বন (দ্র) পরমাণুর (দ্র) দীর্ঘ শৃঙ্খলে প্রত্যেকটি কার্বনের সঙ্গে যদি যতগুলো সম্ভব ততগুলো হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণু যুক্ত থাকে তবে তা গঠন করে সম্পৃক্ত চর্বি। পশুপাখি থেকে পাওয়া চর্বিগুলো সম্পৃক্তই হয়ে থাকে। এ রকম চর্বি খাদ্যে বেশি থাকলে তা রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টরল বাড়িয়ে রক্তনালি সঙ্কুচিত হবার ও হৃদ্‌রোগ (দ্র) ঘটাবার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনশৃঙ্খলে এক বা একাধিক যোজনী যদি হাইড্রোজেন-বিহীন হয় তা হলে তা যথাক্রমে অসম্পৃক্ত বা বহু-অসম্পৃক্ত চর্বি বলে পরিচিত হয়। তরল উদ্ভিদ (দ্র) ও মাছের তেল এই দলে পড়ে। কোলেস্টেরলের দিক থেকে এগুলো নিরাপদ। তবে সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত চর্বি গ্রহণ শরীরে মেদের সৃষ্টি করে। মেদবহুল শরীরে অনেক রোগের চিকিৎসা কঠিন হয়– যেমন ডায়াবেটিস (দ্র), লিভার সিরোসিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি।

যেসব তৈলবীজ থেকে উদ্ভিজ্জ তেল পাওয়া যায় তার মধ্যে আমাদের অধিক ব্যবহৃত সয়াবীন (দ্র), বাদাম, সরষে (দ্র) ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে সূর্যমুখী বীজ, ভুট্টা (দ্র), জলপাই, নারকেল (দ্র) ইত্যাদি তেল। নিম্নচাপে ঠাণ্ডা অবস্থায় নিষ্পেষণ করে (যেমন সাধারণ ঘানিতে), উচ্চ চাপে উত্তপ্ত অবস্থায় নিষ্পেষণ করে, অথবা তেলের কোনো দ্রাবক ব্যবহার করে তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। শেষের পদ্ধতি দু'টিতে উৎপন্ন তেলকে যথেষ্ট বিশোধন করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তেল-চর্বি পানিতে দ্রাব্য নয়, তবে অ্যালকোহল (দ্র), ক্লোরোফর্ম, ইথার এবং পেট্রোলিয়ামে (দ্র) দ্রাব্য। উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন মিশিয়ে এর সম্পৃক্ততা এবং সেই সঙ্গে কাঠিন্য বাড়ানো যায়। এভাবে হাইড্রোজেন পদ্ধতিতে উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতি বা মার্জারিন তৈরি করা হয়। অন্য দিকে মাখন একটি সম্পৃক্ত প্রাণিজ চর্বি।

মু. ই.

তেলাপোকা আরশোলা দ্র

ত্বক / চর্ম (skin)

ত্বক দেহের রেচন অঙ্গের একটি অংশ, যা সমস্ত দেহকে আবৃত করে রাখে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ত্বকের ওজন গড়ে চার কেজি। ত্বক তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি।

এপিডার্মিস (epidermis) এটি প্রথম স্তর। এই স্তরে রক্তজালিকা ও স্নায়ু থাকে না। এখানে ঘাম নিঃসরণের উপযোগী অসংখ্য লোমকূপ থাকে। এই স্তরে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয়, যা দেহত্বকের রঙ নির্ধারণ করে। এর নিচের স্তর থেকে নতুন কোষ তৈরি হয় এবং উপরের কোষ খসে যায়।

ডার্মিস (dermis) এটি দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে রক্তনালি, লসিকানালি, স্নায়ু, ঘর্মগ্রন্থি ও তৈলগ্রন্থি থাকে।

হাইপোডার্মিস (hypodermis) এটি তৃতীয় স্তর। এই স্তরে চর্বি থাকে।

ত্বক দেহের কোমল অংশকে আঘাত এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ত্বকে স্নায়ুকোষ থাকায় আমরা ঠাণ্ডা, গরম, স্পর্শ, বেদনা ইত্যাদি অনুভব করি। ত্বকের নিচের চর্বি সূর্যের অতিবেগুনি (ultra-violet) রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন-ডি তৈরি করে।

ত্বকে ছত্রাক (দ্র) সংক্রমণ সচরাচর হয়। দাদ, খোস-পাঁচড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দেখা যায়। স্বাস্থ্যবিধি পালন ও পরিচ্ছন্নতা চর্মরোগ প্রতিরোধের উপায়। অবশ্য রোগের ক্ষেত্রে দরকার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা। ত্বকের অসুখ বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই অবহেলা না করে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

আ. আ. হা.

ত্বরণ (acceleration)

ত্বরণ হচ্ছে গতির পরিবর্তনের হার। ধরা যাক, কোনো বস্তুর গতি কোনো বিশেষ সময় T_1-এ হচ্ছে V_1 এবং T_2 সময়ে এই গতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে V_2। তা হলে গতির পরিবর্তন এখানে $V_2 - V_1$। এই পরিবর্তন ঘটেছে $T_2 - T_1$ সময়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ত্বরণ হচ্ছে $(V_2 - V_1)/(T_2 - T_1)$। আমরা যদি দূরত্ব মিটারে মাপি এবং সময় সেকেন্ডে, তা হলে গতির একক দাঁড়ায় মিটার/সেকেন্ড এবং ত্বরণের একক দাঁড়ায় মিটার/(সেকেন্ড)^২। এই এককে গণনা করলে আমরা দেখি, যে কোনো বস্তু যখন পৃথিবীর টানে নিচে পড়তে থাকে তা ৯.৮ মিটার/(সেকেন্ড)^২ ত্বরণ লাভ করে। কোনো বস্তুর উপরে বল কাজ করলেই মাত্র এর ত্বরণ ঘটে এবং সেই ত্বরণ প্রযুক্ত বলের আনুপাতিক গতির হার যখন সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তখন আমরা ধনাত্মক ত্বরণ পাই। যদি সময়ের সঙ্গে গতি কমতে থাকে তা হলে ঋণাত্মক ত্বরণ পাই। ঋণাত্মক ত্বরণকে মন্দন বলে। কোনো ট্রেন যখন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে তখন তা কিছুক্ষণ ত্বরণ লাভ করে। যখন ট্রেনের গতি নির্দিষ্ট মান লাভ করে অর্থাৎ স্থির গতিতে উপনীত হয়, তখন ট্রেনের ত্বরণ হয় শূন্য। কোনো ট্রেন যখন স্টেশনে থামার আগে গতি মন্থর করতে থাকে, তখন এর ত্বরণ হয় ঋণাত্মক অর্থাৎ ট্রেনের গতির মন্দন ঘটে।

আমরা শুধু ত্বরণকেই দৈহিকভাবে অনুভব করতে পারি। কোনো যানবাহন যদি ত্বরণহীন গতিতে চলে, অর্থাৎ অপরিবর্তী গতিতে চলে, তা আমরা বাইরে না তাকিয়ে টের পাই না। এই জন্যই বলা হয় যে, গতি পরমভাবে মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু ত্বরণ পরমভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

আ. আ.

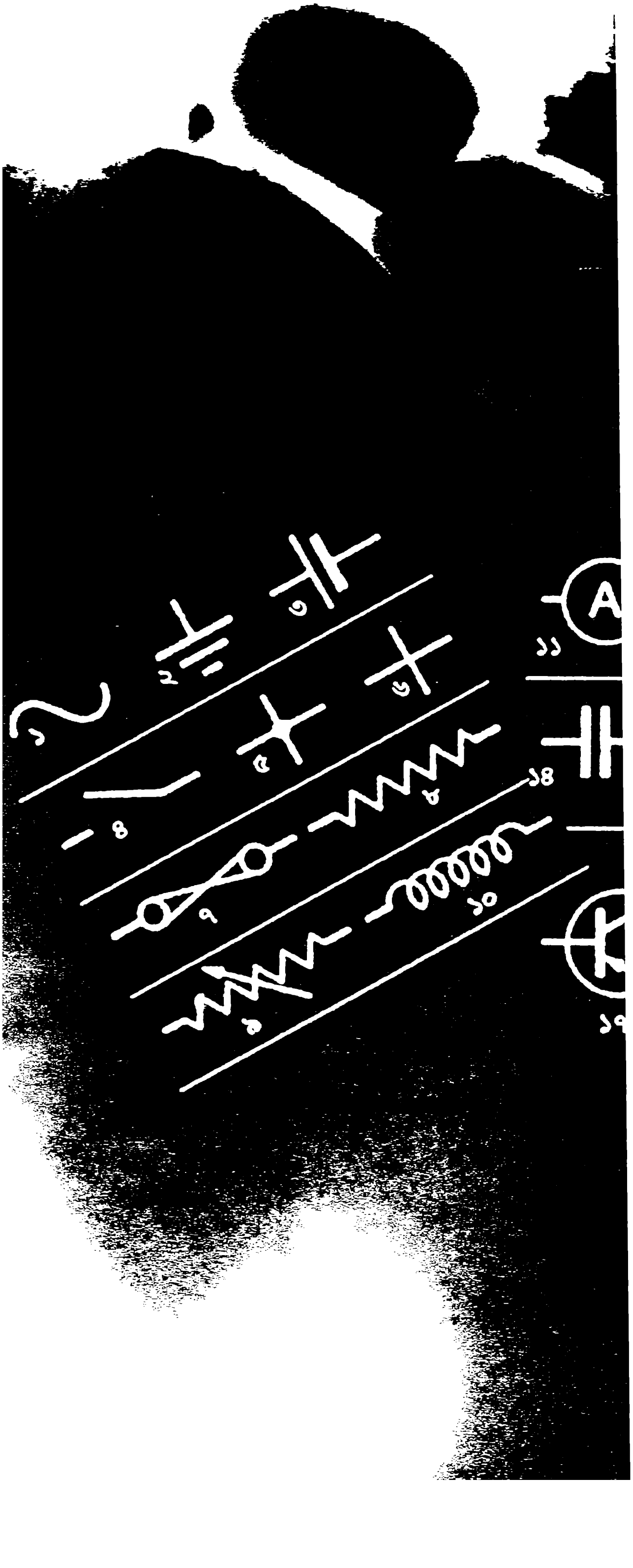

পেট্রোল-ইঞ্জিনচালিত প্লেন উদ্ভাবনের আগে পাখিদের ডানার ও ওড়ার কৌশল অনুসরণ করে ইঞ্জিনবিহীন এক প্লেন নির্মাণ করা হয়েছিল। তার নাম কী ?
–গ্লাইডার

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি ও ছোট পাখির নাম কী ? – উটপাখি ও হামিং বার্ড।

আদিকাল থেকে গোলাপ পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয়। বাগানের ছোট্ট গোলাপ থেকে দীর্ঘগুল্ম বা লতানে গোলাপসহ শত শত রকমের গোলাপ রয়েছে। প্রধানত ৭টি প্রজাতি থেকে আধুনিক সঙ্কর গোলাপের উৎপত্তি।

জলে স্থলে সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী, দেখতে মাছের মতো হলেও কিন্তু মাছ নয়। এই প্রাণীর নাম ?
–তিমি।

ভূগোল, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পরিবেশবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে ছোটদের বিজ্ঞানকোষের প্রথম খণ্ড।
এই খণ্ডের মোট ভুক্তিসংখ্যা ৫৬৩।

মূল্য : ৳ ৫২৫.০০
ISBN : 984-70076-0650-4